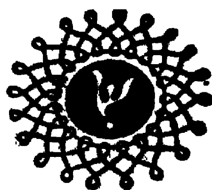
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ



নবপত্র প্রকাশন / কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম নবপত্র-প্রকাশ : ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬০
প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট / কলিকাতা-৭০০০৭৩
মুদ্রক : আশীষ কোঙার
শ্রীগুরু প্রিণ্টার্স
৯এ রায় বাগান স্ট্রীট / কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫ সাল) বেধেছিল পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকটের ক্রমবর্ধমান তীব্রতার পরিস্থিতিতে এবং তা ছিল সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের আগ্রাসী, সোভিয়েতবিরোধী নীতির পরিণাম ফল। এই যুদ্ধের কারণগুলো নিহিত ছিল সমগ্র বিশ্বকে নিজের বশীভূত করতে ও গোলাম বানাতে প্রয়াসী সাম্রাজ্যবাদের খোদ চরিত্রে। যুদ্ধটি ছিল পৃথিবীর পুনর্বণ্টনের জন্য, বিশ্ব বাজারের জন্য ও কাঁচামালের জন্য সংগ্রামে সবচেয়ে বড় পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিরোধিতা বৃদ্ধির ফল। এক দিকে ছিল নাৎসি জার্মানি, ফ্যাসিস্ট ইতালি ও সমরবাদী জাপান, আর অন্য দিকে — ইংলন্ড, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু এই গ্রুপ দু'টির মধ্যে কঠোর সংগ্রাম সত্ত্বেও তাদের ঐক্যবদ্ধ করছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি, সমাজতন্ত্র নির্মাণে তার সাফল্যাদির প্রতি এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে তার মর্যাদা বৃদ্ধির প্রতি শ্রেণীগত বিদ্বেষ।

ব্রিটিশ, ফরাসি ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার এবং বিশ্ব মঞ্চে বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বী হিশেবে জার্মানিকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে সর্বশক্তি দিয়ে ফ্যাসিস্ট জার্মানির আগ্রাসনমূলক আকাঙ্ক্ষাকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে চালিত করতে সচেষ্ট ছিল। তারা ভেবেছিল যে জার্মান ফ্যাসিজমের মধ্যে তারা এমন এক আক্রমণকারী শক্তিকে খুঁজে পেয়েছে যেটাকে সোভিয়েত দেশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্যবহার করা যাবে। আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের — এবং সর্বাগ্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের — ব্যাপক রাজনৈতিক ও প্রভূত আর্থিক সহায়তা পেয়ে জার্মান ফ্যাসিস্টরা আর জাপানী সমরবাদীরা বিশাল এক আগ্রাসক সামরিক শক্তি গড়ে তোলে। গোড়াতে জাপান কর্তৃক এই শক্তিটি ব্যবহৃত হয় চীনের বিরুদ্ধে। ১৯৩১ সালে জাপানী সৈন্যরা মাঞ্চুরিয়া দখল শুরু করে। এর অব্যবহিত পরে জার্মানি অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া আর

পোল্যাণ্ড অধিকার করে নেয়। এর পর আগ্রাসন যন্ত্রটি চালিত হয় তাদেরই বিরুদ্ধে যারা জার্মানিতে ফ্যাসিস্ট শাসন সুদৃঢ়করণে সহায়তা করেছিল, — ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও তাদের মিত্রদের বিরুদ্ধে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন নীতির ঘোর বিরোধিতা করছিল। সে দৃঢ়তার সঙ্গে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে ফ্যাসিজম আর যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়ছিল এবং যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ার জন্য একনিষ্ঠভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে শান্তির সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল পুঁজিতান্ত্রিক দেশসমূহের কমিউনিস্ট পার্টিগুলো, জাতীয় মুক্তি আর স্বাধীনতার সংগ্রামীরা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের দু'টি গ্রুপের মধ্যে এক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হিশেবে। ফ্যাসিস্ট জার্মানি কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের দরুন যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশগ্রহণ এবং হিটলারবিরোধী জোট গঠন যুদ্ধের ন্যায়সঙ্গত ও ফ্যাসিস্টবিরোধী চরিত্র স্থির করে। বিশ্বের পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর ব্রিটেনের শাসক মহলগুলোকে তাদের পররাষ্ট্র নীতি পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করে। ১৯৪১ সালের ২৩ জুন এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্থায়ী পররাষ্ট্র মন্ত্রী স. উওলেস বলেন যে 'আজ হিটলারী বাহিনীগুলো হচ্ছে আমেরিকা মহাদেশের জন্য প্রধান বিপদ'।* ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলও অনুরূপ কথা বলেছিলেন। এবং সত্যিই পৃথিবীর সমস্ত দেশের জাতিসমূহ তখন ফ্যাসিস্ট দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতে যাচ্ছিল।

যুদ্ধ চলাকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য পশ্চিমী দেশের রাজনৈতিক লক্ষ্য সব ক্ষেত্রে সমান ছিল না। তবে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রসমূহকে পরাস্ত করার ব্যাপারে তাদের অভিন্ন অভিপ্রায়টি সামরিক-রাজনৈতিক জোট গঠনের জন্য ভিত্তি হিশেবে কাজ করেছিল। হিটলারবিরোধী জোটের উদ্ভব ঘটার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড ও জোটভুক্ত অন্যান্য দেশের শক্তির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক আর অর্থনৈতিক ক্ষমতা একত্রিত করার সুযোগ মিলল। এই

বিশাল শক্তির সর্বাধিক ফলপ্রসূ ব্যবহারে বাধা সৃষ্টি করে যুদ্ধের রাজনৈতিক ও রণনৈতিক লক্ষ্য উপলব্ধিতে প্রভেদ প্রসূত বিরোধগুলো।

পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহ এই আশা করেছিল যে যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ফ্যাসিস্ট জার্মানি দুর্বল হয়ে পড়লে তারা নিজেরাই পরে যুদ্ধোত্তর বিশ্বের ভাগ্য নির্ধারণ করবে। সবচেয়ে স্পষ্ট ও তীব্রভাবে বিরোধগুলোর প্রকাশ ঘটে ইউরোপে মিত্র শক্তিসমূহ কর্তৃক দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার সময় নির্ধারণের প্রশ্নে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন অনেক বিলম্বের পর তা খুলল ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্ম কালে, যখন সবার কাছেই এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়ন একাই ফ্যাসিস্ট জার্মানিকে পরাজিত করতে পারবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডের রণনীতিজ্ঞরা উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা আর মধ্য প্রাচ্যের গৌণ যুদ্ধক্ষেত্রগুলোতে তাদের সৈন্য প্রেরণ করছিল, অথচ তখন যুদ্ধের গতি নির্ধারিত হচ্ছিল সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে, যেখানে মোতায়েন করা হয়েছিল ফ্যাসিস্ট জার্মানির প্রধান বাহিনীগুলো।

হিটলারবিরোধী জোটের সদস্যদের মধ্যে বিদ্যমান মতবিরোধ সত্ত্বেও তা তার প্রধান সমস্যাটি সাফল্যের সঙ্গে সমাধান করেছিল — বিশ্বাধিপত্যের দাবিদারদের পূর্ণ পরাজয় এনে দিয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি কার্যে লিপ্ত ছিল আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়া এবং তা বাধিয়েছিল মুখ্য আগ্রাসক রাষ্ট্রগুলো — ফ্যাসিস্ট জার্মানি, ফ্যাসিস্ট ইতালি ও সমরবাদী জাপান। এটা ছিল মানবেতিহাসের বৃহত্তম যুদ্ধ। তাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিল পৃথিবীর ৮০ শতাংশেরও বেশি অধিবাসী আর সামরিক ক্রিয়াকলাপ চলছিল তিন মহাদেশে এবং সাগর-মহাসাগরের বিশাল বিশাল এলাকা জুড়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ ছিল সোভিয়েত জনগণের দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধ (১৯৪১-১৯৪৫), যখন হিটলারী জার্মানি ও তার মিত্রদের প্রধান শক্তিসমূহের আঘাত ঠেকাতে হয়েছিল সোভিয়েত মানুষকে। ফ্যাসিস্ট জার্মানির নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের জোটটির বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনগণকে প্রকৃত পক্ষে একাই একনাগাড়ে তিন বছর লড়তে হয়েছিল। ঠিক পূর্ব রণাঙ্গনেই বিনষ্ট হয় সেই জোটের সামরিক ক্ষমতা, এবং কঠোর সংগ্রামে বিধ্বস্ত হয় ফ্যাসিজম। ১৯৪৫ সালের ৯ মে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উদ্যোক্তা নাৎসি জার্মানি আত্মসমর্পণ করে। ২ সেপ্টেম্বর, সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর হাতে কুয়াণ্টুং বাহিনীর পরাজয়ের

পর, সমরবাদী জাপানের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দলিলটি স্বাক্ষরিত হয়।

ফ্যাসিস্ট জোটের বিরুদ্ধে বিজয় ছিল হিটলারবিরোধী জোটের দেশসমূহের জাতিগুলোর মিলিত বিজয়, তবে তাতে চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করে সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে বিধ্বংস হয়েছিল জার্মানি এবং তার তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলোর প্রধান শক্তিসমূহ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বলি হয় অগণিত মানুষ, তা জনগণের জন্য নিয়ে আসে অকথ্য দুঃখদুর্দশা আর লাঞ্ছনা। এই যুদ্ধে নিহত হয় ৫ কোটিরও বেশি লোক। বৈষয়িক ক্ষয়ক্ষতির হিসাব দাঁড়ায় প্রায় ৪ লক্ষ কোটি ডলার। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় অসংখ্য শহর আর গ্রাম, বিলুপ্ত হয়ে যায় মানব প্রতিভার বহু মহান সৃষ্টি, ক্ষত, রোগ আর অনাহারের দরুন বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে কোটি কোটি মানুষ। এরূপই ছিল সাম্রাজ্যবাদ প্রসূত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ানক মূল্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে ৫টি পর্বে বিভক্ত করা যায়।

প্রথম পর্ব (১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪১ সালের ২১ জুন পর্যন্ত) — যুদ্ধ আরম্ভ এবং পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহে জার্মান সৈন্যদের আক্রমণাভিযান।

দ্বিতীয় পর্ব (১৯৪১ সালের ২২ জুন থেকে ১৯৪২ সালের ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত) — সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর ফ্যাসিস্ট জার্মানির আক্রমণ, যুদ্ধের আয়তন বৃদ্ধি এবং হিটলারের বিদ্যুৎগতির যুদ্ধ ('ব্লিট্‌সক্রিগ') নীতির অকৃতকার্যতা।

তৃতীয় পর্ব (১৯৪২ সালের ১৯ নভেম্বর থেকে ১৯৪৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত) — যুদ্ধের মোড় বদল, ফ্যাসিস্ট জোটের আক্রমণাত্মক রণনীতির ব্যর্থতা।

চতুর্থ পর্ব (১৯৪৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ১৯৪৫ সালের ৯ মে পর্যন্ত) — ইউরোপে ফ্যাসিস্ট জোটের পরাভব, সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূখণ্ড থেকে শত্রু বাহিনীর বিতাড়ন, দ্বিতীয় রণাঙ্গন উদ্‌ঘাটন, নাৎসি দখল থেকে ইউরোপের দেশসমূহের মুক্তি, ফ্যাসিস্ট জার্মানির পূর্ণ পতন এবং তার নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ।

পঞ্চম পর্ব (১৯৪৫ সালের ৯ মে থেকে ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) — সাম্রাজ্যবাদী জাপানের পরাজয়, জাপানী দখল থেকে এশিয়ার জাতিসমূহের মুক্তি এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান।

এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস গ্রন্থটিতে নির্দিষ্ট উদাহরণের ভিত্তিতে,

মহাফেজখানা থেকে প্রাপ্ত নতুন ও স্বল্পজ্ঞাত দলিলাদির সাহায্যে, সোভিয়েত এবং বিদেশী রাজনীতিজ্ঞ আর সেনাপতিদের স্মৃতিকথার সহায়তা নিয়ে বর্ণিত হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান ঘটনাবলির কাহিনী। বইটিতে নির্দিষ্ট কিছু সামরিক ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তেও উপনীত হওয়া গেছে।

এই বইয়ে মোট ২১টি নকশা-মানচিত্র আছে। সেগুলির তালিকা ও সংকেতের অর্থ বইটির শেষে দেওয়া হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

যুদ্ধের আগে

১। জার্মান ফ্যাসিজম — ইউরোপে যুদ্ধের প্রধান জ্বালামুখ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধানোর মূলে ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ। যুদ্ধ শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই তারা তাদের আগ্রাসনমূলক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের জন্য অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে তুলতে আরম্ভ করে। ৩০-এর বছরগুলোতে পৃথিবীতে যুদ্ধের প্রধান উৎস ছিল দু'টি। একটি ইউরোপে — ফ্যাসিস্ট জার্মানি ও ইতালি, অন্যটি দূর প্রাচ্যে — সমরবাদী জাপান।

জার্মান সাম্রাজ্যবাদ ১৯১৯ সালের অন্যায্য ভার্সাই শান্তি চুক্তি বাতিল করার অজুহাতে আপন স্বার্থে পৃথিবী পুনর্বণ্টনের দাবি তোলে এবং ফ্যাসিজমের মানববিদ্বেষী ভাবাদর্শের ভিত্তিতে 'নতুন ব্যবস্থা' গড়তে প্রয়াসী হয়।

হিটলারের নেতৃত্বাধীন ফ্যাসিস্ট পার্টিটি — যা ভণ্ডভাবে নিজেকে ন্যাশনাল-সোশ্যালিস্ট শ্রমিক পার্টি বলে অভিহিত করত — জার্মান জাতির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য খোলাখুলিভাবে যুদ্ধের উগ্রজাতিবাদী স্লোগান দিচ্ছিল, অন্য জাতিদের প্রতি বিদ্বেষ প্রচার করছিল এবং কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কঠোর নির্যাতন চালানোর ও শ্রমিক আন্দোলন দমন করার দাবি জানাচ্ছিল। ১৯৩৩ সালে ক্ষমতায় এসে হিটলারপন্থীরা জার্মানির প্রগতিশীল শক্তিসমূহের উপর এবং সর্বাগ্রে কমিউনিস্টদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে, সমস্ত রকমের গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা ধ্বংস করে দেয় এবং জার্মানির বিশ্বাধিপত্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পাগলের মতো প্রলাপ বকতে থাকে।

১৯৩৫ সালে নাৎসি পার্টির কংগ্রেসে জাতিগত 'বিজ্ঞানকে' 'প্রকৃতি আর মানব ইতিহাসের ন্যাশনাল-সোশ্যালিস্ট উপলব্ধির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি বলে', 'ন্যাশনাল-সোশ্যালিস্ট রাইখের আইনপ্রণয়নের... ভিত্তি বলে'

ঘোষণা করা হয়েছিল, আর বর্ণবৈষম্যবাদের প্রধান তাত্ত্বিক অধ্যাপক গ. গ্যুন্টেরকে ওই কংগ্রেসের সিদ্ধান্তক্রমে 'বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পুরস্কার' দিয়ে ভূষিত করা হয়।*

ফ্যাসিস্টরা কমিউনিজম আর সোভিয়েত ইউনিয়নকে 'সমগ্র বিশ্বের শত্রু' বলে অভিহিত করত, আর 'তৃতীয় সাম্রাজ্য' জার্মানিকে 'পাশ্চাত্য সভ্যতার দুর্গ' বলে ঘোষণা করল। সশস্ত্রীকরণ ও পূর্বাভিমুখে যুদ্ধাভিযান আয়োজনের প্রশ্নে তারা জার্মানিকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানের দাবি জানায়। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে গিয়ে ১৯৩৫ সালের ১৬ মার্চ ফ্যাসিস্টরা জার্মান সশস্ত্র বাহিনী — ভের্মাখ্‌ট গঠনের বিষয়ে এবং বাধ্যতামূলক সর্বজনীন সৈনিক বৃত্তি চালুকরণের বিষয়ে একটি আইন পাস করে, দেশকে দ্রুত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করার উদ্দেশ্যে উঠে পড়ে লাগে। অল্পকাল পরেই, ১৯৩৫ সালের ২১ মে, ফ্যাসিস্ট সরকার 'সাম্রাজ্য প্রতিরক্ষা বিষয়ক' একটি আইন গ্রহণ করে, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্তও গোপন রাখা হয়। তাতে যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে, তা আরম্ভ ও পরিচালনা কালে সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কর্তব্য নির্ধারিত হয়েছিল। আইনটি হিটলারকে দিল দেশে সামরিক শাসন প্রবর্তনের বিষয়ে, ব্যাপক সৈন্যযোজনের বিষয়ে এবং যুদ্ধ ঘোষণার বিষয়ে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার।** ন্যুরেমবার্গ মোকদ্দমায় প্রতিরক্ষা বিষয়ক আইনটি যুদ্ধের জন্য নাৎসি জার্মানির সমগ্র প্রস্তুতির ভিত্তি বলে বর্ণিত হয়।

জার্মানিকে আগ্রাসী রাষ্ট্রে পরিণতকরণের উদ্দেশ্যে জার্মান ফ্যাসিস্টদের অতি দ্রুত ও উত্তেজনাপূর্ণ ক্রিয়াকলাপের চরম সীমা ছিল ফ্যাসিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেস, যা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। ওই কংগ্রেসটি 'মুক্তির পার্টি কংগ্রেস' বলে অভিহিত হয়, আর ১৯৩৫ সালকে ঘোষণা করা হয় 'স্বাধীনতা বর্ষ' বলে। নাৎসিরা ঘোষণা করল যে জার্মানরা এবার, অবশেষে, দীর্ঘ প্রত্যাশিত সামরিক সার্বভৌমত্ব, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার স্বাধীনতা অর্জন করল। কংগ্রেসটিতে খোলাখুলিভাবে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের দ্রুত বর্ধমান সামরিক শক্তি প্রদর্শন করা হয়, যুদ্ধের প্রস্তুতির স্বার্থে

* Der Parteitag der Freiheit vom 10-16 September 1935. Offizieller Bericht, S. 50-54.

** মিউলের-গিলেব্রান্ড ব. ১৯৩৩-১৯৪৫ সালে জার্মানির স্থলসেনা। খণ্ড ১, পৃঃ ৩০।

জার্মানির জনগণকে ভাবাদর্শগত ও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে তৈরি করে তোলার জন্য বিশাল প্রচারমূলক ক্রিয়াকলাপ চালানো হয়। ১৯৩৬ সালে নাৎসিরা স্বাক্ষরিত সমস্ত চুক্তি অমান্য করে রাইন অঞ্চলে সৈন্য মোতায়েন করে এবং আবার ফ্রান্সের সীমান্তে গিয়ে হানা দেয়।

এই ভাবে, জার্মানিতে ফ্যাসিস্টরা ক্ষমতায় এসে দেশটিকে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের প্রধান আক্রমণকারী শক্তিতে পরিণত করে, এবং সে শক্তি সর্বাগ্রে চালিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে। সার্বিক সামরিকীকরণের এবং বিশ্বাধিপত্য লাভের ফ্যাসিস্ট কর্মসূচিটি কেবল সোভিয়েত ইউনিয়ন দখলের পরিকল্পনাগুলোতেই সীমিত ছিল না, তা ব্রিটেন, ফ্রান্স আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্যও বিপদ ডেকে আনছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও শেষোক্ত দেশসমূহের শাসক মহলগুলো সোভিয়েত দেশের প্রতি তাদের চিরাচরিত শ্রেণীগত বিদ্বেষ বশত 'অহস্তক্ষেপ' আর 'নিরপেক্ষতা' নীতির আড়ালে থেকে প্রকৃতপক্ষে ফ্যাসিস্ট জোটের রাষ্ট্রগুলোকে আগ্রাসনে উৎসাহ দানের নীতিই অনুসরণ করে। জার্মানির সামরিক অর্থনীতি পুনর্গঠনে সহায়তা করে পশ্চিমের দেশগুলোর পুঁজিপতিদের কাছ থেকে, বিশেষত মার্কিন একচেটিয়াদের কাছ থেকে প্রাপ্ত পুঁজি আর ঋণ। ওদের কল্যাণে ৩০-এর বছরগুলোর শেষ ভাগে ফ্যাসিস্ট জার্মানির সামরিক শিল্পের মান একসঙ্গে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শিল্পের মিলিত মানের চেয়েও অধিকতর উচ্চে উপনীত হয়। ইতালি আর জাপানও নিজ নিজ অর্থনীতিকে যথেষ্ট সামরিকীকৃত করে তোলে।

তাছাড়া পশ্চিমী দেশগুলো ফ্যাসিস্ট জার্মানিকে স্ট্র্যাটেজিক কাঁচামাল দিয়ে সাহায্য করছিল। যেমন, ১৯৩৬ সালের অক্টোবর মাসে বিশিষ্ট জার্মান শিল্পপতি শাখ্‌ট তৃতীয় রাইখের অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রীর পদে আসীন থাকা কালে ফরাসি সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে যার শর্ত অনুসারে ফ্রান্স জার্মানিকে বছরে সাড়ে তিন শো কোটি মার্কেরও বেশি মূল্যের লৌহ আকরিক সরবরাহ করতে বাধ্য ছিল। জার্মানিতে বক্সাইট আমদানির পরিমাণও ৬ গুণ বেড়ে যায় এবং এর ফলে জার্মান ফার্মগুলো বিমান নির্মাণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের ক্ষেত্রে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে ফেলে।

১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বরে নাৎসি পার্টির নুরেমবার্গ কংগ্রেস যুদ্ধ-প্রস্তুতির লক্ষ্যে জার্মানির অর্থনীতির পরবর্তী পুনর্গঠনের জন্য একটা চারসালা পরিকল্পনা অনুমোদন করে। ১৯৩৬ সালের হেমন্তে হিটলারের

এক গোপন সার্কুলারে নির্দেশ দেওয়া হয় যে চার বছর বাদে জার্মান সৈন্য বাহিনীকে সামরিক ক্রিয়াকলাপের জন্য তৈরি থাকতে হবে, আর জার্মান অর্থনীতিকেও ওই সময়ের মধ্যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে তুলতে হবে। এবং ফ্যাসিস্ট জার্মানির সামরিক শিল্প — যা মার্কিন ও ব্রিটিশ একচেটিয়াদের সহায়তায় পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল — দ্রুত গতিতে বিকাশ লাভ করতে শুরু করে।

জার্মান অর্থনৈতিক গবেষণা ইনস্টিটিউটের (জার্মান ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্র) তথ্য অনুসারে, ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৯ সালের শেষ অবধি দেশে অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ১০ গুণ, আর বিমান নির্মাণ — প্রায় ২৩ গুণ। ওই সময়ের মধ্যে জার্মানির মেশিন নির্মাণ কারখানাসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় প্রায় ৪ গুণ। অতি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক-স্ট্র্যাটেজিক সামগ্রীর উৎপাদনও এর চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায়। যেমন, ১৯৩২ সালে অ্যালুমিনিয়াম গালাইয়ের পরিমাণ ছিল ১৯ হাজার টন, আর ১৯৩৯ সাল নাগাদ তা ১ লক্ষ ৯৪ হাজার টন অবধি বৃদ্ধি পায়, এবং এটা ছিল ইউরোপের সমস্ত পুঁজিতান্ত্রিক দেশে উৎপাদিত অ্যালুমিনিয়ামের মিলিত পরিমাণের চেয়েও বেশি। মার্কিন একচেটিয়াদের সহায়তায় জার্মান শিল্পপতিরা ১৯৩৮ সালে কৃত্রিম জ্বালানি উৎপাদনের পরিমাণ ১৬ লক্ষ টনে নিয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময় জার্মানির ধাতু প্রসেসিং লেদযন্ত্রের পার্কটি ছিল পৃথিবীতে সর্ববৃহৎ — ১৬ লক্ষটি যন্ত্র। অর্থনীতিকে সামরিকীকরণের ও মেহনতীদের কঠোর শোষণের মাধ্যমে এবং বিদেশী ঋণের কল্যাণে জার্মানি বিপুল সামরিক-শিল্প ক্ষমতা গড়ে তুলে এবং আবার সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে নিজের স্থান করে নেয়। সে যুদ্ধের জন্য, পৃথিবীর পুনর্বণ্টনের জন্য জোর প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে থাকে। ১৯৩৪ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে জার্মানির সামরিক উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ২২ গুণ, আর সশস্ত্র বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা বাড়ে ৩৫ গুণ।

নাৎসিরা রাষ্ট্রযন্ত্রের সমস্ত মুখ্য পদ নিজেদের করায়ত্ত করে ফেলে এবং তাদের অধীনস্থ সমস্ত জনবহুল সংগঠনের উপর নির্ভর করে দেশকে সরাসরিভাবে সার্বিক যুদ্ধের জন্য সমগ্র প্রস্তুত করে তুলতে থাকে। জার্মান জনগণকে ফ্যাসিজমের সন্ত্রাসবাদী ব্যবস্থার সুবিশাল এক সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরে রাখা হয়েছিল। গেস্টাপো, এস-এস, এস-ডি ইত্যাদির মতো সংস্থাগুলো নিয়ে গঠিত এই সন্ত্রাসবাদী ব্যবস্থাটি ছিল অতি জটিল ও

স্বয়ংসম্পূর্ণ এক যন্ত্র, যার সাহায্যে সমগ্র জাতিকে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের বাধ্য হাতিয়ারে পরিণত করা হচ্ছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের বিদ্বেষকে নিপুণভাবে কাজে লাগিয়ে এবং কাল্পনিক সোভিয়েত হুমকির দ্বারা ওদের ভয় দেখিয়ে ফ্যাসিস্ট নেতারা তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করছিল। হিটলার তার সহাপরাধীদের একবার বলেছিল: 'আমায় ভার্সাই চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্রসমূহকে ঠেকিয়ে রাখতে হবে... বলশেভিকবাদের ভূতের সাহায্যে, ওদের এটা বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে জার্মানি হচ্ছে লাল প্লাবনের বিরুদ্ধে শেষ দুর্গ। ভার্সাই চুক্তি বিসর্জন দিয়ে আবার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হওয়া — এই-ই হচ্ছে আমাদের পক্ষে সঙ্কটজনক সময়টি কাটিয়ে উঠার একমাত্র উপায়।'*

১৯৩৩ সালে হিটলার ক্ষমতায় এল। অব্যবহিত পরেই জার্মান ফ্যাসিজম আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণকারী শক্তি এবং যুদ্ধের প্রধান প্ররোচকের ভূমিকা গ্রহণ করল। ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব বড় বড় পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করছিল এবং বুর্জোয়া শাসনের সবচেয়ে আগ্রাসী ও সন্ত্রাসবাদী রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

দেশের অভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে জার্মান ফ্যাসিজম শ্রমিক শ্রেণীর, এবং সর্বাগ্রে তার অগ্রবাহিনী — জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনসমূহের বিলোপ সাধনে লিপ্ত হয়, অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে — এমনকি বুর্জোয়া উদারনীতিকরাও বাদ পড়ে নি — দমন করতে থাকে।

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে জার্মান ফ্যাসিজম তার দিগ্বিজয়ের ও বিশ্বাধিপত্য প্রতিষ্ঠার অপরাধজনক উদ্দেশ্যগুলো সিদ্ধ করতে চেয়েছিল ধাপে ধাপে: প্রথমে দখল করতে হবে মধ্য ইউরোপের প্রভুত্বকারী অবস্থান, এর পরে গড়তে হবে আটলান্টিক থেকে উরাল পর্যন্ত বিস্তৃত মহাদেশীয় সাম্রাজ্য, আর তারপরই লাভ করতে হবে বিশ্বাধিপত্য।

সুদৃঢ় সামরিক-অর্থনৈতিক ভিত্তি ও বিশাল সশস্ত্র বাহিনী গড়ে ফ্যাসিস্ট জার্মানি তার আক্রমণাত্মক পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের কাজে মনোনিবেশ করল। ১৯৩৬ সালে জার্মানি ও ইতালি একটি সোভিয়েতবিরোধী, তথাকথিত কমিণ্টার্নবিরোধী চুক্তি সম্পাদন করে, যাতে জাপানও যোগ দেয়। বার্লিন, রোম আর টোকিওর মধ্যে বৈধ একটি আগ্রাসী সামরিক

* Ludecke K. I Knew Hitler. — New York, 1938, p. 468.

জোট গড়ে উঠল। ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে হিটলারী সৈন্য বাহিনী অস্ট্রিয়া 'অন্তর্ভুক্তির' অজুহাতে ওই দেশটি অধিকার করে নেয়। নাৎসি জার্মানিকে চেকোস্লোভাকিয়ার অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু সীমান্তবর্তী অঞ্চল দিয়ে দেওয়ার বিষয়ে ওই বছরেরই ২৯ সেপ্টেম্বর ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইতালির প্রতিনিধিরা মিউনিখে এমন একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে, যা ইউরোপের পরিস্থিতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটায়। এ চুক্তির উদ্দেশ্যটি নিহিত ছিল আগ্রাসকদের আরও অনুপ্রেরণা দেওয়ার এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তাদের প্ররোচিত করার নীতিতে। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন ও ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী এদুয়ার্দ দালাদিয়ের চেকোস্লোভাকিয়ার প্রতিনিধিদের অনুপস্থিতিতে হিটলার আর মুসোলিনির সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন, ওদের সামনে আত্মসমর্পণ করেন। চেকোস্লোভাকিয়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে খন্ডবিখন্ড করে ফেলার উদ্দেশ্যে ফ্যাসিস্ট জার্মানির হাতে তুলে দেওয়া হয়।

৩০ সেপ্টেম্বর মিউনিখ ফয়সালার সঙ্গে যুক্ত হয় দ্বিপাক্ষিক ইঙ্গো-জার্মান ঘোষণাপত্র, যা বস্তুত পক্ষে ছিল একটি অনাক্রমণ চুক্তি। ৬ ডিসেম্বর নাৎসি জার্মানির সঙ্গে অনুরূপ ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করে ফরাসি সরকার।

চেকোস্লোভাকিয়ার ক্ষতি করে আক্রমণকারীর সঙ্গে পশ্চিমী দেশগুলো যে-চুক্তি সম্পাদন করে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার কঠোর নিন্দা করেছিল। ১৯৩৮ সালের ৪ অক্টোবর 'প্রাভদা' সংবাদপত্র লিখেছিল, 'সমগ্র পৃথিবী, সমস্ত জাতি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে: চেম্বারলেন নাকি মিউনিখে বিশ্ব শান্তি রক্ষা করেছেন, এরূপ সুন্দর সুন্দর কথার আড়ালে এমন একটি কার্য সম্পাদিত হয়েছে যা নিজস্ব নির্লজ্জতার দিক থেকে প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পরে সংঘটিত সমস্তকিছুকে হার মানায়।'

মিউনিখ চুক্তির নিন্দা করে সমগ্র বিশ্বের জনসমাজ। ১৯৩৮ সালের ৯ অক্টোবর ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'ইউমানিতে' সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল 'ফ্রান্স, ব্রিটেন, স্পেন, চেকোস্লোভাকিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ইতালি, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, সুইডেন, কানাডা আর হল্যান্ডের কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের প্রতিনিধিদের আবেদনপত্র'। তাতে বলা হয় যে 'মিউনিখে বিশ্ব শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ করা হয়েছে... মিউনিখের বিশ্বাসঘাতকতা শান্তি রক্ষা করে নি, তা বরং শান্তি ভঙ্গ করেছে, কেননা এই চুক্তি সমস্ত দেশের শান্তিকামী শক্তিসমূহের জোটের উপর আঘাত হেনেছে এবং ফ্যাসিস্টদের তাদের দাবিগুলো এত বেশি কঠোর

করতে অনুপ্রাণিত করেছে যে তারা এখন বিভিন্ন দেশের প্রতিক্রিয়াশীল মহলসমূহের কাছ থেকে সমর্থন লাভ করছে।' কমিউনিস্টরা শান্তির সমস্ত সমর্থককে গণতন্ত্রের জন্য, সামাজিক প্রগতি আর জাতিসমূহের স্বার্থ রক্ষার জন্য মহান সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানায়।

ব্রিটেন আর ফ্রান্সের নেতৃবৃন্দের আচরণ মূল্যায়ন করতে গিয়ে মার্কিন ইতিহাসবিদ ফ্রেডারিক শূমান লিখেছেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালীন পর্যায়ে গণতান্ত্রিক জাতিসমূহের দায়িত্বশীল প্রতিনিধিবৃন্দ যে ধরনের নির্বুদ্ধিতা ও বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছেন তার সঙ্গে মানুষের দুর্বলতা, নির্বুদ্ধিতা আর মানুষ কৃত অপরাধসমূহের সমগ্র লিখিত ইতিহাসে বর্ণিত কোনকিছুরই তুলনা হয় না।

পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের সোভিয়েত বিদ্বেষী শাসক মহলগুলো যুদ্ধের দিকে ফ্যাসিস্ট জার্মানির পথ অবারিত করতে গিয়ে নিজেরাই আগ্রাসনের বলিতে পরিণত হয়। তখন মিউনিখে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেনের ভূমিকা প্রসঙ্গে জার্মানির পররাষ্ট্র মন্ত্রী ইওয়াহিম রিবেণ্ট্রপ বলেছিল: 'এই বুড়োটি আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মৃত্যুর রায় স্বাক্ষর করল এবং এই রায়টি কাজে পরিণত করার জন্য তাতে আমাদের কেবল একটি তারিখ বসালেই চলবে।'*

ইউরোপে পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের নীতির সঙ্গে দূর প্রাচ্যে আগ্রাসী জাপানের 'স্বস্তিকরণ' নীতির পূর্ণ সঙ্গতি ছিল। ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে একটি ইঙ্গো-জাপানী চুক্তি সম্পাদিত হয়, যা নিজ সারাংশের দিক থেকে চীনের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ আর জাপানী সাম্রাজ্যবাদের খোলাখুলি ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এই চুক্তিটি ছিল চীনে জাপানী বাহিনীগুলোকে ইংলণ্ডের গ্যারাণ্টি দানের সমান, — জাপানী সৈন্যরা চীনের ভূখণ্ডকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মঙ্গোলিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণের পাদভূমি হিশেবে ব্যবহার করতে পারবে।

১৯৩৮ সালের ১ অক্টোবর তারিখে ফ্যাসিস্ট জার্মানি সুদেতস অঞ্চলে নিজের সৈন্য ঢুকিয়ে দেয়, আর ১৯৩৯ সালে মার্চ মাসে সারা চেকোস্লোভাকিয়া দখল করে নেয়। ১৯৩৯ সালের বসন্তে নাৎসিরা লিথুয়ানিয়ার ক্লাইপেদা জেলা অধিকার করে, এবং রুমানিয়ার উপর একটি

অন্যায় 'অর্থনৈতিক' চুক্তি চাপিয়ে দেয় যা তার অর্থনীতিকে জার্মানির অধীনস্থ করে। ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে ফ্যাসিস্ট ইতালি আলবানিয়া আত্মসাৎ করে ফেলে। ১৯৩৮ সালের শেষ দিকে জার্মানি তথাকথিত ডানজিগ সঙ্কট সৃষ্টি করে, যার উদ্দেশ্য ছিল — স্বাধীন ডানজিগ শহরের প্রতি 'ভার্সাই-এর অবিচার' দূরীকরণের দাবিদাওয়ার আড়ালে পোল্যান্ড আক্রমণ করা। ইংলন্ড ও ফ্রান্স তাদের রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে পোল্যান্ড, রুমানিয়া, গ্রীস ও তুরস্ককে তথাকথিত 'নিরাপত্তার নিশ্চয়তা' দিল, এবং তাতে পোল্যান্ডকে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল যে ফ্যাসিস্ট জার্মানি কর্তৃক সে আক্রান্ত হলে তাকে সামরিক সহায়তা প্রদান করা হবে। কিন্তু পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ থেকে যেমনটি দেখা গেল, এই সমস্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয় নি।

১৯৩৯ সালের এপ্রিল-মে মাসে জার্মানি ১৯৩৫ সালে সম্পাদিত ইঙ্গো-জার্মান সমুদ্র চুক্তি বাতিল করে দেয়, ১৯৩৪ সালে পোল্যান্ডের সঙ্গে স্বাক্ষরিত অনাক্রমণ বিষয়ক চুক্তিটি ভঙ্গ করে দেয় এবং ইতালির সঙ্গে তথাকথিত স্টিল প্যাক্ট সম্পাদন করে যা অনুসারে পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে ইতালীয় সরকার জার্মানিকে সহায়তা করতে বাধ্য ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে জার্মানির ক্ষমতাসম্পন্ন সামরিক যন্ত্র ছিল। ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর নাগাদ তার সশস্ত্র বাহিনীতে ছিল ৪৬ লক্ষ লোক, ২৬ হাজার তোপ আর মর্টার কামান (বিমান ধ্বংসী কামান ছাড়া), ৩,১৯৫টি ট্যাঙ্ক, ৪,০৯৩টি জঙ্গী বিমান, প্রধান প্রধান শ্রেণীর ১০৭টি যুদ্ধ-জাহাজ, যার মধ্যে ৫৭টি ডুবো জাহাজও ছিল।

ওই সময় ফ্রান্সের সশস্ত্র বাহিনীতে ছিল ২৬ লক্ষ ৭৪ হাজার লোক, ২৬ সহস্রাধিক তোপ আর মর্টার কামান, ৩,১০০টি ট্যাঙ্ক, ৩,৩৩৫টি বিমান, প্রধান প্রধান শ্রেণীর ১৭৪টি যুদ্ধ-জাহাজ, যার মধ্যে ৭৭টি ডুবো জাহাজ।

ইংলন্ডের মূল ভূখণ্ডে সশস্ত্র বাহিনীতে ছিল ১২ লক্ষ ৭০ হাজার লোক (আর সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে — ১৬ লক্ষ ৬২ হাজার), ৫ হাজার ৬০০টি তোপ আর মর্টার কামান, ৫৪৭টি ট্যাঙ্ক, ৩,৮৯১টি বিমান, প্রধান প্রধান শ্রেণীর ৩২৮টি যুদ্ধ-জাহাজ ও নৌ-বাহিনীর ১,২২২টি জঙ্গী বিমান।

ফ্যাসিস্ট জার্মানির রণনীতি যে-মতবাদটির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল সেই মতবাদটির নাম হল 'ব্লিট্‌সক্রিগ' — অর্থাৎ 'বিদ্যুৎগতির

যুদ্ধ'। এই ধারণা অনুসারে, বিজয় লাভ করা উচিত অল্প সময়ের মধ্যে — শত্রু কর্তৃক তার সশস্ত্র বাহিনী এবং সামরিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের আগেই। 'ব্লিট্‌সক্রিগ' মতবাদে প্রতিফলিত হয় ফ্যাসিস্ট জার্মানির আগ্রাসন নীতি, তা জার্মানির রাজনীতিজ্ঞ আর সামরিক নেতাদের হঠকারী চিন্তাধারা গড়ে তোলে এবং জার্মান সমরবাদের ঐতিহাসিক ঐতিহ্যগুলোর আয়ু বৃদ্ধি করে।

ইতালিতে সামরিক মতাবাদের সার কথাটি ছিল বায়ু যুদ্ধ। সেই সঙ্গে উভয় দেশেই ট্যাঙ্ক যুদ্ধের উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হত। ফ্রান্সে 'অবস্থানমূলক যুদ্ধের' মতবাদের প্রাধান্য ছিল, আর ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে — 'সমুদ্র শক্তির' মতবাদের।

২। দূর প্রাচ্যে যুদ্ধের জ্বালামুখ

ফ্যাসিস্ট জার্মানির মতো সমরবাদী জাপানও সর্বশক্তি দিয়ে বিশ্বাধিপত্যের জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম চালাতে প্রস্তুত হচ্ছিল। সুদীর্ঘ বছর ধরে সে সোভিয়েত দূর প্রাচ্যে, চীনে ও অন্যান্য এশীয় দেশে আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত থাকে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বৃহৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি চালিয়ে যায়। একই সঙ্গে জাপানী সমরবাদীরা পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাজারগুলো থেকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের—ইউরোপের পুঁজিতান্ত্রিক দেশসমূহ আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে — বিতাড়িত করতে এবং সুবিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়তে প্রয়াস পাচ্ছিল।

পশ্চিমের দেশসমূহ ভেবেছিল যে তারা জাপানের আক্রমণকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে পারবে এবং এই আশায় তারা তাকে স্ট্র্যাটেজিক কাঁচামাল দিয়ে সাহায্য করছিল, তার কাছে লোহ আকরিক, তেল ইত্যাদি বিক্রি করছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও নেদার্ল্যান্ডস থেকে জাপান পেল সমস্ত আমদানিকৃত সামরিক সামগ্রীর ৮৬ শতাংশ। বোঝাই যায় যে প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে বঞ্চিত জাপান এই বিপুল পরিমাণ স্ট্র্যাটেজিক মাল না পেলে কিছুতেই যুদ্ধ করতে পারত না।

এই ভাবে, ইংলন্ড, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী, সোভিয়েতবিরোধী নীতি কেবল ফ্যাসিস্ট জার্মানিকেই নয়, সমরবাদী জাপানকেও ক্রিয়াকলাপের স্বাধীনতা দিচ্ছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের

বিরুদ্ধে আক্রমণে অনুপ্রাণিত করছিল। সেই ১৯২৭ সালেই তথাকথিত 'তানাকা স্মারকলিপিতে'* চীন, ভারত ও অন্যান্য এশীয় দেশ দখলের জাপানী পরিকল্পনাগুলোর উল্লেখ ছিল। তাতে বিশেষভাবে বলা হয়েছিল যে চীন দখলের জন্য জাপানকে 'প্রথমে মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়া অধিকার করতে হবে। পৃথিবী দখল করতে হলে আমাদের প্রথমে চীন অধিকার করতে হবে। আমরা যদি চীন দখল করতে সক্ষম হই, তাহলে এশিয়া মাইনরের বাদবাকী দেশগুলো, ভারত আর দক্ষিণ সমুদ্রসমূহের দেশগুলোও আমাদের ভয় করবে এবং আমাদের সামনে আত্মসমর্পণ করবে। দুনিয়া তখন বুঝে নেবে যে পূর্ব এশিয়া আমাদের, এবং আমাদের অধিকার প্রসঙ্গে কোন প্রশ্ন তুলতে সাহস পাবে না... চীনের সমস্ত সম্পদ আত্মসাৎ করে আমরা ভারত, দক্ষিণ সমুদ্রসমূহের দেশগুলো দখল করতে আরম্ভ করব, আর তারপর এশিয়া মাইনর, মধ্য এশিয়া এবং, অবশেষে, ইউরোপ অধিকারের কাজে হাত দেব'।**

সমরবাদী জাপান তার সৈন্য বাহিনীর পুনর্সংগঠন ও পুনরস্ত্রসজ্জিতকরণের ব্যাপারে কিছু ব্যবস্থা অবলম্বনের পর তার আগ্রাসনমূলক পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়িত করতে লাগল। ১৯৩১ সালে সে দখল করে নিল উত্তর-পূর্ব চীন (ওখানে মাঞ্চু-গো নামে একটি ক্রীড়নক রাষ্ট্র গড়ল) এবং অভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়ার একটি অংশ।

মাঞ্চুরিয়া নিয়ে নেওয়ার পর জাপানী সমরবাদীরা সমগ্র চীন দখলের জন্য এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধানোর জন্য একটি পাদভূমি প্রস্তুত করতে আরম্ভ করল। জাপান ও মাঞ্চুরিয়ার কলকারখানাগুলোতে কাঁচা লোহা আর ইস্পাত গালাইয়ের পরিমাণ, কয়লা নিষ্কাশন ও কৃত্রিম তেল উৎপাদন বৃদ্ধি পেল। সামরিক কারখানাগুলো অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধোপকরণের উৎপাদন বৃদ্ধি করল। সোভিয়েত ইউনিয়ন, মঙ্গোলিয়া ও চীন সীমান্তে দখলদার জাপানী বাহিনীগুলো খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে বিমান ঘাঁটি, রেল পথ, মোটর সড়ক, সৈন্য শিবির আর সামরিক গুদাম নির্মাণ করছিল। ১৯৩৪ সাল নাগাদ মাঞ্চুরিয়া আর কোরিয়ায় নির্মিত হয়ে গিয়েছিল প্রায় ৪০টি বিমান ঘাঁটি ও ৫০টি অবতরণ ক্ষেত্র। তাছাড়া

* জেনারেল তানাকা — জাপানের অন্যতম বিশিষ্ট সেনাপতি।

** প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধের ইতিহাস। খণ্ড ১। — মস্কো: বিদেশী সাহিত্য প্রকাশালয়, ১৯৫৭, পৃঃ ৩৩৮-৩৩৯।

মাঞ্চুরিয়াতে স্ট্র্যাটেজিক তাৎপর্যের প্রায় ১,০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথও পাতা হয়েছিল।

একই সঙ্গে জাপান সরকার মাঞ্চুরিয়াতে অবস্থিত এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো কুয়াণ্টুং বাহিনীর লোকসংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি করে দেয়। ১৯৩২ সালের ১ জানুয়ারি নাগাদ কুয়াণ্টুং বাহিনীতে ৫০ হাজার লোক ছিল, যা সমস্ত জাপানী ফৌজের ২০ শতাংশ। কিন্তু ১৯৩৭ সালের ১ জানুয়ারি নাগাদ তা ৫ গুণের বেশি বৃদ্ধি পায় এবং তখন তার কাছে ছিল ৪৩৯টি ট্যাঙ্ক, ১,১৯৩টি কামান ও ৫০০টি বিমান।

কুয়াণ্টুং বাহিনীর সেনাপতিমণ্ডলী মাঞ্চুরিয়ার সর্বাধিকারী মালিক হয়ে অধিকৃত অঞ্চলসমূহের বাসিন্দাদের মগজ-ধোলাইয়ের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিল: তাদের মধ্যে জাপানী শাসনের প্রতি বশ্যতার মনোভাব, কমিউনিজমবিরোধী ও সোভিয়েতবিরোধী চিন্তাধারা গড়ে তুলছিল। স্কুলের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হল 'মহান জাপানের' ইতিহাস, যাতে দূর প্রাচ্যের এবং একেবারে উরাল পর্যন্ত সাইবেরিয়ার ভূখন্ডগুলোকে জাপানের অংশ হিশেবে দেখানো হত। বহু জায়গায়, বিশেষত সোভিয়েত সীমান্ত থেকে অনতিদূরে, নির্মিত হল অসংখ্য জাপানী বসতি, যেগুলোর বাসিন্দাদের দেওয়া হত অস্ত্রশস্ত্র, লড়তে শেখানো হত এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মঙ্গোলিয়ার বিরুদ্ধে ওদের ব্যবহার করা যেত।

আগ্রাসনমূলক লক্ষ্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে অধিক স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৩৩ সালের ২৭ মার্চ জাপান জাতিপুঞ্জ থেকে বেরিয়ে যায়, আর ১৯৩৪ সালে সামুদ্রিক অস্ত্র সীমিতকরণ বিষয়ক ওয়াশিংটন সম্মেলনের (১৯২১-১৯২২) চুক্তিগুলো প্রত্যাখ্যান করে। সেই সঙ্গে সে ১৯৩৬ সালের ২৫ নভেম্বর ফ্যাসিস্ট জার্মানির সঙ্গে 'কমিণ্টার্নবিরোধী চুক্তি' সম্পাদন করে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়তে থাকে। আর ১৯৪০ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর জাপান জার্মানি ও ইতালির সঙ্গে 'ত্রিপাক্ষিক চুক্তি' সম্পাদন করে।

জাপানের শাসক মহলগুলো আক্রমণাত্মক বৈদেশিক নীতির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল অভ্যন্তরীণ নীতিও অনুসরণ করছিল যার উদ্দেশ্য ছিল দেশের জনজীবনের ফ্যাসিস্টকরণ এবং সশস্ত্রবাহিনীকে সুদৃঢ়করণ। ১৯৩৭ সালে জাপান চীন আক্রমণ করে। চীনের বিরুদ্ধে জাপানী সমরবাদীদের বাধানো যুদ্ধ দীর্ঘকালীন চরিত্র ধারণ করল। জাপানীরা সেটা ভাবতেও পারে নি।

কুয়াণ্টুং বাহিনীর সেনাপতিমণ্ডলী হামেশা সোভিয়েত ইউনিয়নের মালিকানাধীন পূর্ব-চীনা রেলপথে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মঙ্গোলিয়া সীমান্তে সামরিক সংঘর্ষে উস্কানি দিত। সেই ১৯৩৩ সালেই সোভিয়েত সরকার মাঞ্চু-গো'র (বস্তুত পক্ষে জাপানের) সরকারের কাছে ১৪ কোটি ইয়েনে এই রেলপথটি বিক্রি করে দেওয়ার প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। এই পদক্ষেপটি দূর প্রাচ্যে বিরোধ আর সংঘর্ষের উৎসগুলো দূরীকরণের ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নের ঐকান্তিক ইচ্ছার কথাই প্রমাণ করে। কিন্তু সমরবাদী জাপান সোভিয়েত সীমান্তে নতুন নতুন প্ররোচনা চালিয়ে যেতে লাগল। ১৯৩৫ সালে সোভিয়েত সীমান্তে জাপানীরা ও তাদের দালালেরা সর্বমোট প্রায় ৮০ বার সংঘর্ষের উস্কানি দেয়। জাপানের সুনগারি ফ্লোটিল্যার জাহাজগুলোর প্ররোচনামূলক ক্রিয়াকলাপ বেড়ে যায়। ১৯৩৬ সালে সোভিয়েত সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সৈন্যরা ১৩৭টি জাপানী চরকে আটক করে।

১৯৩৮ সালে কুয়াণ্টুং বাহিনীর সৈন্যরা খাসান হ্রদের অঞ্চলে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর, আর ১৯৩৯ সালে — খালখিন-গোল নদীর কাছে মঙ্গোলিয়ার উপর সশস্ত্র আক্রমণ চালায়। সোভিয়েত বাহিনী মঙ্গোলীয় ফৌজের সঙ্গে মিলিত হয়ে আগ্রাসককে পর্যুদস্ত ও বিধ্বস্ত করে। সোভিয়েত বাহিনীর হাতে জাপানী ফৌজের পরাজয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ সমুদ্রসমূহের স্ট্র্যাটেজিক কাঁচামাল সমৃদ্ধ দেশগুলো দখলের ব্যাপারটিকে অগ্রাধিকার দিতে জাপান সরকারের সিদ্ধান্তকে কিছুটা প্রভাবিত করে।

এই ভাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত সমরবাদী জাপান চীনের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে মাঞ্চুরিয়া দখল করে নেয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্তে পৌঁছে যায়। একই সঙ্গে সে প্রশান্ত মহাসাগরের অঞ্চলে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, ফ্রান্স আর হল্যাণ্ডের অধীনস্থ ভূখণ্ডগুলোর উপরও হামলা করার জন্য গোপন প্রস্তুতি চালিয়েছিল। দূর প্রাচ্যে বিশ্বযুদ্ধের বিপজ্জনক উৎস দেখা দিল।

৩। যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গঠনের লক্ষ্যে সোভিয়েত সরকারের প্রয়াস

ধারাবাহিক শান্তি নীতির অনুসারী সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধ এড়ানোর জন্য, যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গঠনের জন্য এবং সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের সোভিয়েতবিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ দানের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করল না। সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য ছিল: সমস্ত দেশের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ সুদৃঢ়করণ, প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের বিকাশ সাধন, আগ্রাসনের শিকারে পরিণত ও আপন স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত জাতিসমূহকে সমর্থন দান।

সোভিয়েত ইউনিয়ন হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র দেশ যা ফ্যাসিস্ট জার্মানি ও ইতালির আগ্রাসনমূলক ক্রিয়াকলাপের তীব্র নিন্দা করে এবং যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গঠনের উদ্দেশ্যে বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়ার প্রস্তাব উত্থাপন করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন দৃঢ়তার সঙ্গে ইতালীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ইথিয়োপিয়া ও আলবানিয়ার জাতিসমূহের আর নাৎসি আক্রমণের বিরুদ্ধে চেকোস্লোভাকিয়ার জনগণের পক্ষ সমর্থন করে।

এই ঘটনাটি সত্যি যে মিউনিখ ষড়যন্ত্রের প্রাক্কালে সোভিয়েত ইউনিয়ন পারস্পরিক সহায়তা বিষয়ক চুক্তি অনুসারে ফ্যাসিস্ট জার্মানির আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য চেকোস্লোভাকিয়াকে বাস্তব ও জরুরী সামরিক সাহায্য দানের প্রস্তাব দিয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে যুদ্ধ-প্রস্তুতি নিয়ে থাকে ৭৬টি পদাতিক ও অশ্বারোহী ডিভিশন, ৩টি ট্যাঙ্ক কোর ও ২২টি স্বতন্ত্র ট্যাঙ্ক ব্রিগেড, ১২টি বিমান ব্রিগেড ও লাল ফৌজের অন্যান্য ইউনিট।

কিন্তু ইংলন্ড ও ফ্রান্সের চাপে পড়ে চেকোস্লোভাকিয়া এই সাহায্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং ফ্যাসিস্ট জার্মানির কাছে আত্মসমর্পণ করে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত অন্যান্য দেশকে বাস্তব সহায়তা দিতে প্রস্তুত ছিল এবং সেরূপ সহায়তা দিয়েছিল।

১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে মস্কোয় অনুষ্ঠিত হয় সারা-ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ১৮শ কংগ্রেস। তাতে জার্মানি, জাপান ও ইতালির আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপের ঘোর নিন্দা করা হয় এবং ফ্যাসিস্ট জোটের তরফ থেকে বিশ্ব শান্তির প্রতি ও বহু রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতি

বিরাট হুমকিটি দেখিয়ে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গঠন না করার লক্ষ্যে ব্রিটেন ও ফ্রান্স অনুসৃত নীতির প্রকৃত স্বরূপটি উদ্‌ঘাটন করা হয়। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, '...হস্তক্ষেপ না করার নীতির মানে হচ্ছে আগ্রাসনে ইন্ধন জোগানো, এর মানে হচ্ছে যুদ্ধ বাধানো, সুতরাং এটাকে বিশ্বযুদ্ধে পরিণত করা। অহস্তক্ষেপের নীতিতে আছে আগ্রাসকদের কুকর্মে লিপ্ত হতে বাধা না দেওয়ার প্রয়াস ও বাসনা; যেমন, জাপানকে চীনের সঙ্গে, আরও ভালো হয় যদি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে, যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে বাধা না দেওয়ার প্রয়াস ও বাসনা; যেমন, জার্মানিকে ইউরোপীয় ব্যাপারাদিতে জড়িয়ে পড়তে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে না দেওয়ার প্রয়াস ও বাসনা; যুদ্ধের সমস্ত অংশগ্রহণকারীকে মারাত্মকভাবে যুদ্ধের কাদায় জড়িয়ে পড়তে দেওয়া, চুপিচুপি তাদের এ ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করা, তাদের পরস্পরকে দুর্বল ও কাহিল করতে দেওয়ার প্রয়াস ও বাসনা, আর যখন তারা যথেষ্ট শক্তিহীন হয়ে পড়বে তখন নতুন শক্তি নিয়ে মঞ্চে অবতীর্ণ হওয়া, অবশ্যই 'শান্তির স্বার্থে' সংগ্রাম করা এবং যুদ্ধের দুর্বল-হয়ে-পড়া অংশগ্রহণকারীদের উপর নিজস্ব শর্ত চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াস ও বাসনা।'*

সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল একমাত্র দেশ যা ১৯৪০ সালে দক্ষিণ দব্রুজা নিয়ে বুলগেরিয়া ও রুমানিয়ার মধ্যে বিবাদ মীমাংসার সময় বুলগেরীয় জনগণের জাতীয় স্বার্থগুলো গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিল। ১৯৪০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর ক্রাইয়োভা শহরে স্বাক্ষরিত বুলগেরীয়-রুমানীয় চুক্তি অনুসারে দক্ষিণ দব্রুজা বুলগেরিয়াকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।**

বলকান উপদ্বীপে যুদ্ধের প্রসার নিবারণের উদ্দেশ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন যুগোস্লাভিয়াকে বিপুল রাজনৈতিক ও নৈতিক সমর্থন জোগায়, আলবানীয় জনগণের প্রতিরক্ষায় উঠে দাঁড়ায়। সুইডেনের নিরপেক্ষতা রক্ষার প্রশ্নে সোভিয়েত সরকারের দৃঢ় মতাবস্থান ১৯৪০ সালের বসন্তে ফ্যাসিস্ট

জার্মানিকে ওই দেশটি অধিকার করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করে। ১৯৪০ সালের ১৩ এপ্রিল জার্মান সরকারের উদ্দেশে প্রেরিত এক নোটে সোভিয়েত সরকার সুইডেনের নিরপেক্ষতা রক্ষার বাঞ্ছনীয়তার কথা বলেন।* সুইডেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী গুণ্টের সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত আ. কলোন্তাইয়ের সঙ্গে এক আলাপের সময় বলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নের এই কাজটি সুইডিশ মন্ত্রিপরিষদের অবস্থান এবং নিরপেক্ষতা রক্ষায় সুইডেনের ঐকান্তিক অভিপ্রায় সুদৃঢ় করবে।

আন্তর্জাতিক প্রলেতারীয় সংহতির ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় সূচিত করে ১৯৩৬-১৯৩৯ সালে স্পেনিশ জনগণকে তার জাতীয়-বৈপ্লবিক যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রদত্ত সহায়তা। আন্তর্জাতিক যোদ্ধা বাহিনীগুলোতে বীরত্বের সঙ্গে লড়েছিল প্রায় ৩ হাজার সোভিয়েত স্বেচ্ছাসেবক — সামরিক উপদেষ্টা, পদাতিক সৈনিক, ট্যাঙ্ক-যোদ্ধা, বৈমানিক। ফ্যাসিস্ট অভ্যুত্থানকারীদের ও জার্মান-ইতালীয় হস্তক্ষেপকারীদের সঙ্গে কঠোর লড়াইয়ে তারা অমর কীর্তির দ্বারা নিজেদের চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। স্পেনের প্রজাতন্ত্রী বাহিনী পেত সোভিয়েত অস্ত্রশস্ত্র এবং বিভিন্ন ধরনের বৈষয়িক সহায়তা। জাতিপুঞ্জে এবং স্পেনের ব্যাপারাদিতে অহস্তক্ষেপের বিষয়ে ইউরোপীয় দেশসমূহের লণ্ডনস্থ কমিটিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ধারাবাহিকভাবে স্পেনের জনগণের পক্ষ সমর্থন করে গেছে।

আন্তর্জাতিক প্রলেতারীয় সংহতির উজ্জ্বল অভিব্যক্তি ঘটে জাপানী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মঙ্গোলিয়াকে সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক সহায়তা দানে। ১৯৩৬ সালের ১২ মার্চ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মঙ্গোলিয়া গণ-প্রজাতন্ত্র পারস্পরিক সহায়তার বিষয়ে একটি প্রটোকল স্বাক্ষর করে। এই প্রটোকল অনুসারে, কোন একটি পক্ষের উপর সামরিক হামলা ঘটলে তারা পরস্পরকে সামরিক সহায়তা সহ সর্বপ্রকার সাহায্য দিতে বাধ্য ছিল। এবং ১৯৩৯ সালে জাপানী সমরবাদীরা মঙ্গোলিয়া আক্রমণ করা মাত্রই সোভিয়েত ইউনিয়ন অবিলম্বে মঙ্গোলীয় জনগণের সাহায্যে এগিয়ে যায়। মঙ্গোলিয়ার ভূখণ্ডে প্রবিষ্ট হানাদার বাহিনীগুলো বিধ্বস্ত হয়।

দূর প্রাচ্যে সোভিয়েত সরকার সম্পাদিত অপর গুরুত্বপূর্ণ কাজটি

হল — ১৯৩৭ সালের আগস্ট মাসে চীনের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর। যে-চীন এই ঘটনার দেড় মাস আগেও জাপানের নতুন হামলার শিকারে পরিণত হয় তার সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন ছিল জাপানী সমরবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত একটি দেশের প্রতি এক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সহানুভূতি প্রদর্শন।

১৯৩৭-১৯৪১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনকে জাপানী সমরবাদীদের বিরুদ্ধে তার জাতীয়-মুক্তি যুদ্ধে বাস্তব সহায়তা প্রদান করে। সে তাকে ৯৪০টি কামান, প্রায় ১০০টি ট্যাঙ্ক ৮৮৫টি বিমান ও কয়েক হাজার মেশিনগান জুগিয়েছিল। চীনে ছিল চার সহস্রাধিক সোভিয়েত স্বেচ্ছাসেবক আর সামরিক উপদেষ্টা। সোভিয়েত বৈমানিকরা চীনের আকাশ থেকে শতাধিক জাপানী বিমান ভূপাতিত করেছে। চীনা জনগণের স্বাধীনতা ও সুখের জন্য জীবন দিয়েছিল অনেক সোভিয়েত যোদ্ধা। ওই বছরগুলোতে চীনা সংবাদপত্র 'মিন বাও' লিখেছিল, 'সোভিয়েত দেশ কমিউনিস্টদের ও চীনা জনগণের আশা ভঙ্গ করে নি, মারাত্মক বিপদের মুহূর্তে সে-ই প্রথম চীনকে সাহায্য করেছে।'

আপন স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত জাতিসমূহকে আন্তর্জাতিকতাবাদী সহায়তা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। ফ্যাসিস্ট আগ্রাসককে প্রতিরোধ দানের লক্ষ্যে ১৯৩৯ সালের ১৭ এপ্রিল সে সোভিয়েত-ইঙ্গো-ফরাসি সহযোগিতার একটি বিশদ পরিকল্পনা উপস্থাপিত করে। তাতে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পারস্পরিক সহায়তা এবং ইউরোপের কিছু দুর্বলতর দেশকে ত্রিশক্তির প্রত্যাভূতি প্রদান সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব ছিল।

এই উদ্দেশ্যে ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে মস্কোয় তিনটি শক্তির — সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সামরিক প্রতিনিধিদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মার্শাল ক্লিমেন্ত ভরোশিলভ এবং প্রতিনিধিদলের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জানানো হল যে ফ্যাসিস্ট আক্রমণ আরম্ভ হলে সে বৃহৎ সামরিক শক্তি খাড়া করবে: ১৩৬টি পদাতিক ও অশ্বারোহী ডিভিশন, ৫ হাজার ভারী কামান, ৯-১০ হাজার ট্যাঙ্ক, ৫,৫০০ জঙ্গী বিমান।

কিন্তু দেখা গেল যে প্রয়োজনীয় দলিল স্বাক্ষরের ব্যাপারে ব্রিটিশ প্রতিনিধিদলের কোন ক্ষমতাই নেই। এই সমস্ত আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে ইংরেজ রাজনীতিক ডি. লয়েড জর্জ ব্যঙ্গ করে বলেছেন: লর্ড হ্যালিফ্যাক্স হিটলার আর গোরিঙের সঙ্গে দেখা করেছেন। চেম্বারলেন ফিউরেরের সঙ্গে আলিঙ্গন করেছেন পরপর তিন বার। তিনি মুসোলিনির সঙ্গে কোলাকুলি করতে, আবিসিনিয়া দখলে আমাদের সরকারী স্বীকৃতির আকারে তাকে একটি উপহার দিতে এবং স্পেনে তার হস্তক্ষেপে আমরা কোন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করব না তাকে এটা বোঝাতে তিনি বিশেষভাবে রোম গিয়েছিলেন। আমাদের সহায়তা দানে প্রস্তুত ঢের বেশি শক্তিশালী একটি দেশে আমাদের প্রতিনিধিত্ব করতে ফরিন অফিসের ব্যুরোক্র্যাটকে কেন পাঠানো হয়েছে? এই প্রশ্নের মাত্র একটি উত্তর আছে: মিঃ নেভিল চেম্বারলেন, লর্ড হ্যালিফ্যাক্স ও স্যার সায়মন রাশিয়ার সঙ্গে জোট চান না।'* আলাপ-আলোচনার ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক সম্মতি দিয়ে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের নেতৃবৃন্দ আসলে কিন্তু আসন্ন ফ্যাসিস্ট আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে তিন দেশের সামরিক শক্তি মিলিত করার ধারণা থেকে দূরেই ছিলেন। আলাপ-আলোচনা ব্যর্থ হয় এবং সাম্রাজ্যবাদীরা তদ্দ্বারা জার্মানিকে বুঝতে দিল যে সোভিয়েত ইউনিয়ন একলা, তার কোন মিত্র নেই এবং তার উপর আক্রমণের পথ উন্মুক্ত। আর সারা দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদীরা মনে মনে ঠিক সেটাই চাইছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত ব্রিটিশ সরকার একই সঙ্গে জার্মান সরকারের সঙ্গে গোপন কথাবার্তা আরম্ভ করে এবং হিটলারকে অনাক্রমণ চুক্তি ও বিশ্বজোড়া প্রভাব ক্ষেত্রসমূহ ভাগাভাগির চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব দেয়। বিভাজ্য দেশসমূহেব মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নকেও অন্তর্ভুক্ত করার ভয়ংকর প্রস্তাবটি দেওয়া হয়েছিল। তারা পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতার প্রত্যাভূতি উপেক্ষা করতে এবং চেকোস্লোভাকিয়ার মতো পোল্যাণ্ডকেও হিটলারের হাতে তুলে দিতে রাজী ছিল।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের শাসক মহলগুলো মস্কোয় অনুষ্ঠিত আলাপ-আলোচনা ব্যর্থ করে দিল। এতে ফ্যাসিস্ট আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিরোধ দানের এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ রোধকরণের শেষ সম্ভাবনাটি হাত-

* Zeld W., Coates K. A History of Anglo-Soviet Relations. London, 1945, p. 614.

ছাড়া হল। ব্রিটিশ সামরিক ইতিহাসবিদ লিড্‌ডেল গার্ট তাঁর 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ' গ্রন্থে লিখেছেন যে ওই সংকটময় সময়ে 'যুদ্ধ এড়ানোর একমাত্র উপায় ছিল রাশিয়ার সমর্থন লাভে, কেননা রাশিয়াই ছিল একমাত্র রাষ্ট্র যা পোল্যান্ডকে সরাসরি সহায়তা দিতে পারত'।*

সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে অবস্থা সংকটজনক হয়ে ওঠে। বস্তুত পক্ষে সে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধের অবস্থায়ই ছিল, সোভিয়েত ও মঙ্গোলীয় বাহিনীগুলো খালখিন-গোল নদীর তীরে জাপানী আক্রমণ প্রতিহত করছিল। পোল্যান্ডের উপর হামলার জন্য জার্মানির শেষ-হয়ে-আসা প্রস্তুতি সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্যও সরাসরি হুমকি ছিল। পশ্চিম ও পূর্বের আঘাতগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে পাঠানোর এবং তাকে দুই রণাঙ্গনের মধ্যে চেপে ধরার জন্য আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ যে-সমস্ত পরিকল্পনা নিয়েছিল তা প্রায় বাস্তবায়িত হতে চলেছিল।

সাম্রাজ্যবাদী সরকারসমূহের দোষে যদি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ভেঙ্গে না যেত, তাহলে যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হত। ওই সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স, ব্রিটেন ও পোল্যান্ডের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের হাতে ছিল ৩১১টি ডিভিশন, ১১,৭০০টি বিমান, ১৫,৪০০টি ট্যাঙ্ক, ৯,৬০০টি ভারী কামান। ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রদ্বয় জার্মানি আর ইতালির কাছে ছিল ১৬৮টি ডিভিশন, প্রথম সারির ৭,৭০০টি বিমান, ৮,৪০০টি ট্যাঙ্ক ও ৪,৩৫০টি ভারী কামান।

এহেন জটিল ও বিরোধপূর্ণ পরিস্থিতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সামনে একটি প্রশ্ন দেখা দিল: সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' আয়োজনের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া আর মিউনিখ জোটের পরিকল্পনাগুলো কীভাবে বানচাল করা যায়? এর জন্য কেবল একটি মাত্র পথ ছিল — জার্মানি প্রস্তাবিত অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করা। সেটাই করা হয়েছিল। ১৯৩৯ সালের ২৩ আগস্ট দশ বছরের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। জার্মানির সঙ্গে সম্পাদিত এই চুক্তিটির দরুন সাম্রাজ্যবাদীদের সমস্ত আশাভরসা ভেস্তে গেল এবং তার ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার উপর থেকে পশ্চিমের হুমকিটি সরাতে সক্ষম হল ও দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণের জন্য প্রায় দু'বছর সময় পেল।

সেই সঙ্গে সোভিয়েত সরকারের দূরদর্শী নীতি ১৯৩৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নকে যুদ্ধে জড়িত করার সাম্রাজ্যবাদী প্রয়াস ব্যর্থ করে দেয় এবং সোভিয়েত দেশের বিরুদ্ধে তাদের যুক্ত ফ্রন্ট গড়ার পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

আজ সোভিয়েতবিরোধী সাম্রাজ্যবাদী প্রচারে সোভিয়েত-জার্মান চুক্তিকে 'অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা' বলে বর্ণনা করা হয়, যা নাকি 'ইউরোপে যুদ্ধ অনিবার্য করেছে'। কিন্তু তা হচ্ছে অসদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা কথা। ফ্যাসিস্ট আগ্রাসন রোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল এই চুক্তির জন্য নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্মতি নিয়ে ইংলন্ড ও ফ্রান্সের চাতুরীতে মস্কোর আলাপ-আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার দরুন। সোভিয়েত দেশের বিরুদ্ধে বীভৎস কুৎসা প্রচারে লিপ্ত বুর্জোয়া ভাবাদর্শীরা ১৯৩৯ সালের সোভিয়েত-জার্মান চুক্তিটিকে 'পোল্যান্ডের চতুর্থ বিভাজন' বিষয়ক সন্ধি হিশেবে দেখাচ্ছে। কিন্তু সুবিদিত বাস্তব ঘটনাসমূহই এই সমস্ত মনগড়া কথাবার্তা খন্ডন করে দেয়। আজ সবাই জানে যে এই সোভিয়েত ইউনিয়নই বর্তমান সীমানার মধ্যে স্বনির্ভর পোলিশ রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত করেছিল, এই সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীই বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সয়ে পোলিশ জনগণকে ফ্যাসিস্ট দাসত্বের কবল থেকে মুক্ত করেছে। পোল্যান্ড যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উদ্যোক্তাদের প্রথম বলিতে পরিণত হয়েছিল তার মূলে ছিল আগ্রাসককে পূর্ব দিকে ঠেলে দেওয়ার সাম্রাজ্যবাদী নীতি। সুতরাং দেখাই যাচ্ছে যে ১৯৩৯ সালের সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির তাৎপর্যকে আজ বিকৃত আকারে দেখাতে প্রয়াসী প্রতিক্রিয়াশীল ইতিহাসবিদ আর বুর্জোয়া ভাবাদর্শীদের 'যুক্তিগুলো' সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ওই মুহূর্তে সোভিয়েত সরকার যে অনন্যোপায় হয়ে পড়েছিলেন তা বহু বুর্জোয়া রাজনীতিকও স্বীকার করতেন। রুজভেল্টের সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী গ. ইকেস সোভিয়েত-জার্মান চুক্তি প্রসঙ্গে লিখেছিলেন: 'আমি রাশিয়াকে দোষ দিতে পারি না। আমার মনে হয় যে এক চেম্বারলেনই সমস্তকিছুর জন্য দায়ী।'*

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপ-পররাষ্ট্র মন্ত্রী স. উত্তলেসত্ত অনুরূপ মত ব্যক্ত করেন: 'সোভিয়েত-জার্মান চুক্তি সোভিয়েত সরকারকে প্রাধান্য লাভ করার সুযোগ দিল এবং দু'বছর বাদে যখন বহু প্রতীক্ষিত জার্মান আক্রমণ

সংঘটিত হল তখন ওই সমস্ত প্রাধান্য সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে বিপুল এক ভূমিকা পালন করল।'*

সোভিয়েত সরকারের শান্তিকামী পররাষ্ট্র নীতির গুরুত্বপূর্ণ ফল ছিল ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে জাপানের সঙ্গে সম্পাদিত নিরপেক্ষতা চুক্তি। উভয় রাষ্ট্র পরস্পরকে এই প্রতিশ্রুতি দিল যে তারা শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবে, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জাপান ও মঙ্গোলিয়া গণ-প্রজাতন্ত্রের ভূখণ্ডগত অখণ্ডতার প্রতি আর রাষ্ট্রসীমার অলংঘনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে।

সোভিয়েত রাষ্ট্রের সক্রিয় ও শান্তিকামী লেনিনীয় পররাষ্ট্র নীতি সাম্রাজ্যবাদীদের অপকর্মে বাধা দেয়। তা প্রমাণ করল যে আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই সর্বপ্রথম এমন এক রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটেছে যা শান্তির মহান ধ্বনি তুলেছে এবং দেশে দেশে ও জাতিতে জাতিতে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন নীতি অনুসরণ করছে।

বুর্জোয়া ইতিহাসবিদেরা সোভিয়েত রাষ্ট্রের যুদ্ধপূর্ব পররাষ্ট্র নীতিকে সর্বতোপায়ে বিকৃত করতে সচেষ্ট। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নি এবং এর দোহাই দিয়ে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নকে এই বলে অভিযুক্ত করে যে সে নাকি ফ্যাসিস্ট জার্মানির সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। তাদের উদ্দেশ্য সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ফ্যাসিস্ট জার্মানিকে উস্কানি দিয়ে পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহ যে-অপরাধ করেছে তা থেকে তাদের মুক্ত করা। কিন্তু বিভিন্ন দলিলাদি আর কাগজপত্র বুর্জোয়া ইতিহাসবিদদের 'যুক্তি' খণ্ডন করে দেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এড়ানো যেত। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব সূচিত নতুন ঐতিহাসিক যুগের পরিস্থিতিতে পৃথিবীতে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো শান্তির এরূপ সুদৃঢ় দুর্গের বিদ্যমানতা সামগ্রিকভাবে সামরিক দুষ্প্রয়াসের অবসান না ঘটালেও অন্তত পক্ষে আগ্রাসী রাষ্ট্রসমূহকে দমন করার এবং ওদের নতুন বিশ্বযুদ্ধ বাধাতে না দেওয়ার সুযোগ দিচ্ছিল।

* Wells S. The Time for Decision. — New York, London, 1947, p. 324.

দ্বিতীয় অধ্যায়

যুদ্ধ আরম্ভ। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট আগ্রাসনের প্রস্তুতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধায় সাম্রাজ্যবাদ। ৩০-এর বছরগুলোতে এই সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র — সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করার ইচ্ছায় আরও বেশি সমরবাদী ও আগ্রাসী হয়ে উঠে। কিন্তু পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়: এক দিকে থাকে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রসমূহের জোট আর অন্য দিকে — বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক দেশসমূহের জোট। আন্তর্জাতিক বাজার ও কাঁচামালের উৎস নিয়ে তাদের মধ্যে যে গভীর বিরোধ দেখা দেয় তা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের প্রবৃত্তি জাগায়। সেই সঙ্গে পুঁজিতান্ত্রিক জোটগুলোতে অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করছিল সোভিয়েতবিরোধী মতাবস্থান, যা পশ্চিমী দুনিয়ায় এরূপ মোহ সৃষ্টি করেছিল যে ফ্যাসিস্ট আগ্রাসনে তাদের নাকি কোন ক্ষতি হবে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতিতে চালিকাশক্তির ভূমিকা পালন করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান ও ইতালির একচেটিয়ারা। তারা পুঁজিতান্ত্রিক দেশসমূহের সমগ্র সমাজ জীবনের সামরিকীকরণে আগ্রহী ছিল এবং সক্রিয়ভাবে সামরিক সংঘর্ষ বাধিয়ে তাতে ইন্ধন জোগাচ্ছিল। আর এর দরুন যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়ার এবং যুদ্ধে অধিক সংখ্যক দেশ ও জাতির জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরে, দুই সাম্রাজ্যবাদী জোটের মধ্যে: এক দিকে প্রধান ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রদ্বয় — জার্মানি আর ইতালির এবং অন্য দিকে গ্রেট ব্রিটেন আর ফ্রান্সের মধ্যে।

ফ্যাসিস্ট জোটের রাষ্ট্রগুলো প্রথম থেক শেষ দিন পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী ও অন্যায় যুদ্ধ চালিয়ে যায়। প্রথমে তারা যদিও অন্যান্য পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলোর উপর হামলা করে তাদের আসল উদ্দেশ্য কিন্তু ছিল সোভিয়েত

ইউনিয়নকে ধ্বংস করা, কেননা এ দেশ তাদের বিশ্বাধিপত্য লাভের পথে বড় এক অন্তরায় ছিল।

তাছাড়া ফ্যাসিস্ট জোটের রাষ্ট্রসমূহ আপন ও অন্যান্য জাতিগুলোর মৌলিক স্বার্থ উপেক্ষা করে অতি অগণতান্ত্রিক লক্ষ্য অনুসরণ করছিল। আগ্রাসকরা বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার যাকিছু অবশিষ্ট ছিল তা-ও ধ্বংস করে দিচ্ছিল, মেহনতীদের আপন অধিকার রক্ষার্থে যেকোন রকমের আন্দোলন কঠোরভাবে দমন করছিল, রাজনৈতিক পার্টিগুলোকে ভেঙ্গে দিচ্ছিল ও নিষিদ্ধ করছিল, ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের বিলোপ ঘটাচ্ছিল। ফ্যাসিস্টরা কমিউনিস্ট আর শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিশেষ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল, — এ ধরনের আন্দোলনের অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপক সংখ্যায় হত্যা করতে তারা দ্বিধা বোধ করত না।

সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী লক্ষ্য অনুসরণকারী ফ্যাসিস্ট জোটভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ বিশ্বাধিপত্য লাভের জন্য, ইউরোপ এশিয়া আফ্রিকা ও আমেরিকার দেশগুলোকে অধিকার ও অধীনস্থকরণের জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। এতে প্রধান ভূমিকা পালন করছিল নাৎসি জার্মানি। কিন্তু নতুন নতুন দেশ দখলের স্বপ্নে বিভোর ফ্যাসিস্ট ইতালিও আশা করেছিল যে সে অস্ত্রের সাহায্যে যুদ্ধোত্তর সমস্যাবলি সমাধানের ক্ষেত্রে জার্মানির পাশাপাশি নিজেকেও মুখ্য স্থানে অধিষ্ঠিত করতে পারবে। অন্য দিকে, সমরবাদী জাপান এশিয়ায় — এবং তাতে সোভিয়েত দূর প্রাচ্যের বৃহৎ একটি অংশ এবং সমগ্র চীন অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা ছিল — নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিল। সে জার্মানির সঙ্গে মিলে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল।

যুদ্ধের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অনুসারে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রগুলো যুদ্ধ পরিচালনার সবচেয়ে অমানবিক পদ্ধতিসমূহের আশ্রয় নিয়েছিল: তারা বন্দীদের উপর অত্যাচার করত, শান্তিপূর্ণ বাসিন্দাদের হত্যা করত, নারীদের উপর বলপ্রয়োগ করত, শহরগুলো ধ্বংস করত, সংস্কৃতির স্মৃতিসৌধ বিনষ্ট করত, গ্রাম ও জনপদ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিত।

ইঙ্গো-ফরাসি জোটের তরফ থেকেও যুদ্ধ তার প্রাথমিক পর্যায়ে ন্যায়বিরুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ছিল। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সরকারগুলো তা শুরু করে আপামর মানুষের স্বার্থে নয়, সেই জাতীয় বুর্জোয়া সম্প্রদায়েরই

স্বার্থে, যে-বুর্জোয়া সম্প্রদায় নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীকে দুর্বল করতে ও নিজের মহাজাতিসুলভ অবস্থান সুদৃঢ় করতে চেয়েছিল। সেই জন্যই ব্রিটিশ ও ফরাসি সরকারগুলো জার্মানি কর্তৃক আক্রান্ত পোল্যান্ডকে বাস্তব সহায়তা দেওয়ার ব্যাপারে বস্তুত পক্ষে কোনকিছুই করে নি। তারা জার্মানির সঙ্গে নতুন এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পৃথিবীতে নিজেদের অবস্থান রক্ষা করতে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষতি সাধন করে জার্মানির সঙ্গে বিরোধ মীমাংসা করতে চেয়েছিল। এতেই নিহিত ছিল তথাকথিত 'অদ্ভুত যুদ্ধের' আসল অর্থ। বস্তুত পক্ষে এ যুদ্ধে মিউনিখ নীতিই অনুসৃত হচ্ছিল এবং তা প্রকৃত পক্ষে জার্মানিকে দুর্বল না করে ক্রমশ কেবল শক্তিশালীই করছিল।

যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাসিস্ট জোটবিরোধী রাষ্ট্রসমূহের তরফ থেকে যুদ্ধের সামাজিক-রাজনৈতিক চরিত্র বদলাতে থাকে। এই সমস্ত পরিবর্তন সর্বাগ্রে ঘটে এই কারণে যে ফ্যাসিস্ট আক্রমণের প্রবলতাবৃদ্ধির ফলে অনেকগুলো দেশের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের প্রতি বাস্তব হুমকি সৃষ্টি হয়। জাতিসমূহ দেখতে পেল যে ফ্যাসিজম তাদের দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করতে প্রয়াসী। কেবল কমিউনিস্টরাই নয়, বহু বুর্জোয়া নেতাও তা বুঝেছিল। সেই জন্যই আপন জাতীয় স্বতন্ত্রতার জন্য রাষ্ট্রসমূহের সংগ্রাম তাদের তরফ থেকে বিষয়গতভাবে ন্যায় যুদ্ধে পরিণত হচ্ছিল।

ফ্যাসিস্ট জার্মানি আক্রান্ত পোল্যান্ড আর যুগোস্লাভিয়ার জনগণ নিজের স্বাধীনতা ও জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের জন্য, নিজের মৌলিক স্বার্থ রক্ষার জন্য একেবারে গোড়া থেকেই ন্যায় যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। মুক্তি যুদ্ধে লিপ্ত হয় গ্রীস, আলবানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, আর তার পরে নরওয়ে, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের জনগণ।

কিন্তু যে প্রধান ও চূড়ান্ত কারণটি হিটলারী জোটের রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিত্রাণমূলক চরিত্র নির্ধারণ করে তা ছিল যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবেশ। সোভিয়েত জনগণের দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধ (১৯৪১-১৯৪৫) আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার গণ্ডি ছেড়ে বেরিয়ে যায় এবং তার কেন্দ্রস্থলে এক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও ফ্যাসিস্ট জার্মানির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। নাৎসি জার্মানির প্রতিক্রিয়াশীল ও আগ্রাসনমূলক লক্ষ্যের বিপরীতে সোভিয়েত ইউনিয়ন অনুসরণ করছিল যুদ্ধের পরিত্রাণমূলক ও ন্যায্য উদ্দেশ্য। ঠিক এই কারণেই সোভিয়েত

জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের সঙ্গে মিলিত হয় অন্যান্য জাতির ফ্যাসিজমবিরোধী মুক্তি সংগ্রাম।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান উইলিয়ম ফস্টার লিখেছেন, 'সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধে প্রবেশ যুদ্ধকে চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্য প্রদান করল যা ছিল নাৎসিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উত্থিত গণতান্ত্রিক জাতিসমূহের বিজয়ের প্রতিশ্রুতি। প্রথমত, সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধে প্রবেশ তার পশ্চিমী মিত্রদের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ মিউনিখ নীতির পতন ঘটাল এবং এই যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে ফ্যাসিজমবিরোধী সুদৃঢ় এক নেতৃত্বের নিশ্চয়তা দিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলে ফ্যাসিজমের প্রতি গভীর সহানুভূতিশীল এবং যেকোন মুহূর্তে হিটলারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে প্রস্তুত ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা কোনক্রমেই ফ্যাসিজমের সঙ্গে চূড়ান্ত সংগ্রামে লিপ্ত হত না। দ্বিতীয়ত, সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধে প্রবেশের ফলে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজির বাস্তবায়ন শুরু হল এবং তা যুদ্ধের পরিণতি নির্ধারণ করল...'*

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ন্যায্য ও পরিত্রাণমূলক চরিত্রের উজ্জ্বল অভিব্যক্তি ঘটে দখলদার বাহিনী ও অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানে, যা পরে এশিয়া ও ইউরোপের অনেকগুলো দেশে জন-গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরিত হয়।

হিটলারবিরোধী জোটের তরফ থেকে যুদ্ধের ন্যায্য ও পরিত্রাণমূলক চরিত্র আগ্রাসক এবং সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক প্রভুত্বের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলোর জাতিসমূহের জাতীয়-মুক্তি সংগ্রামকে বিপুল ব্যাপকতা দিয়েছিল।

আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ যেমনটি পরিকল্পনা করেছিল যুদ্ধের আগুন ঠিক সেভাবে ছড়ায় নি। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জেহাদের পরিবর্তে হিটলার সর্বাগ্রে আঘাত হানল ইঙ্গো-ফরাসি জোটের উপর। খ্যাতনামা ফরাসি রাজনীতিজ্ঞ এদুয়ার্দ এরিওর সূক্ষ্ম মন্তব্য মতে, ফ্যাসিস্ট জার্মানি এমন একটি কুকুরের মতো ছিল যা শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে নিজের প্রভুকে দংশন করে।

পোল্যান্ডের পরে ফ্যাসিস্ট সৈন্য বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হয়

* ফস্টার, উইলিয়ম। আমেরিকার রাজনৈতিক ইতিহাসের রূপরেখা। ইংরেজী থেকে অনুবাদ। — মস্কো, ১৯৫৩, পৃঃ ৬০৯।

ডেনমার্ক, নরওয়ে, হল্যান্ড, ফ্রান্স এবং বলকান উপদ্বীপের দেশসমূহ। ফ্রান্সে ও বেলজিয়ামে ব্রিটিশ অভিযানকারী সৈন্য দলগুলো পরাজয় বরণ করে। এভাবে সমাপ্ত হয় যুদ্ধের প্রথম পর্যায়।,

১। জার্মান-পোলিশ যুদ্ধ (১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর)

পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট জার্মানির যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল — পোলিশ রাষ্ট্রের বিলোপ সাধন ও পোলিশ জনগণকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধকরণ। পোল্যান্ডকে বিধ্বস্ত করার মাধ্যমে নাৎসিরা নিজেদের রণনৈতিক অবস্থান উন্নত করতে, অতিরিক্ত সামরিক-অর্থনৈতক সম্পদ পেতে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর আক্রমণ চালানোর জন্য একটি পাদভূমি গড়তে চেষ্টা করছিল।

১৯৩৯ সালের ২১ মার্চ জার্মানি পোল্যান্ডের কাছে চূড়ান্ত দাবি রাখল: তাকে ডানজিগ (গ্দানস্ক) দিয়ে দিতে হবে এবং 'পোলিশ করিডরে'* তার মোটর সড়ক ও রেলপথ নির্মাণের অধিকার মেনে নিতে হবে। পোলিশ সরকার এই সমস্ত দাবি মানতে অস্বীকার করল।

৩ এপ্রিল হিটলারী সেনাপতিমণ্ডলী পোল্যান্ড আক্রমণের পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে আরম্ভ করল। তা একটি কোড নাম পেল — 'শুভ্র পরিকল্পনা'। ১১ এপ্রিল হিটলার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার বিষয়ে একটি নির্দেশপত্র স্বাক্ষর করে। ২৮ এপ্রিল ফ্যাসিস্ট জার্মানি ১৯৩৪ সালে স্বাক্ষরিত জার্মান-পোলিশ অনাক্রমণ চুক্তিটি নাকচ করে দেয় এবং আগ্রাসনের জন্য সরাসরি প্রস্তুতি আরম্ভ করে। অন্য দিকে, পোল্যান্ডের সামরিক নেতৃবৃন্দ তাদের দেশের পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে হাত দেয়। এই পরিকল্পনার সারকথাটি ছিল এই যে স্ট্র্যাটেজিক প্রতিরক্ষা

* পোলিশ করিডর, ডানজিগ করিডর — ১৯১৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এই নামে অভিহিত ছিল পোলিশ ভূখণ্ডের সেই সংকীর্ণ স্থানটি যা বুর্জোয়া-ভূস্বামী শাসিত পোল্যান্ড পেয়েছিল ভার্সাই শান্তি চুক্তি অনুসারে। তা পোল্যান্ডকে বল্টিক সাগরে প্রবেশের পথ করে দেয়। পোলিশ শহর গ্দানস্ক, তার সংলগ্ন ভূখণ্ড সহ বিশেষ এক রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। তার নাম ছিল — 'স্বাধীন ডানজিগ শহর' (জাতিপুঞ্জের রক্ষণাধীনে)।

চালিয়ে শত্রুকে রুখা এবং মিত্র ফরাসি ও ব্রিটিশ ফৌজের আক্রমণাভিযানের প্রস্তুতির জন্য সময় লাভ করা; আর পরে সার্বিক পাল্টা-আক্রমণের প্রস্তুতি নেওয়া ও অবস্থা বুঝে কাজ করা।

যুদ্ধের গোড়ার দিকে জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী পোল্যাণ্ডের পশ্চিম সীমান্তের কাছে বৃহৎ শক্তির সমাবেশ ঘটিয়েছিল — ৬২টি ডিভিশন (তার মধ্যে ৭টি ট্যাঙ্ক ও ৪টি মোটোরাইজড ডিভিশন), ২,৮০০টি ট্যাঙ্ক, ৬,০০০ তোপ ও মর্টার কামান, প্রায় ২,০০০টি বিমান (১ম ও ৪র্থ বিমান বহরের), সর্বমোট ১৬ লক্ষ লোক। এই সমস্ত শক্তি অন্তর্ভুক্ত ছিল 'উত্তর' বাহিনীসমূহের গ্রুপে (৩য় বাহিনী — পূর্ব প্রাশিয়ায়, ৪র্থ বাহিনী — পমেরানিয়ায়) এবং 'দক্ষিণ' বাহিনীসমূহের গ্রুপে (৮ম, ১০ম ও ১৪শ বাহিনীগুলো সাইলেসিয়ায়)। বাহিনীসমূহের গ্রুপগুলোর সেনাপতিত্বে ছিল: 'উত্তর' — কর্নেল-জেনারেল ফ. বক, 'দক্ষিণ' — কর্নেল-জেনারেল গ. রুণ্ড্স্টেড্ট।

পোল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য ফ্যাসিস্ট জার্মানি যে সামরিক নৌ-শক্তি পৃথক করে রাখে তাতে ছিল ২টি রণপোত, ৭টি ডুবো জাহাজ, অনেকগুলো ডেসট্রয়ার, মাইন-সুইপার এবং নৌ-বাহিনীর বেশকিছু বিমান। তাছাড়া স্ভিনেমিউণ্ডে (স্ভিনোউইস্তিয়ে) সামরিক ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রস্তুত ছিল ৩টি ক্রুজার, আর পিলাউয়ে (বল্টিস্ক) — ডেস্ট্রয়ারের ফ্লোটিল্যা ও টর্পেডো বোটের ফ্লোটিল্যা। সামরিক নৌ-বহরের কাজ ছিল — পোল্যাণ্ডের সামরিক নৌ-ঘাঁটিগুলো অবরোধ করা ও তার নৌ-বহর ধ্বংস করা, নিরপেক্ষ দেশসমূহের সঙ্গে পোল্যাণ্ডের সামুদ্রিক বাণিজ্যে ব্যাঘাত ঘটানো এবং পূর্ব প্রাশিয়া, সুইডেন ও বল্টিক উপকূলের রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে নিজের সামুদ্রিক যোগাযোগের নিরাপত্তা সুদৃঢ় করা।*

জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের বিরুদ্ধে ছিল পোলিশ বাহিনী, যাতে ছিল ৩৯টি পদাতিক ডিভিশন ও ১১টি অশ্বারোহী ব্রিগেড, ৩টি ইনফেন্ট্রি মাউণ্টেন ব্রিগেড ও ২টি সাঁজোয়া মোটোরাইজ্ড ব্রিগেড, জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রায় ৮০টি ব্যাটেলিয়ন, সর্বমোট প্রায় ১০ লক্ষ লোক এবং ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর নাগাদ পোলিশ বাহিনী যে-সমস্ত হাতিয়ারের অধিকারী হয় তার মধ্যে ছিল: ২২০টি হালকা ট্যাঙ্ক ও ৬৫০টি ট্যাঙ্কেট

* Der Zweite Weltkrieg in Bildern und Dokumenten. Bd. 1. Die Blitzkriege 1939-1940. — München, 1968, S. 50.

আর সাঁজোয়া গাড়ি, ৪,৩০০টি তোপ ও মর্টার কামান, ৮০০টি জঙ্গী বিমান, ১৬টি যুদ্ধজাহাজ ও সহায়ক জাহাজ।

কিন্তু পোলিশ জেনারেল স্টাফ সময় মতো সশস্ত্র বাহিনীকে সামরিক ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রস্তুত করতে এবং তাকে প্রয়োজনীয় গ্রুপিংয়ে প্রসারিত করতে পারে নি। সৈন্যযোজন করতে দেরি করে ফেলে। সৈন্যযোজনের নির্দেশ প্রকাশিত হয় কেবল ৩১ আগস্ট তারিখে, অর্থাৎ যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার একদিন আগে, যখন পুরোপুরিভাবে সমাবেশিত জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনী আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল। আত্মরক্ষা লাইনে পোলিশ সেনাপতিমণ্ডলী প্রসারিত করতে পেরেছিল স্রেফ ২৪টি ইনফেণ্ট্রি ডিভিশন, ৮টি অশ্বারোহী, ১টি মোটোরাইজ্‌ড, ৩টি ইনফেণ্ট্রি মাউণ্টেন ব্রিগেড ও জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৫৬টি ব্যাটেলিয়ন।

এই শক্তিসমূহ প্রসারিত করা হচ্ছিল পশ্চিমের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে প্রশস্ত অর্ধবৃত্তাকার বেড়ির ধরনে যার ফলে পোলিশ ফৌজগুলো ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল এবং কোথাও তাদের শক্তির বড় কোন গ্রুপিং ছিল না।

পোলিশ প্রতিরক্ষার মূল ভিত্তি ছিল প্রতিরোধ কেন্দ্রগুলো এবং দূরে দূরে অবস্থিত ও গোলাগুলিবর্ষণের ক্ষেত্রে পরস্পর যোগাযোগহীন কেল্লাসমূহ। এমনিতেই ওগুলোর পাশ কেটে যাওয়া ছিল খুবই সহজ, তদুপরি পদাতিক ডিভিশনের এলাকায় ট্যাঙ্কবিরোধী উপকরণের ঘনতা ছিল অতি সামান্য এবং রণাঙ্গনের প্রতি কিলোমিটারে দুটোর বেশি কামান ছিল না।

পোল্যাণ্ডের নৌ-বাহিনীতে ছিল ৪টি ডেসট্রয়ার (এর মধ্যে ৩টি চলে গিয়েছিল ইংলণ্ডে), ৫টি ডুবো জাহাজ, একটি মাইন-প্ল্যাণ্টার, ৫টি মাইন সুইপার, সহায়ক জাহাজগুলি, কয়েকটি উপকূলীয় প্রতিরক্ষা ব্যাটেলিয়ন, সামুদ্রিক বিমান বাহিনী। নৌ-বহরের কাজ ছিল — গ্দিনিয়া সামরিক নৌ-ঘাঁটি ও হেল উপদ্বীপ রক্ষা করা, ওখানে সৈন্য অবতরণ করতে না দেওয়া, শত্রুর যুদ্ধ-জাহাজগুলোর সঙ্গে সংগ্রাম চালানো এবং মাইন পাতা।*

নাৎসি ফৌজের লোকবল ও অস্ত্রবল ছিল অনেক বেশি, এবং এ সমস্তকিছু বিবেচনা করলে পোলিশ বাহিনীর অবস্থা ছিল অতি সংকটজনক।

জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী দুটি আঘাত হানার পরিকল্পনা

* Mala encyklopedia wojskowa, t. II, S. 276.

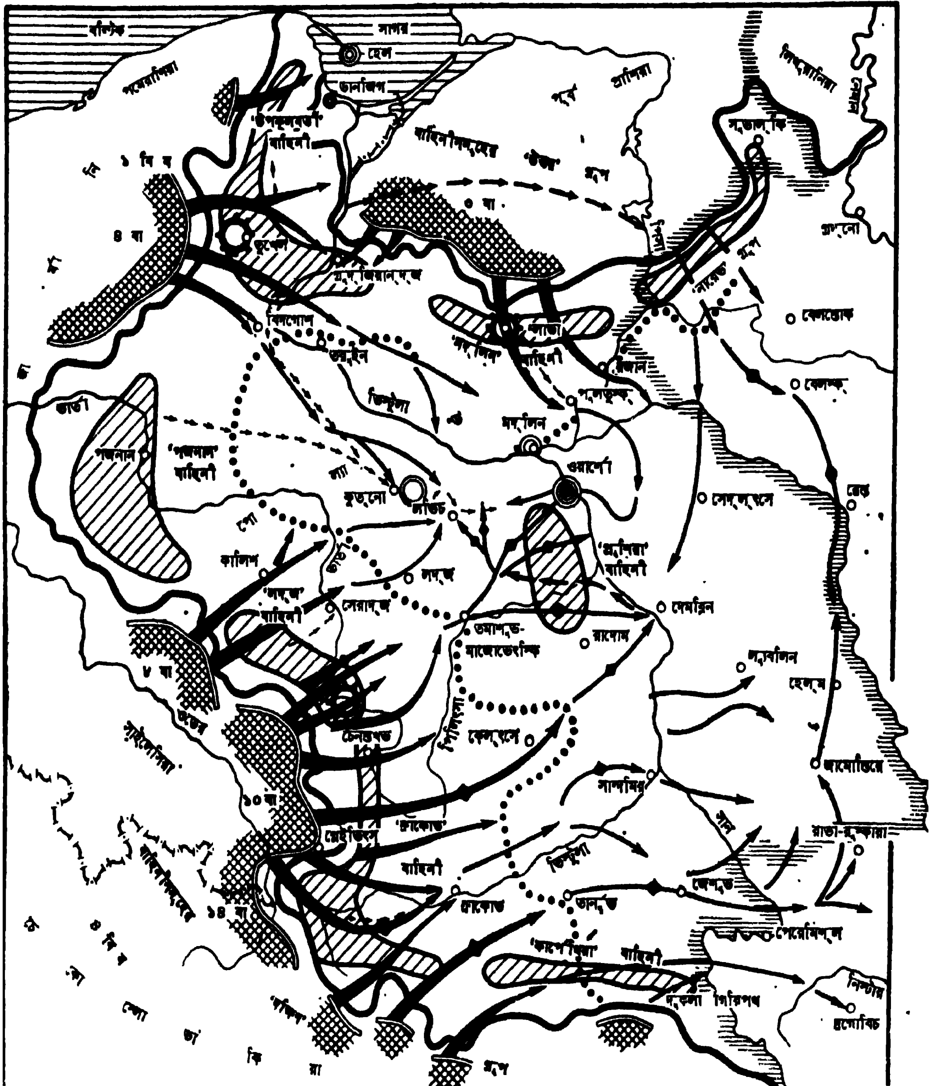
প্রস্তুত করে। বিভিন্ন দিক থেকে ওয়ার্শোর উপর প্রধান আঘাতটি হানবে পূর্ব প্রাশিয়া থেকে ৩য় বাহিনীর শক্তি দিয়ে এবং দ্বিতীয় আঘাতটি হানবে সাইলেসিয়া থেকে ১০ম বাহিনীর শক্তি দিয়ে। আঘাতগুলোর উদ্দেশ্য: ভিস্টুলা আর নারেভ নদীদ্বয়ের পশ্চিমে অবস্থিত পোলিশ বাহিনীর প্রধান শক্তিগুলোকে ঘিরে ফেলা ও বিধ্বস্ত করা।

আক্রমণ যাতে আকস্মিক হয় সেই উদ্দেশ্যে ফ্যাসিস্টরা সামরিক চালাকির আশ্রয় নেয়। যুদ্ধকালীন লোকসংখ্যা সম্বলিত স্থায়ী ডিভিশনগুলো পূর্ব প্রাশিয়ায় লড়াইয়ের ২৫তম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের অজুহাতে 'উত্তর' বাহিনীসমূহের গ্রুপটির রণনৈতিক প্রসারণের অঞ্চলগুলোতে প্রেরিত হয়, আর হালকা ইনফেণ্ট্রি ও মোটোরাইজ্‌ড ডিভিশনগুলোকে 'হেমন্তকালীন মহড়ার' অছিলায় পোল্যাণ্ডের সীমান্তের কাছে নিয়ে আসা হয়।

৩১ আগস্ট পোল্যাণ্ডের সীমানা সন্নিকটস্থ জার্মান শহর গ্লেইভিৎসে ফ্যাসিস্টরা এক প্ররোচনার আয়োজন করে। জার্মানির শাসকরা তা ব্যবহার করে পোল্যাণ্ডের উপর আক্রমণ আরম্ভ করার হেতু হিশেবে। প্ররোচনাটি সংঘটিত হয় এভাবে: পোলিশ সামরিক পোশাক পরিহিত ফ্যাসিস্টরা জার্মান ভূখণ্ডের উপর সাজানো হামলার দোহাই দিয়ে স্থানীয় বেতার কেন্দ্রে ঢুকে মাইক্রোফোনের কাছে কিছু গুলি ছোঁড়ে এবং পোলিশ ভাষায় আগে থেকে তৈরি একটি বয়ান পড়ে। বয়ানটিতে অংশত এ কথাও বলা হয়েছিল যে 'জার্মানির বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডের যুদ্ধ ঘোষণার সময় এসেছে।' অধিক প্রত্যয় জন্মানোর উদ্দেশ্যে নাৎসিরা তাদের সঙ্গে করে নিয়ে আসে পোলিশ সামরিক পোশাক পরানো কিছু জার্মান অপরাধীকে এবং গ্লেইভিৎসে ওদের গুলি করে হত্যা করে। এই ঘটনার কয়েক দিন আগে হিটলার নির্লজ্জভাবে তার জেনারেলদের বলেছিল: 'যুদ্ধ বাধানোর কারণ দর্শানোর জন্য আমি প্রচারকার্য চালাব, তবে তা বিশ্বাসযোগ্য হবে কি না তাতে কিছু এসে যায় না। বিজয়ীকে পরে জিজ্ঞেস করা হবে না সে সত্যি কথা বলেছিল কি না।'*

১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর জার্মান-ফ্যাসিস্ট সৈন্যরা বিশ্বাসঘাতকের

* ১৯৩৯ সালের ২২ আগস্ট সর্বোচ্চ সেনাপতিবৃন্দের সামনে হিটলারের দ্বিতীয় ভাষণ। Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal (further on — IMT) — Nuremberg, 1947, Vol. II, p. 290.



১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পোল্যান্ডের সীমান্ত
জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের আক্রমণকারী গ্রুপগুলো।
১. ৯. ৩৯ তারিখে পোলিশ ফৌজের অবস্থান
১ থেকে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জার্মান-ফ্যাসিস্ট সৈন্যদের আক্রমণাভিযান
পোলিশ ফৌজের পশ্চাদপসরণ
আক্রমণের প্রথম দিনগুলোতে সবচেয়ে দৃঢ় প্রতিরক্ষার অঞ্চলগুলো
৭.৯ তারিখে পোলিশ ফৌজের প্রতিরক্ষা লাইন
৭ থেকে ১৭.৯ তারিখ পর্যন্ত জার্মানদের আক্রমণাভিযান
পরিবেষ্টনের মধ্যে পোলিশ ফৌজের সংগ্রামের অঞ্চলগুলো
২৮.৯ তারিখের চুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত-জার্মান সীমান্ত রেখা

নকশা ১। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীর পোল্যান্ড আক্রমণ

মতো পোল্যান্ড আক্রমণ করল। ভোর ৪টা ৪৫ মিনিটের সময় জার্মান বিমান বাহিনী পোল্যান্ডের বিমান বন্দর, যোগাযোগ ব্যবস্থা, রেল জংশন, অর্থনৈতিক আর প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলোর উপর বোমাবর্ষণ করতে আরম্ভ করে। এর ফলে প্রথম দিনেই পোলিশ বিমান বাহিনী বিপুলভাবে

ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জার্মান ট্যাঙ্ক ডিভিশনগুলো প্রধান প্রধান অভিমুখে পোলিশ রণাঙ্গন ভেদ করে ফেলে, ওই সমস্ত ডিভিশনের পেছন পেছন চলতে থাকে বৃহৎ মোটোরাইজ্‌ড ইউনিটগুলো; ডাইনে ও বাঁয়ে ওগুলোর পার্শ্বদেশ রক্ষা করছিল পদাতিক সৈন্যরা।

৭ সেপ্টেম্বর জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনী পূর্ব প্রাশিয়া থেকে আক্রমণাভিযান চালিয়ে নারেভ নদীতে পেঁছে যায়, আর ৮ সেপ্টেম্বর 'দক্ষিণ' বাহিনীসমূহের গ্রুপটির অগ্রণী ইউনিটগুলো সাইলেসিয়া থেকে আক্রমণাভিযান চালিয়ে ওয়ার্শোর কাছে এসে যায়।

পোলিশ সরকার সামরিক চুক্তি অনুসারে ফ্রান্স ও ব্রিটেনর কাছে অবিলম্বিত সহায়তার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাল। উক্ত দেশ দুটিকে বলা হল যে তাদের স্থল বাহিনী আক্রমণাভিযান ও বিমান বাহিনী বোমাবর্ষণ আরম্ভ করুক। কিন্তু মিত্ররা বস্তুত কিছুই করল না। ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর তারা ভার্সাই চুক্তি পুনর্বিবেচনার জন্য সম্মেলন আহ্বানের বিষয়ে হিটলারের কূটনীতিকদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করল, কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। মিউনিখ সমঝোতার সমর্থকদের নেতা চেম্বারলেন সম্পর্কে হিটলার তার অনুচরদের ঘৃণার সঙ্গে বলেছিল: 'ছাতাওয়ালা এই লোকটি' বের্খ্‌টেসগাডেন-এ আমার কাছে একবার এসে দেখুক না ... আমি ওকে পাছায় লাথি মেরে সিঁড়ি দিয়ে ফেলে দেব। এবং ওই দৃশ্য দেখার জন্য যথাসম্ভব বেশি সংখ্যক সাংবাদিককে ডেকে আনতে ভুলব না।'*

কেবল ৩ সেপ্টেম্বর ব্রিটেন ও ফ্রান্স আনুষ্ঠানিকভাবে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তবে তার বিরুদ্ধে তারা কোন সক্রিয় সামরিক ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ করে নি।

এটা অবশ্য সত্যি যে ৯ সেপ্টেম্বর ফরাসি বাহিনী সীমিত উদ্দেশ্য নিয়ে সার-এ আক্রমণাভিযান চালায়, তবে ১২ সেপ্টেম্বর তা বন্ধ হয়ে যায়। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রকৃত পক্ষে নিজের মিত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। অথচ পোল্যাণ্ডকে বাস্তব সহায়তা দানের মতো এবং পশ্চিম থেকে আঘাত হেনে ফ্যাসিস্ট জার্মানিকে পরাস্ত করার মতো বিপুল সামরিক শক্তি তাদের

।

* দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস। খণ্ড ৩। — মস্কো: ভয়েনইজদাত, ১৯৭৪, পৃঃ ১৪।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে মিত্র বাহিনীগ্লোর বির্দ্ধে দাঁড়িয়ে ছিল জার্মান 'C' বাহিনীসম্হের গ্রুপটি। তাতে ছিল ৪৩টির মতো পদাতিক ডিভিশন। ওগ্লোর, মধ্যে, লিখেছেন পশ্চিম জার্মান ইতিহাসবিদ ন. ফর্মান, 'কেবল ১১টি স্থায়ী পদাতিক ডিভিশনকেই প্র্ণাঙ্গ বলে অভিহিত করা সম্ভব ছিল, আর বাদবাকি সমস্ত ডিভিশন ছিল নতুন ফর্ম্যাশন এবং নিজেদের প্রস্তুতি ও প্রয্ক্তিগত সাজসজ্জার বিচারে ওগ্লো মোটেই গতিশীল য্দ্ধের উপযোগী ছিল না ... তদ্পরি ওগ্লোর একাংশ অবস্থিত ছিল পথিমধ্যে — সমাবেশ স্থলের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। বাহিনীসম্হের (অর্থাৎ 'C' বাহিনীসম্হের। — সম্পাঃ) গ্রুপটির হাতে একটি ট্যাঙ্কও ছিল না, একটি ব্হৎ মোটোরাইজ্‌ড ইউনিটও ছিল না।*

জার্মান সীমান্তে ফ্রান্সের ছিল প্রায় ৯০টি ফর্ম্যাশন। কামান, ট্যাঙ্ক আর বিমানের সংখ্যায় তার বাহিনী জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। নাৎসি জেনারেল গাল্‌ডের তার সামরিক ডায়েরিতে লিখেছিল যে পশ্চিম রণাঙ্গনে ডিভিশনের আর্টিলারি না ধরলে জার্মানদের হাতে ছিল প্রায় ৩০০টি কামান, আর ফরাসিদের হাতে — ১,৬০০টি।** ফরাসি বাহিনীতে ছিল প্রায় ২,০০০টি ট্যাঙ্ক, আর জার্মানদের কাছে কোন ট্যাঙ্ক ছিল না বললেই চলে। মিত্রদের হাতে ছিল প্রায় ৩ হাজার বিমান (ফ্রান্সের — ১,৪০০টি, ইংলন্ডের — ১,৫০০টি), আর 'C' বাহিনীসম্হের গ্রুপটির হাতে ছিল সীমিত সংখ্যক বিমান।

ন্রেমবার্গ মোকদ্দমার দলিলাদি থেকে জানা যায় যে ফ্যাসিস্ট জার্মানির সামরিক নেতৃবর্গ মিত্র বাহিনীসম্হের আক্রমণাভিযানকে ভীষণ ভয় করত। জেনারেল-ফিল্ডমার্শাল ভ. কেইটেল তা এভাবে স্বীকার করেছে: 'ফ্রাঙ্কো-ব্টিশ সৈন্যরা যদি আক্রমণাভিযান আরম্ভ করত তাহলে আমরা ওদের একেবারে সামান্য প্রতিরোধই দিতে পারতাম।'*** আর জেনারেল

* Vormann N. Der Feldzug 1939 in Polen. — Weissenburg, 1958, S. 71.

** গাল্‌ডের ফ.। সামরিক ডায়েরি। জার্মান থেকে অন্বাদ। খণ্ড ১। — মস্কো, ১৯৬৮, প্ঃ ৩২।

*** ম্খ্য জার্মান য্দ্ধাপরাধীদের বির্দ্ধে ন্রেমবার্গ মোকদ্দমা। দলিলপত্রের সংগ্রহ। সাত খণ্ডে। (পরে লেখা হবে — ন্রেমবার্গ মোকদ্দমা।) খণ্ড ১। — মস্কো, ১৯৫৯, প্ঃ ৪২১।

ইওডল এ প্রসঙ্গে বলেছে: '১৯৩৯ সালেই আমরা যে পরাস্ত হই নি তার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই যে পোল্যান্ডের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধের সময় পশ্চিমে ২৩টি জার্মান ডিভিশনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান প্রায় ১১০টি ফরাসি ও ব্রিটিশ ডিভিশন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ছিল।'*

এরূপ নিষ্ক্রিয়তার কারণটি খুবই স্পষ্ট। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের শাসক মহলগুলো ফ্যাসিস্ট জার্মানিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছিল। ফরাসি জেনারেল বোর্ফের স্বীকৃতি অনুসারে, 'একমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের মধ্যেই খোঁজা উচিত আমাদের লোরেন ফ্রন্টের পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তার কারণ'।**

'উত্তর' বাহিনীসমূহের গ্রুপের ফৌজগুলো পূর্ব দিক থেকে ওয়ার্শো ঘিরে ফেলে আর 'দক্ষিণ' বাহিনীসমূহের গ্রুপের ফৌজগুলো শহরটি ঘেরাও করে দক্ষিণ দিক থেকে এবং ১৯৩৯ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর ভ্লদাভা অঞ্চলে নিজেদের মধ্যে মিলিত হয়। পোলিশ বাহিনীর প্রধান শক্তিসমূহের চারিদিকের বেষ্টনী সংকুচিত হয়ে আসে। ওই দিনই পোলিশ সরকারের সদস্যরা দেশ ও জনগণকে নিয়তির হাতে সঁপে দিয়ে রুমানিয়ায় পালিয়ে যায়। পোলিশ সরকার তার অদূরদর্শী নীতির দ্বারা দেশকে এক জাতীয় বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। তবে পোল্যান্ডের সামরিক ও অসামরিক স্বদেশপ্রেমিকরা জার্মান-ফ্যাসিস্ট হানাদারদের সঙ্গে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম অব্যাহত রাখে। ২০ দিন ধরে পূর্ণ অবরোধের মধ্যে, ফ্যাসিস্টদের প্রবল বোমাবর্ষণের মধ্যে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে ওয়ার্শোর রক্ষকরা। ১২ সেপ্টেম্বর লড়াইয়ের এলাকায় এল হিটলার। সে স্থল বাহিনীর প্রধান সেনাপতিমণ্ডলীকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি পোলিশ রাজধানী অধিকার করার হুকুম দিল। ওয়ার্শোর উপর ভীষণ বোমাবর্ষণ শুরু হল। তাতে অংশ নেয় ১,১৫০টি বিমান। এই বর্বরোচিত বোমাবর্ষণে বিধ্বস্ত হয় সামরিক ঘাঁটি নয়, আবাসিক এলাকাগুলো। একই সঙ্গে শহরের উপর কামান থেকেও ব্যাপক পরিমাণ গোলা বর্ষিত হয়। তবে ওয়ার্শোর রক্ষী সৈন্যদল ফ্যাসিস্টদের প্রতিরোধ দিয়ে যায়। কেবল বিপুল ক্ষয়ক্ষতিই, গোলাবারুদ, জল, খাদ্যদ্রব্য আর ঔষধপত্রের তীব্র অভাবই ওয়ার্শোবাসীদের আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। রাজধানীর রক্ষকদের মোট

ক্ষয়ক্ষতির চেহারাটি এরূপ: ২ হাজার সৈনিক ও অফিসার নিহত হয়, ১৬ হাজার আহত হয়; অসামরিক জনসংখ্যার মধ্যে নিহত হয়েছিল প্রায় ৬০ হাজার লোক, আহতের সংখ্যা ছিল বেশ কয়েক সহস্র।* ওয়ার্শোর বীরত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এ হচ্ছে প্রথম দৃষ্টান্ত, যখন বিশাল এক শহরের বাসিন্দারা পূর্ণ অবরোধের পরিস্থিতিতে আগ্রাসকের বহু গুণ বেশি শক্তিশালী বাহিনীকে নির্ভর প্রতিরোধ দেয়।

৩০ সেপ্টেম্বর অবধি লড়াই চলে মদ্‌লিন দুর্গের জন্য, আর ২ অক্টোবর পর্যন্ত পোলিশ যোদ্ধারা আত্মরক্ষা করে যায় হেল উপদ্বীপে। অক্টোবরের প্রথম দিনগুলোতেই পোল্যাণ্ডে সামরিক ক্রিয়াকলাপ সমাপ্ত হয়ে যায়। মক্রা ও ম্লাভার কাছে, বজুরা নদীর তীরে লড়াই চলা কালে, মদ্‌লিন, রাদোম আর ভেস্তেরপ্লাতের প্রতিরক্ষা কালে এবং ওয়ার্শোর বীরত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষার সময় পোলিশ যোদ্ধাদের অটল প্রতিরোধ সত্ত্বেও পোল্যাণ্ডের পরাজয় এড়ানো সম্ভব হল না। জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীগুলো তার ভূখণ্ড দখল করে নিল।

জার্মান-পোলিশ যুদ্ধে পোলিশ বাহিনীর ৬৬ হাজার ৩ শো লোক নিহত হল, ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৭ শো হল আহত, প্রায় ৪ লক্ষ ২০ হাজার হল বন্দী। অসামরিক নাগরিকদের মধ্যেও হতাহতের সংখ্যা ছিল অনেক। জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীগুলোর ক্ষয়ক্ষতির চিত্রটি এরূপ: ১০ হাজার ৬০০ লোক নিহত, ৩০ হাজার ৩ শো আহত এবং ৩ হাজার ৪ শো নিখোঁজ।

পোল্যাণ্ডের পরাজয়ের কী কী কারণ ছিল? প্রথমত, বুর্জোয়া-ভূস্বামী শাসিত পোলিশ রাষ্ট্রের দুর্বলতা, — পোলিশ সরকার প্রতিক্রিয়াশীল অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করছিল, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে প্রতিরক্ষামূলক জোট গড়তে অস্বীকার করেছিল। দ্বিতীয়ত, পোল্যাণ্ডের সীমিত সামরিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতার দরুন সে একাকী সামরিক-অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী ফ্যাসিস্ট জার্মানির সঙ্গে অসমান যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে নি। তৃতীয়ত, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে পোল্যাণ্ডের জোট গড়ার আশা ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন হল। আর পোল্যাণ্ডের বিচ্ছিন্নতা ভের্মাখ্‌টকে পোলিশ বাহিনীর উপর তার শ্রেষ্ঠতা (বিশেষত ট্যাঙ্ক ও বিমানের ক্ষেত্রে) প্রমাণ করার ও দ্রুত গতিতে সামরিক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করার সুযোগ দিল।

* Historia wojskowości polskej, S. 473.

সমর কৌশলের বিচারে জার্মান-পোলিশ যুদ্ধ আক্রমণকারীর ক্রিয়াকলাপে নতুন কিছু ব্যাপার দেখিয়েছিল। তা হল: সৈন্যযোজন ও সশস্ত্র বাহিনী প্রসারণের উদ্দেশ্যে আগে থেকে ব্যবস্থাদি অবলম্বন; স্থল বাহিনীর, বিশেষত ট্যাঙ্ক বাহিনীর, এবং বিমান বাহিনীর আগে থেকে তৈরি গ্রুপিংয়ের আকস্মিক ব্যাপক আঘাতের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা; ট্যাঙ্ক বাহিনীর বিপুল সম্ভাবনা, যা এই প্রথম বার কাজে লাগানো হয়েছিল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করার জন্য, রণাঙ্গনের গভীরে সাফল্য লাভের জন্য এবং বিপক্ষের বৃহৎ গ্রুপিংগুলোকে পরিবেষ্টনের উদ্দেশ্যে সামরিক চালের জন্য।

পোলিশ জনগণের জন্য জার্মান-পোলিশ যুদ্ধের পরিণাম ছিল মর্মান্তিক। পোল্যান্ডে প্লাবনের গতিতে ঢুকল ফ্যাসিস্ট নিরাপত্তা বিভাগ (এস-এস) আর পুলিশ বিভাগের পিটুনি বাহিনীগুলো। পোলিশ রাষ্ট্রিকতা ও পোলিশ জনগণকে ধ্বংস করার বিভীষিকাময় নাৎসি কর্মসূচিটির বাস্তবায়ন শুরু হল। ৯৫ লক্ষ লোক অধ্যুষিত পজনান, পমেরানিয়া, সাইলেসিয়া ও লদ্‌জ প্রদেশগুলো এবং কেলৎসে ও ওয়ার্শো প্রদেশের একাংশ 'জার্মান ভূমি' বলে ঘোষিত হয় এবং ফ্যাসিস্ট জার্মানির সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। বাকি ভূখণ্ড পরিণত হয় 'অধিকৃত পোলিশ অঞ্চলসমূহের যুক্ত প্রদেশে', যা ১৯৪০ সালের হেমন্তে 'জার্মান সাম্রাজ্যের প্রদেশ' নামে অভিহিত হয়।

পোলিশ জনগণের জল্লাদ ফ্রাঙ্ক্‌কে হিটলার ওই 'প্রদেশের' শাসনকর্তা নিযুক্ত করে। পোল্যান্ডে নিজের কার্যকলাপের বিষয়ে ফ্রাঙ্ক্ এই কথাগুলো বলেছিল: 'আমি অধিকৃত পূর্বাঞ্চলসমূহ শাসন করার দায়িত্ব এবং যুদ্ধের ভূখণ্ড ও বিজিত দেশ হিশেবে এই সমস্ত অঞ্চলকে নির্মমভাবে বিনষ্ট করার জরুরী আদেশ পেয়েছি। এই অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোকে আমার এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার কথা ছিল।'* কিন্তু পোলিশ জনগণ দমিত হয় নি। জার্মান-ফ্যাসিস্ট দখলকারীদের বিরুদ্ধে দেশ জোড়া সংগ্রামের প্রবলতা ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

পোল্যান্ডে জার্মান ফৌজগুলোর অভিযান এবং পূর্বাভিমুখে তাদের দ্রুত অগ্রগতি এ বিষয়ে কোন সন্দেহই রাখে নি যে হিটলারী সরকার

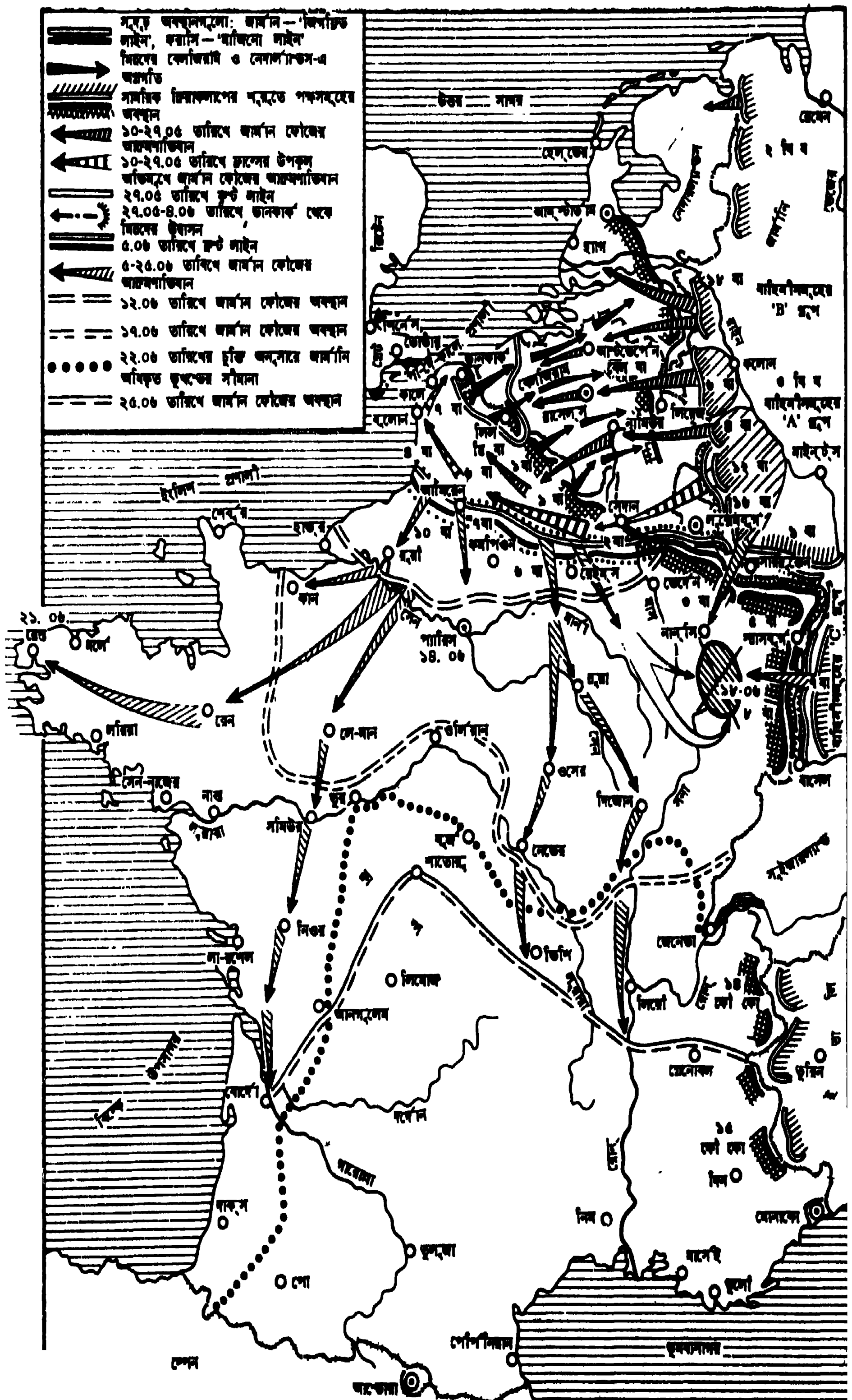
* Piotrowski S. Dziennik Hansa Franka. — Warszawa, 1957, S. 96.

সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের উদ্দেশ্যে সোভিয়েত সীমান্তের কাছে সুবিধাজনক অবস্থান লাভ করতে সচেষ্ট। এহেন পরিস্থিতিতে সোভিয়েত সরকারকে দ্রুত ও জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। পূর্বাভিমুখে জার্মান সৈন্যদের অগ্রগতি রুখা এবং ওদের সোভিয়েত সীমান্তের কাছে পৌঁছতে বাধা দেওয়া প্রয়োজন ছিল। ভূস্বামী শাসিত পোল্যাণ্ডে অধিকারহীন জাতি হিশেবে বসবাসকারী আপন ভাইদের — পশ্চিম ইউক্রেনীয় ও বেলোরুশদের দুরদৃষ্টের প্রতিও সোভিয়েত জনগণ উদাসীন থাকতে পারে নি। ও-দেশে ওদের একেবারে অদৃষ্টের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই জন্যই ১০ সেপ্টেম্বর তারিখে লাল ফৌজ সোভিয়েত সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে পশ্চিম ইউক্রেন ও পশ্চিম বেলোরুশিয়ায় মুক্তি অভিযান আরম্ভ করে। পূর্বাভিমুখে নাৎসি বাহিনীর পথ রোধ করে দেওয়া হল, এবং তারা থামতে বাধ্য হয়।

১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে পশ্চিম ইউক্রেনে ও পশ্চিম বেলোরুশিয়ায় জাতীয় সভাগুলোতে গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওখানকার বাসিন্দাদের ইচ্ছানুসারে জাতীয় সভাগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের কাছে পশ্চিম ইউক্রেন ও পশ্চিম বেলোরুশিয়াকে সোভিয়েত দেশের জাতিসমূহের ভ্রাতৃপ্রতিম পরিবারে গ্রহণের অনুরোধ জানায়। অনুরোধটি রক্ষা করা হয়।

২। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অভিযান (১৯৪০ সালের ১০মে-২৪জুন)

মিত্রদের নিষ্ক্রিয়তা, তাদের মিউনিখপন্থী, সোভিয়েতবিরোধী নীতি ফ্যাসিস্টদের কেবল দ্রুত পোল্যাণ্ডকে পরাস্ত করারই সুযোগ দিল না, তাদের পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহের বিরুদ্ধে আক্রমণাভিযানের জন্য প্রস্তুত হতেও সাহায্য করল। হিটলার অনাক্রমণের বিষয়ে তার সমস্ত প্রতিশ্রুতি পদদলিত করল — ১৯৪০ সালের ৯ এপ্রিল জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজগুলো যুদ্ধ ঘোষণা না করেই ডেনমার্কে ঢুকে পড়ে এবং তাড়াতাড়ি সারা দেশটি দখল করে নেয়। ওই দিনই নরওয়ের বিরুদ্ধে জার্মান আক্রমণ আরম্ভ হল। নৌ-সৈন্যরা অবতরণ করে অস্‌লোতে, আরেনদালে, ক্রিস্টিয়ানসানে, স্তাভানগেরে, এগেরসুনে, বের্গেনে, ত্রনহেইমে, নার্ভিকে; আর অস্‌লোতে, স্তাভানগেরে ও অন্যান্য স্থানে নৌ-সৈন্যদের সঙ্গে সঙ্গে বায়ুসেনারাও অবতরণ ঘটে। নরওয়েজীয় স্বদেশপ্রেমিকদের এবং সামরিক



নকশা ২। ১৯৪০ সালে পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহে জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীগুলোর আক্রমণ

ইউনিটগ‍ুলোর প্রতিরোধ সত্ত্বেও ফ্যাসিস্টরা তাড়াতাড়ি দেশের গ‍ুর‍ুত্বপ‍ূর্ণ স্ট্র্যাটেজিক স্থানগ‍ুলো অধিকার করে নিতে সমর্থ হয়।

এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে নরওয়েতে এসে নামল ইঙ্গো-ফরাসি বাহিনীগ‍ুলো। তারা নার্ভিক ম‍ুক্ত করল বটে, কিন্তু ফ্যাসিস্ট আগ্রাসককে বড় রকমের কোন প্রতিরোধ দিতে পারল না এবং জ‍ুন মাসে তারা নরওয়ে থেকে অপসারিত হল। ফ্যাসিস্টপন্থী ব্যক্তিদের সহায়তায়, নরওয়েজীয় জনগণের বিশ্বাসঘাতক ভ. ক্‌ভিস্‌লিঙের নেতৃত্বাধীন তথাকথিত 'পঞ্চম বাহিনীর' সহায়তায় জার্মান-ফ্যাসিস্ট সৈন্যরা দ‍ুমাস পরে দেশটি সম্প‍ূর্ণর‍ূপে অধিকার করে নেয়।

এই ভাবে, পোল্যান্ডের বির‍ুদ্ধে য‍ুদ্ধের মতো এখানেও হিটলারী সেনাপতিমণ্ডলী ক্রিয়াকলাপের আকস্মিকতা, বিপক্ষ দেশগ‍ুলোর মধ্যে বিরোধ, তাদের সামরিক মতবাদের প্রতিরক্ষাম‍ূলক চরিত্র এবং সৈন্য পরিচালনার দ‍ুর্বলতার স‍ুযোগ নিয়ে ডেনমার্ক ও নরওয়ের বির‍ুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে ত্বরিত এক অভিযান সম্পন্ন করে। এই দেশ দ‍ু'টি দখল করাতে ফ্যাসিস্ট জার্মানি উত্তরে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্তের কাছে গ‍ুর‍ুত্বপ‍ূর্ণ স্ট্র্যাটেজিক স্থানগ‍ুলো পেল, নিজের নৌ-বাহিনীর ঘাঁটি ব্যবস্থা উন্নত করল, এবং ডেনমার্ক ও নরওয়ের অর্থনৈতিক ক্ষমতা কাজে লাগানোর, আর স‍ুইডেনের আকরিক ব্যবহার করার স‍ুযোগ লাভ করল।

নরওয়ে অভিযান সমাপ্ত হওয়ার আগেই জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী 'গেল্‌ব' পরিকল্পনা (হলদে পরিকল্পনা) বাস্তবায়নের কাজে হাত দিল। তা অন‍ুসারে, ল‍ুক্সেমব‍ুর্গ, বেলজিয়াম ও নেদার্ল্যান্ডসের ভেতর দিয়ে ফ্রান্সের উপর বিদ‍্যুৎগতিতে আঘাত হানার কথা। ফ্রান্সের বির‍ুদ্ধে অভিযানের উদ্দেশ্য — পশ্চিম ইউরোপে মিত্র বাহিনীসম‍ূহকে বিধ্বস্ত করা, হল্যান্ড ও বেলজিয়াম দখল করা, ফ্রান্সকে য‍ুদ্ধ থেকে সরিয়ে দেওয়া এবং ইংলন্ডকে ফ্যাসিস্ট জার্মানির পক্ষে লাভজনক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা।

ফ্রান্সকে পরাস্তকরণের উদ্দেশ্যে জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী গৃহীত পরিকল্পনাটি ছিল এর‍ূপ: ৪র্থ, ১২শ, ১৬শ বাহিনীগ‍ুলো, একটি ট্যাঙ্ক গ্র‍ুপ ও ১৫শ স্বতন্ত্র ট্যাঙ্ক কোর নিয়ে গঠিত 'A' বাহিনীসম‍ূহের গ্র‍ুপটির (অধিনায়ক জেনারেল গ. র‍ুণ্ডস্টেড্‌ট) শক্তি দিয়ে পশ্চিম রণাঙ্গনের মধ্য ভাগে প্রধান আঘাত হানা। ফৌজগ‍ুলোর এই গ্র‍ুপিংয়ে ছিল ৪৫টি ডিভিশন, যার মধ্যে ৭টি ট্যাঙ্ক ডিভিশন। আকাশ থেকে

তাকে সমর্থন জোগাচ্ছিল ৩য় বিমান বহর যাতে বিমানের সংখ্যা ছিল প্রায় ১ হাজার। ফৌজগুলোকে এরূপ দায়িত্ব দেওয়া হল: লুক্সেমবুর্গের ভূখণ্ড ও বেলজিয়ান আর্দেনে অতিক্রম করতে হবে, যেখানে ফরাসিরা ট্যাঙ্কের প্রয়োগ প্রত্যাশা করছিল না, পরে সেদান ও স্তেনে রণাঙ্গনে মাস নদীতে পৌঁছতে হবে এবং মাজিনো প্রতিরক্ষা লাইনের সঙ্গে মিত্র বাহিনীসমূহের প্রথম গ্রুপের সংযোগ স্থলে প্রবেশ করতে হবে। এর পর আক্রমণাভিযান চালাতে হবে আরাস ও বুলোন অভিমুখে, ইংলিশ প্রণালীর তীরে পৌঁছতে হবে, বেলজিয়ামে ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনীগুলোকে ঘিরে ফেলতে হবে এবং 'B' বাহিনীসমূহের গ্রুপের সঙ্গে সহযোগিতায় ওগুলোকে ধ্বংস করতে হবে। এ কাজে প্রধান ভূমিকা পালন করে জেনারেল এ. ক্লেইস্টের ট্যাঙ্ক গ্রুপ (১,২৫০টি ট্যাঙ্ক) এবং জেনারেল গ. গটের ট্যাঙ্ক কোর (৫৪২টি ট্যাঙ্ক)।

পশ্চিম রণাঙ্গনের ডান পার্শ্বে সহায়ক আঘাত হানা হচ্ছিল ১৮শ, ৬ষ্ঠ বাহিনীগুলো ও ১৬শ স্বতন্ত্র ট্যাঙ্ক কোর — সর্বমোট ২৯টি ডিভিশন, যার মধ্যে ৩টি ট্যাঙ্ক ডিভিশন — নিয়ে গঠিত 'B' বাহিনীসমূহের গ্রুপটির (অধিনায়ক জেনারেল ফ. বক) শক্তি দিয়ে। আকাশ থেকে গ্রুপটিকে সমর্থন জোগাচ্ছিল ২য় বিমান বহর। নির্দেশ দেওয়া হয় যে ১৮শ বাহিনীর শক্তিসমূহকে (পদাতিক ডিভিশন — ৭, ট্যাঙ্ক ডিভিশন — ১, মোটরাইজড ডিভিশন — ১, অশ্বারোহী ডিভিশন — ১) হল্যান্ডে প্রবেশ করতে হবে, প্যারাট্রুপার আর বায়ুসেনার ইউনিটগুলো দিয়ে হ্যাগ, রটার্ডাম দখল করতে হবে এবং ওলন্দাজ বাহিনীর প্রতিরোধ দমন করতে হবে। ১৮শ বাহিনীর শক্তিসমূহ রটার্ডাম অঞ্চলে ঢুকে পড়ার ও বায়ুসেনার ইউনিটগুলোর সঙ্গে মিলিত হওয়ার আদেশ পেল।

বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে প্রসারিত ৬ষ্ঠ বাহিনী (১৬শ স্বতন্ত্র ট্যাঙ্ক কোর সহ ১৭টি ডিভিশন) নামিউর, লিয়েজ, আণ্টভের্পেন দুর্গগুলো ঘিরে ফেলার, ওগুলোর বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টি করার, 'A' বাহিনীসমূহের গ্রুপের ইংলিশ প্রণালীর তীরে পৌঁছার আগে বেলজিয়ামে ইঙ্গো-ফরাসি বাহিনীকে অচল ও অকেজো করে দেওয়ার এবং তদ্দ্বারা মিত্র বাহিনীসমূহের ১ম গ্রুপটিকে পরিবেষ্টনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করার দায়িত্ব পেল। সুতরাং, 'B' বাহিনীসমূহের গ্রুপের কাজ ছিল — হল্যান্ড দখল করা এবং বেলজিয়ামে মিত্র বাহিনীগুলোকে অচল ও অকেজো করে দেওয়া, আর তারপর 'A' বাহিনীসমূহের গ্রুপটির সঙ্গে সহযোগিতায় ওগুলোকে ধ্বংস করার কাজে অংশ নেওয়া।

জেনারেল ভ. লিয়েবের পরিচালনাধীন 'C' বাহিনীসমূহের গ্রুপটিকে প্রসারিত করা হয়েছিল পশ্চিম রণাঙ্গনের বাম পার্শ্বে এবং তার কাজ ছিল — মাজিনো লাইনে ফরাসি ফৌজগুলোকে নিশ্চল করে রাখা। গ্রুপে ছিল ১ম ও ৭ম বাহিনীগুলো — সর্বমোট ১৯টি ডিভিশন।

ভের্মাখ্টের রিজার্ভে ছিল ৪২টি ডিভিশন ও ১টি ব্রিগেড।

এই ভাবে, ফ্রান্স আক্রমণের জন্য নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলী ১৩৬টি ডিভিশনের সমাবেশ ঘটায়, এবং তাতে ছিল ১০টি ট্যাংক ও ৭টি মোটোরাইজ্ড ডিভিশন, ৩,৮২৪টি জঙ্গী বিমান, ২,৫৮০ ট্যাংক, ৭৫ মিলিমিটার ও ততোধিক ক্যালিবরের ৭,৩৭৮টি কামান। এর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান মিত্র বাহিনীগুলোতে ছিল ২৩টি ট্যাংক, মেকানাইজ্ড ও মোটোরাইজ্ড ডিভিশন সহ সর্বমোট ১৪৭টি ডিভিশন, প্রায় ৩,১০০টি ট্যাংক, ১৪,৫০০টিরও বেশি কামান, প্রায় ৩,৮০০টি জঙ্গী বিমান। সুতরাং, মিত্র বাহিনীগুলোর পক্ষে শক্তির অনুপাত অধিকতর অনুকূল ছিল, বিশেষত ট্যাংকের ক্ষেত্রে। কিন্তু মিত্রদের এই শ্রেষ্ঠতা বস্তুত পক্ষে কোন কাজেই লাগে নি, কেননা অধিকাংশ ফরাসি ট্যাংকই বাহিনীগুলোর মধ্যে বণ্টিত বিভিন্ন ট্যাংক ব্যাটেলিয়নে চলে গিয়েছিল, যার ফলে ওগুলোর ব্যাপক ব্যবহারের সম্ভাবনা সীমিত হয়ে যায়। অথচ জার্মান ট্যাংকগুলো সুশৃঙ্খলভাবে ট্যাংক ডিভিশনসমূহে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ওগুলোকে রাখা হয় ব্যাপক ব্যবহারের জন্য।

এই অভিযানে শক্তির অনুপাতের প্রশ্নটি আধুনিক বুর্জোয়া সাহিত্যে তীব্র সমালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহু ফরাসি ও ব্রিটিশ লেখক মিত্র বাহিনীগুলোর শক্তি ও যুদ্ধোপকরণের পরিমাণ কম করে দেখান এবং বলেন যে শত্রুর সংখ্যাগত শ্রেষ্ঠতাই হচ্ছে তাদের পরাজয়ের কারণ। অন্য গবেষকরা এঁদের সঙ্গে একমত নন। যেমন, ওই ঘটনাবলির অন্যতম অংশগ্রহণকারী, ফরাসি জেনারেল ফ. গামবিয়েজ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন: '১৯৪০ সালে ফ্রান্সের পরাজয় ছিল এক বিস্ময়কর ঘটনা। আজ আমরা জানি যে শক্তির সাধারণ অনুপাতে ফ্রাঙ্কো-ব্রিটিশ বাহিনীগুলোর ট্যাংক ও আর্টিলারিতে শ্রেষ্ঠতা ছিল, আর বিমানের ক্ষেত্রে তাদের দুর্বলতা এত দ্রুত পরাজয় আশা করার মতো কোন ব্যাপারই ছিল না।'*

* দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস। খণ্ড ৩। — মস্কো: ভয়েনইজ্দাত, ১৯৭৪, পৃঃ ৮৯।

ইঙ্গো-ফরাসি সেনাপতিমণ্ডলী মনে করেছিলেন যে জার্মান সৈন্যরা ১৯১৪ সালেরই মতো প্রধান আঘাত হানবে মধ্য বেলজিয়ামের ভেতর দিয়ে। সেই জন্যই তাঁরা ১ম, ২য়, ৯ম ফরাসি ও ৭ম ব্রিটিশ অভিযানকারী বাহিনীগ‌ুলো নিয়ে গঠিত সবচেয়ে শক্তিশালী ১ম গ্র‌ুপটিকে (অধিনায়ক জেনারেল প. বিওট) ফ্রাঙ্কো-বেলজিয়ান সীমান্ত বরাবর প্রসারিত করেছিলেন। গ্র‌ুপটিতে সর্বমোট ৩২টি ফরাসি ও ৯টি ব্রিটিশ ডিভিশন ছিল যার মধ্যে ৩টি ছিল মেকানাইজ্‌ড। গ্র‌ুপটির কাজ ছিল — মাজিনো লাইনকে ভিত্তি করে মিত্রদের একটি স্থায়ী রণাঙ্গন গড়া। আর্দেন অভিম‌ুখে, যেটাকে ফরাসিরা প্রচুর বনজঙ্গল আর বন্ধ‌ুর এলাকার দর‌ুন অনতিক্রম্য বলে গণ্য করত, মোতায়েন করা হয়েছিল ফরাসি ফৌজের দ‌ুর্বল সৈন্যদলগ‌ুলো — ২য় ও ৯ম বাহিনীগ‌ুলোর ১৫টি ডিভিশন।

জেনারেল গ. প্রেতেলের সেনাপতিত্বে বাহিনীসম‌ূহের ২য় গ্র‌ুপটি — যাতে ছিল ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম ফরাসি বাহিনীগ‌ুলো, সর্বমোট ৩৯টি ডিভিশন — ফ্রাঙ্কো-জার্মান সীমান্ত বরাবর প্রধানত মাজিনো লাইনটিই রক্ষা করছিল।

৬ষ্ঠ ও ৮ম ফরাসি বাহিনী, সর্বমোট ১১টি ডিভিশন নিয়ে গঠিত ৩য় গ্র‌ুপটি (অধিনায়ক জেনারেল আ. বেসন) আপার রাইন বরাবর ও স‌ুইজারল্যাণ্ডের সীমান্তে প্রতিরক্ষাম‌ূলক অবস্থান নিয়ে ছিল। বাহিনীসম‌ূহের তিনটি গ্র‌ুপের সবগ‌ুলোকেই জেনারেল জ. জর্জের সেনাপতিত্বে উত্তর-প‌ূর্ব ফ্রণ্টে মিলিত করা হয়। রিজার্ভে ছিল ১৭টি ডিভিশন আর ফরাসি স্থলসেনার সর্বাধিনায়ক জেনারেল ম. গামেলেনের অধীনে থেকে যায় ৬টি ডিভিশন।

ওলন্দাজ সেনা বাহিনীর হাতে ছিল ১০টি ডিভিশন এবং ১২৪টি বিমান। তাকে কেবল দেশের পক্ষে সবচেয়ে গ‌ুর‌ুত্বপ‌ূর্ণ অঞ্চলসম‌ূহ রক্ষার কাজ দেওয়া হয়। বেলজিয়ান সেনা বাহিনীতে ছিল ২৩টি ডিভিশন ও ৪১০টি বিমান। তার কাজ ছিল — স‌ুদ‌ৃঢ় অঞ্চলগ‌ুলোর উপর নির্ভর করে মিত্র বাহিনীসম‌ূহের আগমন পর্যন্ত নাৎসি সৈন্যদের আটকে রাখা।

আক্রমণাভিযানের প্রস্তুতি পর্বে জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী বিশেষ মনোযোগ প্রদান করে সামরিক ক্রিয়াকলাপে আকস্মিকতা অর্জনের দিকে। এই উদ্দেশ্যে তারা অপারেটিভ ক্যাম‌ুফ্লেজ ব্যবস্থা স‌ুদ‌ৃঢ়করণের ব্যাপারে বেশকিছ‌ু উপায় অবলম্বন করে। যেমন, তারা মিত্রদের মনে এই ধারণা স‌ৃষ্টি করতে সক্ষম হয় যে প্রধান আঘাত হানা হচ্ছে লিয়েজের দিকে,

যেভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেভাবে আর্দেনের মধ্য দিয়ে ব্রুলনের দিকে নয়।

মিত্রদের অনুসন্ধান বিভাগ জানত যে, অদূর ভবিষ্যতে জার্মানরা পশ্চিমে আক্রমণাভিযান আরম্ভ করবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা নিজেদের বাহিনীগুলোর সামরিক প্রস্তুতির মানোন্নয়নের জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করে নি। সেই জন্যই জার্মান আক্রমণাভিযান শুরু হলে মিত্র বাহিনীগুলো কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। ১০মে ভোরবেলা জার্মান-ফ্যাসিস্ট সৈন্যদের উদ্দেশে হিটলারের একটি আবেদন-পত্র পাঠ করা হয়। তাতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে বিশ্বাসঘাতকতার নীতিতে অভিযুক্ত করা হয় এবং বলা হয় যে 'আজকের আরভমাণ সংগ্রাম আগামী হাজার বছরের জন্য জার্মান জাতির ভাগ্য নির্ধারণ করছে'।* সকাল ৫টা ৩৫ মিনিটের সময় প্রায় ২ হাজার জার্মান বিমান ৭০টি ফরাসি, বেলজিয়ান ও ওলন্দাজ বিমান ঘাঁটির উপর অতর্কিতে ব্যাপক হামলা চালায়। প্ররোচনামূলক উদ্দেশ্যে ফ্যাসিস্ট বিমানগুলো জার্মান শহর ফ্রেইবুর্গের উপরও বোমাবর্ষণ করে। হিটলারী প্রচার মাধ্যম এই বোমাবর্ষণের জন্য বেলজিয়ান ও ওলন্দাজ বিমান বাহিনীকে দায়ী করে। একই সঙ্গে প্রায় ৪ হাজার ফ্যাসিস্ট প্যারাশুটিস্ট হ্যাগ ও রটার্ডাম অঞ্চলে অবতরণ করে। কয়েকটি বিমান বন্দর দখল করে নিয়ে তারা ২২ হাজার প্যারাট্রুপারের ইউনিটগুলোকে অবতরণ করতে সাহায্য করে। এ ছাড়া নাৎসি প্যারাশুটিস্টরা হল্যাণ্ডে মাস নদীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেতুগুলো কব্জা করে নেয় এবং নিজেদের ট্যাঙ্ক ফৌজগুলোর আগমন অবধি তা হাতছাড়া করে নি, আর বেলজিয়ামে আলবের্ট খালের দু'টি সেতু অধিকার করে নিয়ে তারা ৬ষ্ঠ জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে উত্তর থেকে লিয়েজ শহর ঘিরে ফেলার, আর ১৬শ ট্যাঙ্ক কোরকে উন্মুক্ত রণক্ষেত্রে প্রবেশ করার সুযোগ দেয়।

১২ মে ১৮শ জার্মান বাহিনীর ট্যাঙ্ক ইউনিটগুলো রটার্ডাম অঞ্চলে নিজেদের প্যারাট্রুপারদের সঙ্গে মিলিত হয়, আর তার দু'দিন বাদে হল্যাণ্ড আত্মসমর্পণ করে ও তার সশস্ত্র বাহিনী প্রতিরোধ দান বন্ধ করে দেয়। রানী ভিলগিলমিনা ও হল্যাণ্ডের সরকার লণ্ডনে উদ্বাসিত হন।

জার্মানদের প্রধান আঘাতের অভিমুখে 'A' বাহিনীসমূহের গ্রুপের

* Dokumente zum Westfeldzug 1940. — Gottingen, 1960, S. 4.

সৈন্যদের সামরিক ক্রিয়াকলাপও সাফল্যের সঙ্গে এগ্নচ্ছিল। তারা দ্রুত আর্দেন পেরিয়ে যায়, বেলজিয়ান ভূখণ্ড অতিক্রম করে এবং ১২ মে তারিখে দিনের শেষে ফরাসি শহর ও দুর্গ সেদান দখল করে নেয়। সামনে আক্রমণাভিযানে লিপ্ত ছিল ট্যাঙ্ক গ্রুপ, ডান দিক থেকে তাকে আড়াল দিয়ে মদদ করছিল ১৫শ স্বতন্ত্র ট্যাঙ্ক কোর। পেছনে লড়ছিল পদাতিক ডিভিশনগুলো। সেদান অঞ্চলে ৯ম ফরাসি বাহিনীর প্রতিরক্ষা লাইন ভেদ করে জেনারেল ক্লেইস্টের ট্যাঙ্ক গ্রুপটি ১৩ মে তিনটি পাড়ি-ব্যবস্থা ব্যবহার করে মাস নদী পার হয়ে ইংলিশ প্রণালীর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ২০ মে তা উপকূলে পৌঁছে যায়।

ক্লেইস্টের ট্যাঙ্ক গ্রুপের পেছন পেছন অগ্রসর হচ্ছিল ১২শ বাহিনী, ডান দিক থেকে — ৪র্থ বাহিনী, বাঁ দিক থেকে — ১৬শ বাহিনী। দু'দিন বাদে ট্যাঙ্ক গ্রুপটি অধিকার করে বুলোন, আর পরের দিন — কালে। এর ফলে বেলজিয়ামে আর উত্তর ফ্রান্সে অবস্থিত ইঙ্গো-ফরাসি বাহিনীগুলো তাদের পশ্চাদ্ভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। জার্মানদের আক্রমণাভিযান রুখার ও পরিবেষ্টন ফ্রণ্ট ভেদ করার জন্য মিত্ররা যে প্রচেষ্টা চালায় তা ব্যর্থ হয়। নাৎসি ফিল্ডমার্শাল রমেল পরবর্তী কালে বলেছিল: 'আমাদের দশটি ট্যাঙ্ক ডিভিশন ফ্রান্সে ১৯৪০ সালের অভিযান সম্পন্ন করে। তাদের সহজ সাফল্যের পেছনে ছিল ইঙ্গো-ফরাসি সেনাপতিমণ্ডলীর নিষ্ক্রিয়তা।' জার্মান বাহিনীগুলোর বিশাল নাল মিত্রদের ৪৯টি ডিভিশনকে একেবারে উপকূলে চেপে দেয়।

পরিস্থিতি বিবেচনা করে ব্রিটিশ সেনাপতিমণ্ডলী ফ্রান্স থেকে নিজের ফৌজ প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং ডানকার্ক বন্দর দিয়ে তাদের অপসারণের কাজে হাত দিলেন। বেলজিয়ান সেনাপতিমণ্ডলী ২৮ মে রাত ১২টা ২০ মিনিটের সময় নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষর করেন। ইংরেজরা ৩ লক্ষ ৩৮ হাজার সৈনিক আর অফিসারকে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে স্থানান্তরিত করতে পেরেছিল। এদের মধ্যে ২ লক্ষ ১৫ হাজার ছিল ব্রিটিশ, আর ১ লক্ষ ২৩ হাজার ফরাসি ও বেলজিয়ান। ৪ জুন সকালে নাৎসি ফৌজ ডানকার্কে প্রবেশ করে। শহরাঞ্চলে তখনও অবস্থানরত ৪০ হাজার ফরাসি সৈন্যকে বন্দী করা হয়।

ডানকার্ক ব্রিজ-হেডের জন্য লড়াইয়ে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর নিহত, নিখোঁজ আর বন্দী সৈনিকদের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৮ হাজার। পরিবেষ্টিত সৈন্যবাহিনীকে উদ্ধার করার কাজে নিযুক্ত ৬৯৩ ব্রিটিশ

যুদ্ধ-জাহাজ ও পরিবহণ জাহাজের মধ্যে ৬টি ডেস্ট্রয়ার নিয়ে ২২৪টি জাহাজ জলমগ্ন করা হয়। ডানকার্ক অঞ্চলে ১৪০ জার্মান বিমানের তুলনায় ১০৬ ব্রিটিশ বিমান ধ্বংস করা হয়। ফ্রান্সের উপকূলে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী বিরাট পরিমাণের অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সাজসরঞ্জাম ফেলে দেয়।

জার্মানদের আসল উদ্দেশ্য ছিল — ফ্ল্যান্ডার্সে ইঙ্গো-ফরাসি ফৌজকে ধ্বংস ও বন্দী করা। ফ্যাসিস্ট বাহিনীর বিপুল সাফল্য সত্ত্বেও তাদের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নি। উপকূল থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে আ-আ খালের যুদ্ধসীমায় ক্লেইস্টের গ্রুপের ট্যাঙ্কগুলোকে থামানোর ব্যাপারে ২৪মে তারিখে জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তটি ডানকার্ক থেকে মিত্র সৈন্যদের অপসারণ করতে অনেকাংশে সাহায্য করে। এটা ছিল জার্মানদের বড় রণকৌশলগত ভুল। যে-সমস্ত কারণ হিটলারকে এই কুখ্যাত 'স্টপ-অর্ডার' দিতে উদ্বুদ্ধ করে সে সম্পর্ক বুর্জোয়া ইতিহাসবিদদের ব্যাখ্যাগুলো খুবই পরস্পরবিরোধী। তবে এই আদেশ দানের পেছনে প্রধান কারণটি কিন্তু রাজনৈতিকই ছিল। নাৎসিরা ফ্রান্সকে পরাস্ত করতে ও তাকে যুদ্ধ থেকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করছিল; আর ইংলন্ডের সঙ্গে তারা চুক্তি করতে যাচ্ছিল। ১৯৪০ সালের ২১ মে গাল্ডের তার ডায়েরিতে লিখে রাখে: '...আমাদের আসল বিরোধী হচ্ছে... ফ্রান্স। আমরা ইংলন্ডের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের উপায় খুঁজছি পৃথিবীতে প্রভাবের ক্ষেত্র বণ্টনের ভিত্তিতে।'*

রুণ্ড্স্টেড্ট পরবর্তী কালে বলেছিল: 'আমায় যদি আমার বিচার-বিবেচনা মতো কাজ করতে দেওয়া হত তাহলে ডানকার্কে ইংরেজরা এত সহজে পার পেত না। কিন্তু হিটলার ব্যক্তিগতভাবে নির্দেশ দিয়ে আমার হাত দু'টি বেঁধে রেখেছিল। ইংরেজরা কষ্টেসৃষ্টে উঠছিল তীরে অপেক্ষমাণ জাহাজগুলোতে, আর আমি বন্দরের কাছে ঘুরঘুর করছিলাম এবং টুঁ শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারছিলাম না। আমি সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীকে অবিলম্বে শহরে আমার ৫টি ট্যাঙ্ক ডিভিশন পাঠাতে এবং পশ্চাদপসরণত ইংরেজদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে বললাম, কিন্তু ফিউরেরের কাছ থেকে এমন একটি কড়া নির্দেশ পেলাম যাতে বলা হয় যে, কোন পরিস্থিতিতেই আমার আক্রমণ করা উচিত হবে না; আমায় শহরের ১০ কিলোমিটারের চেয়ে কম কাছে যেতে বারণ করে দেওয়া

* গাল্ডের ফ.। সামরিক ডায়েরি। খণ্ড ১। পৃঃ ৪১২

হয়েছিল।... শহর থেকে এই দূরত্বেই আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম কীভাবে ইংরেজরা চলে যাচ্ছে, অথচ তখন আমার ট্যাঙ্কগুলোর এবং পদাতিক সৈন্যদের জায়গা ছেড়ে এক কদম এগুনোরও অধিকার ছিল না।*

ফরাসি সেনাপতিমণ্ডলী মাজিনো লাইন থেকে, এনা ও সোমা নদীদ্বয় বরাবর ইংলিশ প্রণালী পর্যন্ত নতুন একটি ফ্রণ্ট গড়ল। ৪৩টি ডিভিশন তাতে তাড়াতাড়ি অবস্থান নিল। মাজিনো লাইনে ফরাসিরা রাখল ১৭টি ডিভিশন। তাদের রিজার্ভে ছিল ৩টি অশ্বারোহী ডিভিশন।

জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী পরিস্থিতি বিবেচনা করে তাড়াতাড়ি নিজেদের শক্তিসমূহ পুনর্বিন্যস্ত করল এবং 'রট্' নামক আক্রমণাত্মক অপারেশনটি আরম্ভ করল। তাতে অংশগ্রহণ করে ১৪০টি ডিভিশন, এবং এর মধ্যে ১০টি ট্যাঙ্ক ও ৬টি মোটোরাইজ্‌ড ডিভিশন ছিল। অপারেশনের উদ্দেশ্য — ফরাসি সশস্ত্র বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে ফ্রান্সকে যুদ্ধ থেকে বার করে দেওয়া।

৫ জুন ভোর বেলা জার্মান বিমান বাহিনী সোমা নদীর তীরে ফরাসিদের প্রতিরক্ষা ঘাঁটির উপর প্রবল আঘাত হানে। বাহিনীসমূহের 'B' গ্রুপের (৪র্থ ও ৬ষ্ঠ বাহিনী) সৈন্যরা পশ্চিম দিক থেকে প্যারিস ঘিরে ফেলার উদ্দেশ্যে আমিয়েন শহর এবং সমুদ্রের মধ্যবর্তী অঞ্চলে নদী অতিক্রম করল, আর ৯ জুন ভোরে বাহিনীসমূহের 'A' গ্রুপের (৯ম, ২য়, ১২শ ও ১৬শ বাহিনীগুলো) সৈন্যরা পশ্চাদ্ভাগ থেকে মাজিনো লাইন অবরোধ করার উদ্দেশ্যে সুয়াসনের পূর্বে এনা নদী পার হল। ফরাসিদের দ্রুত তৈরি প্রতিরক্ষা ফ্রণ্টটি ভেদ করে জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজ ফরাসি ফৌজের তরফ থেকে তেমন কোন প্রতিরোধ না পেয়ে ওদের পশ্চাদ্ধাবন করতে আরম্ভ করে।

ফরাসি সৈনিকরা তাদের দেশ রক্ষার্থে বীরত্বের সঙ্গে লড়ছিল। কিন্তু উপর মহলে বিশ্বাসঘাতকতা, সেনাপতিমণ্ডলীর নিষ্ক্রিয়তা এবং অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদের অভাব লড়াইয়ের গতিকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। জার্মান বাহিনীগুলো আবার ফ্রণ্ট লাইন ভেদ করে ফেলে এবং পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা শুরু করে।

ফ্রান্স তার স্বাধীনতা হারাতে বসেছিল। এই দুর্দিনে সমস্ত

* Shulman M., Defeat in the West. — London, 1947, pp. 42-43.

স্বদেশপ্রেমিক শক্তির, সমগ্র ফরাসি জনগণের ঐক্য ও সংহতি সাধনের প্রয়োজন ছিল। ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টি আক্রমণকারীকে সর্বজনীন প্রতিরোধ দিতে ও প্যারিসের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠন করতে আহ্বান জানায়। কিন্তু ফরাসি আত্মসমর্পণকারী আর বিশ্বাসঘাতকরা — জেনারেল ম. গামেলেনের পর সর্বাধিনায়কের পদে অধিষ্ঠিত ম. ভেইগানের নেতৃত্বাধীন প. রেইনো, আ. পেতেন, প. লাভাল প্রভৃতির মতো রাজনীতিকেরা — প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক আন্দোলন আর ফরাসি জনসাধারণের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব বৃদ্ধির ভয়ে এ সমস্তকিছু প্রত্যাখ্যান করে। ফরাসি সরকারের সদস্যরা প্যারিস ছেড়ে তুরে পালিয়ে যায়, আর সৈন্য বাহিনী প্রতিরোধ দানের সম্ভাবনাগুলো কাজে না লাগিয়েই অস্ত্র ত্যাগ করে। ১৪ জুন জার্মান-ফ্যাসিস্ট সৈন্যরা কোন প্রতিরোধ না পেয়ে প্যারিসে ঢুকে পড়ল। বিশাল শহরটি শূন্য হয়ে গেল। বাসিন্দাদের তিন-চতুর্থাংশ শহর ত্যাগ করে চলে যায়। নাৎসি আক্রমণের ভয়ে অন্যান্য শহর ও গ্রামের বাসিন্দারা সমস্ত পথ দিয়ে অজস্র ধারায় চলেছিল দেশের দক্ষিণাভিমুখে।

১৯৪০ সালের ১০ জুন ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার সিদ্ধান্ত নিল ইতালি। মুসোলিনি দেখল যে ফ্রান্স একেবারে পূর্ণ পরাজয়ের মুখে, তাই সে শিকারের ভাগ পাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করতে লাগল। '...কেবল কয়েক হাজার লোক মারতে পারলেই আমি শান্তি সম্মেলনে যুদ্ধের শরিক হিশেবে যোগদান করতে পারব,' — মুসোলিনি নির্লজ্জভাবে বলেছিল ইতালির চিফ অব জেনারেল স্টাফ মার্শাল ব. বাদোলিয়োকে।* তবে গোড়ার দিকে ইতালি ও ফ্রান্সের মধ্যে সামরিক ক্রিয়াকলাপের চরিত্র ছিল সীমিত। কিন্তু ২০ জুন তারিখে ইতালীয় সৈন্যরা যখন আল্পসে ফরাসি ফৌজের বিরুদ্ধে সার্বিক আক্রমণাভিযান আরম্ভ করল তখন ওরা কামানের প্রবল গোলাবর্ষণের সম্মুখীন হয় এবং ওদের আক্রমণ প্রতিহত করা হয়। রণাঙ্গনের কেবল দক্ষিণাংশে, মেন্তনা অঞ্চলে ইতালীয়রা সামান্য অগ্রসর হতে পেরেছিল। তখন মুসোলিনির আশঙ্কা হল যে যুদ্ধ-বিরতির কথাবার্তা আরম্ভ হওয়ার আগে সে ফ্রান্সের বড় একটি অংশ দখল করতে পারবে না। সেই ভয়ে সে প্রথমে লিওন অঞ্চলে প্যারাট্রুপার বাহিনী নামানোর ও তারপর রোন্ নদী অবধি

* Azeau H. La Guerre Franco-Italienne. Juine 1940. — Paris, 1967, p. 41.

বিস্তৃত ফরাসি ভূখণ্ডটি অধিকার করার চেষ্টা চালানোর হুকুম দিল। কিন্তু হিটলার মুসোলিনির পরিকল্পনাটি সমর্থন করল না এবং এই 'অপারেশনটি' সম্পন্ন করা সম্ভব হল না।

১৯৪০ সালের ২২ জুন আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরের পর ফ্রান্সে সামরিক ক্রিয়াকলাপ সমাপ্ত হয়ে গেল। পেতেনের 'সরকার' কমপিওনের বনে ঠিক সেই বগিটিতেই দলিলটি স্বাক্ষর করল, যেটাতে ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর ফরাসি সর্বাধিনায়ক মার্শাল ফশ কাইজের জার্মানির আত্মসমর্পণ পত্র গ্রহণ করেছিলেন।

আত্মসমর্পণ চুক্তির শর্তানুসারে ফ্রান্সের ভূখণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত হয়: উত্তর ও মধ্য ভাগে প্রতিষ্ঠিত হয় জার্মান-ফ্যাসিস্ট আগ্রাসকদের শাসন ব্যবস্থা, আর দক্ষিণ ভাগে — অবস্থিত ছিল পেতেনের জাতিবিরোধী সরকার, যা নাৎসি জার্মানির তাঁবেদারি করত। ওটাই ছিল তথাকথিত ভিশি সরকার। এই ভাবে, ফ্রান্সের দুই-তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড জার্মানদের দখলে চলে গেল, আর এক-তৃতীয়াংশে রাজত্ব করছিল জার্মানির অধীন পেতেন সরকার।

দু'দিন পরে ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে ইতালি ২৮ হাজার ৫০০ বাসিন্দা সমেত ৮৩২ বর্গ কিলোমিটার ফরাসি ভূখণ্ড অধিকার করে নেয়। এ ছাড়া, ইতালি-ফ্রান্স সীমান্তে ৫০ কিলোমিটার গভীর অবধি ফ্রান্সকে তার সীমান্তবর্তী ঘাঁটিগুলো নিরস্ত্রীকৃত করতে হয়েছিল; তুলোঁ, বিজের্তা, আইয়াচো ও ওরান বন্দরগুলোকে এবং আলজিরিয়ায়, টিউনিসিয়ায় ও ফরাসি সোমালির উপকূল ভাগে কিছু কিছু এলাকাকে অসামরিকীকৃত করতে হয়েছিল।

১৯৪০ সালের জুন মাসের শেষে লণ্ডনে জেনারেল শার্ল দ্য গলের নেতৃত্বে 'স্বাধীন ফ্রান্স' নামে (১৯৪২ সালের জুলাই থেকে 'সংগ্রামরত ফ্রান্সের পরিষদ' নামে পরিচিত) একটি স্বদেশপ্রেমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল — জার্মান-ফ্যাসিস্ট হানাদার ও তাদের তাঁবেদারদের কবল থেকে দেশকে মুক্তকরণের জন্য সংগ্রাম পরিচালনা করা। একই সঙ্গে ফ্রান্সে প্রতিরোধ আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠছিল।

১৯৪১ সালের মে মাসে ফ্রান্সে ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে জাতীয় ফ্রণ্ট নামে একটি স্বদেশপ্রেমিক গণ-সংগঠন গড়ে উঠতে শুরু করে। ফ্রণ্টের ছিল নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী ও পার্টিজান দল।

১৯৪১ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর সোভিয়েত সরকার দ্য গলকে স্বাধীন ফরাসিদের নেতা হিশেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দান করেন।

ফ্রান্সের পরাজয়ের কী কী কারণ ছিল? এই প্রশ্নটি আজ অবধিও পত্রপত্রিকায় আলোচিত হচ্ছে।

প্রথমত, ফ্রান্সের তদানীন্তন নেতারা জাতিবিরোধী নীতি অনুসরণ করছিল। তারা মিউনিখ নীতির আশ্রয় নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে, অর্থাৎ ১৯৩৫ সালের ২মে তারিখে স্বাক্ষরিত পারস্পরিক সহায়তা বিষয়ক ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েত চুক্তিটি নাকচ করে দেয়। দ্বিতীয়ত, ফ্রান্সের শাসক মহলগুলো বিপ্লবের ভয়ে জার্মান ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে ফরাসি জনগণের চূড়ান্ত সংগ্রাম সমর্থন করে নি এবং নাৎসি জার্মানির কাছে আত্মসমর্পণের ব্যাপারে বেশি তাড়াহুড়ো করে ফেলেছিল। প্যারিস কমিউনের ৭০তম বার্ষিকী দিবসে ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদ্বয় মরিস তরেজ ও জাঁক দুকলো গোপনে প্রকাশিত 'ইউমানিতে' সংবাদপত্রে লিখেছিলেন: 'শ্রমিক শ্রেণীর সামনে ভীতি ১৮৭১ সালে পুঁজিপতিদের বিসমার্কের আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ হতে বাধ্য করেছিল। এবং ফরাসি জনগণের সামনে সেই একই ভীতি ১৯৪০ সালে ফ্রান্সের শাসক মহলগুলোকে হিটলারের সঙ্গে কোলাকুলি করতে বাধ্য করেছিল।'*

তৃতীয়ত, আধুনিক যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে মিত্র বাহিনীসমূহের অপ্রস্তুতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতার উপর অন্ধ-বিশ্বাস হেতু ফরাসি সেনাপতিরা ভরসা করছিল আগে থেকে গড়া প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অনতিক্রম্যতার উপর। একমাত্র সেই কারণেই ব্যাপক ব্যবহারের জন্য ও দ্রুত গতিতে জরুরী সামরিক কর্তব্য সম্পাদনের জন্য জার্মানদের মতো সচল (এবং সর্বাগ্রে ট্যাংক) ফৌজের, বিমান বাহিনীর ও প্যারাট্রুপারদের কোনরূপ বড় বড় ইউনিট গড়া হয় নি।

এ ছাড়া, ইঙ্গো-ফরাসি সেনাপতিমণ্ডলী জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের প্রধান আঘাতের দিকটি সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে নি এবং জটিল পরিস্থিতিতে মিত্র বাহিনীসমূহকে নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়তা ও অপারকতার পরিচয় দেয়। বাহিনীর পরাজয়ের কারণ সম্পর্কে ১৯৪০ সালের ১৮ মে সমর মন্ত্রীর কাছে প্রেরিত প্রতিবেদনে জেনারেল গামেলেন উল্লেখ করেন: 'জার্মান ট্যাংক ডিভিশনগুলোর হঠাৎ আগমন এবং বিস্তৃত রণাঙ্গন জুড়ে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করার অপ্রত্যাশিত ক্ষমতাই ছিল ওই দিনগুলোর প্রধান স্ট্র্যাটেজিক ফ্যাক্টর। জার্মানরা তাদের

* Thorez M. Oeuvres. — Paris, 1959, p. 82.

ট্যাঙ্কগুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে আমাদের ভাঙ্গন জোড়া দেওয়ার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিচ্ছিল, শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য নতুন করে গড়া প্রতিরক্ষা লাইনটি বার বার ছিন্ন করছিল। যথেষ্ট সংখ্যক মেকানাইজ্‌ড ইউনিট আর ফর্ম্যাশনের অভাবে দ্রুত কোন প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব ছিল না।'*

এই অভিযান চলার সময় ফরাসি বাহিনীর ৮৪ হাজার সৈন্য নিহত ও ১৫ লক্ষ ৪৭ হাজার সৈন্য বন্দী হয়। জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির চিত্রটি ছিল এরূপ: প্রায় ৪৫,৫০০ লোক নিহত ও নিখোঁজ, ১ লক্ষ ১১ হাজারের বেশি আহত।** জার্মান ফৌজের সাফল্য সুনিশ্চিত হয় প্রধান আঘাতের সঠিক দিক নির্বাচনের দ্বারা, ফরাসি অভিযানের নিখুঁত প্রস্তুতির দ্বারা, ক্রিয়াকলাপের আকস্মিকতার দ্বারা এবং সেই সঙ্গে ট্যাঙ্ক আর বিমানের ব্যাপক প্রয়োগের দ্বারাও।

আজ বহু পশ্চিমী ইতিহাসবিদ প্রমাণ করতে চান যে ১৯৪০ সালে মিত্রদের পরাজয়ের কারণগুলো হল সামরিক নেতৃত্বের দোষত্রুটি, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠনের প্রতি উপেক্ষাত্মক মনোভাব, সমাজে ও সরকারগুলোতে দুর্নীতি। আসলে কিন্তু ১৯৪০ সালের জুন মাসে ইঙ্গো-ফরাসি জোটের পরাজয়ের প্রধান কারণটি ছিল পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের শাসক মহলগুলোর সোভিয়েতবিরোধী, কমিউনিস্টবিরোধী, জনগণবিরোধী নীতিতে। ইতিহাস এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে যে আগ্রাসকের সঙ্গে দ্বিধাগ্রস্ত সংগ্রাম, দহরম মহরম ও অন্যান্য রাষ্ট্রের ক্ষতি করে সংঘর্ষ মীমাংসা করার প্রচেষ্টার মতো আর কোনকিছু আগ্রাসককে এত বেশি অনুপ্রাণিত করে না।

৩। ইংলন্ড এবং আটলান্টিকের জন্য লড়াই (১৯৪০ সালের ১২ আগস্ট — ১৯৪১ সালের জুন)

ফ্রান্সের পরাজয়ের পর বিপদ ঘনিয়ে এল ব্রিটেনের উপর। তখনকার পরিস্থিতি শাসক মহলগুলোর ভেতর থেকে মিউনিখ নীতি অনুসরণকারী ব্যক্তিদের পৃথকীকরণে ও ব্রিটিশ জনগণের শক্তিসমূহের সংহতি সাধনে

* Gamelin M. Servir. — Paris, 1947, p. 424.

** তিপেলস্‌কির্খ ক.। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস। জার্মান থেকে অনুবাদ। — মস্কো, ১৯৫৬, পৃঃ ৯৩।

সাহায্য করেছে। ১৯৪০ সালের ১০ মে নেভিল চেম্বারলেনের সরকারের পতন ঘটে এবং উইনস্টন চার্চিলের সরকার তার স্থলাভিষিক্ত হয়। এই সরকারটি অধিকতর ফলপ্রসূ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠনের কাজে হাত দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারও ধীরে ধীরে তার বৈদেশিক নীতি পুনর্বিবেচনা করতে শুরু করল। মার্কিন সরকার ১৯৪১ সালের বসন্তে গ্রীনল্যাণ্ডে আর গ্রীষ্ম কালে আইসল্যাণ্ডে সামরিক ঘাঁটি গড়ে ওখানে সৈন্য মোতায়েন করে।

১৯৪০ সালের ১৬ জুলাই হিটলার ব্রিটেন আক্রমণের নির্দেশপত্র স্বাক্ষর করে। ওটার সাঙ্কেতিক নাম ছিল 'সাগরের সিংহ'। জার্মানদের এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য ছিল — ইংলণ্ডকে আক্রমণের আশঙ্কার মধ্যে রাখা এবং একই সঙ্গে, আর এটাই হচ্ছে প্রধান, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণের আরব্ধ প্রস্তুতির ব্যাপারটি গোপন করা। আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময়ে জার্মান-ফ্যাসিস্ট বিমান বাহিনী ব্রিটিশ শহরগুলোর উপর ব্যাপক বোমাবর্ষণ আরম্ভ করে এবং ১৯৪১ সালের ১১ মে অবধি তা চলতে থাকে। ওই একই সময়ে আটলাণ্টিক মহাসাগরেও নাৎসি নৌ-বাহিনী সক্রিয় হয়ে উঠে। তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর আক্রমণের জন্য বিপুলাকারে আরব্ধ প্রস্তুতি নাৎসি নেতাদের ইংলণ্ড আক্রমণের পরিকল্পনা পুরোপুরিভাবে ত্যাগ করতে বাধ্য করে। অধিকন্তু, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল জার্মানি, ইতালি ও জাপানের জোট সুদৃঢ়করণের প্রশ্নটি এবং সেটা প্রকাশ পেয়েছিল ১৯৪০ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে স্বাক্ষরিত বার্লিন চুক্তিতে।

ইংলণ্ডের জন্য লড়াই

ইংলণ্ডের জন্য লড়াইকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্যায়টির (১৯৪০ সালের ১৩ আগস্ট থেকে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অন্তরীক্ষে আধিপত্য অর্জনের জন্য জার্মান সেনাপতিমণ্ডলীর প্রচেষ্টা। এ থেকেই ব্রিটিশ বায়ুসেনার বিমান ঘাঁটিগুলোর উপর হামলার অত্যধিক প্রবলতা (২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১,০০০-১,৮০০ বিমান-উড্ডয়ন) এবং অন্তরীক্ষে কঠোর লড়াই।

দ্বিতীয় পর্যায়ের (১৯৪০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত) প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল জনগণকে সন্ত্রস্ত করার ও তাদের মনোবল

ভেঙ্গে দেওয়ার উদ্দেশ্যে লণ্ডন এবং অন্যান্য বড় বড় ব্রিটিশ শহরের উপর বোমাবর্ষণ। ৭ সেপ্টেম্বর জার্মান বোমারুগুলো রাত আটটা থেকে সকাল সাতটা পর্যন্ত লণ্ডনের উপর অবিরাম বোমাবর্ষণ করে এবং সে রাত্রে প্রায় ৩০০ টন উগ্র বিস্ফোরক বোমা ও ১৩ হাজার আগুনে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। শহরের বিমানবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল ছিল বলে জার্মানরা অনেকগুলো বাড়ি ধ্বংস করে দিয়েছিল। এর পর থেকে সময় সময় লণ্ডনের উপর হামলা ঘটত। তবে বিমান ঘাঁটিগুলোর উপর আর বেশি বোমাবর্ষণ না করে জার্মানরা যখন লণ্ডনের উপর বোমাবর্ষণে মনোযোগী হল তখন ইংরেজরা ফাইটার বিমানগুলো হারানোর দরুন যে-ক্ষতি হয় তা কিয়দপরিমাণ পূরণ করার ও নাৎসিদের প্রতি প্রতিরোধ প্রবলতর করার সুযোগ পেল। ১৪ সেপ্টেম্বর রাত্রে লণ্ডনের উপর হামলায় অংশগ্রহণ করে সহস্রাধিক জার্মান বিমান। শহরের উপর শুরু হয় কঠোর বায়ু যুদ্ধ। ব্রিটিশ রাজধানীর নিকটে নিয়ে আসা ফাইটার বিমান বাহিনী ও বিমানধ্বংসী কামানগুলো ফ্যাসিস্ট হামলাকারীদের প্রবল প্রতিরোধ দেয়। এর ফলে জার্মানরা ৬০টি বিমান হারায়, আর ইংরেজরা — ২৬টি।* এই হামলার পর থেকে লণ্ডনের উপর বোমাবর্ষণের প্রবলতা হ্রাস পেতে শুরু করে। ইংরেজদের মনোবল অক্ষুণ্ণ থাকে।

তৃতীয় পর্যায়ে (১৯৪০ সালের নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ১৯৪১ সালের মে পর্যন্ত) জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী তাদের বিমান বাহিনীর রণকৌশল বদলাতে বাধ্য হয়। তারা দিবাকালীন হামলার সংখ্যায় তীব্র হ্রাস ঘটিয়ে নৈশ হামলার সংখ্যা বৃদ্ধি করে দেয়, এবং তখন আঘাতের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয় দেশের প্রধান শিল্প কেন্দ্রগুলো: বার্মিংহাম, লিভারপুল, ব্রিস্টল, কভেণ্ট্রি ও অন্যান্য শহর। সময় সময় লণ্ডনের উপরও হামলা চলতে থাকে। ব্রিটিশ শিল্পের কাজ ব্যাহত করাই ছিল এই সমস্ত বোমাবর্ষণের উদ্দেশ্য।

ইংলণ্ডের জন্য লড়াইয়ে জার্মান বিমান বাহিনী সর্বমোট ৪৬ সহস্রাধিক বিমান-উড্ডয়ন করে এবং ইংলণ্ডের উপর প্রায় ৬০ হাজার টন বোমা ফেলে। জার্মানরা ১,৭০০-র বেশি বিমান হারায়। ইংরেজরা

* বাটলের জ., গুয়াইয়ের জ.। বৃহৎ রণনীতি। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪১ সালের জুন পর্যন্ত। ইংরেজী থেকে অনুবাদ। — মস্কো, ১৯৫৫, পৃঃ ২৭৫।

হারিয়েছিল ৯১৫টি বিমান ও ৫ শতাধিক বৈমানিককে। বোমাবর্ষণের দরুন বেসামরিক লোকজনের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা ছিল অনেক: ৮৬ সহস্রাধিক লোক, যাদের মধ্যে প্রায় ৪০ হাজার নিহত। ১০ লক্ষাধিক বাড়ি নষ্ট হয়, অনেকগুলো শহর ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়।

তবে ফ্যাসিস্ট জার্মানির আসল উদ্দেশ্য — ব্রিটেনকে যুদ্ধ থেকে বার করে দেওয়া — সিদ্ধ হল না। তার শিল্প বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি এবং সে জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধের অবস্থায়ই থাকে। যে-ব্যাপারটি ইংরেজদের সাফল্যে সহায়তা করেছিল তা হল এই যে ওই সময় নাৎসিদের প্রধান কাজ ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণের প্রস্তুতি, সে উদ্দেশ্যেই তারা পশ্চিম থেকে সবচেয়ে যুদ্ধক্ষম বেশি সংখ্যক বিমান ইউনিটকে পূর্বে পাঠিয়ে দিয়েছিল। হিটলার ঠিক করল যে সে প্রথমে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিনাশ করবে, এবং কেবল তারপরই বিশ্বাধিপত্য লাভের পরবর্তী পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়িত করবে। ১৯৪০ সালের ৩ জুলাই তারিখে জেনারেল গাল্‌ডের এই প্রসঙ্গে তার ডায়েরিতে লিখেছিল যে সর্বাগ্রে দু'টি সমস্যা দেখা দিচ্ছে: একটা ব্রিটিশ সমস্যা, অন্যটা পূর্ব সমস্যা। ৩১ জুলাই ফিউরেরের সদর-দপ্তরে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর আক্রমণের পরিকল্পনাটি এবার আলোচিত হয় আশু কর্তব্য হিশেবে। জার্মান-ফ্যাসিস্ট নেতৃবৃন্দ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল: 'রাশিয়া যদি পরাস্ত হয় তাহলে ইংলন্ড তার অন্তিম আশাটিও হারিয়ে ফেলবে।'* সুতরাং, ইংলন্ডের অদৃষ্ট নির্ভর করছিল পূর্বাভিমুখে অভিযানের ফলাফলের উপর। সেই দিনই, ৩১ জুলাই, গাল্‌ডের লিখেছিল: 'আচ্ছাদন: স্পেন, উত্তর আফ্রিকা, ইংলন্ড।'**

সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে জার্মান বিমান বাহিনীর বোমাবর্ষণ তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারে নি অনেকটা এই কারণে যে ইংরেজরা ধীরে ধীরে শত্রুর বিমান আঘাত প্রতিহত করার পদ্ধতিগুলো প্রস্তুত করছিল। এতে তাদের বিশেষ সহায়তা দেয় নবোদ্ভাবিত র‍্যাডার। ১৯৪০ সালেই তা ব্রিটেনের বিমানবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায়-ব্যবহৃত হয়েছিল।

* গাল্‌ডের ফ.। সামরিক ডায়েরি, খণ্ড ২, পৃঃ ৮১।

** ঐ, পৃঃ ৮২।

আটলাণ্টিকের জন্য লড়াই
(১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪১ সালের জুন পর্যন্ত)

আটলাণ্টিকের জন্য লড়াইয়ের উদ্দেশ্য ছিল উপনিবেশগুলো থেকে ইংলণ্ডের সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত করা এবং অবরোধের দ্বারা তাকে গলা টিপে মেরে ফেলা। গোড়াতে উভয় পক্ষ থেকে সামুদ্রিক যোগাযোগ পথগুলোতে লড়াইয়ে লিপ্ত ছিল সামান্য শক্তি। কিন্তু এরূপ পরিস্থিতিতেও জার্মান ডুবো জাহাজগুলো ফলপ্রসূতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছিল, এবং তা সম্ভব হয়েছিল ব্রিটিশ সাবমেরিনবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতার দরুন।

১৯৪০ সালের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলী আটলাণ্টিক মহাসাগরে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করে: ডুবো জাহাজ আর ভাসমান জাহাজগুলোর সঙ্গে বিমান বাহিনীও লড়াইয়ে লিপ্ত হল। তাতে ব্রিটিশ নৌ-বহর শোচনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আটলাণ্টিকের জন্য লড়াই চলা কালে, ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪১-এর জুন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে, মিত্র শক্তিসমূহের এবং নিরপেক্ষ দেশগুলোর মোট ৭৬ লক্ষ টনের মালবাহী জাহাজ ও যুদ্ধ-জাহাজ জলমগ্ন করা হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে শতকরা ৫৩·৪ ভাগ জার্মান ডুবো জাহাজ দ্বারা, ১৮·৭ ভাগ — বিমানের বোমাবর্ষণের ফলে এবং প্রায় ১২ ভাগ ভাসমান যুদ্ধ-জাহাজের আক্রমণে জলমগ্ন করা হয়েছ। নাৎসি জার্মানি ওই সময়ের মধ্যে ৪৩টি ডুবো জাহাজ হারিয়েছিল।

এই ভাবে, ব্রিটেনের বাণিজ্যিক নৌ-বহরের ক্রমশ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ও জাহাজ চলাচল পুরোপুরিভাবে বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সরকারী ব্রিটিশ ইতিহাসে বলা হয়েছে, 'শত্রু যদি অন্তত আরও কিছুকাল আঘাতের প্রাথমিক শক্তিটি টিকিয়ে রাখতে পারত তাহলে আমাদের অবস্থা হত বিপর্যয়কর।'*

সামরিক ও বাণিজ্যিক নৌ-বহরগুলোর কর্মীরা এবং ইংলণ্ডের মেহনতী মানুষ তাদের শ্রমের দ্বারা দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণের কাজে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। এ ছাড়া, ব্রিটিশ সেনাপতিমণ্ডলী নতুন কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করেন: ফাইটার বিমান দিয়ে কনভয়গুলোকে আড়াল

* গুয়াইয়ের জ., বাটলের জ.। বৃহৎ রণনীতি... পৃঃ ২৫।

দেওয়া হত, বাণিজ্য পোতগুলোকে অস্ত্র-সজ্জিত করা হত, সময় সময় কনভয়গুলোর গমনাগমনের পথ পরিবর্তন করা হত, ঘাঁটিতে জার্মান ডুবো জাহাজ ও ভাসমান জাহাজগুলোর অবরোধ সুদৃঢ় করা হত। ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর ক্রিয়াকলাপের ফলে ফ্রান্সের ব্রেস্ত বন্দরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে জার্মান যুদ্ধ-জাহাজ 'শার্ণ্‌হোর্স্ট' আর 'গ্নেইজিনাউ'। আর ২৭ মে ব্রিটিশ নৌ-বহর বৃহত্তম জার্মান যুদ্ধ-জাহাজ 'বিসমার্ক'কে ডুবিয়ে দেয়। এই যুদ্ধ-জাহাজের জল-সমাধি জার্মান সামরিক নৌ-বহরের পক্ষে ছিল অতি শোচনীয় ক্ষতি। এ সমস্তকিছু ইংলণ্ডকে সাগর-মহাসাগরে আশঙ্কিত বিপর্যয় এড়াতে সাহায্য করেছে।

৪। বলকান অভিযান (১৯৪১ সালের ৬-২৯ এপ্রিল)

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি কালে ফ্যাসিস্ট জার্মানি বলকান দেশসমূহের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযান চালায়। ওগুলো দখলের ফলে নাৎসিরা সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের জন্য দক্ষিণের স্ট্র্যাটেজিক পাদভূমি গড়ার এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে পরিকল্পিত সামরিক কার্যকলাপ পরিচালনা করার সুযোগ পেল। ১৯৪০ সালের ১ মার্চ জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজ বুলগেরিয়ায় প্রবেশ করল। ৬ এপ্রিল জার্মান বাহিনীগুলো যুগোস্লাভিয়া ও গ্রীসের বিরুদ্ধে আক্রমণ আরম্ভ করে।

যুগোস্লাভিয়া ও গ্রীসের বিরুদ্ধে সামরিক ক্রিয়াকলাপ পরিকল্পিত হয়েছিল একটি অপারেশন হিশেবে। তা পরিচালনার জন্য নিযুক্ত হয়েছিল ১২শ, ২য় বাহিনীগুলো ও ১ম ট্যাঙ্ক গ্রুপ (সর্বমোট ৩২টি ডিভিশন, যার মধ্যে ১০টি ছিল ট্যাঙ্ক ডিভিশন) এবং ৪র্থ বিমান বহরের ও ৮ম বিমান কোরের দেড় সহস্রাধিক বিমান। ইতালীয় ও হাঙ্গেরীয় বাহিনীগুলোর লড়ার কথা ছিল সহায়ক দিকগুলোতে। বলকান অভিযান সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে ফ্যাসিস্ট জোট রণাঙ্গনে পাঠায় ৮০টি ডিভিশন, প্রায় ২ হাজার ট্যাঙ্ক ও ২ সহস্রাধিক বিমান। ওগুলোর বিরুদ্ধে যুগোস্লাভিয়া ও গ্রীস খাড়া করেছিল অনেক কম শক্তি। যুগোস্লাভ বাহিনীতে ছিল ২৮টি পদাতিক ডিভিশন, ৩টি অশ্বারোহী ডিভিশন, ৩২টি স্বতন্ত্র রেজিমেণ্ট, ১১০টি ট্যাঙ্ক ও পুরনো মডেলের ৪১৬টি

বিমান। গ্রীক বাহিনীর প্রধান অংশটি — ১৫টি পদাতিক ডিভিশন — অবস্থিত ছিল আলবানিয়ায় ইতালীয়-গ্রীক রণাঙ্গনে। জার্মান-ফ্যাসিস্ট আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য গ্রীক সেনাপতিমণ্ডলী দিতে পেরেছিলেন কেবল ৬টি ডিভিশন। গ্রীসে তখন অবস্থিত ছিল ব্রিটিশ অভিযানকারী কোর যা গঠিত হয়েছিল একটি ব্রিটিশ সাঁজোয়া ব্রিগেড, একটি অস্ট্রেলীয় ও একটি নিউ-জিল্যাণ্ডীয় ডিভিশন নিয়ে। তাতে ছিল মোট ৬০ হাজার সৈন্য এবং ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর কিছু শক্তি — ৯টি স্কোয়াড্রন। কিন্তু এই সমস্ত ইউনিট আর ফর্ম্যাশন গ্রীকদের বিশেষ কোন সাহায্য দিতে পারে নি। এই ভাবে, শক্তির অনুপাত ছিল ফ্যাসিস্ট জোটের অনুকূলে এবং তা ছিল অনেক বেশি।

যুগোস্লাভ ও গ্রীক বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে জার্মান ফৌজের অবস্থানটি ছিল সুবিধাজনক ও আবেষ্টনকারী। জার্মানরা এরূপ দায়িত্ব পেল: বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরি ও অস্ট্রিয়ার ভূখণ্ড থেকে পরে এক জায়গায় মিলিত-হয়ে-যাওয়া দিকসমূহ বরাবর আঘাত হানতে হানতে যুগোস্লাভিয়ায় প্রবেশ করে তার সৈন্য বাহিনীকে খণ্ডবিখণ্ড ও ধ্বংস করে দিতে হবে, একই সঙ্গে গ্রীসের বিরুদ্ধে আক্রমণ আরম্ভ করে সালোনিকা দখল করতে হবে ও লারিসা শহর অভিমুখে অগ্রসর হতে হবে। বিমান বাহিনীর কাজ ছিল: বেলগ্রেডের উপর, বিমান বন্দরগুলোর উপর ও রেল জংশনগুলোর উপর বোমাবর্ষণ করা এবং সৈন্য সমাবেশের কাজ বিঘ্নিত করা।

আক্রমণের প্রথম দিনেই জার্মান-ফ্যাসিস্ট সৈন্যরা বিমান বাহিনীর সহায়তায় ৩০-৫০ কিলোমিটার গভীরে ঢুকে পড়ে। পরের দিন মেসিডোনিয়ায় যুগোস্লাভ বাহিনীগুলো বিধ্বস্ত হয়ে যায়; আর তৃতীয় দিনের শেষ দিকে জার্মান ইউনিটগুলো ২০০ কিলোমিটার ভেতরে চলে গিয়ে বেলগ্রেডের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে। ১১ এপ্রিল হামলা শুরু করে ইতালীয় ও হাঙ্গেরীয় বাহিনীগুলো, এবং দু'দিন বাদে ফ্যাসিস্টরা বেলগ্রেডে প্রবেশ করে। ১৫ এপ্রিল যুগোস্লাভ বাহিনী প্রতিরোধ দেওয়া বন্ধ করে দেয়, এবং তারপর তার নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের বিষয়ে একটি দলিল স্বাক্ষরিত হয়।

গ্রীসের ভূখণ্ডেও জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিণীগুলোর আক্রমণাভিযান চলে দ্রুত গতিতে। সামরিক ক্রিয়াকলাপের চতুর্থ দিনেই নাৎসিরা

সালোনিকা দখল করে নেয়, আর গ্রীক সৈন্যবাহিনী 'পূর্ব মেসিডোনিয়া' আত্মসমর্পণ করে। দক্ষিণাভিমুখে ফ্যাসিস্ট ফৌজের পরবর্তী অভিযান গ্রীক বাহিনীর প্রধান শক্তিসমূহের পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। ১২ এপ্রিল গ্রীক সেনাপতিমণ্ডলী আলবানিয়া থেকে দেশের গভীরে তাদের সৈন্য অপসারণ আরম্ভ করল। ওদের পশ্চাদনুসরণ করে ইতালীয় বাহিনীগুলো। ২৩ এপ্রিল গ্রীক সৈন্যবাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হয়, আর ২৭ এপ্রিল জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনী প্রবেশ করে এথেন্সে। ব্রিটিশ অভিযানকারী কোরটি প্রায় ১২ হাজার লোক হারিয়ে এবং নিজেদের ভারী অস্ত্রশস্ত্র ও যানবাহনগুলো ফেলে দিয়ে ক্রিট দ্বীপে উদ্বাসিত হয়।

বলকান অভিযানের চূড়ান্ত পর্যায়টি ছিল ক্রিট দ্বীপে বিমান থেকে জার্মানদের সৈন্য অবতরণের অপারেশন, যা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম বৃহৎ ল্যাণ্ডিং অপারেশন।

এই অপারেশনটির উদ্দেশ্য ছিল — ক্রিট দ্বীপ দখল করা। ভূমধ্যসাগরের পূর্বাংশে ও ইজিয়ান সাগরে আধিপত্য লাভের পক্ষে দ্বীপটির ছিল গুরুত্বপূর্ণ স্ট্র্যাটেজিক তাৎপর্য। অপারেশনের পরিকল্পনানুসারে, অগ্রণী প্যারাট্রুপার ইউনিটগুলোর দ্বীপের তিনটি বিমান ঘাঁটি দখল করে নিয়ে ওখানে প্রধান শক্তিসমূহ নামানোর কথা ছিল। একই সঙ্গে নৌ-সৈন্যদের নামানোরও পরিকল্পনা হচ্ছিল।

শক্তির অনুপাত ছিল জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীগুলোর অনুকূলে। তাদের হাতে ছিল ৭ম এয়ারবোর্ন ডিভিশন, ৫ম মাউণ্টেন ইনফেণ্ট্রি ডিভিশন ও স্বতন্ত্র ইউনিটগুলো, সর্বমোট ২২ হাজার লোক, ৪৩৩টি বোমারু, ২৩৩টি ফাইটার, ৫০০টি পরিবহণ, ৫০টি অনুসন্ধানী বিমান ও ৭২টি মালবাহী গ্লাইডার।

নৌ-সৈন্যদের অবতরণ বাহিনীতে ছিল প্রায় ৭ হাজার লোক ও ৭০টি জাহাজ।

জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের বিরুদ্ধে খাড়া ছিল দ্বীপের ব্রিটিশ গ্যারিসনটি। তাতে ছিল প্রায় ৩০ হাজার ইংরেজ ও প্রায় ১৪ হাজার গ্রীক সৈনিক। প্রতিরক্ষারত সৈন্যদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র তেমনকিছু ছিল না: মাত্র ছ'টি ট্যাঙ্ক, কামানে কুলাচ্ছিল না, বিমান ছিলই না। ব্রিটিশ সেনাপতিমণ্ডলীর আসল মনোযোগ ছিল নৌ-বহরের বিমানবিরোধী প্রতিরক্ষার দিকে (দ্বীপের

ঘাঁটিতে দাঁড়িয়ে ছিল ৪টি যুদ্ধ-জাহাজ, ১টি বিমানবাহী জাহাজ, ৯টি ক্রুজার, ২০টিরও বেশি ডেস্ট্রয়ার)।

নির্ধারিত দিনে, ২০ মে সকালে, মালেমিও, রেটিমনন্, ইরাকলিওন বিমান বন্দরগুলোর এবং হানিয়া শহরের অঞ্চলে ব্যাপক বিমান হামলার পর জার্মান প্যারাশুটিস্টদের নামানো হয়। বিপুল ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে ওরা কেবল মালেমিও ও হানিয়া অঞ্চলেই একটি দৃঢ় অবস্থান নিতে পেরেছিল। দ্বিতীয় দিনে সারাক্ষণ ধরে ৫ম মাউণ্টেন ইনফেন্ট্রি ডিভিশনের ইউনিটগুলো নিয়ে বিমান আর গ্লাইডারগুলো ওখানে আসতে থাকে। একই সঙ্গে জার্মান সেনাপতিমণ্ডলী সমুদ্র থেকে নৌ-সৈন্যদের দ্বীপে নামাতে চেষ্টা করে, কিন্তু ব্রিটিশ নৌ-বহর ওদের দেখে ফেলে এবং প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। ১ জুন নাগাদ জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনী দ্বীপ দখলের কাজ সম্পন্ন করে। তাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয়: প্রায় ৪ হাজার লোক নিহত ও নিখোঁজ হয়, ২১ শতাধিক লোক আহত হয়, ২২০টি বিমান ও বেশকিছু জাহাজ ধ্বংস হয়। বিপুল সংখ্যক প্যারাশুটিস্ট ও বিমান খুয়া খাওয়াতে জার্মান সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলী ভয় পেয়ে গেল এবং পরবর্তীকালে কোন বৃহৎ ল্যাণ্ডিং অপারেশন চালাতে অস্বীকার করল।

ব্রিটিশরা ক্রিট দ্বীপের লড়াইয়ে ১৫ সহস্রাধিক লোক হারায়, তার মধ্যে ১,৭৪২ জনকে নিহত অবস্থায়; বাকীদের উদ্বাসিত করা হয় কায়রোতে। নৌ-বাহিনীও খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়: ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল ৩টি ক্রুজার ও ৬টি টর্পেডো জাহাজ, অনেকগুলো রণপোত — যার মধ্যে ছিল ১টি বিমানবাহী জাহাজ, ৩টি যুদ্ধ-জাহাজ, ৬টি ক্রুজার ও ৭টি টর্পেডো জাহাজ — আংশিকভাবে নষ্ট হয়ে যায়। গ্রীস হারায় ১টি সাঁজোয়া জাহাজ, ১২টি ডেস্ট্রয়ার, ১০টি টর্পেডো বোট এবং ৭৫ শতাংশ বাণিজ্য পোত। ক্রিটে অবস্থিত গ্রীক বাহিনীও যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে।

নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলী পরিচালিত অপারেশনে তাদের উদ্দেশ্যগুলো সিদ্ধ হল। এ কাজে নির্ধারক ভূমিকা পালন করে জার্মান বিমান বাহিনী যা আকাশে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে ব্রিটিশ নৌ-বহরের বিপুল লোকসান ঘটায়।

ক্রিট দ্বীপ দখল হওয়াতে ফ্যাসিস্ট জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত তার বাহিনীগুলোর ডান পার্শ্বের নির্ভরযোগ্য নিরাপত্তা বিধানের সুযোগ পেল। তাছাড়া ইজিয়ান সাগর ও ভূমধ্যসাগরের

প্‌র্বাংশে সম্‌দ্র পথগ্‌লোর উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চাল্‌ হয়ে যায়, আর ব্রিটেন ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে অতি গ্‌র্‌ত্বপ্‌র্ণ একটি ঘাঁটি থেকে বঞ্চিত হয়।

সামরিক দ্‌ষ্টিকোণ থেকে, নরওয়েজিয়ান ল্যান্ডিং অপারেশনের মতো ক্রিট অপারেশনও অন্তিম লক্ষ্য অর্জনে চ্‌ড়ান্ত ভূমিকা পালন করেছিল। এর ম্‌খ্য বৈশিষ্ট্যটি ছিল এই যে অবতরণ বাহিনীতে ব্যবহৃত হয়েছিল কেবল প্যারাট্র্‌পারই নয়, সাধারণ পদাতিক ফৌজও। প্যারাট্র্‌পার ইউনিট আর সাব-ইউনিটগ্‌লোকে নামানো হচ্ছিল সরাসরি লক্ষ্যস্থলগ্‌লোতে, যার ফলে সর্বাধিক মাত্রায় আকস্মিকতার উপাদান ব্যবহার করা ও দ্র্‌ত উদ্দেশ্য হাসিল করা সম্ভব হয়েছে।

এই ভাবে, ১৯৪১ সালের জ্‌ন নাগাদ পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের সমস্ত দেশ ফ্যাসিস্ট জার্মানি ও ইতালি কর্তৃক অধিকৃত হয়ে যায় অথবা ওই রাষ্ট্র দ্‌টির অধীনতা স্বীকার করে নেয়। নাৎসিরা ওদের অর্থনীতি ও সম্পদ ব্যবহার করে সোভিয়েত ইউনিয়নের বির্‌দ্ধে য্‌দ্ধে।

৫। উত্তর আফ্রিকায় ও ভূমধ্যসাগরে য্‌দ্ধ (১৯৪০ সালের জ্‌ন — ১৯৪১ সালের জ্‌ন)

উত্তর আফ্রিকায় এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ইতালীয় ও ব্রিটিশ সশস্ত্র বাহিনীগ্‌লোর সামরিক ক্রিয়াকলাপ শ্‌র্‌ হয় ১৯৪০ সালের জ্‌ন মাসে। প্রথম মাসগ্‌লোতে এই সমস্ত সামরিক ক্রিয়াকলাপ প্রধানত সীমিত থাকে সম্‌দ্রে ইতালীয় ও ব্রিটিশ নৌ-বহর আর বিমান বাহিনীর সংগ্রামে, এবং প্‌র্ব আফ্রিকায় উপনিবেশগ্‌লোর জন্য লড়াইয়ে।

১৯৪০ সালের ১০ জ্‌ন ফ্যাসিস্ট ইতালি ব্রিটেন আর ফ্রান্সের বির্‌দ্ধে য্‌দ্ধে নামে। তার সৈন্যরা আগস্ট মাসে দখল করে নেয় ব্রিটিশ সোমালি, কেনিয়া ও স্‌দানের একাংশ, আর সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে লিবিয়া থেকে মিশরে ঢুকে পড়ে এবং স্‌য়েজ অভিম্‌খে আঘাত হানে খালটি দখলের ও মধ্য প্রাচ্যে অন্‌প্রবেশের উদ্দেশ্যে।

উত্তর আফ্রিকায় আসল লড়াই চলে ৮০ কিলোমিটার চওড়া উপকূলবর্তী অঞ্চলে, কেননা ওখান থেকে দক্ষিণে শ্‌র্‌ হচ্ছিল বালিয়াড়ি আর পর্বত শ্রেণী। ইংরেজদের প্রবল প্রতিরোধের মধ্যে ১৯৪০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর নাগাদ ৫ম ইতালীয় বাহিনী ৯০ কিলোমিটার পর্যন্ত অগ্রসর হতে

পেরেছিল। পরে ইতালীয় সৈন্যদের আক্রমণাভিযান রুখে দেওয়া হয়েছিল। ইতালীয় সেনাপতিমণ্ডলী আশা করেছিল যে ১৯৪০ সালের অক্টোবরে ফ্যাসিস্ট জোট কর্তৃক গ্রীসের বিরুদ্ধে আরব্ধ আক্রমণ ইংরেজদের প্রধান শক্তিসমূহকে বেঁধে দেবে, এবং অনায়াসে সুয়েজ খাল অধিকার করা যাবে। তবে এই সমস্ত আশা সার্থক হয় নি।

ব্রিটিশ সেনাপতিমণ্ডলী বিরতির সুযোগ নিয়ে আপন বাহিনীকে শক্তিশালী করে তুলে এবং ৯ ডিসেম্বর পাল্টা আঘাত হানে। এই আঘাতের ফলে ইতালীয়রা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ১০ ফেব্রুয়ারি নাগাদ ইংরেজরা এল-আগেইলা অঞ্চলে পেঁছে যায়। পরে, ১৯৪১ সালের মে মাস পর্যন্ত তারা স্বদেশপ্রেমিক শক্তিসমূহের সমর্থনে ইতালীয়দের ব্রিটিশ সোমালি, কেনিয়া, সুদান, ইথিয়োপিয়া, ইতালীয় সোমালি ও এরিত্রিয়া থেকে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু বলকানে সুদৃঢ় অবস্থান লাভের চেষ্টায় ব্রিটিশ সেনাপতিমণ্ডলী মিশর থেকে নিজের ফৌজের একাংশ গ্রীসে পাঠিয়ে দেন, এবং তাতে ইতালীয় ইউনিটগুলো পূর্ণ পরাজয় থেকে রক্ষা পেল।

ভূমধ্যসাগরে ইতালীয় নৌ-বহরও ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসে মুসোলিনি হিটলারের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে বাধ্য হয়। এ দিকে হিটলারও ভূমধ্যসাগরীয় যোগাযোগ পথের জন্য আশঙ্কিত হয়ে উত্তর আফ্রিকায় একটি দৃঢ় অবস্থান পেতে চাইল। ১৯৪১ সালের গোড়াতে ওখানে পেঁছতে আরম্ভ করল জার্মান-ফ্যাসিস্ট সৈন্যদলগুলো, যাদের নিয়ে অচিরেই 'আফ্রিকা' নামে একটি অভিযানকারী কোর (একটি ট্যাঙ্ক ডিভিশন ও একটি লাইট ইনফেণ্ট্রি ডিভিশন) গঠিত হল। এর অধিনায়ক ছিল জেনারেল এ. রমেল। এই কোরকে আকাশ থেকে সমর্থন জোগাচ্ছিল সিসিলি দ্বীপে অবস্থিত ১০ম জার্মান বিমান কোরটি।

শক্তির পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে জার্মান-ইতালীয় বাহিনীগুলো ১৯৪১ সালের ৩১ মার্চ আক্রমণাভিযান আরম্ভ করে। অতর্কিত হামলায় হতভম্ব ইংরেজরা পূর্বাভিমুখে দ্রুত পশ্চাদপসরণ করতে শুরু করে।

এল-মেকিলি দুর্গে, যেখানে অবস্থিত ছিল ব্রিটিশ সাঁজোয়া ডিভিশনের সদর-দপ্তর, বন্দী করা হয় ব্রিটিশ গ্যারিসনের কমাণ্ডার জেনারেল গাম্বিয়ে-পেরিকে, অন্য পাঁচ জন জেনারেল আর ২ হাজার সৈনিক ও অফিসারকে। জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীর আক্রমণ এরূপ আতঙ্ক সৃষ্টি করে যে ত্রস্ত ইংরেজ অফিসারেরা বেনগাজির দিকে পশ্চাদপসরণরত নিজেদের

ট্যাঙ্কগুলোকে জার্মান ট্যাঙ্ক বলে মনে করল এবং পেট্রল গুদাম উড়িয়ে দিল। এর ফলে ৩য় ব্রিটিশ সাঁজোয়া ব্রিগেডের ট্যাঙ্কগুলো জ্বালানি পায় নি এবং ওগুলোকে ফেলে দিতে হয়।

৩ এপ্রিল রাত্রে জার্মান-ইতালীয় সৈন্যরা বেনগাজি দখল করে নেয়, আর ১০ এপ্রিল তব্রুক শহরের কাছে পেশছে যায় এবং ওটাকে ঘিরে ফেলে। কিন্তু তারা গতিতে থেকে শহরটি করায়ত্ত করতে পারল না।

জেনারেল রমেল মিশরের দিকে নিজের প্রধান শক্তিগুলো প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেয়। ১২ এপ্রিল তার সৈন্যরা বার্দিয়ায় প্রবেশ করে। এই যুদ্ধ-সীমায় অগ্রগতি রুখে দেওয়া হয়েছিল।

এই ভাবে, এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে জার্মান-ইতালীয় ইউনিটগুলো ৯০০ কিলোমিটার গভীরে প্রবেশ করে ফের মিশরের সীমান্তে পেশছে যায় এবং সক্রিয় ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত থাকে। আক্রমণাভিযান থেমে যাওয়ার মুখ্য কারণটি ছিল এই যে নাৎসিরা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে 'বিদ্যুৎগতির যুদ্ধ' সমাপ্তির আগে উত্তর আফ্রিকায় বৃহৎ কোন অভিযান চালাতে ইচ্ছুক ছিল না। ১৯৪১ সালের ২১ জুন মুসোলিনির কাছে প্রেরিত পত্রে হিটলার লিখেছিল: '১৯৪১ সালের হেমন্ত পর্যন্ত মিশর আক্রমণ অসম্ভব।'*

যুধ্যমান পক্ষগুলো বিপুল গুরুত্ব আরোপ করছিল ভূমধ্যসাগরের সামরিক ক্রিয়াকলাপের উপর, — ওখান দিয়ে চলেছে মধ্য প্রাচ্যের ও উত্তর আফ্রিকার দেশসমূহের সঙ্গে, ভারতের সঙ্গে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের অঞ্চলগুলোর সঙ্গে ইউরোপকে যুক্তকারী সবচেয়ে অদীর্ঘ সমুদ্র পথগুলো। জিব্রাল্টারের মালিক ইংরেজরা ভূমধ্যসাগর থেকে আটলাণ্টিক মহাসাগরে জাহাজ চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখত। মাল্টা অবস্থিত ছিল ভূমধ্যসাগরের মাঝখানে, ইতালি এবং উত্তর আফ্রিকার মধ্যে সবচেয়ে ছোট যোগাযোগ পথে। বৃহত্তম সামরিক নৌ-ঘাঁটি আলেক্‌জেন্দ্রিয়ায় অবস্থিত ছিল ইংলণ্ডের সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় নৌ-বহর। সুয়েজ খালের মালিক হওয়াতে ইংরেজরা নিজেদের হাতে ধরে রেখেছিল ভূমধ্যসাগর থেকে ভারতে যাওয়ার সবচেয়ে অদীর্ঘ সমুদ্র পথটি।

* Les Lettres Secrètes Échangées par Hitler et Mussolini (1940-1943). — Paris, 1946, p. 126.

ভূমধ্যসাগরের অঞ্চলে সামিরক ক্রিয়াকলাপ শুরু হওয়ার পর থেকে ইংরেজদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল ফরাসি সামরিক নৌ-বহর দখল অথবা নিষ্ক্রিয়করণ — এ নৌ-বহরের বড় একটি অংশ অবস্থিত ছিল ওরান, আলজিয়ের্স, কাসাব্লাঙ্কা ও ডাকার বন্দরগুলোতে। ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে ব্রিটিশ সামরিক নৌ-শক্তি আফ্রিকার বন্দরগুলোতে ফরাসি নৌ-বহরকে অবরোধ করে রেখে দেয়। ফরাসি নৌ-বহরের কাছে চূড়ান্ত শর্ত হাজির করা হল: হয় অবিলম্বে জার্মানি ও ইতালির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হবে, হয় অল্প সংখ্যক সৈন্য সমেত জাহাজগুলোকে ব্রিটিশ বন্দরগুলোতে পাঠিয়ে দিতে রাজী হতে হবে, নয় জাহাজগুলো ডুবিয়ে দিতে হবে। ফরাসিরা চূড়ান্ত শর্ত গ্রহণ করল না। ব্রিটিশ যুদ্ধ-জাহাজগুলো ফরাসি নৌ-বহরের উপর প্রবল গোলাবর্ষণ করে, টর্পেডো মারে এবং অনেকগুলো জাহাজ জলমগ্ন করে দেয়। কেবল কয়েকটি মাত্র ফরাসি জাহাজ তুলোনে চলে যেতে পেরেছিল।

দ্য গল তাঁর স্মৃতিকথায় ইংরেজদের এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপকে 'পাশবিক আবেগের' অভিব্যক্তি বলে বর্ণনা করেন। তিনি লেখেন, 'অথচ তখন এ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ স্পষ্ট ছিল যে ফরাসি সামরিক নৌ-বহর কদাচ ইংরেজদের বিরুদ্ধে শত্রুতাপূর্ণ ক্রিয়াকলাপের কথা ভাবে নি।'* অবশ্য এটা ঠিক যে জার্মান-ফরাসি যুদ্ধ-বিরতি চুক্তির শর্তসমূহ বিশ্বাস করা সম্ভব ছিল না, কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের অবিশ্বাস সত্ত্বেও ফরাসি-সৈনিকরা বিশ্বাসের যোগ্য ছিল।

ফরাসী জাহাজগুলো ডুবিয়ে দেওয়ার পর ইংরেজরা তাদের ভূমধ্যসাগরীয় নৌ-বহরের শক্তি বৃদ্ধি করল ও ওটাকে দুই অংশে বিভক্ত করে দিল: পূর্ব স্কোয়াড্রন (যাতে ছিল ৫টি রণপোত, ২টি বিমানবাহী জাহাজ, ১০টি ক্রুজার, ২৬টি ডেস্ট্রয়ার ও ১২টি ডুবো জাহাজ) এবং পশ্চিম দল (যাতে ছিল একটি যুদ্ধ-ক্রুজার, একটি বিমানবাহী জাহাজ, ৫টি ক্রুজার, ১০টি ডেস্ট্রয়ার ও ৬টি ডুবো জাহাজ)।

ব্রিটিশ নৌ-বহরের প্রধান কাজ ছিল — শত্রুর সামরিক নৌ-বহরের সঙ্গে সংগ্রামে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে সামুদ্রিক যোগাযোগ পথগুলো রক্ষা করা এবং মাল্টা হাত-ছাড়া না করা।

* গল, শার্ল দ্য। সামরিক স্মৃতিকথা। — মস্কো, ১৯৫৭, পৃঃ ১১৯।

১৯৪০ সালের ১০ জ্বন ভূমধ্যসাগরে আরব্ধ সামরিক ক্রিয়াকলাপ গোড়াতে ইংরেজদের জন্য সাফল্যের সঙ্গেই চলছিল। যেমন, ১৯৪০ সালের নভেম্বরে 'আর্ক রয়েল' নামক বিমানবাহী জাহাজ থেকে কর্মরত ব্রিটিশ বিমানগুলো তারান্তোয় ইতালীয় সামরিক নৌ-শক্তির উপর প্রবল আঘাত হানল, সুদীর্ঘ কালের জন্য তিনটি রণপোত ও দু'টি ক্রুজারকে বিকল ও অচল করে দিল। এর ফলে ইতালীয় নৌ-বাহিনীর অবস্থা খুবই সংকটজনক হয়ে পড়ে, আর আফ্রিকা অভিমুখে সামুদ্রিক পরিবহণ যথেষ্ট বিঘ্নিত হয়।

১৯৪০ সালের ডিসেম্বরে জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী সিসিলিতে একটি বিমান কোর প্রেরণ করে, তাতে ছিল ১৪০টি বোমারু, ২২টি ফাইটার ও ১৬টি অনুসন্ধানী বিমান। পরে নাৎসিরা ব্রিটিশ নৌ-বহরকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করতে এবং মাইন পেতে সুয়েজ খাল দিয়ে জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল।

১৯৪১ সালের মার্চের শেষ দিকে ইতালীয় নৌ-বহর মাতাপান অন্তরীপের কাছে ক্রিটের দক্ষিণ দিকে সংঘটিত সংগ্রামে নতুন এক পরাজয় বরণ করে। ব্রিটিশ স্কোয়াড্রনটি রাত্রিকালীন লড়াইয়ে র‍্যাডারের সাহায্যে ইতালীয়দের একটি রণপোত, তিনটি হেভি ক্রুজার আর দু'টি ডেস্ট্রয়ার শনাক্ত করে ওগুলোকে ডুবিয়ে দেয়। ইতালীয়দের র‍্যাডার ছিল না, সুতরাং তারা বিপক্ষকে দেখতে পায় নি ও গোলাবর্ষণ করে নি।

কিন্তু এর পর, বিশেষ করে ১৯৪১ সালের মে মাসে জার্মানরা যখন ক্রিট দ্বীপ দখল করে ফেলে, ব্রিটিশ নৌ-বহর খুবই সংকটজনক অবস্থায় পড়ে। ওই সময় ইংরেজদের তিনটি ক্রুজার ও সাতটি ডেস্ট্রয়ার ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আর তিনটি রণপোত, একটি বিমানবাহী জাহাজ, ছ'টি ক্রুজার ও সাতটি ডেস্ট্রয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৬। সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের জন্য ফ্যাসিস্ট জার্মানির প্রস্তুতি। 'বার্বারোসা' পরিকল্পনা

জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা বহুকাল থেকেই 'দ্রাঙ্গ নাখ ওস্টেন' অর্থাৎ 'পুব দিকে চলো' বলে আসছিল। এবার তাদের আগ্রাসী ভাবধারা নাৎসিদের পূর্ণ সমর্থন লাভ করল। হিটলার তার 'মাইন কাম্পফ্' ('আমার সংগ্রাম') বইয়ে — যা ছিল ফ্যাসিজমের স্বকীয় এক কর্মসূচি —

খোলাখুলিভাবেই ঘোষণা করেছিল: 'ইউরোপে সমস্ত ভূখণ্ড প্রাপ্তির কথা উঠলে এটাই বলব যে তা প্রধানত পেতে হবে রাশিয়ার কাছ থেকে। এমতাবস্থায় নতুন জার্মান সাম্রাজ্যকে আবার সেই পথেই অভিযান আরম্ভ করতে হবে যে-পথটি বহু কাল আগে গড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন টেভটোনীয় নাইটরা।'*

সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হতে গিয়ে ফ্যাসিস্টরা এই লক্ষ্যগুলো অনুসরণ করছিল: বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র — সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করা, কোটি কোটি সোভিয়েত মানুষের প্রাণনাশ করা, আর বাকীদের দাসে পরিণত করা। ১৯৪১ সালের ৩০ মার্চ ভের্মাখ্‌টের জেনারেলদের সামনে বক্তৃতা দান কালে হিটলার বলে যে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ 'সংগ্রাম চলবে ধ্বংসের জন্য। আমরা যদি ব্যাপারটাকে এভাবে না দেখি তাহলে শত্রুকে পরাস্ত করে দিলেও ৩০ বছর পরে আবার কমিউনিস্ট বিপদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। আমরা যুদ্ধ চালাচ্ছি নিজের শত্রুকে টিনে সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে নয়।'**

'তৃতীয় রাইখের' (ফ্যাসিস্ট জার্মানিকে তখন মাঝেমধ্যে এই নামে অভিহিত করা হত) সামরিক-রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পরিকল্পিতভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

গোড়াতে জার্মান-ফ্যাসিস্ট সৈন্যরা পশ্চিমে সহজে বিজয় লাভ করেছিল। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ চলে বস্তুত তিন সপ্তাহ, বেলজিয়াম অধিকৃত হয় ১৮ দিনে, নরওয়ে ২ মাসে, আর ফ্রান্স যুদ্ধের ৪৪ দিনের দিন আত্মসমর্পণ করে। ডেনমার্ক ও হল্যাণ্ডের মতো দেশগুলো দখল করতে নাৎসি জার্মানির কয়েক দিন মাত্র সময় লেগেছিল।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে ধনী ও কাঁচামালে সমৃদ্ধ বহু ইউরোপীয় দেশ দখল করে নিয়ে হিটলার দ্রুত গতিতে জার্মানির সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে এবং সোভিয়েত সীমান্তে বৃহৎ সামরিক শক্তি পাঠাতে শুরু করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আগ্রাসন আরম্ভ হওয়ার মুহূর্তে নাৎসি জার্মানি বিপুল সামরিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিল। নিচের সারণিটি দেখলেই তা বোঝা যাবে:

* Hitler A. Mein Kampf. — München, 1942, S. 154.

** গাল্‌ডের ফ.। সামরিক ডায়েরি, খণ্ড ২, পৃঃ ৪৩০।

প্রধান সূচকসমূহ	জার্মানি এবং অস্ট্রিয়া	তাবেদার রাষ্ট্রসমূহ ও অধিকৃত দেশগুলো সমেত জার্মানি
আয়তন (হাজার বর্গ কিলোমিটারে)	৫৫৪	৩,২৭৭
জনসংখ্যা (দশ লক্ষ লোকের হিসাবে)	৭৬	২৮৩
ইস্পাত গালাই (দশ লক্ষ টনের হিসাবে)	২০	৪৩·৬
কয়লা নিষ্কাশন (দশ লক্ষ টনের হিসাবে)	১৮৫	৩৪৮
তৈল নিষ্কাশন (দশ লক্ষ টনের হিসাবে)	০·৫	১০
বিদ্যুৎ শক্তি (শত কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টার হিসাবে)	৫২	১১০
শস্যোৎপাদন (দশ লক্ষ টনের হিসাবে)	১৩·৬	৫৪·৮

এছাড়া, ফ্যাসিস্ট জার্মানির হাতে চলে আসে ৩০টি চেকোস্লোভাক, ৯২টি ফরাসি, ১২টি ব্রিটিশ, ২২টি বেলজিয়ান, ১৮টি ওলন্দাজ ও ৬টি নরওয়েজিয়ান ডিভিশনের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র আর সাজসরঞ্জাম।

খোদ ফ্যাসিস্ট জার্মানির অর্থনীতিকে আগে থেকেই সামরিক চাহিদা পূরণ করার কাজে লাগানো হয়েছিল। যেমন, ১৯৪০-১৯৪১ সালে তার বিমান নির্মাণ শিল্প বছরে উৎপাদন করে ১০-১১ হাজার বিমান। ১৯৪০ সালে ট্যাঙ্ক কারখানাগুলো উৎপাদন করে ১,৪০০টি ভারী ও মাঝারি ট্যাঙ্ক, ২,৩০০টি হালকা ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ি। জার্মানির সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীর সদর-দপ্তরের সামরিক অর্থনীতি বিভাগ ১৯৪০ সালের

১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪১ সালের এপ্রিল পর্যন্ত কাল পর্যায়ের যে-প্রতিবেদন পেশ করে তাতে বলা হয়েছিল, 'মহান জার্মানির অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং অধিকৃত অঞ্চলসমূহে সমস্ত উৎপাদনী শক্তির অতি প্রবল প্রয়োগের কল্যাণে সশস্ত্র বাহিনীর সাজসজ্জার মান ব্যাপকভাবে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে।'*

১৯৪১ সালে পূর্বাভিমুখে জার্মান বাহিনীগুলো প্রেরণের এবং সোভিয়েত সীমান্তের কাছে তাদের সমাবেশের কাজ চলতে থাকে ক্রমবর্ধমান গতিতে। ফেব্রুয়ারি-মার্চে যেখানে সাড়ে ৪ দিনে সোভিয়েত ভূখণ্ড থেকে ১৫০-১৮০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত অঞ্চলে রেলপথে আসত মাত্র একটি করে ডিভিশন, সেখানে ২৫ মে থেকে দিনে এসে পৌঁছত এক-দুটি ফর্ম্যাশন, যেগুলোকে নামানো হত সোভিয়েত সীমান্ত থেকে ৬০-৮০ কিলোমিটার দূরে। পদাতিক ডিভিশনগুলোর জন্য সীমান্ত থেকে ৭-৩০ কিলোমিটার এবং ট্যাঙ্ক ও মোটোরাইজ্‌ড ডিভিশনগুলোর জন্য ২০-৩০ কিলোমিটার দূরবর্তী মূল অঞ্চলসমূহে সৈন্য বিন্যাসের কাজ চলছিল গোপনে, রাত্রিবেলা, সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার যথাক্রমে ১২ ও ৪ দিন আগে।

ঘন ঘন লঙ্ঘিত হতে লাগল সোভিয়েত ইউনিয়নের পশ্চিম সীমান্ত। ১৯৪১ সালের প্রথমার্ধে জার্মান বিমানগুলো ৩২৪ বার সোভিয়েত দেশের বায়ুসীমা লঙ্ঘন করেছে। যুদ্ধপূর্ব ১১ মাসের মধ্যে সোভিয়েত সীমান্ত রক্ষীরা প্রায় ৫ হাজার জার্মান গুপ্তচরকে আটক করেছিল।

ফ্যাসিস্টরা ভাবাদর্শগত দিক থেকেও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। জার্মান জনগণের মধ্যে কমিউনিজমবিরোধী ও সোভিয়েতবিরোধী মনোভাব গড়ে তোলা হচ্ছিল। ১৯৪৫ সালের ১৩ জুন 'Die Volkszeitung' সংবাদপত্রে জার্মান জনগণের প্রতি জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশিত এক আবেদনপত্রে বলা হয়, 'আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণটি ছিল এই যে বহু লক্ষ জার্মান নাৎসি বাগাড়ম্বরের বেড়াজালে বন্দী হয়ে পড়েছিল, পাশবিক জাতিগত তত্ত্বের, 'জীবনের ক্ষেত্রের জন্য সংগ্রামের' তত্ত্বের বিষ জনগণের মনঃপ্রাণ বিষাক্ত করে দিতে পেরেছিল।

* Deutsches Militärarchiv (DMA), Potsdam, N° 61.10/58. BL 149, 152-155, 'Fall Barbarossa', S. 221-225.

আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণটি ছিল এই যে ব্যাপক জনসাধারণ সাধারণ সততা ও ন্যায় বোধ হারিয়ে ফেলেছিল এবং হিটলার যখন তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে যুদ্ধ ও লুণ্ঠনের ফলে অন্যান্য জাতিদের মুখের অন্ন দিয়ে তাদের উদরপূর্তি করা হবে তখন তারা তাকে অন্ধের মতো অনুসরণ করেছিল।'

১৯৪০ সালের ১৮ ডিসেম্বর হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করার বিষয়ে ২১ নং নির্দেশটি স্বাক্ষর করে। তা 'বার্বারোসা' পরিকল্পনা নামে পরিচিত। এই পরিকল্পনা অনুসারে, জার্মানির আশু স্ট্র্যাটেজিক কর্তব্য ছিল: বল্টিক উপকূলে, বেলোরুশিয়ায় ও নীপার নদীর ডান তীরে ইউক্রেনের অংশটিতে অবস্থিত সোভিয়েত সৈন্যদের বিধ্বস্ত করা, তার পরে উত্তরে লেনিনগ্রাদ, মধ্যাঞ্চলে মস্কো এবং দক্ষিণে ইউক্রেন আর দনেৎস নদীর অঞ্চলে অবস্থিত কয়লাঞ্চল অধিকার করে নেওয়া। প্রাচ্য অভিযানের অন্তিম উদ্দেশ্য ছিল — ভোলগা ও উত্তর দ্‌ভিনা নদীগুলোতে জার্মান-ফ্যাসিস্ট সৈন্যদের আগমন। ২১ নং নির্দেশ স্বাক্ষর কালে হিটলার সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিল যে বিদ্যুৎগতি যুদ্ধের তত্ত্ব তাকে সমগ্র অভিযানে সাফল্য এনে দেবে: ১৫ আগস্ট নাগাদ মস্কোর পতন ঘটবে, আর ১ অক্টোবরের মধ্যে যুদ্ধই শেষ হয়ে যাবে, অর্থাৎ ২-৩ মাসের মধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়নকে খতম করে দেওয়া হবে।*

২১ নং নির্দেশে বলা হয়েছিল: 'ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার আগেই স্বল্পকালীন অভিযানে সোভিয়েত রাশিয়াকে পরাস্ত করার জন্য জার্মান সশস্ত্র বাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে হবে।... পশ্চিম রাশিয়ায় অবস্থিত রুশ স্থলসেনার প্রধান শক্তিগুলোকে ট্যাঙ্ক বাহিনীর দ্রুত ও গভীর অগ্রগতির সাহায্যে নির্ভীক অভিযান চালিয়ে ধ্বংস করে দিতে হবে। রুশ ভূখণ্ডের বিস্তীর্ণ এলাকায় শত্রুর যুদ্ধক্ষম বাহিনীগুলোর পশ্চাদ-পসরণ রোধ করতে হবে।

দ্রুত পশ্চাদগমনের মাধ্যমে এমন একটা যুদ্ধ-সীমায় পৌঁছতে হবে যেখান থেকে রুশ সামরিক বিমান শক্তি জার্মান সাম্রাজ্যের ভূখণ্ডের উপর হামলা চালাতে পারবে না।

অপারেশনের অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে — ভোলগা-আর্খাঙ্গেল্‌স্ক সাধারণ যুদ্ধ-সীমায় এশীয় রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক বেড়া গড়া। এইভাবে,

* রেইনগার্ড্‌ট ক.। মস্কোর উপকণ্ঠে পট-পরিবর্তন, পৃঃ ৫১।

১৯৪১ সালের ২১ জুনে পক্ষসমূহের বাহিনীগুলোর গ্রুপিং
আশু কর্তব্য সম্পাদনের জন্য আঘাতের অভিমুখ
অন্তর্বর্তীকালীন কর্তব্য সম্পাদনের জন্য আঘাতের অভিমুখ
পরবর্তী কর্তব্য সম্পাদনের জন্য আঘাতের অভিমুখ
সোভিয়েত ফৌজ পরিকল্পিত পশ্চাদানুসরণের অভিমুখ এবং 'বার্বারোসা' পরিকল্পনানুসারে জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীর অগ্রগতির অন্তিম লাইন
উরালের শিল্পাঞ্চলসমূহের উপর বিমান বাহিনীর পরিকল্পিত আক্রমণ

উত্তরের নৌ-বহর
মুর্মানস্ক
'নরওয়ে' বাহিনী (জা)
কান্দালাক্শা
আর্খাঙ্গেল্স্ক
উত্তর দ্ভিনা
কারেলীয় বাহিনী (ফি)
পেত্রজাভদস্ক
দক্ষিণ-পূর্ব বাহিনী (ফি)
লাদোগা হ্রদ
হেলসিঙ্কি
লেনিনগ্রাদ
ভোলোগ্দা
কিরোভ
হানকো (সোভিয়েত ইউনিয়নের ঠিকা জমি)
তালিন
বাল্টিক নৌ-বহর
নভগরদ
কালিনিন
রিগা
মস্কো
গোর্কি
বাল্টিক উপকূলের বিশেষ সামরিক অঞ্চল
পশ্চিম দ্ভিনা
ভিতেব্স্ক
স্মোলেন্স্ক
ভিলনিউস
মিনস্ক
তুলা
কুইবিশেভ
পশ্চিমের বিশেষ সামরিক অঞ্চল
কুর্স্ক
ভরোনেজ
কিয়েভ
খারকভ
কিয়েভের বিশেষ সামরিক অঞ্চল
স্তালিনগ্রাদ
ভোলগা
দন তীরের রস্তভ
জাপরোজিয়ে
ওদেসার সামরিক অঞ্চল
কিশিনেভ
ওদেসা
আস্ত্রাখান
রুমানিয়া
কৃষ্ণ সাগরের নৌ-বহর
সেভাস্তোপোল


নকশা ৩। হিটলারের 'বার্বারোসা' পরিকল্পনা

উরালে রুশদের হাতে বিদ্যমান শেষ শিল্পাঞ্চলটি প্রয়োজন বোধে বিমান বাহিনীর সাহায্যে অচল করে দেওয়া সম্ভব হবে।'*

জার্মান-ফ্যাসিস্ট নেতৃবৃন্দের পরিকল্পনাসমূহের হঠকারিতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাতে নাৎসি জার্মানি ও তার মিত্রদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আর সামরিক ক্ষমতাকে বাড়িয়ে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষমতাকে খাট করে দেখানো হয়েছিল। ফ্যাসিস্টরা সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অর্থ ও চরিত্র বুঝতে এবং তার বিপুল সম্ভাবনাসমূহ উপলব্ধি করতে সম্পূর্ণ অক্ষম প্রতিপন্ন হয়েছিল। তারা নতুন সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের শক্তি, সোভিয়েত সমাজের নৈতিক-রাজনৈতিক ঐক্য আর সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিসমূহের অবিচ্ছেদ্য মৈত্রীকে ছোট করে দেখেছিল।

তৃতীয় রাইখের নেতৃবৃন্দের এরূপ অভিপ্রায় ছিল: সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাজয়ের পর ভারত সহ ব্রিটিশ উপনিবেশগুলো এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে, আফ্রিকায় ও মধ্য প্রাচ্যে কিছু স্বাধীন দেশের ভূখণ্ড দখল করতে হবে, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও আমেরিকা মহাদেশ আক্রমণ করতে হবে। এক কথায়, তারা বিশ্বাধিপত্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের স্বপ্ন দেখছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট জার্মানির যুদ্ধের পরিকল্পনাটি ছিল রাষ্ট্র হিশেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পূর্ণ বিলোপ ঘটানোর, তার জাতিসমূহকে ধ্বংস করার ও দাস বানানোর পরিকল্পনা। নাৎসি জেনারেলদের এক অধিবেশনে হিটলার নির্লজ্জ অকপটতার সঙ্গে বলেছিল: 'রুশ সৈন্য বাহিনীকে পরাস্ত করা এবং লেনিনগ্রাদ, মস্কো ও ককেশাস দখল করাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। পৃথিবীর বুক থেকে এই দেশটিকে আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে, তার জনগণকে ধ্বংস করে দিতে হবে।' নাৎসিদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সোভিয়েত রাশিয়ার দ্রুত পরাজয় ঘটবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের কিছুকাল আগে সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দের সদর-দপ্তরের অন্যতম মাথা জেনারেল ইওডল বলেছিল: 'আক্রমণাভিযান আরম্ভ হওয়ার তিন সপ্তাহ পরেই এই তাসের বাড়িটি ধসে পড়বে।'** জার্মানির প্রবীন সামরিক বিশেষজ্ঞদের মাত্র কেউ কেউ এই

সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সম্ভাবনায় সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। যেমন, রাইখস্‌ভেরে-এর প্রাক্তন প্রধান সেনাপতি কাউণ্ট কুর্ট ফন গাম্মেরস্টেইন ১৯৪১ সালের ২২ জুন বলেছিল যে রাশিয়া অভিমুখে গমনরত সৈন্যদের কেউ-ই আর ফিরে আসবে না।

পশ্চিমী দেশসমূহের শাসক মহলগুলোর কথা বললে এটা উল্লেখ করতে হয় যে তারা তখন এতই সোভিয়েতবিরোধী ছিল যে ফ্যাসিস্ট জোটের আগ্রাসী নীতির ভয়বহতার সমগ্র গভীরতা উপলব্ধি করতে পারে নি। যুদ্ধের প্রাক্কালে ইউরোপ সফরে আগত মার্কিন উপ-পররাষ্ট্র সচিব স্যামনের ওয়েলেস ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত তাঁর 'সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়' নামক বইটিতে লিখেছিলেন: 'ওই যুদ্ধপূর্ব বছরগুলোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমের গণতান্ত্রিক দেশসমূহের বৃহৎ পুঁজিপতি আর ব্যবসায়ী মহলগুলোর প্রতিনিধিদের এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও নাৎসি জার্মানির মধ্যেকার যুদ্ধ কেবল তাদের নিজেদেরই স্বার্থের পক্ষে অনুকূল হবে। তারা বলত যে রাশিয়া অবশ্যই পরাজয় বরণ করবে, এবং তদ্দ্বারা কমিউনিজম বিলুপ্ত হবে, আর এই সংঘর্ষের ফলে সুদীর্ঘ বছরের জন্য হীনবল হয়ে-পড়া জার্মানিও বাদবাকী দুনিয়ার পক্ষে বাস্তব কোন বিপদ সৃষ্টি করতে পারবে না।'*

'বার্বারোসা' পরিকল্পনা অনুসারে তিনটি প্রধান আঘাত হানার কথা ছিল।

প্রধান আঘাতটি হানা হবে ওয়ার্শোর পূর্বাঞ্চল থেকে মিনস্ক ও পরে মস্কো অভিমুখে বাহিনীসমূহের 'সেণ্টার' গ্রুপের (অধিনায়ক — জেনারেল-ফিল্ডমার্শাল বক) শক্তির দ্বারা। তাতে অন্তর্ভুক্ত হয় ৯ম ও ৪র্থ বাহিনী, ৩য় ও ২য় ট্যাঙ্ক গ্রুপ, সর্বমোট ৫০টি ডিভিশন, যার মধ্যে ৯টি ট্যাঙ্ক, ৬টি মোটোরাইজ্‌ড ডিভিশন, ১টি অশ্বারোহী ও ২টি মোটোরাইজ্‌ড ব্রিগেড।

উত্তরে আঘাতটি হানা হবে বাহিনীসমূহের 'উত্তর' গ্রুপের (অধিনায়ক — জেনারেল-ফিল্ডমার্শাল লিয়েব) শক্তিগুলোর দ্বারা পূর্ব প্রাশিয়া থেকে প্স্কভ আর লেনিনগ্রাদ অভিমুখে। এই গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত হয় ১৮শ ও ১৬শ বাহিনী, ৪র্থ ট্যাঙ্ক গ্রুপ, সর্বমোট ২৯টি ডিভিশন, যার মধ্যে ৩টি ট্যাঙ্ক ও ৩টি মোটোরাইজ্‌ড ডিভিশন।

---

* Welles S. The Time for Decision. — New York, London, 1944, p. 321.

ফিনল্যান্ডের ভূখণ্ড থেকে আক্রমণাভিযানে লিপ্ত হয় 'নরওয়ে' নামক জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীটি এবং দু'টি ফিন বাহিনী — দক্ষিণ-পূর্ব ও কারেলীয় বাহিনীগুলো, সর্বমোট ২২টি (যার মধ্যে ৫টি জার্মান) ডিভিশন, ১টি অশ্বারোহী ও ২টি পদাতিক ব্রিগেড। মুর্মানস্ক, কান্দালাক্শা ও উখ্তা অভিমুখে আঘাত হানছিল ৪টি জার্মান ও ২টি ফিন ডিভিশন নিয়ে গঠিত 'নরওয়ে' নামক নাৎসি বাহিনীটি। ফিন ফৌজগুলোর লাদোগা হ্রদের পূর্বে ও পশ্চিমে আক্রমণ চালানোর এবং লেনিনগ্রাদ অঞ্চলে ও স্ভির নদীর তীরে বাহিনীসমূহের 'উত্তর' গ্রুপটির সঙ্গে মিলিত হওয়ার কথা ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব বাহিনীর ফিনদের একটি পদাতিক ডিভিশনের হাঙ্কো উপদ্বীপ দখল করার কথা ছিল।

দক্ষিণে আঘাতটি হানা হবে ল্যুবলিন অঞ্চল থেকে জিতোমির ও কিয়েভ অভিমুখে বাহিনীসমূহের 'দক্ষিণ' গ্রুপের (অধিনায়ক — জেনারেল-ফিল্ডমার্শাল রুণ্ড্স্টেড্ট) শক্তি দিয়ে। এতে অন্তর্ভুক্ত হল ৬ষ্ঠ, ১৭শ জার্মান, ৩য়, ৪র্থ রুমানীয় বাহিনীগুলো, ১ম ট্যাঙ্ক গ্রুপ, সর্বমোট ৬৩টি ডিভিশন (যার মধ্যে ৫টি ট্যাঙ্ক, ৪টি মোটোরাইজ্ড ডিভিশন, ৬টি পদাতিক, ৩টি মোটোরাইজ্ড ও ৪টি অশ্বারোহী ব্রিগেড), এবং এর মধ্যে ১৩টি পদাতিক ডিভিশন ও ১৩টি ব্রিগেড জুগিয়েছিল তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলো।

৩য় ও ৪র্থ রুমানীয় বাহিনীগুলোর তিরাসপোল অভিমুখে আক্রমণ চালানোর কথা ছিল।

বাহিনীসমূহের 'সেণ্টার' গ্রুপের সমর্থন পাওয়ার কথা ছিল ২য় বিমান বহরের কাছ থেকে, 'দক্ষিণ' গ্রুপের — ৪র্থ বিমান বহরের কাছ থেকে এবং 'উত্তর' গ্রুপের — ১ম বিমান বহরের কাছ থেকে।

১৮ থেকে ২১ জুনের মধ্যে নাৎসি বাহিনীগুলো আক্রমণাভিযানের জন্য প্রাথমিক অবস্থান নিয়ে নেয়।

এটা উল্লেখ্য যে বিদ্যুৎগতি যুদ্ধের জার্মান-ফ্যাসিস্ট তত্ত্বটি সরাসরিভাবে যুক্ত ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নাৎসি জার্মানির 'আত্মরক্ষামূলক' যুদ্ধের ধারণার সঙ্গে। আর এই যুদ্ধের 'আত্মরক্ষামূলক' চরিত্র প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নাৎসি প্রচার মাধ্যম জার্মানি সহ ইউরোপের প্রতি 'কমিউনিস্ট হুমকির' বিষয়ে কল্পকাহিনী রচনা ও রটনায় লিপ্ত থাকে। ঠিক এই উদ্দেশ্যেই ১৯৪১ সালের ২৫ মে হিটলারের সদর-দপ্তর থেকে একটি গুপ্ত টেলিফোনবার্তা প্রেরিত হয় যাতে সমস্ত মিলিটারি

অফিসারদের জানানো হয় যে আসন্ন সপ্তাহগুলোতে রুশরা নাকি আত্মরক্ষামূলক সামরিক ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ করতে পারে এবং তা প্রতিহত করার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে থাকতে হবে।

আজও কোন কোন বুর্জোয়া ইতিহাসবিদ ও ভাবাদর্শী সোভিয়েত ইউনিয়নের আক্রমণাত্মক মনোভাব সম্পর্কে (ট. ডিউপুই এবং স. পসোনি — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে; ভ. গ্লাজেবেক্ এবং উ. ভার্লেন্ড — পশ্চিম জার্মানিতে), তার সম্প্রসারণবাদী আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে আজগুবি গল্প রাটিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের বিষয়ে হিটলারের সিদ্ধান্তকে বাধ্যতামূলক পদক্ষেপ হিশেবে দেখাতে প্রয়াস পাচ্ছে। তারা বলে যে 'ইংলণ্ডের জন্য লড়াইয়ের' সময় প্রতিরোধ পেয়ে ও 'সি লায়ন' অপারেশনটি সম্পন্ন করার অসাধ্যতা বুঝতে পেরেই নাকি হিটলার অনুরূপ পদক্ষেপ করেছিল। তবে এই সমস্ত শঠতাপূর্ণ কাহিনী ঐতিহাসিক সত্যকে গোপন করতে অক্ষম। সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর ফ্যাসিস্ট জার্মানির আক্রমণ ছিল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সুপরিকল্পিত ও আগে থেকে সুবিবেচিত আগ্রাসনমূলক কাজ। আরও একটি জিনিস নাৎসি পরিকল্পনাসমূহের দখলকারী চরিত্রের পরিচয় দেয়। আগ্রাসকদের লক্ষ্য কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নকে যুদ্ধে পরাজিত করার মধ্যেই সীমিত ছিল না, তারা পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে দিতে ও তাকে জার্মান উপনিবেশে পরিণত করতে চেয়েছিল।

আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ায় ফ্যাসিস্ট জার্মানিই ছিল সর্ববৃহৎ সামরিক শক্তি। তার সশস্ত্র বাহিনীতে মোট লোকসংখ্যা ছিল ৮৫ লক্ষ — ২১৪টি ডিভিশন (তার মধ্যে ৩৫টি ট্যাঙ্ক ও মোটোরাইজড্) ও ৭টি স্বতন্ত্র ব্রিগেড। বিমান বাহিনীর হাতে ছিল ১০ সহস্রাধিক বিমান। সামরিক নৌ-বহরে ছিল ৫টি রণপোত, ৮টি ক্রুজার, ৪৩টি ডেস্ট্রয়ার ও টর্পেডো জাহাজ, ১৬১টি ডুবো জাহাজ, বৃহৎ সংখ্যক বোট ও সহায়ক জাহাজ। সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের জন্য পৃথক করে দেওয়া হয়েছিল ১৫৩টি জার্মান ডিভিশন ও ২টি ব্রিগেড (তার মধ্যে ৩৩টি ট্যাঙ্ক ও মোটোরাইজড্ ডিভিশন), ৩,৯৫০টি বিমান, প্রায় ৪,৩০০টি ট্যাঙ্ক, ৪৭,২৬০টি তোপ ও মর্টার কামান, ১৯২টি যুদ্ধ-জাহাজ। এছাড়া, ৩৭টি ডিভিশন খাড়া করেছিল তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলো— ফিনল্যান্ড, রুমানিয়া ও হাঙ্গেরি। সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের জন্য পৃথকীকৃত শত্রু সৈন্যের মোট শক্তি ছিল এরূপ: ১৯০টি ডিভিশন, প্রায়

৪,৩০০টি ট্যাঙ্ক, ৪৭,২৬০টি তোপ ও মর্টার কামান, ৪,৯৮০টি বিমান। সামরিক ক্রিয়াকলাপ শুরু করার কথা ছিল অকস্মাৎ এবং তা পরিচালনা করার কথা ছিল ট্যাঙ্ক, বিমান আর পদাতিক বাহিনীগুলোর ব্যাপক আঘাতের দ্বারা।

এই ভাবে, সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের সময় ফ্যাসিস্ট জার্মানি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বিশাল এক সৈন্য বাহিনী ও ক্ষমতাসম্পন্ন সামরিক অর্থনীতির অধিকারী ছিল। তার হাতে ছিল সুদৃঢ় ফ্যাসিস্ট জোট, যাতে সে ছাড়া অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল জাপান, ইতালি, ফিনল্যান্ড, হাঙ্গেরি ও রুমানিয়া। ফ্যাসিস্ট জোটের সশস্ত্র বাহিনীর পশ্চিমে লড়াইয়ের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা ছিল এবং তার প্রধান শক্তিসমূহ সোভিয়েত সীমান্তে সমাবেশিত থাকাতে সে সোভিয়েত ইউনিয়নের মুখ্য স্ট্র্যাটেজিক দিশা-গুলোতে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র-গুলোর উপর আকস্মিক আঘাত হানার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে অবস্থান করছিল।

৭। সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের জন্য সমরবাদী জাপানের প্রস্তুতি। এশিয়ায় আগ্রাসনের প্রসার

ফ্যাসিস্ট জার্মানি যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন সমরবাদী জাপানও সোভিয়েত দেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল এবং একই সঙ্গে চীনে তার সম্প্রসারণবাদী ক্রিয়াকলাপ অব্যাহত রেখেছিল। 'মহান পূর্ব এশিয়ার সম্মিলিত সমৃদ্ধির ক্ষেত্র' গঠনের বড় বড় স্লোগান তুলে জাপানী সমরবাদীরা সোভিয়েত দূর প্রাচ্য ও সাইবেরিয়া, চীন, ইন্দোচীন এবং এশীয় মহাদেশে ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অন্যান্য দেশ দখলের পরিকল্পনা প্রস্তুত করছিল। সরকারের নির্দেশে জাপানের সেনাপতিমণ্ডলী যুদ্ধ পরিচালনার দু'টি পরিকল্পনা তৈরি করে: উত্তরের পরিকল্পনা — সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে এবং দক্ষিণের পরিকল্পনা — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও তাদের মিত্রদের বিরুদ্ধে।*

১৯৩৯-১৯৪০ সালে মাঞ্চুরিয়ায় মোতায়েন কুয়াণ্টুং বাহিনীর সৈন্য

সংখ্যা বাড়িয়ে ৯ থেকে ১৫টি পদাতিক ডিভিশনে পৌঁছানো হয় এবং ১৯৪০ সালে তাতে ছিল প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ সৈনিক ও অফিসার।*

যুদ্ধ পরিচালনার দ্বিতীয় পরিকল্পনা অনুসারেও চূড়ান্ত ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হওয়ার কথা ছিল। তার প্রমাণ মেলে জাপানের যুক্ত নৌ-বাহিনীর সর্বাধিনায়ক অ্যাডমিরাল ই. ইয়ামোমতো-র কথাগুলোতে যা সে উচ্চারণ করেছিল ১৯৪১ সালের ২৪ জানুয়ারি: 'যদি জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধে, তাহলে আমরা গুয়াম, ফিলিপাইন এবং এমনকি হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ আর সান-ফ্রান্সিস্ক দখল করেই তুষ্ট থাকতে পারব না। আমাদের ওয়াশিংটনে গিয়ে হানা দিতে হবে এবং হোয়াইট হাউসে চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে।'**

এই ভাবে, জাপানী সমরবাদীরা আশা করছিল যে ফ্যাসিস্ট জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধে ঔপনিবেশিক পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহের পরাজয়ের এবং পূর্বে তাদের বাহিনীগুলোর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে একই সঙ্গে কয়েকটি দিকে আক্রমণাভিযান চালিয়ে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া আত্মসাৎ করে নিতে পারবে। গোড়াতে ফরাসি ইন্দোচীন দখল করার এবং পরে তার ভূখণ্ড থেকে চীন ও মালয় অভিমুখে আক্রমণাভিযান আরম্ভ করার কথা ভাবা হচ্ছিল।

সম্রাটের নির্দেশে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠান হিশেবে নির্মিত হয়েছিল সার্বিক যুদ্ধের ইনস্টিটিউট। জনসাধারণকেও এই যুদ্ধের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তৈরি করা হচ্ছিল। ১৯৪০ সালের নভেম্বর মাসে জাপান সরকার 'উৎপাদনের মাধ্যমে পিতৃভূমির সেবা করার এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠার বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বস্তুত পক্ষে শ্রমিক ও কর্মচারিদের জন্য এর সদস্য হওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। দেশে এসোসিয়েশনের ৪৬ সহস্রাধিক শাখা গঠিত হয়েছিল, আর তার সদস্য সংখ্যা ছিল ৪০ লক্ষাধিক লোক।

আগ্রাসনমূলক উদ্দেশ্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে জাপান তার সামরিক শিল্পের দ্রুত বিকাশ সাধনের কাজে বিশেষ প্রয়াসী হয়। ১৯৩৮ সালে শিল্পের সামরিক শাখাগুলো নিষ্কাশন ও প্রসেসিং শিল্পের অন্যান্য

শাখার চেয়ে ২·৭ গুণ দ্রুত গতিতে বিকাশ লাভ করছিল, আর ১৯৪০ সালে — ৪·৫ গুণ দ্রুত গতিতে। এর ফলে অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক যন্ত্রপাতির উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পেল।

এই ভাবে, জাপানী সমরবাদীরা দূর প্রাচ্যে, এশিয়ায় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টিত ছিল। চীনের গভীরে আক্রমণাভিযানে লিপ্ত জাপান ১৯৪০-এর জুন থেকে ১৯৪১-এর মে'র মধ্যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে তার দক্ষিণাঞ্চলগুলো দখল করে। ১৯৪০ সালের আগস্টে জাপান সরকার ইন্দোচীনকে 'সম্মিলিত সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে' অন্তর্ভুক্ত করে এবং তাকে ইন্দোচীনে সামরিক ঘাঁটি গড়ার ও তার ভূখণ্ডের উপর দিয়ে নিজের সৈন্য প্রেরণের অধিকার দানের জন্য ফ্রান্সের কাছে চরম প্রস্তাব পেশ করে। ১৯৪০ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর হ্যানয়ে ঔপনিবেশিক ফরাসি কর্তৃপক্ষ উত্তর ইন্দোচীনে জাপানী সৈন্য মোতায়েনের বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। ওই দিনই জাপানী ফৌজ ইন্দোচীনের মাটিতে পা ফেলে। ইন্দোচীন দখল করাতে জাপান প্রশান্ত মহাসাগরে 'বৃহৎ যুদ্ধের' প্রস্তুতির জন্য রণনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রাধান্য লাভ করল। তবে ইন্দোচীনের অনেকগুলো অঞ্চলে দখলদারদের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। ফরাসি ও জাপানি ঔপনিবেশিকদের সম্মিলিত প্রয়াসে সে সমস্ত বিদ্রোহ কঠোরভাবে দমন করা হয়। উত্তর ইন্দোচীন দখলের মানে ছিল এই যে সমরবাদী জাপান আমেরিকা ও ইংলণ্ড সমর্থিত 'দূর প্রাচ্যের মিউনিখ' নীতিটি কাজে লাগিয়ে আক্রমণ পরিচালনার দক্ষিণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজে হাত দেয়।

অতএব দেখাই যাচ্ছে যে ফ্যাসিস্ট জার্মানির মতো সমরবাদী জাপানও সামরিক-ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং দেশের সমস্ত শক্তি ও সম্পদ কাজে লাগিয়ে 'বৃহৎ যুদ্ধের' জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। নিজের আগ্রাসনমূলক অভিসন্ধি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সে ইউরোপে ফ্যাসিস্ট জোটের যুদ্ধের ফলাফলগুলো সর্বাধিক মাত্রায় ব্যবহার করতে চেষ্টা করছিল।

৮। দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা সুদৃঢ়করণের উদ্দেশ্যে সোভিয়েত সরকার অবলম্বিত ব্যবস্থাদি

পৃথিবীতে যখন পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকট অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করছিল তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সমাপ্তি পর্বে

পদার্পণ করেছিল এবং ঐতিহাসিক বিচারে অতি অল্প সময়ের মধ্যে লেনিন নির্ধারিত বিরাট একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করে ফেলেছিল। দেশের শিল্পায়নের, কৃষি অর্থনীতির যৌথীকরণের, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের লেনিনীয় নীতি পুরোপুরিভাবে জয় লাভ করল। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্য চলাকালে সোভিয়েত সমাজের শ্রেণীগত কাঠামোয় গভীর পরিবর্তন ঘটে — শোষক শ্রেণীসমূহের শেষাংশগুলো বিলুপ্ত হয়। সমাজতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্কের পরবর্তী বিকাশ সাধনের এবং সোভিয়েত জনগণের নৈতিক-রাজনৈতিক ঐক্য সুদৃঢ়করণের মজবুত ভিত্তি স্থাপিত হল। সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন সংবিধান (১৯৩৬ সাল) সমাজতন্ত্রের বিজয়কে আইনের দ্বারা সুদৃঢ় করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংগঠনের সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুমোদন করে, নাগরিকদের ব্যাপক সামাজিক স্বাধীনতা ও অধিকার দেয়। সামাজিক উৎপাদন নিরবচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধি পাওয়াতে জনগণের সচ্ছলতা বাড়ানোর এবং ক্রমশই ভালোভাবে মেহনতীদের ক্রমবর্ধমান বৈষয়িক ও আত্মিক চাহিদা মেটানোর সুযোগ মিলেছিল। শ্রমিক ও কর্মচারিদের বেতন, যৌথখামারীদের সর্বপ্রকার আয় বাড়ল। এ সমস্তকিছু সম্ভব হয়েছিল বেকারির অনুপস্থিতির কল্যাণে, সোভিয়েত অর্থনীতির পরিকল্পনাভিত্তিক সংকটহীন বিকাশ, শ্রমিক ও কর্মচারির নিরবচ্ছিন্ন সংখ্যাবৃদ্ধি এবং সামাজিক ভোগ্য তহবিলসমূহের (এগুলো থাকাতে বিনা খরচে শিক্ষা লাভ করা যায়, চিকিৎসা পাওয়া যায়, পেন্সন দেওয়া যায়, শিশু প্রতিষ্ঠানসমূহে শিশুদের ভরণপোষণের খরচ জোগানো যায়, বিশ্রামের আয়োজন করা যায়) বিকাশের কল্যাণে।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দৃঢ়তা ও উন্নত বৈষয়িক-প্রযুক্তিগত ভিত্তি সাংস্কৃতিক নির্মাণের সমস্ত ক্ষেত্রে বিপুল সাফল্য এনে দেয়। সোভিয়েত সাহিত্য ও শিল্প, থিয়েটার ও চলচ্চিত্র মেহনতীদের সামাজিক চেতনাকে সক্রিয়ভাবে প্রভাবিত করে, তাদের আত্মিক বিকাশে ও ভাবাদর্শমূলক দৃঢ়তায় সহায়তা করে, তাদের মধ্যে উচ্চ দেশাত্মবোধক চিন্তা ও অনুভূতি জাগিয়ে তুলে, কমিউনিজমের ভাবধারার বিজয়ে তাদের বিশ্বাসকে বদ্ধমূল করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট জার্মানির আসন্ন আগ্রাসনের পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকার দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা সুদৃঢ়করণের ও সশস্ত্র বাহিনীর সামরিক শক্তি বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করছিলেন। ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে সারা-

ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ১৮শ কংগ্রেস অনুমোদিত অর্থনৈতিক কর্মসূচিতে প্রতিরক্ষা শিল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাখা-সমূহের দ্রুত বিকাশের কথা এবং দেশের পূর্বাঞ্চলে ক্ষমতাসম্পন্ন শিল্পের ভিত্তি নির্মাণের কথা বলা হয়েছিল। ১৯৪০ সালে প্রতিরক্ষা শিল্পের উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি।

প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেল: ১৯৩৯ সালে তা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় বাজেটের ২৫·৫%, ১৯৪০ সালে — ৩২·৬%, আর ১৯৪১ সালে — ৪৩·৪%। ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শিল্পকে সামরিক উৎপাদনের উপযোগী করে তোলার পরিকল্পনা প্রণীত ও গৃহীত হয়।

১৯৩৯ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল: 'বিদ্যমান বিমান কারখানাসমূহের পুনর্গঠন ও নতুন বিমান কারখানাগুলো নির্মাণ বিষয়ক সিদ্ধান্ত', '১৯৪০ সালে ত-৩৪ ট্যাঙ্ক উৎপাদন বিষয়ক সিদ্ধান্ত', '১৯৪০ সালে রাষ্ট্রীয় রিজার্ভ সংগ্রহ ও সৈন্যযোজনের বিষয়বস্তু সঞ্চয় করার পরিকল্পনা বিষয়ক সিদ্ধান্ত' এবং এ ধরনের অন্যান্য সিদ্ধান্ত। চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানোর ফলে ১৯৪১ সালের গ্রীষ্ম নাগাদ সোভিয়েত বিমান ও ট্যাঙ্ক শিল্পের উৎপাদনী ক্ষমতা ফ্যাসিস্ট জার্মানির অনুরূপ ক্ষমতাকে প্রায় দেড় গুণ ছাড়িয়ে যায়। যেমন, ১৯৪০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিমান শিল্প উৎপাদন করে ৮,১৩৩টি জঙ্গী বিমান। একই সঙ্গে তা নতুন ধরনের বিমান উৎপাদনের কাজ রপ্ত করে। সোভিয়েত কারখানাগুলোতে নির্মিত হয় ফাইটার মিগ-৩, লাগ-৩, ইয়াক-১, বোমারু পে-২, আক্রমণকারী বিমান ইল-২। পৃথিবীর আর কোন সৈন্য বাহিনীতে শেষোক্ত আক্রামণকারী বিমান ছিল না। ১৯৪১ সালের প্রথমার্ধে এরূপ 'উড়ন্ত ট্যাঙ্ক' নির্মিত হয়েছিল ২,৭০৭টি।

যুদ্ধের আগে ট্যাংক কারখানাগুলো নতুন ধরনের — কভ, ত-৩৪ ট্যাঙ্ক উৎপাদন শুরু করে। এই ট্যাঙ্কগুলোর ছিল উচ্চ জঙ্গী গুণ, মজবুত আচ্ছাদন, ক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্র, উচ্চ গতি এবং সর্বত্র চলাচল করার ক্ষমতা। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার প্রাক্কালে নতুন ডিজাইনের ১,৮৬১টি ট্যাঙ্ক উৎপাদিত হয়েছিল।

আর্টিলারির কামান উৎপাদনের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছিল। সোভিয়েত কামান অনেকগুলো সূচকের দিক থেকে বিদেশী শ্রেষ্ঠ কামানের চেয়ে কোন অংশেই কম ছিল না। ১৯৩৯ সাল থেকে যুদ্ধ আরম্ভ

হওয়ার সময় পর্যন্ত সোভিয়েত প্রতিরক্ষা শিল্প উৎপাদন করে ৪৬ হাজার তোপ ও মর্টার কামান (৫০ মিলিমিটারীগুলো বাদ দিয়ে), ২ লক্ষাধিক মেশিনগান ও সাবমেশিনগান। যুদ্ধের আগে নির্মিত হয়েছিল রকেট মর্টার কামান বম-১৩ (তথাকথিত 'কাতিউশা' রকেট মর্টার কামান) পরীক্ষামূলক নমুনা, পরে ওগুলোর ব্যাপক উৎপাদন আরম্ভ হয়।

তখন সোভিয়েত সামরিক নৌ-বহর বিপুল সংখ্যক জাহাজ পেল, তার মধ্যে ছিল ৪টি ক্রুজার, ৭টি ডেস্ট্রয়ার লিডার, ৩০টি ডেস্ট্রয়ার, ১৮টি পাহারা-জাহাজ, ৩৮টি মাইন সুইপার, ২০৬টি ডুবো জাহাজ। তাছাড়া নৌ-বহরের হাতে এল ৪৭৭টি জঙ্গী বোট ও অনেকগুলো সহায়ক জাহাজ। কেবল যুদ্ধপূর্ব সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই নির্মিত হয়েছিল ২৬৫টি নতুন যুদ্ধ-জাহাজ।

যুদ্ধের আগে সোভিয়েত নৌ-বহরের কাছে ছিল ৩টি রণপোত, ৭টি ক্রুজার, ৫৯টি ডেস্ট্রয়ার লিডার ও ডেস্ট্রয়ার, ২১৮টি ডুবো জাহাজ, ২৬৯টি টর্পেডো বোট এবং ২,৫৫৮টি বিমান।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল বিপুল সামরিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী। ১৯৪০ সালে উৎপাদিত হয়েছিল ১ কোটি ৫০ লক্ষ টন কাঁচা লোহা, ১ কোটি ৮০ লক্ষাধিক টন ইস্পাত, নিষ্কাশিত হয়েছিল ১৬ কোটি ৬০ লক্ষ টন কয়লা, ৩ কোটি ১০ লক্ষ টন তেল, সংগ্রহ করা হয়েছিল প্রায় ৩০ লক্ষ টন কার্পাস। শিল্পোৎপাদনের পরিমাণে — যা ১৯১৩ সালের তুলনায় ১২ গুণ বেড়ে গিয়েছিল — সোভিয়েত ইউনিয়ন ইউরোপে প্রথম স্থানের ও পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী ছিল।

কিন্তু সামরিক উৎপাদন প্রসারণ এবং সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর পুনর্সজ্জীকরণের পরিকল্পিত কাজগুলো শত্রুর আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার আগে পুরোপুরিভাবে শেষ করা সম্ভব হয় নি। তা ফ্যাসিস্ট সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে প্রথম লড়াইগুলোর গতি ও ফলাফলকে প্রভাবিত না করে পারে নি। সেই সঙ্গে, যুদ্ধপূর্ব বছরগুলোতে স্থাপিত প্রতিরক্ষা শিল্প লাল ফৌজকে দিল আধুনিক সমরাস্ত্র, যা ছিল তার যুদ্ধক্ষমতার বৈষয়িক ভিত্তি এবং ভবিষ্যৎ বিজয়গুলোর নির্ভরযোগ্য বনিয়াদ।

সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীকে সুদৃঢ়করণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এক পর্যায় সূচিত হয় ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সর্বজনীন সামরিক কর্তব্য বিষয়ক আইনটি গ্রহণের পর। ওই সময়ই সৈন্য দল গঠনের আঞ্চলিক পদ্ধতি ছেড়ে স্থায়ী পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় এবং মিলিটারি সার্ভিসের মেয়াদ

বাড়িয়ে দেওয়া হয় — সৈন্য বাহীনিতে তিন বছর পর্যন্ত, নৌ-বহরে পাঁচ বছর পর্যন্ত।

এই ভিত্তিতে সমস্ত ধরনের সশস্ত্র বাহিনীর বিকাশ আরম্ভ হয়, তাদের কাঠামো উন্নত করা হয়।

স্থল-বাহিনীতে গঠিত হয় নতুন ইনফেণ্ট্রি, মেকানাইজ্‌ড ও ট্যাঙ্ক ফর্ম্যাশনগ্‌লো, বিমান, আর্টিলারি ও ইঞ্জিনিয়রিং ইউনিটগ্‌লো। সামরিক নৌ-বহরে ও বিমানবিরোধী প্রতিরক্ষা বাহিনীতে বড় বড় সংগঠনম্‌লক কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। ১৯৪১ সালের মাঝামাঝি সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সশস্ত্র বাহিনীতে মোট লোকসংখ্যা ছিল ৫০ লক্ষাধিক, যা ১৯৩৯ সালের চেয়ে ২·৮ গ্‌ণ বেশি। য্‌দ্ধপ্‌র্ব দ্‌ই বছরের মধ্যে সোভিয়েত সৈন্যরা পেল ৭ সহস্রাধিক ট্যাঙ্ক, প্রায় ৩০ হাজার কামান, ৫০ সহস্রাধিক মর্টার কামান, প্রায় ১৮ হাজার জঙ্গী বিমান।

দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা স্‌দ্‌ঢ়করণের কাজে গ্‌র্‌ত্বপ্‌র্ণ এক ভূমিকা পালন করে সীমান্তবর্তী ভূখণ্ডে নিরাপত্তাম্‌লক ব্যবস্থাদি অবলম্বন, বিমান ঘাঁটি নির্মান, রাস্তাঘাটের বিকাশ ইত্যাদি।

১৯৩৯ সাল নাগাদ প্‌রনো সীমান্তের অঞ্চলসম্‌হে সোভিয়েত ইউনিয়ন রেলপথে পশ্চিমী প্রতিবেশীদের চেয়ে আড়াই গ্‌ণ বেশি যাত্রী ও জিনিস বহন করতে পারত। কিন্তু পশ্চিম ইউক্রেন ও পশ্চিম বেলোর্‌শিয়া ম্‌ক্ত হওয়ার পর সীমান্ত ৩০০-৩৫০ কিলোমিটার দ্‌রে সরে যায়। ওই সমস্ত অঞ্চলের রেলপথগ্‌লো ছিল পরিত্যক্ত অবস্থায়: অনেকগ্‌লো লাইন থেকে দ্বিতীয় পথটি তুলে নেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া ওখানকার রেলপথগ্‌লো ছিল অধিকতর সংকীর্ণ, পশ্চিম ইউরোপের মতো।

জেনারেল স্টাফ — এবং বিশেষ করে যখন তার নেতৃত্বে ছিলেন গেওর্গি জ্‌কোভ — রেল সড়কের লাইনগ্‌লো তাড়াতাড়ি বদলানোর দাবি জানাল। কিন্তু এ কাজের জন্য এবং সমগ্র প্‌নর্নির্মাণের কাজের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল — প্রায় এক হাজার কোটি র্‌বল। এত বিপ্‌ল পরিমাণ অর্থ তাড়াতাড়ি বরাদ্দ করা ও কাজে লাগানো মোটেই সহজ ছিল না। এস্তোনিয়া, লাতভিয়া ও লিথ্‌য়ানিয়ার রেলপথগ্‌লোর অবস্থাও ছিল অন্‌র্‌প।

এই ভাবে, য্‌দ্ধারম্ভের সময় জটিল পরিস্থিতি গড়ে উঠেছিল। প্রথম স্ট্র্যাটেজিক এশিলনকে সমাবেশ ও প্রসারিত করার জন্য প্রয়োজন ছিল ২৫ দিনের মতো।

ফ্যাসিস্ট জার্মানি যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে তখন প্রথম স্ট্র্যাটেজিক এশিলনের সোভিয়েত বাহিনীগুলো অবস্থিত ছিল স্থায়ী মোতায়েন কেন্দ্রগুলোতে, তাদের একাংশ অবস্থিত ছিল সৈন্য শিবিরগুলোতে এবং নতুন অঞ্চলসমূহে সমাবেশের জন্য পথিমধ্যে। সীমান্তবর্তী সামরিক অঞ্চলগুলোর বিমান বাহিনী অবস্থিত ছিল স্থায়ী বিমান ঘাঁটিগুলোতে। অনেকগুলো ফর্ম্যাশনের আর্টিলারি আর বিমানধ্বংসী কামানগুলোকে শিক্ষামূলক গোলাবর্ষণ পরিচালনার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল চাঁদমারির জায়গাতে, আর স্যাপার ইউনিটগুলোকে — ইঞ্জিনিয়ারিং শিবিরে। রক্ষাকারী বাহিনীসমূহের প্রথম এশিলনের ইনফেন্ট্রি আর অশ্বারোহী ডিভিশনগুলো অবস্থিত ছিল পশ্চিম সীমান্ত থেকে ৫-৫০ কিলোমিটার দূরে, আর দ্বিতীয় এশিলনের ডিভিশনগুলো — ৫০-১০০ কিলোমিটার দূরে। দ্বিতীয় এশিলনগুলো, সামরিক অঞ্চলসমূহের রিজার্ভগুলো এবং সরাসরিভাবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ডিভিশনসমূহ সীমান্ত থেকে ১০০-১৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ছিল। প্রধান সেনাপতিমণ্ডলীর রিজার্ভের বাহিনীগুলো রেলপথে স্থানান্তরিত হচ্ছিল। নির্দিষ্ট দিকে সামরিক ক্রিয়াকলাপের জন্য ১৯৪১ সালের ২২ জুন নাগাদ জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজগুলোর গ্রুপিংয়ের কাজ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং আক্রমণাভিযানের প্রস্তুতি নিয়ে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রসীমার একেবারে নিকটে অবস্থিত ছিল।

এই ভাবে, ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালে — যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর ফ্যাসিস্ট জার্মানির আক্রমণের হুমকি বৃদ্ধি পেল — সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী দেশের পশ্চিম সীমান্তে লাল ফৌজের প্রসারণের প্রস্তুতিতে অনেক বড় বড় কাজ সম্পন্ন করলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও জুলাইয়ের শেষ দিকেই সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে সৈন্য সমাবেশ করার এবং জরুরী প্রতিরক্ষামূলক গ্রুপিংগুলো গড়ার কাজ শেষ করা সম্ভব হত। আর এর মানে, পশ্চিমের সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহের বাহিনীগুলো পূর্ণ সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে না থাকাতে এবং স্ট্র্যাটেজিক প্রসারণ সম্পন্ন না করাতে বিশাল রণাঙ্গনে ও গভীর অভ্যন্তর ভাগ পর্যন্ত ছোট ছোট অংশে অবস্থান করছিল। মোটামুটিভাবে শক্তির অনুপাত ছিল জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের অনুকূলে। সাধারণ অনুপাত — প্রায় ২ গুণ, আর প্রধান প্রধান অভিমুখে — ৩-৪ গুণ।

সশস্ত্র বাহিনী বিকাশের জন্য বিপুল সংখ্যক দক্ষ সেনাপতি

রাজনৈতিক কর্মী আর সামরিক বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন ছিল। তাদের প্রস্তুত করার জন্য ১৯৪১ সালের দিকে অনেকগুলো সামরিক স্কুল ও আকাদেমি নির্মাণ করা হয়। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে ইউনিট আর ফর্ম্যাশনগুলোকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পেশাদার সেনাপতি দেওয়া গেল না।

সামরিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনার রূপ ও পদ্ধতি সম্পর্কে সোভিয়েত যুদ্ধকলা ওই সময়ের বিচারে সবচেয়ে অগ্রণী ধ্যানধারণা সৃষ্টি করে। সোভিয়েত রণনীতি আধুনিক সশস্ত্র সংগ্রামের চরিত্র সঠিকভাবে মূল্যায়ন করেছিল এবং বলত যে শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ সম্ভব কেবল ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে সমস্ত ধরনের সশস্ত্র বাহিনীগুলোর প্রয়োগের মাধ্যমে। এই রণনীতি 'ট্যাঙ্ক যুদ্ধের', 'বায়ু যুদ্ধের' ও 'জল যুদ্ধের' বুর্জোয়া তত্ত্বগুলো মানত না, — ওগুলো কেবল কোন এক ধরনের সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকার উপর জোর দিত এবং 'বিদ্যুৎগতি যুদ্ধের' উপর ভরসা করত।

সামরিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে সোভিয়েত সমরবিজ্ঞানীরা ফ্রন্ট অপারেশন ও আর্মি অপারেশনের প্রস্তুতি আর পরিচালনার সম্পূর্ণ নতুন ও বিজ্ঞানসম্মত একটি তত্ত্ব সৃষ্টি করেন। তার ভিত্তিতে ছিল ৩০-এর বছরগুলোতে তৈরি গভীর অপারেশনের তত্ত্ব, যার লক্ষ্য হচ্ছে পদাতিক বাহিনী, ট্যাঙ্ক বাহিনী, গোলন্দাজ বাহিনী, বিমান বাহিনী ও প্যারাট্রুপার বাহিনীর সমন্বিত আঘাতের দ্বারা সমগ্র গভীরতা বরাবর শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার এককালীন বিনাশ সাধন। পৃথিবীর আর কোন সৈন্য বাহিনীর কাছে অনুরূপ তত্ত্ব ছিল না।

বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল ইউনিটগুলোতে ও জাহাজগুলোতে শিক্ষাদানমূলক কাজের অবস্থা উন্নয়নের দিকে, যোদ্ধাদের রাজনৈতিক জ্ঞান বৃদ্ধির দিকে। এই উদ্দেশ্যে সৈন্য বাহিনী আর নৌ-বহরের পার্টি সংগঠনসমূহ সুদৃঢ়করণের জন্য এবং সেনাপতিদের মধ্যে পার্টি গ্রুপটিকে শক্তিশালীকরণের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা হয়েছিল। ১৯৪১ সালের গোড়াতে সৈন্য বাহিনীতে ও নৌ-বহরে কমিউনিস্ট ছিল ৫ লক্ষাধিক — ১৯৩৮ সালের চেয়ে তিন গুণেরও বেশি, আর কমসোমল সদস্য ছিল ২০ লক্ষাধিক।

কিন্তু শত্রুর আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার আগে সংখ্যার দিক থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত সৈন্য বাহিনী আর নৌ-বহরকে পুনর্গঠিত

ও পুনঃসজ্জিত করার এবং নতুন মালমসলার ভিত্তিতে শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে সময় ছিল খুবই অল্প। নতুন ধরনের ট্যাঙ্ক ও বিমান তখনও বেশি উৎপাদিত হয় নি। পরিবহণ মাধ্যমের — মোটর গাড়ি ও টানা-যন্ত্রের অভাব ছিল। তখনকার অর্থনৈতিক ক্ষমতা ছিল সীমিত, তাই আরও অল্প সময়ের মধ্যে কোনকিছু করা সম্ভব ছিল না।

সাধারণ সামরিক-রণনৈতিক পরিস্থিতি এবং ফ্যাসিস্ট জার্মানির আক্রমণের সম্ভাব্য দিন-তারিখগুলো মূল্যায়নে সোভিয়েত সামরিক-রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বড় রকমের ভুলভ্রান্তিও প্রতিরক্ষার জন্য দেশকে প্রস্তুত করার কাজের উপর কুপ্রভাব ফেলেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জার্মানির আগ্রাসনের প্রস্তুতি সম্পর্কে তথ্য লাভ সত্ত্বেও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কম লোকই বিশ্বাস করছিল যে কূটনৈতিক উপায়াদির দ্বারা আসন্ন যুদ্ধকে ঠেকানো যাবে না। পশ্চিমের সামরিক অঞ্চলসমূহের সৈন্যদের যথা সময়ে পূর্ণ সামরিক প্রস্তুতির অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় নি। নাৎসিদের সম্ভাব্য আকস্মিক আক্রমণ সম্পর্কে সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে সতর্কবাণী সমেত একটি নির্দেশ প্রেরিত হয়েছিল কেবল ২১ জুন সন্ধ্যাবেলায়, এবং অনেকগুলো ফর্ম্যাশন আর ইউনিটেই তা আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার আগে পৌঁছতে পারে নি। আগ্রাসকের প্রথম আঘাতটি সোভিয়েত ফৌজের কাছে ছিল এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার।

স্বনামধন্য সোভিয়েত সেনাপতি মার্শাল গেওর্গি জুকোভ, যুদ্ধের আগে যিনি ছিলেন সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর জেনারেল স্টাফের অধিকর্তা, তাঁর 'স্মৃতি ও ভাবনা' বইয়ে নাৎসি জার্মানির আসন্ন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার জন্য দেশ ও সৈন্য বাহিনীর প্রস্তুতি সম্পর্কে নিরপেক্ষ মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'আমার মনে হয় যে দেশের প্রতিরক্ষার কাজ তার প্রধান প্রধান দিকে মোটামুটিভাবে সঠিকভাবেই চলছিল। সুদীর্ঘ বছর ধরে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সমস্তকিছুই অথবা প্রায় সমস্তকিছুই করা হয়েছিল। ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪১ সালের মাঝামাঝি অবধি কাল পর্যায়ের কথা ধরলে বলতে হয় যে ওই সময় জনগণ এবং পার্টি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণের কাজে বিশেষ প্রয়াস, সমস্ত শক্তি ও সঙ্গতি নিয়োগ করেছিল। বিকশিত শিল্প, যৌথখামার ব্যবস্থা, সর্বজনীন সাক্ষরতা, জাতিসমূহের ঐক্য ও সংহতি, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈষয়িক-আত্মিক শক্তি, রণাঙ্গন ও পশ্চাদ্ভাগকে এক করে দিতে প্রস্তুত লেনিনীয় পার্টির নেতৃত্ব — এ ছিল বিশাল দেশের প্রতিরক্ষা

ক্ষমতার শক্তিশালী ভিত্তি, ফ্যাসিজমের সঙ্গে সংগ্রামে আমাদের অর্জিত বিপুল বিজয়ের প্রধান কারণ।' সেই সঙ্গে মার্শাল জুকোভ এ কথাও বলছেন যে 'সমস্তকিছু সম্পন্ন করার জন্য ইতিহাস আমাদের শান্তিপূর্ণ সময় দিয়েছিল খুবই অল্প বটে। অনেককিছুই আমরা আরম্ভ করেছিলাম সঠিকভাবে এবং অনেককিছুই শেষ করতে পারি নি। ফ্যাসিস্ট জার্মানির আক্রমণের সম্ভাব্য সময় নিরূপণে যে-ভুল হয়েছিল তার নির্দিষ্ট কুফল ছিল। শত্রুর প্রথম আঘাতের মোকাবেলা করার প্রস্তুতির দোষত্রুটিগুলো এর সঙ্গে জড়িত ছিল।'*

এই ভাবে, দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা সুদৃঢ়করণের উদ্দেশ্যে অনেকগুলো ব্যবস্থা কিছুটা বিলম্বে অবলম্বিত হলেও প্রথম পাঁচসালাগুলোর সামাজিক-অর্থনৈতিক সাফল্য, সমাজতন্ত্র নির্মাণের গতিতে প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত সমাজের ভাবাদর্শগত-রাজনৈতিক ঐক্য ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনগণ অর্জিত বিজয়ের ভিত্তি রচনা করেছিল।

* জুকোভ গ.। স্মৃতি ও ভাবনা। — মস্কো, ১৯৭৯, পৃঃ ২৫৫, ২৫৬।

তৃতীয় অধ্যায়

জার্মানি ও জাপানের আগ্রাসনের প্রসারণ। হিটলারের 'বিদ্যুৎগতি যুদ্ধের' স্ট্র্যাটেজির অকৃতকার্যতা

১। সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর ফ্যাসিস্ট জার্মানির বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আক্রমণ। যুদ্ধের প্রাথমিক পর্ব

১৯৪১ সালের ২২ জুন ভোর প্রায় ৪টার সময় যুদ্ধ ঘোষণা না করেই ফ্যাসিস্ট জার্মানি ও তার তাঁবেদার রাষ্ট্রসমূহের সশস্ত্র বাহিনীগুলো বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে প্রায় সমগ্র পশ্চিম সীমান্ত জুড়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে। সর্বত্র চলে কঠোর লড়াই। হাজার হাজার জার্মান বোমারু দেশের পশ্চিমাঞ্চলগুলোর শিল্প কেন্দ্র, বন্দরনগরী, রেল জংশন আর সামরিক কেন্দ্রগুলোর উপর ব্যাপক বোমাবর্ষণ করে। নাৎসি বিমান বাহিনী আকাশ থেকে বিশেষ প্রবল আঘাত হানে সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহের বিমান ঘাঁটিগুলোর উপর, মাটিতে ৮০০টি প্লেন ধ্বংস করে দেয়, আর প্রথম দিনের বায়ু যুদ্ধে বিধ্বস্ত বিমান নিয়ে সোভিয়েত বিমান বাহিনী প্রায় ১,২০০টি বিমান হারায়। তা ফ্যাসিস্ট বিমান বাহিনীকে অন্তরীক্ষে আধিপত্য লাভের সুযোগ দিল।

ফ্যাসিস্ট ট্যাঙ্ক আর মোটোরাইজ্ড ইনফেণ্ট্রি ফৌজগুলো গোলন্দাজ ও বিমান বাহিনীর প্রবল সমর্থনে সোভিয়েত সীমান্ত অতিক্রম করে দেশের অভ্যন্তর অভিমুখে ধাবিত হতে থাকে। পশ্চিম রণাঙ্গনের বাহিনীগুলো অচিরেই তাদের প্রায় সমস্ত ওর্ড্ন্যান্স ডিপো থেকে বঞ্চিত হল, — ওগুলোতে ছিল প্রচুর পরিমাণ গোলাবারুদ। তাছাড়া নাৎসিরা বিপুল সংখ্যক সোভিয়েত ট্যাঙ্ক আর কামান কব্জা করে নেয়। বিভিন্ন কারণে ওগুলোকে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করা হয় নি, এবং এর ফলে শক্তির অনুপাত ফ্যাসিস্টদের আরও বেশি অনুকূলে চলে যায়।

যুদ্ধের প্রথম দিনগুলোতে বিশেষ কঠোর লড়াই চলে সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে — লিয়েপায়া, শাউলিয়াই, গ্রদ্নো, ব্রেস্ত, ভ্লাদিমির-

ভলিনস্কি, দুবনো ও পেরেমিশ্‌লের অঞ্চলে। অপরিসীম বীরত্বের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যায় সোভিয়েত সীমান্তরক্ষীদের অনতিবৃহৎ সাব-ইউনিটগুলো। যেমন, ভ্লাদিমির-ভলিনস্কি অঞ্চলে লেফটেনেণ্ট আ. লপাতিনের ১৩শ সীমান্ত চৌকিটি অবরোধের মধ্যে ১১ দিন ধরে সংগ্রাম করে যায়। পেরেমিশ্‌ল রক্ষাকারী যোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে ফ্যাসিস্টদের আক্রমণ প্রতিহত করে। কঠোর লড়াইয়ের পর তারা শহর ত্যাগ করে সেনাপতিমণ্ডলীর নির্দেশে। কিন্তু পরদিন সকাল বেলাই ৯৯তম ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের ইউনিটগুলো আকস্মিক পাল্টা-আক্রমণ চালিয়ে ফের পেরেমিশ্‌ল মুক্ত করে এবং পাঁচ দিন ধরে নিজেদের অধিকারে রাখে। অটলভাবে ও নৈপুণ্যের সঙ্গে লড়ে লিয়েপায়ার রক্ষকরা — ন. দেদায়েভের পরিচালনাধীন ৬৭তম ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের যোদ্ধারা।

ব্রেস্ত দুর্গ অনেক দিনের জন্য আটকে রাখে হিটলারের স্বদেশবাসীদের নিয়ে গঠিত বাছাই-করা ৪৫তম পদাতিক ডিভিশনটিকে। প্রথম সোভিয়েত শহরে প্রতিশ্রুত প্যারেডের পরিবর্তে ওয়ার্শো ও প্যারিস দখলকারী এই ডিভিশনটি লড়াইয়ে দুর্বল হয়ে পশ্চাদ্ভাগে চলে যায় পুনর্গঠনের জন্য। চারিদিক থেকে শত্রু পরিবেষ্টিত ব্রেস্ত দুর্গের অনতিবৃহৎ গ্যারিসন — যার নেতৃত্বে ছিলেন রেজিমেণ্ট কমিশার ইয়ে. ফমিন, মেজর প. গাভ্রিলোভ ও ক্যাপ্টেন ই. জুবাচেভ — মাসাধিক কাল প্রতিরোধ দিয়ে যায়। দুর্গ প্রাকারে তার রক্ষকদের হাতে লেখা আছে: 'আমরা পাঁচজন: সেদোভ, গ্রুদোভ, বগোলুব, মিখাইলোভ ও সেলিভানোভ। আমরা প্রথম লড়াই শুরু করি ২২.৬.৪১ তারিখে — ৩টা ১৫ মিনিটের সময়। মরব, কিন্তু হটব না!' 'আমি মরছি, কিন্তু আত্মসমর্পণ করছি না! বিদায় মাতৃভূমি। ২০.৭.৪১।'

হিটলারের জেনারেল ফ. গাল্‌ডের ২৯ জুন তার ডায়েরিতে লিখে রাখে: 'রণাঙ্গন থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে রুশরা সর্বত্র শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত লড়ছে, কেবল কোন কোন স্থানে আত্মসমর্পণ করছে।'*

ফিল্ডমার্শাল ক্লেইস্টও পরবর্তী কালে বলেছিল যে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী একেবারে শুরু থেকেই 'গঠিত হয়েছিল সেরা যোদ্ধাদের নিয়ে' এবং 'ওরা লড়েছিল অসাধারণ অটলতা আর বিস্ময়কর স্থৈর্যের সঙ্গে।'**

---

* গাল্‌ডের ফ.। সামরিক ডায়েরি, খণ্ড ৩, বই ১, পৃঃ ৩১৭।

** Hart, B. Liddel. The German Generals Talk. — New York: Murrou, 1948, pp. 183-184.

সোভিয়েত যোদ্ধাদের অসীম বীরত্ব ও অটল প্রতিরোধ সত্ত্বেও শত্রুকে ঠেকানো গেল না। শত্রু ছিল কয়েক গুণ বেশি শক্তিশালী। অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যুদ্ধে নেমে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী ওই দিনগুলোতে অখণ্ড রণাঙ্গন গড়তে, আগে থেকে সুবিধাজনক অবস্থান নিতে ও দৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠন করতে সক্ষম হয় নি।

জুলাইয়ের মাঝামাঝি নাগাদ সামরিক ক্রিয়াকলাপ বিশাল এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে — ফ্রন্ট লাইন বরাবর তা চলে ৩ হাজার কিলোমিটার জুড়ে আর প্রধান প্রধান অভিমুখে গভীরতা বরাবর ৪০০-৬০০ কিলোমিটার পর্যন্ত। অনুরূপ চিত্র লক্ষ্য করা যায় সশস্ত্র বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির গতিতেও। যুদ্ধের প্রথম দিনে নাৎসিরা লড়াইয়ে লাগিয়েছিল ১১৭টি ডিভিশন, কিন্তু দশ দিন বাদে দ্বিতীয় এশিলনগুলোর সৈন্যদের ও তাঁবেদার রাষ্ট্রসমূহের ফৌজগুলোকে লড়াইয়ে লাগালে প্রথম লাইনে যুধ্যমান ডিভিশনগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৭১-এ পেণছে যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের তরফ থেকে সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহের লড়াইয়ে নেমেছিল কেবল রক্ষাকারী বাহিনীগুলো। পরবর্তী দিনগুলোতে প্রাথমিক অপারেশনসমূহে অংশগ্রহণ করছিল সমস্ত পশ্চিম সীমান্তবর্তী সামরিক অঞ্চলের সৈন্যরা — মোট ১৭০টি ডিভিশন, আর জুলাইয়ের গোড়াতে লড়াইয়ে নেমেছিল দেশের অভ্যন্তর ভাগ থেকে আগত স্ট্র্যাটেজিক রিজার্ভগুলো। যুদ্ধের প্রথম সপ্তাহগুলোতে উভয় পক্ষ থেকে লড়াইয়ে ব্যাপৃত হয়েছিল প্রায় ৪০০টি ডিভিশন, হাজার হাজার ট্যাঙ্ক আর বিমান, বহু সহস্র তোপ আর মর্টার কামান, বিপুল পরিমাণ অন্যান্য সমরাস্ত্র।

সমগ্র সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে লাল ফৌজের অটল ও ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে (সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের সদর-দপ্তর লড়াইয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে স্ট্র্যাটেজিক রিজার্ভগুলো ঢোকাচ্ছিল) শত্রু তার প্রয়াস বিক্ষিপ্ত করতে বাধ্য হয়েছিল, তার সৈন্যদের আক্রমণাভিযানের গতি ভীষণ হ্রাস পেতে শুরু করেছিল (প্রথম দিনগুলোতে ২৪ ঘণ্টায় ৩০ কিলোমিটার, আর জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে ৬-৭ কিলোমিটার), এবং পিয়ার্নু আর তার্তু লাইনে, স্মোলেন্স্কের পশ্চিমে, লুগা নদীতে, কিয়েভের উপকণ্ঠে ও ইউক্রেনের রাজধানী থেকে দক্ষিণ দিকে নীপারের তীরে সে আক্রমণাভিযান থামাতে বাধ্য হয়েছিল। এই যুদ্ধ-সীমাগুলোতেই সমাপ্ত হয়েছিল দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের প্রাথমিক পর্বের অপারেশনসমূহ। সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের সদর-দপ্তরের বৃহৎ স্ট্র্যাটেজিক রিজার্ভগুলো — যা নিয়ে

গঠিত হয়েছিল সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর দ্বিতীয় স্ট্র্যাটেজিক এশিলন— লড়াইয়ে ব্যাপৃত হওয়ার পর আরম্ভ হল ১৯৪১ সালের গ্রীষ্ম-হেমন্তকালীন লড়াইয়ের নতুন এক পর্যায়।

যুদ্ধের প্রাথমিক পর্বে, যখন শত্রুর হাতে ছিল স্ট্র্যাটেজিক উদ্যোগ এবং সে ব্যাপকভাবে বিচ্ছিন্নকারী আঘাত প্রয়োগ করছিল, গভীরে প্রবেশ করে ফৌজের বড় বড় গ্রুপিংকে ঘিরে ফেলছিল, তখন তার ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনী সক্রিয় স্ট্র্যাটেজিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আশ্রয় নেয়। এর উদ্দেশ্য ছিল — শত্রুর আক্রমণ ক্ষমতা নষ্ট করা, তার আক্রমণকারী গ্রুপিংগুলোকে নাজেহাল ও দুর্বল করে দেওয়া। কঠোর আত্মরক্ষামূলক লড়াই চালিয়ে সোভিয়েত বাহিনীগুলো তাদের অধিকৃত যুদ্ধ-সীমার অটল প্রতিরক্ষা অব্যাহত রেখে প্রয়োজন বোধে মধ্যবর্তী ও পশ্চাদ্ভাগের যুদ্ধ-সীমায় সরে যেতে পারত।

অসংখ্য পাল্টা-আক্রমণ, আর্মি ও ফ্রন্টের অগণিত প্রতিঘাত — যেগুলোতে সাধারণত অংশগ্রহণ করত ট্যাংক ফর্ম্যাশন — ছিল সোভিয়েত ফৌজের প্রতিরক্ষামূলক ক্রিয়াকলাপের অবিচ্ছেদ্য অংশ। উদাহরণ হিশেবে উল্লেখ করা যায় কাউনাস ও গ্রদ্‌নো অঞ্চল থেকে সুভাল্‌কি শহর অভিমুখে উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম ফ্রন্টগুলোর সৈন্যদের প্রতিঘাতের কথা, ল্যুবলিন অভিমুখে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের সৈন্যদের প্রতিঘাতের কথা।

সোভিয়েত সৈন্যদের বহু প্রতিআক্রমণ ও প্রতিঘাত পরিণত হয় পাল্টা লড়াইয়ে। দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের পাল্টা ট্যাংক যুদ্ধটিই ছিল যুদ্ধের প্রাথমিক পর্বের সবচেয়ে বড় পাল্টা লড়াই, যা সংঘটিত হয়েছিল ১৯৪১ সালের জুনের শেষে লুৎস্ক, রাদেখোভো, ব্রদী ও রোভনো অঞ্চলে। উভয় পক্ষ থেকে তাতে অংশগ্রহণ করে দেড় হাজারের মতো ট্যাংক। সোভিয়েত বাহিনীর আসল প্রয়াস চালিত হয়েছিল শত্রুর ১ম ট্যাংক গ্রুপিংটিকে বিধ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে। এই লড়াইটি এভাবে বর্ণনা করেছে নাৎসি জেনারেল গ. গট: 'সবচেয়ে বেশি কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল বাহিনীসমূহের 'দক্ষিণ' গ্রুপকে। উত্তর পার্শ্বের ফর্ম্যাশনগুলোর সম্মুখে প্রতিরক্ষারত শত্রু সৈন্যদের সীমান্ত থেকে হটিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা খুবই তাড়াতাড়ি অপ্রত্যাশিত আঘাতের কুফল কাটিয়ে উঠল এবং নিজেদের রিজার্ভগুলোর ও অভ্যন্তর ভাগে অবস্থিত ট্যাংক ইউনিটগুলোর দ্বারা প্রতিআক্রমণ চালিয়ে জার্মান সৈন্যদের অগ্রগতি রোধ করে দিল। ৬ষ্ঠ বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ১ম ট্যাংক গ্রুপের অপারেশন্যাল ব্রেক-থ্রু ২৮ জুন পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। জার্মান

ইউনিটগুলোর আক্রমণাভিযানের পথে বড় বাধা ছিল শত্রুর প্রবল প্রতিঘাত।'*

প্রধান প্রধান অভিমুখে শত্রু অতিক্রান্ত স্ট্র্যাটেজিক ফ্রন্ট পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ও সুস্থিতকরণে এক বৃহৎ ভূমিকা পালন করে সর্বোচ্চ সদর-দপ্তরের স্ট্র্যাটেজিক রিজার্ভগুলো। যেমন, যুদ্ধের প্রথম দিনগুলোতে কেন্দ্রীয় অভিমুখে শত্রু বিদ্ধ প্রতিরক্ষা ব্যূহটি কেবল পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সর্বোচ্চ সদর-দপ্তর ২৭ জুন থেকে ১০ জুলাইয়ের মধ্যে পশ্চিম ফ্রন্টকে ৩৬টি ডিভিশন দেয়।

যুদ্ধের প্রথম দিনগুলোতে লাল ফৌজ জার্মানদের যে বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ দিয়েছিল তা তাদের কাছে ছিল অতি অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। খোদ নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলীর বিবৃতি অনুসারে, যুদ্ধের কেবল প্রথম ৫৩ দিনেই শত্রু সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে হারায় প্রায় ৩ লক্ষ ৯০ হাজার সৈনিক ও অফিসার, অর্থাৎ ফ্যাসিস্ট জার্মানির সমস্ত স্থলসেনার ১১·৪ শতাংশ জনবল। অথচ পোল্যান্ড, ফ্রান্স, নরওয়ে, ডেনমার্ক, যুগোস্লাভিয়া, গ্রীস ও লুক্সেমবুর্গে জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীগুলোর সামরিক ক্রিয়াকলাপের পুরো সময়টা ধরে ওরা ৩ লক্ষের বেশি সৈনিক ও অফিসার হারায় নি।

দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের প্রাথমিক পর্বের প্রধান সামরিক-রাজনৈতিক ফলটি হচ্ছে এই যে 'বিদ্যুৎগতির' সামরিক অভিযান চালিয়ে সোভিয়েত রাশিয়াকে পরাস্ত করার নাৎসি 'বার্বারোসা' পরিকল্পনাটি প্রথম গুরুতর ব্যর্থতার সম্মুখীন হল। তখনকার অবস্থা দীর্ঘকালীন যুদ্ধেরই ইঙ্গিত দিচ্ছিল, কিন্তু ফ্যাসিস্ট জার্মানি তা চাইছিল না।

সমস্ত প্রধান প্রধান স্ট্র্যাটেজিক অভিমুখে সামরিক ঘটনাবলি নাৎসি রণনীতিজ্ঞদের হতভম্ব করে দিয়ে ভিন্ন দিকে মোড় নিচ্ছিল। ফ্যাসিস্ট ফৌজের আক্রমণাভিযান ক্রমশই দৃঢ় প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছিল। সোভিয়েত সৈন্যরা ঘন ঘন শত্রুকে আত্মরক্ষায় লিপ্ত হতে বাধ্য করছিল। জার্মান স্থলসেনার সদর-দপ্তরের অধিকর্তা জেনারেল গাল্ডের ২৯ জুন তার অফিস ডায়েরিতে লিখে রাখে, 'রুশদের অটল প্রতিরোধ আমাদের সমস্ত সামরিক নিয়ম মেনে লড়াই করতে বাধ্য করছে। পোল্যান্ডে এবং

পশ্চিমে আমরা নিজেদের কিছুটা স্বাধীনতা দিতে ও সামরিক নিয়ম লঙ্ঘন করতে পেরেছিলাম। কিন্তু এখন তা আর সম্ভব নয়।'* আর হিটলারের 'Deutsche Allgemeine Zeitung' সংবাদপত্রটি ১৯৪১ সালের ২ জুলাই লিখেছিল: 'পূর্বের লড়াইগুলোর চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। সমগ্র পূর্ব রণাঙ্গনে যে-যুদ্ধ চলছে তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে রুশরা সর্বত্র অটল ও কঠোর প্রতিরোধ দিচ্ছে।'

যুদ্ধের প্রাথমিক পর্ব থেকে কী কী শিক্ষা মিলল? প্রধান শিক্ষাটি হচ্ছে এই যে সশস্ত্র বাহিনীর সতর্কতা ও যুদ্ধ-প্রস্তুতির মাত্রা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যুদ্ধের আগে থেকেই প্রস্তুতিমূলক কাজকর্ম চালানো প্রয়োজন।

যুদ্ধের প্রাথমিক পর্বের আরও কিছু শিক্ষা হচ্ছে এই যে অন্তরীক্ষে ও সমুদ্রে আধিপত্য লাভ সহ নিকটতম স্ট্র্যাটেজিক উদ্দেশ্যসমূহ সিদ্ধির জন্য আগ্রাসক রাষ্ট্রগুলো তাদের প্রথম আঘাতে সর্বাধিক শক্তি ও সঙ্গতি নিয়োগ করতে চেষ্টা করে; আকস্মিকতা অর্জনের লক্ষ্যে তারা কেবল সামরিকই নয়, রাজনৈতিক আর কূটনৈতিক ক্রিয়াকলাপেরও আশ্রয় নেয়, যুদ্ধের প্রাথমিক পর্বে নৈতিক-রাজনৈতিক ফ্যাক্টরের তাৎপর্য খুব বেড়ে যায়।

যুদ্ধোত্তর পর্বের ঘটনাবলি পুরোপুরিভাবে এই সিদ্ধান্তগুলোর সত্যতা প্রমাণ করছে। আগ্রাসী রাষ্ট্রসমূহ স্থানীয় যুদ্ধে ক্রিয়াকলাপের আকস্মিকতা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। যেমন, ১৯৬৭ সালে মিশর, সিরিয়া ও জর্ডানের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের আক্রমণ আরম্ভ হয় বিমান বাহিনীর আকস্মিক আঘাত দিয়ে, আর ১৯৪৫, ১৯৬২ ও ১৯৬৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে ইংলণ্ড ও হল্যান্ডের আক্রমণ শুরু হয় নৌ-সৈন্যদের আচমকা অবতরণ ও নৌ-বহরের ক্রিয়াকলাপ দিয়ে। ১৯৬০ সালে কঙ্গোর বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বেলজিয়ামের আক্রমণ আরম্ভ হয়েছিল প্যারাট্রুপারদের আকস্মিক অবতরণ দিয়ে।

সুতরাং অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে শত্রুর আচমকা আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজন উচ্চ মাত্রায় স্থায়ী সতর্কতা, যুদ্ধের প্রাথমিক পর্বে সামরিক ক্রিয়াকলাপের জন্য সশস্ত্র বাহিনীর উপযুক্ত প্রস্তুতি, ভালো অনুসন্ধানী কাজ এবং নতুন ফর্ম্যাশনসমূহের দ্রুত সমাবেশকরণ ও প্রসারণের সুব্যবস্থা।

* গাল্ডের ফ.। সামরিক ডায়েরি, খণ্ড ৩, বই ১, পৃঃ ২৫।

এই ভাবে, যুদ্ধের প্রাথমিক পর্বে ফ্যাসিস্টরা সমগ্র বেলোরুশিয়া, লিথুয়ানিয়া, লাতভিয়া, এস্তোনিয়া, মোলদাভিয়া, ইউক্রেনের অনেকগুলো জেলা দখল করে নেয় এবং লেনিনগ্রাদের একেবারে কাছে পৌঁছে যায়। সোভিয়েত দেশ মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হয়। সোভিয়েত মানুষের বীরত্ব যতই বিপুল হোক না কেন তা কিন্তু রণাঙ্গনের সাংঘাতিক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কোন আমূল পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম ছিল না। শত্রুকে প্রতিরোধ দেওয়ার জন্য সমস্ত শক্তির সমাবেশ ঘটাতে সর্বরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি সাফল্যের সঙ্গে সে দায়িত্ব পালন করেছিল। সে তাড়াতাড়ি জটিল ও কঠোর পরিস্থিতি বুঝতে পেরেছিল এবং পিতৃভূমি রক্ষার্থে সমগ্র সোভিয়েত জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সারা দেশ পরিণত হয় এক অখন্ড সংগ্রাম শিবিরে। 'সমস্তকিছু রণাঙ্গনের জন্য, সমস্তকিছু বিজয়ের জন্য!' — পার্টির এই স্লোগানটি সমস্ত সোভিয়েত মানুষের জন্য অলংঘনীয় নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়।

জুলাই মাসের শেষের দিকে মোট ৩ লক্ষ ২৮ হাজার লোক নিয়ে গঠিত হয়েছিল ১,৭৫৫টি ধ্বংসকারী ব্যাটেলিয়ন, যা শত্রুর অন্তর্ঘাতক আর প্যারাশুটিস্টদের সঙ্গে সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ এক ভূমিকা পালন করেছিল। পরে এই সমস্ত ব্যাটেলিয়নের বৃহৎ একটি অংশ যোগ দেয় স্থায়ী সৈন্য বাহিনীতে। ১৯৪১ সালের গ্রীষ্ম ও হেমন্তের কঠিন দিনগুলোতে শ্রমিক, কর্মচারি ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল ৬০ ডিভিশন জন স্বেচ্ছা-বাহিনী, ২০০টি স্বতন্ত্র রেজিমেন্ট, বিপুল সংখ্যক সাব-ইউনিট — ব্যাটেলিয়ন, কোম্পানি, প্ল্যাটুন ও দল। ওগুলোতে ছিল মোট প্রায় ২০ লক্ষ যোদ্ধা। তাছাড়া প্রায় ১ কোটি লোক নিয়োজিত ছিল প্রতিরক্ষামূলক কাজে, তারা ফ্যাসিস্টদের ঠেকানোর জন্য নানা রকমের প্রতিবন্ধক গড়ছিল। ১৯৪১ সালের শেষ দিকে লাল ফৌজের ৪ শতাধিক নতুন ডিভিশন গড়ে উঠেছিল। যুদ্ধের কেবল প্রথম ছ'মাসে কমিউনিস্ট পার্টি সশস্ত্র বাহিনীতে প্রেরণ করে ১১ লক্ষাধিক কমিউনিস্টকে, ২০ লক্ষ কমসোমল সদস্যকে, ৮,৮০০ জন দায়িত্বশীল পার্টি কর্মীকে। যে একাত্মবোধ নিয়ে সোভিয়েত মানুষ ফ্যাসিজমের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল তা তাদের রাজনৈতিক পরিপক্কতা, নিজেদের গভীর নাগরিক ও আন্তর্জাতিক কর্তব্য বোধের পরিচয় দেয়।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর কমিউনিস্ট পার্টি ফ্যাসিস্ট জার্মানির সঙ্গে সংগ্রামের একটি বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মসূচি রচনা করে। কর্মসূচিটি প্রকাশিত

হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের গণ-কমিশনার পরিষদ এবং সারা-ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৪১ সালের ২৯ জনুন তারিখের নির্দেশপত্রে। এই নির্দেশপত্রে পার্টি সংগঠনসমূহকে, সোভিয়েত ও সামাজিক সংগঠনসমূহকে সমস্ত শক্তি ও সঙ্গতি যুদ্ধ পরিচালনার কাজে লাগাতে বলা হয়। তাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হয় যে দেশাভ্যন্তরের কাজকে পুনর্গঠিত করতে হবে, জাতীয় অর্থনীতিকে যুদ্ধকালীন অবস্থার উপযোগী করে তুলতে হবে, সশস্ত্র বাহিনীকে সর্বতোভাবে সুদৃঢ় করতে হবে, শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে পার্টিজান আন্দোলন বিকশিত করতে হবে এবং সমগ্র ভাবাদর্শগত-রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে পুনর্গঠিত করতে হবে। নির্দেশপত্রে বলা হয়েছিল 'এবার সমস্তকিছু নির্ভর করছে শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামে কালক্ষেপ না করে, কোন সুযোগ হাতছাড়া না করে তাড়াতাড়ি আমাদের সংগঠিত হতে ও কাজ করতে পারার উপর।'*

মার্শাল গেওর্গি জুকোভ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন যে নির্দেশপত্রটি তখন ধ্বনিত হয়েছিল 'এক শক্তিশালী ও আশঙ্কাজনক বিপদ-সংকেতের মতো যাতে শোনা যাচ্ছিল বিখ্যাত লেনিনীয় স্লোগানের প্রতিধ্বনি: 'সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমি বিপদাপন্ন!..' 'সমস্তকিছু রণাঙ্গনের জন্য! সমস্তকিছু বিজয়ের জন্য!' ধ্বনিটির দ্বারা পার্টি প্রতিটি সোভিয়েত মানুষকে বিপদের মুখোমুখি হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।... সর্বোচ্চ স্বদেশপ্রেমিক লক্ষ্যে — আপন পিতৃভূমি রক্ষার্থে এগিয়ে এসেছিল আমাদের সমগ্র বহুজাতিক রাষ্ট্রের জনগণ, যারা তাদের অভিন্ন আত্মিক আবেগ দিয়ে বহু গুণ বৃদ্ধি করেছিল অস্ত্রের বৈষয়িক শক্তি ও ক্ষমতা।**

যুদ্ধের সময় কমিউনিস্ট পার্টি পরিণত হয় 'যুধ্যমান', সংগ্রামরত পার্টিতে, আর তার কেন্দ্রীয় কমিটি — সংগ্রামী সদর-দপ্তরে, যা দেশকে এবং সশস্ত্র বাহিনীকে দিচ্ছিল সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ও স্ট্র্যাটেজিক নেতৃত্ব। যুদ্ধরত সৈন্য বাহিনীতে ছিল অর্ধেকেরও বেশি পার্টি সদস্য।

গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে এবং সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমি রক্ষার বিষয়ে লেনিনের ভাবধারা অনুসরণ করে কমিউনিস্ট পার্টি দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধ শুরু হতেই সশস্ত্র সংগ্রামে পার্টির নেতৃত্ব দানের স্পষ্ট একটি ব্যবস্থা প্রস্তুত করে। রণাঙ্গন ও দেশাভ্যন্তরের প্রয়াস একত্রিত করার উদ্দেশ্যে, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্যে ৩০ জুন সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত, সারা-ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের গণ-কমিশনার পরিষদ ই. স্তালিনের নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির হাতে ন্যস্ত হয়েছিল রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা।

রণাঙ্গন নিকটবর্তী যে-সমস্ত শহরের শত্রু কবলিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল সেখানে পার্টির জেলা কমিটি আর শহর কমিটিগুলোর প্রথম সম্পাদকদের নেতৃত্বে গঠিত হয় প্রতিরক্ষা কমিটিসমূহ। প্রতিরক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছিল সেভাস্তপোল, তুলাতে, রস্তভ, স্তালিনগ্রাদ, কুর্স্কে — ৬০টিরও বেশি শহরে।

সশস্ত্র বাহিনীকে নেতৃত্ব দানের জন্য সারা-ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর এক সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৪১ সালের ২৩ জুন গঠিত হয় প্রধান সেনাপতিমণ্ডলীর সদর-দপ্তর, যা ১০ জুলাই নতুন একটি নাম পায় -- সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর সদর-দপ্তর।

যুদ্ধের প্রথম দিনগুলোতেই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোতে ট্যাঙ্ক আর বিমান উৎপাদনের প্রশ্নে অনেকগুলো অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনের দিকে, কলকারখানাসমূহ দেশের পূর্বাঞ্চলগুলোতে স্থানান্তরীকরণের দিকে। খাদ্য সামগ্রী সর্বাগ্রে প্রেরিত হচ্ছিল লাল ফৌজ আর শিল্পকেন্দ্রসমূহের বাসিন্দাদের জন্য। সমস্ত অর্থ সম্পদও ব্যয়িত হচ্ছিল সামরিক খরচ জোগানোর উদ্দেশ্যে।

পলিটব্যুরোর সিদ্ধান্ত অনুসারে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত 'যুদ্ধকালে শ্রমিক ও কর্মচারিদের কাজের সময় সম্পর্কে' একটি ডিক্রি জারি করে। এই ডিক্রি অনুসারে চালু হয় বাধ্যতামূলক অতিরিক্ত সময়ের খাটুনি এবং ছুটি বাতিল করে দেওয়া হয়। তাতে শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা না বাড়িয়ে উৎপাদনী ক্ষমতা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছিল।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকার গৃহীত অন্যতম বাস্তব ব্যবস্থাটি ছিল ১৪টি সামরিক অঞ্চলে সৈন্য বাহিনীর জন্য লোক মনোনয়ন। দেশের পশ্চিমাঞ্চলগুলোতে সামরিক আইন জারি করা হয়েছিল। ১ জুলাই নাগাদ সশস্ত্র বাহিনীর জন্য ৫৩ লক্ষ লোক নেওয়া হয়েছিল। প্রতিরক্ষা কাজ সংগঠন, সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিধানের রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত হয় ফ্রন্ট, বাহিনী আর সামরিক অঞ্চলসমূহের সামরিক পরিষদের উপর, আর যেখানে সামরিক পরিষদ ছিল না — আর্মি ফর্ম্যাশনসমূহের সেনাপতিদের দপ্তরের উপর।

এই সমস্ত ও অন্যান্য ব্যবস্থাদির দ্বারা যুদ্ধের প্রাথমিক পর্বের সাময়িক অসুবিধাগুলো অতিক্রমণের জন্য এবং শত্রুর বিরুদ্ধে শেষ বিজয় লাভের জন্য দৃঢ় একটি ভিত্তি গড়ে তোলা হয়েছিল।

২। স্মোলেনস্কের লড়াই
(১৯৪১ সালের ১০ জুলাই — ১০ সেপ্টেম্বর)

সীমান্তবর্তী অঞ্চলে লড়াইয়ের প্রতিকূল গতি লক্ষ্য করে সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী ১৯৪১ সালের জুন মাসের শেষ দিক থেকে নীপার নদী বরাবর দ্বিতীয় স্ট্র্যাটেজিক এশিলনের ফৌজগুলোকে — ২২তম, ১৯শ, ২০শ ও ২১তম বাহিনীগুলোকে প্রসারিত করতে আরম্ভ করেন এবং ওগুলোকে পশ্চিম ফ্রন্টের সৈন্য বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করেন। স্মোলেনস্ক অঞ্চলে সমাবেশিত হয়েছিল ১৬শ বাহিনী। জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজসমূহের ট্যাঙ্ক গ্রুপগুলোর নীপারের নিকটস্থ হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যদিও এই সমস্ত বাহিনী বিন্যাসের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নি (অবস্থান নিয়েছিল কেবল ২৪টি ডিভিশন) তা সত্ত্বেও তারা মস্কো অভিমুখে সামরিক ক্রিয়াকলাপের পরবর্তী গতির উপর চূড়ান্ত প্রভাব ফেলেছিল। তাদের কর্তব্য ছিল — মস্কো অভিমুখে ফ্যাসিস্টদের অভিযানের গতি রোধ করা।

জার্মান বাহিনীসমূহের 'সেন্টার' গ্রুপটির কাজ ছিল পশ্চিম দ্ভিনা ও নীপার নদীগুলোর যুদ্ধ-সীমা প্রতিরক্ষারত সোভিয়েত ফৌজগুলোকে ঘিরে ফেলা এবং ওর্শা, স্মোলেনস্ক ও ভিতেবস্ক অঞ্চল দখল করে মস্কো অভিমুখে যাত্রার জন্য সবচেয়ে অদীর্ঘ একটি পথ তৈরি করা। এর পর গটের ৩য় ট্যাঙ্ক গ্রুপটিকে ব্যবহার করার কথা ছিল বাহিনীসমূহের

'উত্তর' গ্রুপটির শক্তি বৃদ্ধিকরণের জন্য অথবা পূর্বাভিমুখে পরবর্তী আক্রমণাভিযানের উদ্দেশ্যে — তবে খোদ মস্কোর উপর ঝঞ্ঝাক্রমণের জন্য নয়, তাকে অবরোধ করার জন্য। জেনারেল ফ. গাল্ডের তার ডায়েরিতে লিখেছে: 'ফিউরের মস্কো ও লেনিনগ্রাদকে ধূলিসাৎ করে দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই শহর দু'টির বাসিন্দাদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেওয়াই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য, অন্যথায় সারা শীত কাল আমাদেরই ওদের খাওয়াতে হবে। এই শহরগুলো ধ্বংসকরণের কাজ সম্পন্ন করবে বিমান বাহিনী। এর জন্য ট্যাঙ্ক ব্যবহার করা উচিত হবে না। এ হবে এক জাতীয় বিপর্যয়, যা কেন্দ্রগুলোকে কেবল বলশেভিজম থেকেই নয়, রুশদের থেকেও বঞ্চিত করবে।'*

শক্তির অনুপাত ছিল শত্রুর অনুকূলে। যেমন, স্মোলেন্স্ক অভিমুখে সে পশ্চিম ফ্রন্টের ফৌজগুলোকে জনবলে, আর্টিলারিতে ও বিমানের সংখ্যায় ছাড়িয়ে গিয়েছিল দ্বিগুণ, আর ট্যাঙ্কের সংখ্যায় — চার গুণ।

১০ জুলাই ২য় ও ৩য় জার্মান ট্যাঙ্ক গ্রুপ দু'টি নীপার নদীর যুদ্ধ-সীমা থেকে স্মোলেন্স্ক অভিমুখে ধাবিত হল ওখানে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে। শুরু হল স্মোলেন্স্কের লড়াই। সামরিক ক্রিয়াকলাপের গতি এবং ফলাফল অনুসারে এই লড়াইকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়।

প্রথম পর্যায় (১০ থেকে ২০ জুলাই)। ফ্যাসিস্ট সৈন্যরা পশ্চিম ফ্রন্টের ডান পার্শ্বে ও কেন্দ্রস্থলে প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে ফেলে। শত্রুর ট্যাঙ্ক ইউনিটগুলো ২০০ কিলোমিটার অবধি অগ্রসর হয়ে মগিলেভ শহর ঘিরে ফেলে এবং ওর্শা, স্মোলেন্স্ক, ইয়েল্নিয়া ও ক্রিচেভ দখল করে নেয়। ১৯শ, ১৬শ ও ২০শ সোভিয়েত বাহিনীগুলোর সৈন্যরা স্মোলেন্স্ক অঞ্চলে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

সর্বত্র চলে কঠোর লড়াই। সোভিয়েত যোদ্ধারা তাতে অপরিসীম শৌর্য ও সাহসিকতার পরিচয় দেয়। ১৬ জুলাই তারিখে শত্রুর ট্যাঙ্কগুলো দক্ষিণ ও উত্তর দিক থেকে স্মোলেন্স্কে ঢুকে পড়লে শহরের রাস্তায় রাস্তায় তুমুল লড়াই বেধে যায় এবং দিনরাত তা চলতে থাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে। জার্মানদের ২য় ট্যাঙ্ক গ্রুপের ইউনিটগুলো কয়েক দিন

* গাল্ডের ফ.। সামরিক ডায়েরি, পৃঃ ১০১।

ধরে নীপার নদী পেরিয়ে শহরের উত্তরাংশে পেশছতে চেষ্টা করছিল ৩য় ট্যাঙ্ক গ্রুপের সঙ্গে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু নাৎসিদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ভারী অস্ত্রশস্ত্রের অভাব সত্ত্বেও সোভিয়েত যোদ্ধারা অদৃষ্টপূর্ব অটলতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে লড়ে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তাদের অবস্থানগুলো রক্ষা করছিল। ২য় ট্যাঙ্ক গ্রুপের অধিনায়ক জেনারেল গুদেরিয়ান পরবর্তী কালে লিখেছিল, 'রুশ সৈনিক সম্পর্কে মহান ফ্রিদরিখই বলেছিলেন যে ওকে দু'বার গুলিবিদ্ধ করে পরে আবার ধাক্কা দিতে হয় যাতে ও অবশেষে পড়ে যায়। তিনি এই সৈনিকের দৃঢ়তা সম্পর্কে সত্যি কথাই বলেছেন। ১৯৪১ সালে আমাদেরও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত ছিল। এই সৈনিকরা অদম্য অটলতার সঙ্গে তাদের অবস্থান টিকিয়ে রেখেছিল।'*

জেনারেল ম. লুকিনের ১৬শ বাহিনী ও জেনারেল ই. কনেভের ১৯শ বাহিনীর ভিতেব্‌স্ক থেকে সরে-পড়া ইউনিটগুলো স্মোলেন্‌স্ক অঞ্চলে লড়াই চালিয়ে যায়, আর পশ্চিম ফ্রণ্টের প্রধান শক্তিসমূহ ওর্শা, মগিলেভ, ক্রিচেভ ও জ্‌লবিন অঞ্চলগুলোতে সক্রিয় প্রতিরক্ষামূলক ক্রিয়াকলাপ অব্যাহত রাখে। ১৪ জুলাই জেনারেল প. কুরোচকিনের ২০শ বাহিনীটি— ওটা লড়ছিল ওর্শা শহরের উত্তর-পূর্ব দিকে — সেই প্রথম বারের মতো রকেট মর্টার কামানগুলো ব্যবহার করেছিল। পরবর্তী কালে সোভিয়েত যোদ্ধারা ওগুলোকে একটি আদরের নাম দিয়েছিল — 'কাতিউশা'। ক্যাপ্টেন ই. ফ্লেরোভের তোপশ্রেণী রেল স্টেশন অঞ্চলে অবস্থিত শত্রুর উপর প্রবল গোলাবর্ষণ করে এবং তার বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ঘটায়।

১৩শ বাহিনীর শক্তিসমূহের একাংশ সজ নদী পেরিয়ে যায়, আর বাদবাকি শক্তি শত্রুর ট্যাঙ্ক আক্রমণ প্রতিহত করে মগিলেভ শহরটিকে হাতছাড়া হতে দিচ্ছিল না। পশ্চিম ফ্রণ্টের বাম পার্শ্বে ২১তম বাহিনীটি মুক্ত করে রগাচেভ ও জ্‌লবিন শহরগুলো এবং তা নীপার ও বেরেজিনা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ২য় জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীর প্রধান শক্তিসমূহকে সুদীর্ঘ কালের জন্য আটকে রেখে দেয়।

স্মোলেন্‌স্কের লড়াইয়ের দ্বিতীয় পর্যায়ে (২৭ জুলাই থেকে ৭ আগস্ট পর্যন্ত) সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী পশ্চিমাভিমুখে মজুদ

৮,

বাহিনীসমূহের সৈন্যদের দিয়ে পাল্টা-আক্রমণ চালান। এই উদ্দেশ্যে পাঁচটি অপারেটিভ গ্রুপ গঠিত হয়েছিল। পশ্চিম ফ্রন্টের হাতে তুলে দেওয়ার পর ওগুলো বিয়েলয়ে ইয়াৎর্সেভো ও রস্লাভল অঞ্চল থেকে স্মোলেন্স্ক অভিমুখে আঘাত হানে ১৬শ ও ২০শ বাহিনীগুলোর সঙ্গে সহযোগিতায় শহরের উত্তরে ও দক্ষিণে অবস্থিত শত্রুর গ্রুপিংটিকে বিধ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে।

২১তম বাহিনীর এলাকায় শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্যে ৩য় অশ্বারোহী ডিভিশন ও রিইনফোর্সমেণ্ট ইউনিটসমূহের অধীনে একটি অশ্বারোহী গ্রুপ প্রেরিত হয়। পাল্টা-আক্রমণ চলাকালে সোভিয়েত সৈন্যরা যদিও শত্রুর স্মোলেন্স্ক গ্রুপিংটি বিধ্বস্ত করতে সক্ষম হয় নি, তা সত্ত্বেও তারা কিন্তু মস্কো অভিমুখে জার্মান বাহিনীসমূহের 'সেণ্টার' গ্রুপটির অভিযান রোধ করে দেয় এবং ২০শ ও ১৬শ বাহিনীগুলোকে অবরোধ বেষ্টনী ভেদ করে প্রধান শক্তিগুলো সমেত নীপারের অপর তীরে সরে যেতে সাহায্য করে।

৩০ জুলাই জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী প্রতিরক্ষা কার্যে লিপ্ত হওয়ার এবং 'সেণ্টার' গ্রুপের পার্শ্বদেশগুলোর প্রতি সোভিয়েত সৈন্যদের দ্বারা সৃষ্ট হুমকি দূরীকরণ অবধি মস্কো অভিমুখে আক্রমণাভিযান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। ১১ আগস্ট গাল্‌ডের তার ডায়েরিতে লিখে রাখে: 'সামূহিক পরিস্থিতি ক্রমশই অধিকতর প্রত্যক্ষ ও স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে যে মহাশক্তিমান রাশিয়ার উপর... আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করি নি। একই কথা বলা যায় সমস্ত অর্থনৈতিক ও সাংগঠনিক দিক সম্পর্কে, যোগাযোগ মাধ্যম সম্পর্কে এবং বিশেষত স্রেফ সামরিক দিকগুলো সম্পর্কে।'*

স্মোলেন্স্কের লড়াইয়ের তৃতীয় পর্যায়ে (৮ থেকে ২১ আগস্ট পর্যন্ত) সামরিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রস্থল স্থানান্তরিত হয়েছিল দক্ষিণ দিকে। ৮ আগস্ট কেন্দ্রীয় ফ্রন্টের** বিরুদ্ধে আক্রমণাভিযান আরম্ভ করে জার্মানদের

২য় ফিল্ড আর্মি ও ২য় ট্যাঙ্ক গ্রুপের সৈন্যরা। বিপুল ক্ষয়ক্ষতির মূল্যে তারা সোভিয়েত সৈন্যদের দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করতে এবং ২১ আগস্ট নাগাদ ১২০-১৪০ কিলোমিটার অগ্রসর হয়ে গোমেল ও স্তারোদুব যুদ্ধ-সীমায় পৌঁছে যেতে সমর্থ হয়। এভাবে নাৎসিরা ব্রিয়ানস্ক* ফ্রন্ট ও কেন্দ্রীয় ফ্রন্টের মধ্যবর্তী অঞ্চলের গভীরে ঢুকে পড়ে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের পার্শ্বদেশ ও পশ্চাদ্ভাগের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে।

পশ্চিম ফ্রন্টের সৈন্যরা এবং রিজার্ভ ফ্রন্টের শক্তিসমূহের একাংশ ১৬ আগস্ট শত্রুর দুখোভশিনা ও ইয়েল্নিয়া গ্রুপিংটিকে বিধ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে আক্রমণাভিযান শুরু করে। এই আক্রমণাভিযানটি যদিও সম্প্রসারিত হয় নি তা সত্ত্বেও সোভিয়েত সৈন্যরা ইয়েলনিয়ার উপকণ্ঠের লড়াইয়ে শত্রুর সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা লাইনটি ভেদ করে দিয়ে নাৎসিদের শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেছিল।

স্মোলেন্স্কের লড়াইয়ের চতুর্থ পর্যায়ে (২২ আগস্ট থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী 'সেণ্টার' গ্রুপটিকে পরাস্ত করার এবং দক্ষিণ অভিমুখে, দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের পশ্চাদ্ভাগে তার আক্রমণাভিযান ব্যর্থ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই পর্যায়ে শত্রুর ইয়েল্নিয়া গ্রুপিংটি বিধ্বস্তকরণের কাজ সমাপ্ত হয়, আর ব্রিয়ানস্ক ফ্রন্টের এলাকায় ৪৬০টি আক্রমণকারী বিমান ও বোমারুর অংশগ্রহণে একটি এয়ার অপারেশন পরিচালিত হয়, যার ফলে জার্মানদের ২য় ট্যাঙ্ক গ্রুপটির প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়।

স্মোলেন্স্কের উপকণ্ঠে পশ্চিম ফ্রন্টের সৈন্যরা ১ সেপ্টেম্বর আবার আক্রমণাভিযান আরম্ভ করে, কিন্তু তা সফল হয় নি।

১০ সেপ্টেম্বর পশ্চিমাভিমুখে যুদ্ধরত সোভিয়েত সৈন্যরা সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর সদর-দপ্তরের নির্দেশে প্রতিরক্ষা কার্যে লিপ্ত হয়।

৬৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ২৫০ কিলোমিটার অবধি গভীর রণাঙ্গন জুড়ে চলা স্মোলেন্স্কের লড়াইয়ে সোভিয়েত বাহিনীগুলো শত্রুকে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং মস্কো অভিমুখে নাৎসিদের অবাধ অগ্রগতির আশা ভঙ্গ করে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সেই প্রথম বারের মতো জার্মান-ফ্যাসিস্ট

* গঠিত হয়েছিল ১৯৪১ সালের ১৬ আগস্ট রিজার্ভ ও কেন্দ্রীয় ফ্রন্টগুলোর মধ্যবর্তী অঞ্চলে ব্রিয়ান্স্ক অভিমুখটি রক্ষার উদ্দেশ্যে।

বাহিনীগুলো প্রধান অভিমুখে আক্রমণাভিযান বন্ধ করে আত্মরক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিল। সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী মস্কোর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তুতির জন্য এবং পরে মস্কোর উপকণ্ঠের লড়াইয়ে জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে পর্যুদস্ত করার জন্য সময় পেলেন।

স্মোলেন্‌স্কের লড়াইয়ে সোভিয়েত সৈন্যরা বিপুল বীরত্ব, সাহসিকতা ও সামরিক নিপুণতার পরিচয় দেয়। সবচেয়ে ভালো ইউনিটসমূহ সেই সর্বপ্রথম রক্ষীর (Guards) খেতাব লাভ করেছিল।

জার্মান জেনারেলরাই স্বীকার করেছিল যে স্মোলেন্‌স্কের লড়াইয়ে নাৎসিরা আড়াই লক্ষ সৈনিক আর অফিসারকে হারায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল গেওর্গি জুকোভ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'সর্বোচ্চ সদর-দপ্তরের পরিকল্পনা মতো শত্রুকে বিধ্বস্ত করা না গেলেও তার আক্রমণকারী গ্রুপিংগুলোকে কিন্তু ভীষণ নাজেহাল করে দেওয়া হয়েছিল।*

১৯৪১ সালের ২২ জুলাই জার্মান বিমান বাহিনী প্রথম বার মস্কোর উপর হামলা করে। তাতে অংশগ্রহণ করে ২৫০টি বোমারু। সুসংগঠিত বিমানবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কল্যাণে কেবল সামান্য কয়েকটি বিমানই সোভিয়েত রাজধানীর কাছে ঘেঁষতে পেরেছিল। ওগুলো বিশেষ কোন ক্ষতি করে নি। সোভিয়েত ফাইটারগুলো ১২টি জার্মান বিমান ভূপাতিত করে, আর বিমানবিরোধী কামান চালকরা ধ্বংস করে ১০টি।

৩। লেনিনগ্রাদ, কিয়েভ, ওদেসা ও সেভাস্তপোলের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা

বাহিনীসমূহের 'সেণ্টার' গ্রুপটি যে-সময় স্মোলেন্‌স্ক অভিমুখে সোভিয়েত সৈন্যদের প্রতিঘাত প্রতিহত করছিল, তখন বাহিনীসমূহের 'উত্তর' গ্রুপটি লেনিনগ্রাদ দখল করতে চেষ্টা করছিল, আর বাহিনীসমূহের 'দক্ষিণ' গ্রুপটি প্রথমে কিয়েভ এবং পরে ওদেসা নেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল।

লুগা প্রতিরক্ষা লাইন ভেদ করার পর শত্রু সৈন্যরা ৮ থেকে ১২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে লেনিনগ্রাদের একেবারে নিকটস্থ প্রবেশ পথগুলোর কাছে পেঁছে যায়, এবং শ্লিসেলবুর্গ দখল করে নিয়ে স্থলপথে শহরটি অবরোধ করে ফেলে। পরে শহরে ঢোকার জন্য এবং পূর্ব দিক থেকে তাকে ঘিরে

ফেলে ফিনিশ বাহিনীগুলোর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য শত্রুর সমস্ত প্রচেষ্টাই লেনিনগ্রাদ ফ্রন্টের সৈন্যরা ও বল্টিক নৌ-বহর ব্যর্থ করে দেয়। এ কাজে শহরের বাসিন্দারাও সক্রিয় সহায়তা জোগায়। কিন্তু শহরের অবস্থা ছিল খুবই সংকটজনক। লেনিনগ্রাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছিল কেবল লাদোগা হ্রদের মাধ্যমে এবং বিমান পথে। এতে লেনিনগ্রাদের প্রতিরক্ষা কাজ অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠে, কেননা এই পথ দিয়ে সৈন্যদের ও শহরের বাসিন্দাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুর জোগান দেওয়া সম্ভব ছিল না। ৪ সেপ্টেম্বর থেকে নাৎসিরা তসনো অঞ্চল থেকে লেনিনগ্রাদের উপর ভারি তোপ দাগতে আরম্ভ করলে অবস্থা আরও বেশি সঙ্গিন হয়ে ওঠে।

শহরের বীর রক্ষকদের সহায়তায় এগিয়ে আসে সারা দেশ। কেবল ১০ জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কাল পর্যায়ের মধ্যে লেনিনগ্রাদের উপকণ্ঠবর্তী অঞ্চলে প্রেরিত হয় অতিরিক্ত ১৭টি ইনফেণ্ট্রি ও ৩টি অশ্বারোহী ডিভিশন। জার্মান-ফ্যাসিস্ট সৈন্যরা তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারল না — অর্থাৎ বিপ্লবের জন্মভূমি লেনিনগ্রাদ দখল করতে ও ফিনিশ ফৌজের সঙ্গে মিলিত হতে পারল না। সেপ্টেম্বরের শেষ ভাগে লেনিনগ্রাদের উত্তর ও দক্ষিণ উপকণ্ঠের ফ্রণ্টে সুস্থিরতা এল। অসাধারণ শৌর্য আর সাহসিকতার অধিকারী সোভিয়েত সৈন্যরা বাসিন্দাদের আত্মোৎসর্গী সহায়তায় কঠোর প্রতিরক্ষামূলক লড়াইয়ে নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলীর লেনিনগ্রাদ অধিকার করার পরিকল্পনাটি বানচাল করে দেয়।

উত্তর-পশ্চিম অভিমুখের বাহিনীগুলো যে-সময় লেনিনগ্রাদের উপর শত্রুর প্রবল আক্রমণ প্রতিহত করছিল, তখন দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্ট কিয়েভ অভিমুখে জার্মান-ফ্যাসিস্ট সৈন্যদের ক্ষিপ্ত আক্রমণের মোকাবেলা করছিল। হিটলার হুকুম দিল — ৮ আগস্ট কিয়েভ দখল করে সেই দিনই ক্রেশাতিকে (শহরের প্রধান অ্যাভেনিউতে) মিলিটারি প্যারেডের আয়োজন করতে হবে। কিন্তু এই হুকুম তামিল করা হয় নি। অল্প কালের মধ্যে কিয়েভ দৃঢ় প্রতিরক্ষা ঘাঁটিতে পরিণত হয়। দুই মাসাধিক কাল চলে কঠোর লড়াই। লেনিনগ্রাদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষার মতো কিয়েভের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষাও হিটলারের 'ব্লিট্সক্রিগ' পরিকল্পনা ব্যর্থকরণে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। কিয়েভের রক্ষকরা তাদের পৌরুষ ও পারদর্শিতার দ্বারা 'দক্ষিণ' গ্রুপের শক্তিসমূহের বড় একটি অংশকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে ব্যস্ত

রাখে। এ ছাড়া, কিয়েভের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলীকে 'সেণ্টার' গ্রুপের শক্তির একাংশকে দক্ষিণাভিমুখে পাঠাতে বাধ্য করে। ইউক্রেনের রাজধানী প্রতিরক্ষায় সৈন্যদের অনেক সাহায্য করেছিল জন স্বেচ্ছা-বাহিনীগুলো।

শত্রু একাধিক বার পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক থেকে আঘাত হেনে কিয়েভ দখল করার এবং প্রতিরক্ষারত সোভিয়েত বাহিনীগুলোকে ঘিরে ফেলে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। বিপুল ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে সে শহরে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছিল। ১৯ সেপ্টেম্বর ৩৭তম বাহিনীর সৈন্যরা সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর সদর-দপ্তরের নির্দেশে কিয়েভ ত্যাগ করে পূর্বাভিমুখে সরে পড়ে।

কিয়েভের প্রতিরক্ষা চলে ৭১ দিন। তা চলাকালে জার্মান-ফ্যাসিস্ট সৈন্যরা জুলাই ও আগস্ট মাসে এতদঞ্চলে নীপার নদীর বাঁ তীরে পাড়ি জমাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ২০টি ডিভিশন নিয়ে গঠিত শক্তিশালী একটি জার্মান গ্রুপিংকে বেশকিছু কালের জন্য ইউক্রেনের রাজধানী অঞ্চলে আটকে রাখা হয়। জার্মানদের ১ম ট্যাঙ্ক গ্রুপটিও দু'সপ্তাহের জন্য আটকে পড়েছিল।

'বিদ্যুৎগতি যুদ্ধের' জার্মান-ফ্যাসিস্ট পরিকল্পনাটি ভণ্ডুল করে দেওয়ার কাজে ওদেসার বীরত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষাও বৃহৎ এক ভূমিকা পালন করে। নাৎসিরা এই শহরটি দখলের উপর বিপুল গুরুত্ব আরোপ করেছিল। তা ছিল কৃষ্ণ সাগরীয় নৌ-বহরের অন্যতম সামরিক নৌ-ঘাঁটি, যা ক্রিমিয়ার প্রবেশ পথগুলো রক্ষা করছিল। সেই জন্যই ওদেসার উদ্দেশে প্রেরিত হয়েছিল বৃহৎ এক শক্তি — জার্মান ইনফেণ্ট্রি ও ট্যাঙ্ক ইউনিটগুলোর দ্বারা শক্তিশালীকৃত ৪র্থ রুমানীয় বাহিনীটি। তাতে ছিল ২০টিরও বেশি ডিভিশন। কয়েক দিনের মধ্যে শহরটি অধিকার করে নেওয়ার আশায় দুশমন ৮ আগস্ট আক্রমণাভিযান আরম্ভ করে।

ওদেসা প্রতিরক্ষা করছিল চারটি ডিভিশন নিয়ে গঠিত উপকূলীয় বাহিনী এবং কৃষ্ণ সাগরীয় নৌ-বহর। তাছাড়া শত্রুর সঙ্গে সক্রিয় সংগ্রামে শহরবাসীরাও অংশ নিয়েছিল। ওদেসার বীর রক্ষকরা ৬০ দিন ধরে শত্রুর প্রবল আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখে, তারা নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলীকে এখানে যুদ্ধরত জার্মান ফৌজকে রণাঙ্গনের অন্যান্য এলাকায় পাঠানোর সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। শত্রু সুদীর্ঘ কালের জন্য শহরের লড়াইয়ে কেবল আটকা পড়েই যায় নি, জনবলে এবং অস্ত্রবলে অনেক ক্ষয়ক্ষতিও সহ্য করে।

ওদেসা অঞ্চলে প্রতিরক্ষারত সোভিয়েত সৈন্যদের অবস্থা দৃঢ়-মজবুত ছিল। কিন্তু সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের অন্যান্য এলাকায় শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠনের স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্ট্র্যাটেজিক ব্যাপারাদির কথা ভেবে সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী শহর থেকে সৈন্য অপসারণ করতে বাধ্য হন। কৃষ্ণ সাগরীয় নৌ-বহরের প্রধান ঘাঁটি সেভাস্তপোলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণের প্রয়োজনে ১৯৪১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর সদর-দপ্তর ওদেসা থেকে ক্রিমিয়ায় ফৌজ উদ্বাসনের সিদ্ধান্ত নেয়। ওই সময় নাগাদ সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের বৃহত্তর অংশেই অবস্থা সুস্থির হয়ে ওঠে। লেনিনগ্রাদের উপকণ্ঠে, স্মোলেন্স্কের পূর্বে ও নীপারের নিম্নাঞ্চলে জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজগুলোকে রুখে দেওয়া হয়েছিল। কেবল খারকভ ও রস্তভ অভিমুখে তাদের আক্রমণাভিযান অব্যাহত থাকে।

১৯৪১ সালের ৩০ অক্টোবর থেকে শুরু হয় কৃষ্ণ সাগর তীরস্থ বৃহৎ বন্দর এবং প্রধান সামরিক নৌ-ঘাঁটি সেভাস্তপোলের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা। তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠছিল ১৯৪১ সালের জুলাই থেকে। তাতে ছিল তিনটি আত্মরক্ষা লাইন: অগ্রবর্তী লাইন, প্রধান লাইন ও পশ্চাদ্ভাগস্থ লাইন, যেগুলোর নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয় নি। গ্যারিসনে ছিল প্রায় ২৩ হাজার লোক এবং ১৫০টির মতো ফিল্ড ও কোস্ট কামান। সমুদ্রের দিকে প্রতিরক্ষা কার্যে লিপ্ত ছিল কোস্ট আর্টিলারি ও কৃষ্ণ সাগরীয় নৌ-বহর। সেভাস্তপোলের উপর আক্রমণ চালাচ্ছিল ১১শ জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনী। গতিতে থেকে তার শহর দখলের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। সেভাস্তপোলের রক্ষকরা অদৃষ্টপূর্ব দৃঢ়তা ও বীরত্বের পরিচয় দেয়। শহরের রক্ষকদের ভালো নেতৃত্বদানের উদ্দেশ্যে ৪ নভেম্বর গঠিত হয়েছিল সেভাস্তপোলের প্রতিরক্ষা অঞ্চল, যাতে অন্তর্ভুক্ত হয় স্থল বাহিনী ও নৌ-শক্তি, আর ৯ নভেম্বরের পর উপকূলীয় বাহিনীও যার অধিনায়ক ছিলেন মেজর-জেনারেল ই. পেত্রোভ। সেভাস্তপোলের প্রতিরক্ষা অঞ্চলের সেনাপতির দায়িত্বভার অর্পিত হয় কৃষ্ণ সাগরীয় নৌ-বহরের অধিনায়ক ভাইস-অ্যাডমিরাল ফ. ওক্তিয়াবর্স্কির উপর।

সেভাস্তপোলের আট মাস ব্যাপী প্রতিরক্ষার ফলে শত্রুর বৃহৎ শক্তি এখানে আটকা পড়ে যায় এবং এর বড় একটি অংশকে ধ্বংস করে দিয়ে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের দক্ষিণ পার্শ্বে জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের আক্রমণাভিযানের গতির হ্রাস ঘটানো হয়। এখানে জার্মানদের

হতাহতের সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ। সেভাস্তপোলের প্রতিরক্ষার বৈশিষ্ট্য হল নৌ-বহর ও বিমান বাহিনীর সঙ্গে স্থলসেনার ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক সহযোগিতা, যেটা সম্ভব হয়েছিল এক সেনাপতিমণ্ডলী গঠন এবং সুদক্ষ পরিচালনা ব্যবস্থা সংগঠনের কল্যাণে। এই শহরের প্রতিরক্ষা কালে সোভিয়েত যোদ্ধাদের বিপুল বীরত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল।

লেনিনগ্রাদ, কিয়েভ, ওদেসা ও সেভাস্তপোলের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষার কাহিনী দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

৪। মস্কোর উপকণ্ঠের লড়াই
(১৯৪১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর — ১৯৪২ সালের ২০ এপ্রিল)

যে-সমস্ত বড় বড় লড়াই জার্মান-ফ্যাসিস্ট সৈন্য বাহিনীর নিপাত পূর্বনিরূপিত করেছিল তার মধ্যে একটি প্রধান ছিল মস্কোর উপকণ্ঠস্থ প্রান্তরগুলোতে সংঘটিত লড়াই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে নাৎসি বাহিনীর প্রথম বড় পরাজয়, ওই কঠিন ও কঠোর সময়ে সোভিয়েত জনগণ ও তার সশস্ত্র বাহিনী অর্জিত প্রথম বড় বিজয় যুদ্ধের গতিতে আমূল পরিবর্তনের সূচনা করে। মস্কোর উপকণ্ঠের লড়াইয়ে উভয় পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করে ২০ লক্ষাধিক লোক, প্রায় ৩ হাজার ট্যাঙ্ক, ২ হাজারের মতো বিমান এবং ২৫ সহস্রাধিক তোপ আর মর্টার কামান। এই বৃহৎ লড়াইয়ে সোভিয়েত যোদ্ধারা প্রদর্শন করে বীরত্ব, মাতৃভূমির প্রতি নিঃস্বার্থ আনুগত্য আর সোভিয়েত সমর কৌশল উত্তীর্ণ হয় দুরূহ এক পরীক্ষায়, — অসমান সংগ্রামের জটিল পরিস্থিতিতে তা ফ্যাসিস্ট জার্মানির যুদ্ধ কৌশলের বিরুদ্ধে নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত করে।

মস্কোর উপকণ্ঠের লড়াই শুরু হয় ও চলে লাল ফৌজের পক্ষে যারপরনাই জটিল পরিস্থিতিতে। সোভিয়েত দেশকে গ্রাস করতে উদ্যত শত্রুর সংখ্যাগরিষ্ঠ, প্রবলতর বাহিনীগুলোর সঙ্গে কঠোর লড়াইয়ে সোভিয়েত সৈন্যরা প্রচুর জনবল, অস্ত্রশস্ত্র আর সামরিক সাজসরঞ্জাম হারায়। দুশমন দেশের ভূখণ্ডের বড় একটি অংশ দখল করে নেয়, লেনিনগ্রাদ অবরোধ করে ফেলে, খারকভের দিকে, দনবাস কয়লাঞ্চল ও ক্রিমিয়ার দিকে ধাবিত হয়। কাঁচামালের উৎস ও শিল্প ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য, লাল ফৌজের নতুন নতুন ইউনিট আর ফর্ম্যাশন গঠনের জন্য, শত্রুর

পশ্চাদ্ভাগে পার্টিজান আন্দোলনের প্রবলতা বৃদ্ধির জন্য পার্টি ও সরকার চূড়ান্ত ব্যবস্থাদি অবলম্বন করেন।

সীমান্তবর্তী অঞ্চলের লড়াইয়েই, লেনিনগ্রাদ, স্মোলেন্স্ক আর কিয়েভের উপকণ্ঠের লড়াইগুলোতেই লাল ফৌজ শত্রুর অগ্রগতি রোধ করতে এবং তার যথেষ্ট শক্তি নষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল। জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলীর পরিকল্পনা — শীতের আগে লেনিনগ্রাদ এবং দক্ষিণের তৈল সমৃদ্ধ অঞ্চলসমূহ দখলের পরিকল্পনা — ভেস্তে গেল। ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে জার্মান বাহিনীগুলো অবস্থিত ছিল ভল্‌খভ নদী, ইলমেন হ্রদ, রস্লাভল, পল্‌তাভা ও জাপরোঝিয়ে যুদ্ধ-সীমায়। বিশাল সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের দক্ষিণ ও উত্তরের ক্ষেত্রসমূহে প্রধান কর্তব্যগুলো পূরণ না করে হিটলারের সেনাপতিমণ্ডলী মস্কো অধিকারের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় অভিমুখে আসল প্রয়াস নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিল।

রাজনৈতিক ও রণনৈতিক পরিকল্পনায় মস্কোর বিপুল তাৎপর্য নাৎসিরা বুঝতে পেরেছিল। সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহের জন্য মস্কো স্পষ্টত মূর্ত করেছিল দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশকে, যে-দেশ ফ্যাসিজমের সঙ্গে পবিত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। মস্কো ছিল দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের সংগঠনকারী কেন্দ্র। সোভিয়েত রাজধানীতে ছিল বৃহৎ সংখ্যক প্রতিরক্ষা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান। মস্কো ছিল দেশে রেলপথ ও মোটর সড়কের সর্ববৃহৎ সঙ্গম স্থল। তা দখল করতে পারলে দেশের অভ্যন্তর ভাগের সঙ্গে বারেনৎস সাগর থেকে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে সক্রিয় রণাঙ্গনগুলোর আর নৌ-বহরসমূহের যোগাযোগ মারাত্মকভাবে ছিন্ন হয়ে যেত।

মস্কো দখলের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজে হাত দিয়ে হিটলার তার সৈন্যদের উদ্দেশে প্রচারিত এক আবেদন-পত্রে লিখেছিল: 'সৈনিকগণ! তোমাদের সামনে মস্কো নগরী! দু' বছরের মধ্যে মহাদেশের সমস্ত রাজধানী তোমাদের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে, তোমরা সেরা শহরসমূহের রাস্তাগুলো দিয়ে মার্চ করে গেছ। বাকি রইল মস্কো। তাকে মস্তক অবনত করতে বাধ্য করো, তাকে দেখিয়ে দাও তোমাদের অস্ত্রের শক্তি, তার চকগুলোর উপর দিয়ে হেঁটে যাও। মস্কো — এ হচ্ছে যুদ্ধের শেষ। মস্কো — এ হচ্ছে বিশ্রাম। এগিয়ে যাও!'

'আজ যেখানে মস্কো নগরী, — ঘোষণা করে হিটলার, — সেখানে

নির্মিত হবে বিশাল এক সমুদ্র যা রুশ জাতির রাজধানীকে সভ্য জগৎ থেকে চিরতরে বিলুপ্ত করে দেবে।'* নতুন জার্মান-ফ্যাসিস্ট আক্রমণাভিযানের ('টাইফুন' অপারেশন) লক্ষ্য ছিল — সোভিয়েত প্রতিরক্ষা লাইন ছিন্নবিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে, ভিয়াজমা, গ্জাত্স্ক ও ব্রিয়ানস্ক অঞ্চলে পশ্চিম, রিজার্ভ আর ব্রিয়ানস্ক ফ্রন্টসমূহের সৈন্যদের ঘিরে ফেলা ও ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে দুখোভশিনা, রস্লাভল আর শস্ত্কা অঞ্চলগুলো থেকে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব অভিমুখে তিনটি ফিল্ড আর্মির (৯ম, ৪র্থ ও ২য়) এবং তিনটি ট্যাঙ্ক গ্রুপের (৩য়, ৪র্থ ও ২য়) শক্তি দিয়ে প্রবল আঘাত হানা। পরে ইনফেণ্ট্রি ফর্ম্যাশনগুলোর দ্বারা ফ্রন্ট দিক থেকে মস্কো অভিমুখে অভিযানের প্রবলতা বৃদ্ধি করার এবং মোবাইল ফর্ম্যাশনগুলোর দ্বারা উত্তর ও দক্ষিণ থেকে তাকে ঘিরে ফেলে সোভিয়েত রাজধানী দখল করার কথা ছিল।

জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী আক্রমণাভিযানের জন্য জোর প্রস্তুতি চালায়। রাজধানী প্রতিরক্ষারত সোভিয়েত সৈন্যদের বিরুদ্ধে তারা খাড়া করে বাছাই-করা বিপুল শক্তি: রণাঙ্গনে যুদ্ধরত সমস্ত ফৌজের দুই-পঞ্চমাংশেরও বেশি লোক, তিন-চতুর্থাংশ ট্যাঙ্ক, প্রায় অর্ধেক সংখ্যক তোপ ও মর্টার কামান, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বিমান।

মস্কো দখল করতে উদ্যত গ্রুপিংটিতে ছিল ৭৪টি ডিভিশন, তার মধ্যে ১৪টি ট্যাঙ্ক ও ৮টি মোটোরাইজ্‌ড ডিভিশন। ১৮ লক্ষাধিক সৈন্য, ১,৭০০ ট্যাঙ্ক, ১৪ সহস্রাধিক তোপ ও মর্টার কামান মস্কোর উপর — নাৎসিদের হিসাবানুযায়ী — অপ্রতিরোধ্য আঘাত হানার জন্য তৈরি হচ্ছিল। আকাশ থেকে স্থল বাহিনীকে সাহায্য করছিল ২য় বিমান বহরের ১,৩৯০টি বিমান।

৭৫০ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে অবস্থিত শত্রুর গ্রুপিংয়ের বিরুদ্ধে ছিল এই ফ্রন্টগুলো: পশ্চিম ফ্রন্ট (অধিনায়ক জেনারেল ই. কনেভ), রিজার্ভ ফ্রন্ট (অধিনায়ক মার্শাল স. বুদিওন্নি), ব্রিয়ানস্ক ফ্রন্ট (অধিনায়ক জেনারেল আ. ইয়েরেমেঙ্কো)। ফ্রন্টসমূহের ফৌজগুলোতে ছিল প্রায় সাড়ে ১২ লক্ষ লোক (৯৫টি ডিভিশন), ৭,৬০০ তোপ ও মর্টার কামান, ৯৯০টি ট্যাঙ্ক, ৬৭৭টি বিমান (বেশির ভাগই পুরনো ডিজাইনের)। শত্রু

* Offiziere gegen Hitler. Nach einem Erlebnisbericht von Fabian von Schlabrendorf. — Zürich, 1946, S. 48.

সব ক্ষেত্রেই সোভিয়েত ফৌজকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল: জনবলে ১·৪ গুণ, ট্যাঙ্কে ১·৭ গুণ, তোপ আর মর্টার কামানে ১·৮ গুণ, বিমানে ২ গুণ।

সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর সদর-দপ্তর পরিস্থিতি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেয়: আগে থেকে প্রস্তুত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপর এবং শত্রুর সম্ভাব্য আঘাতের দিকসমূহে ফৌজের গভীর অবস্থিতির উপর নির্ভর করে সোভিয়েত প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করতে না দেওয়া, শত্রুকে নাস্তানাবুদ করে তার বিপুল ক্ষতি সাধন করা, সময় নেওয়া এবং চূড়ান্ত প্রতিআক্রমণ আরম্ভ করার জন্য অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে তোলা।

এই উদ্দেশ্যে রণাঙ্গনের পশ্চিম এলাকায় সমাবেশিত হয়েছিল সংগ্রামরত সৈন্য বাহিনীর স্থলসেনার ৪০ শতাংশাধিক ফর্ম্যাশন, রাজধানীর নিকটতম অঞ্চলগুলোতে মোট ১০০ কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত গঠিত হয়েছিল চারটি প্রতিরক্ষা লাইন ও মস্কো প্রতিরক্ষা এলাকা। আর মস্কো প্রতিরক্ষা এলাকাতে ছিল একটি সরবরাহ এলাকা ও দুটি আত্মরক্ষা লাইন: প্রধান (মস্কোর উপকণ্ঠস্থ) আত্মরক্ষা লাইন ও শহরের আত্মরক্ষা লাইন। এখানে আনা হয় সর্বোচ্চ সদর-দপ্তরের প্রধান রিজার্ভগুলো।

সর্বোচ্চ সদর-দপ্তর বিশেষ মনোযোগ দেয় রাজধানীর বিমানবিরোধী প্রতিরক্ষার দিকে। এ দায়িত্বটি অর্পিত হয়েছিল বিমানবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ১ম ও ৬ষ্ঠ ফাইটার কোরগুলোর উপর। এই সমস্ত কোরের কাছে ছিল সহস্রাধিক বিমানধ্বংসী কামান, প্রায় ৭০০টি ফাইটার প্লেন, ৬১৮টি সার্চ-লাইট, ৭০২টি বিমান নিরীক্ষণ কেন্দ্র ও অন্যান্য সামরিক সাজসরঞ্জাম। বিমানবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার এরূপ উপায়সমূহের সাহায্যে যেকোন দিক ও উচ্চতা থেকে শত্রুর বিমান হামলা প্রতিহত করা যেত।

প্রতিরক্ষামূলক লড়াইয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের আক্রমণাভিযান আরম্ভ হয়েছিল ৩০ সেপ্টেম্বর — ব্রিয়ানস্ক ফ্রন্টের সৈন্যদের উপর বাহিনীসমূহের 'সেণ্টার' গ্রুপের ডান পার্শ্বের ট্যাঙ্ক ফর্ম্যাশনগুলোর আঘাত দিয়ে। ২ অক্টোবর আক্রমণাভিযানে লিপ্ত হয় নাৎসিদের মুখ্য শক্তিসমূহ। কয়েকটি জায়গায় আত্মরক্ষা লাইন ভেদ করে শত্রুর আক্রমণকারী গ্রুপিংগুলো সোভিয়েত

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অভ্যন্তর ভাগ অভিমুখে ধাবিত হয়। ব্রিয়ানস্ক অঞ্চলে ও ভিয়াজমার পশ্চিমে কঠোর লড়াই চলাকালে জার্মানরা ৫ অক্টোবর নাগাদ ব্রিয়ানস্ক, পশ্চিম ও রিজার্ভ ফ্রন্টসমূহের বাহিনীগুলোর একাংশকে ঘিরে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল।

সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলীর হাতে আর কোন রিজার্ভ নেই মনে করে জার্মান বাহিনীসমূহের 'সেণ্টার' গ্রুপের সদর-দপ্তর ১৪ অক্টোবর ৪র্থ ট্যাঙ্ক গ্রুপ ও ৪র্থ বাহিনীকে এই নির্দেশ দিল: 'অবিলম্বে মস্কো অভিমুখে আঘাত হানতে হবে, মস্কোর সামনে অবস্থিত শত্রু সৈন্যকে বিধ্বস্ত করতে হবে... এবং শহরটি ভালো করে ঘিরে ফেলতে হবে।'

সোভিয়েত দেশের পক্ষে কঠোর ওই দিনগুলোতে কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকার সমগ্র সোভিয়েত জনগণকে রাজধানী রক্ষার কাজে উৎসাহিত করেন। ভয়ংকর শত্রুকে থামানোর উদ্দেশ্যে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলী জরুরী কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

অক্টোবর মাসের গোড়াতেই মজাইস্ক লাইনে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে তোলা হয়েছিল। ১০ অক্টোবর পশ্চিম ও রিজার্ভ ফ্রন্ট দুটির ফৌজগুলোকে পশ্চিম ফ্রন্টে একত্রিত করা হয়। ফ্রন্টটির অধিনায়ক নিযুক্ত হলেন জেনারেল গেওর্গি জুকোভ, যাঁকে লেনিনগ্রাদ ফ্রন্ট থেকে ডেকে আনা হয়েছিল। মজাইস্ক লাইনে জরুরীভাবে প্রেরিত হচ্ছিল উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টগুলোর সৈন্যরা, ওখানে আসছিল দূর প্রাচ্যের ডিভিশনগুলো। দেশের সমস্ত প্রজাতন্ত্র থেকে ওই সময়ের পক্ষে রেকর্ড গতিতে মস্কোর দিকে আসছিল সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ বোঝাই ট্রেনগুলো।

কমিউনিস্ট পার্টি আহ্বান দিয়েছিল: 'সমস্তকিছু আমাদের প্রিয় মস্কো রক্ষার্থে!' মস্কোর লড়াইয়ের পুরো সময়টা ধরে রাজধানীতে অবস্থানরত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো, রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি, সোভিয়েত সরকার ও সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর সদর-দপ্তর মস্কো রক্ষার জন্য নতুন শক্তি সমাবেশের উদ্দেশ্যে, তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণের উদ্দেশ্যে ও শহরে নিয়মশৃঙ্খলা সুরক্ষার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল।

রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে মস্কোয় ও শহরতলিগুলোতে ২০ অক্টোবর থেকে অবরোধ অবস্থা ঘোষণা করা হয়, এবং তা রাজধানী প্রতিরক্ষার কাজে নিয়মশৃঙ্খলার মান বৃদ্ধি করে। একই

সঙ্গে রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটির সিদ্ধান্তানুযায়ী মস্কোর নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে দুই যুদ্ধ-সীমা নিয়ে নতুন একটি প্রতিরক্ষা লাইন গঠিত হয়। এই যুদ্ধ-সীমা দু'টির একটি — মস্কো থেকে ১৫-২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত প্রধান যুদ্ধ-সীমা, অন্যটি — বৃত্তাকার রেলপথ বরাবর চলে-যাওয়া শহরের যুদ্ধ-সীমা। মস্কো পরিণত হয় ফ্রণ্ট-লাইন শহরে।

মস্কোর প্রতিরক্ষা এলাকায় ছিল রাজধানীর গ্যারিসন, জন স্বেচ্ছা-বাহিনীর ডিভিশনগুলো এবং সর্বোচ্চ সদর-দপ্তরের রিজার্ভ থেকে আগত সৈন্যরা। সাড়ে চার লক্ষ মস্কোবাসী প্রতিরক্ষামূলক কাজে নিযুক্ত হয়েছিল।

১৩ অক্টোবর মস্কোয় পার্টির সক্রিয় সদস্যদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাতে শহরের কমিউনিস্ট, কমসোমল সদস্য ও মেহনতীদের কাছে এই আবেদন জানানো হয় যে তারা যেন ফ্যাসিস্ট হানাদারদের সঙ্গে নির্মম সংগ্রাম চালিয়ে যায়, শৃঙ্খলা সুদৃঢ় করে, আতঙ্ক-সৃষ্টিকারীদের সঙ্গে, কাপুরুষ আর পলাতকদের সঙ্গে সংগ্রাম জোরদার করে তোলে। শহরে গঠিত হতে থাকে শ্রমিক ব্যাটেলিয়নগুলো, মস্কোর কলকারখানাসমূহে পুরোদমে চলে অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদন।

কয়েক দিনের মধ্যেই গঠিত হয়ে যায় ২৫টি শ্রমিক কোম্পানি আর ব্যাটেলিয়ন, যেগুলোতে তিন-চুতর্থাংশ লোকই ছিল কমিউনিস্ট আর কমসোমল সদস্য। প্রধানত তাদের নিয়ে এবং ফাইটার ব্যাটেলিয়নগুলো নিয়ে গঠিত হয়েছিল জন স্বেচ্ছা-বাহিনীর চারটি নতুন ডিভিশন যাতে ছিল মোট ৩৯ সহস্রাধিক লোক। অক্টোবরের প্রথমার্ধে মস্কো রণাঙ্গনকে অতিরিক্ত ৫০ হাজার যোদ্ধার একটি বাহিনী দিয়েছিল। স্থানীয় বিমানবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যথেষ্ট সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। গঠিত হয়েছিল স্থানীয় বিমানবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ২৫টি ব্যাটেলিয়ন, ৪টি মেরামত-পুনর্নির্মাণকারী রেজিমেণ্ট, স্থানীয় বিমানবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার একটি যুব কমসোমল রেজিমেণ্ট, ৩,৬০০ আত্মরক্ষাকারী গ্রুপ।

মস্কো ছিল ইউরোপীয় রাজধানীগুলোর মধ্যে একমাত্র শহর যা স্থল ও অন্তরীক্ষ থেকে ছিল অগম্য, অজেয়।

অথচ শত্রু এ দিকে মস্কো অভিমুখে ধাবিত হচ্ছিল। জার্মানরা ওরিওল শহর দখল করে তুলা-র কাছে পেঁাছে গিয়েছিল। ১৪ অক্টোবর সোভিয়েত সৈন্যরা কালিনিন শহর পরিত্যাগ করে। মজাইস্ক লাইনে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠনের উদ্দেশ্যে যেকোন উপায়ে শত্রুকে আটকে রাখা

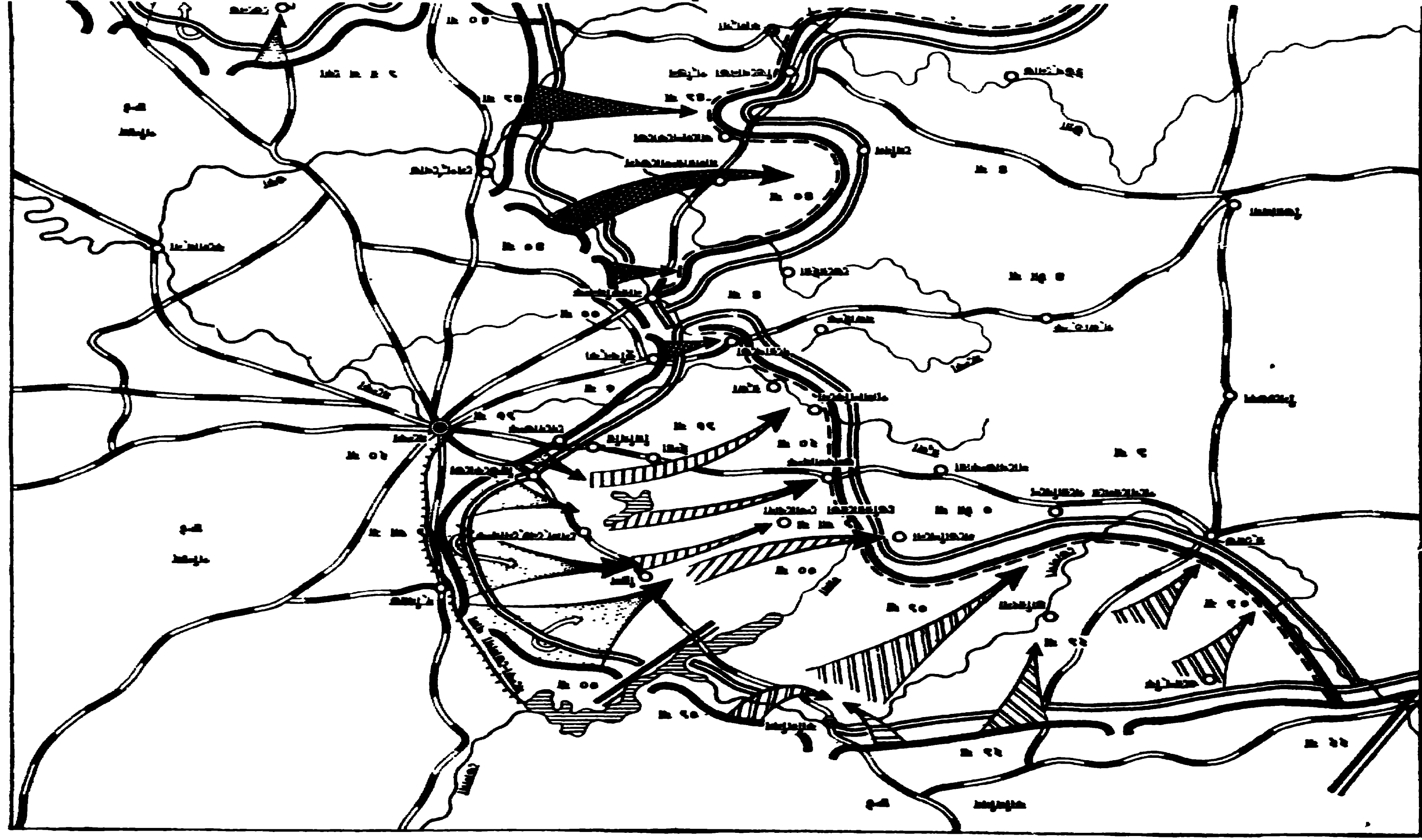
ও সময় লাভ করা প্রয়োজন ছিল। পশ্চিম ফ্রন্টের ডান পার্শ্বের বাহিনীগুলোকে নিয়ে গঠিত হয় কালিনিন ফ্রন্ট যার অধিনায়ক নিযুক্ত হন জেনারেল ই. কনেভ। পশ্চিম ও কালিনিন ফ্রন্ট দু'টির এবং মৎসেনস্ক-ল্গোভ যুদ্ধ-সীমার দিকে হটে-যাওয়া ব্রিয়ানস্ক ফ্রন্টের সৈন্যরা দৃঢ় প্রতিরোধ দিয়ে শত্রুর আক্রমণকারী গ্রুপিংগুলোকে ঠেকিয়ে রাখে। ভিয়াজমার অঞ্চলে পরিবেষ্টিত সোভিয়েত বাহিনীগুলো প্রধান শক্তিসমূহের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য সংগ্রাম অব্যাহত রেখে পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। তারা বাহিনীসমূহের 'সেণ্টার' গ্রুপের ২৮টি ফর্ম্যাশনকে ক্রিয়াকলাপের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে রাখে।

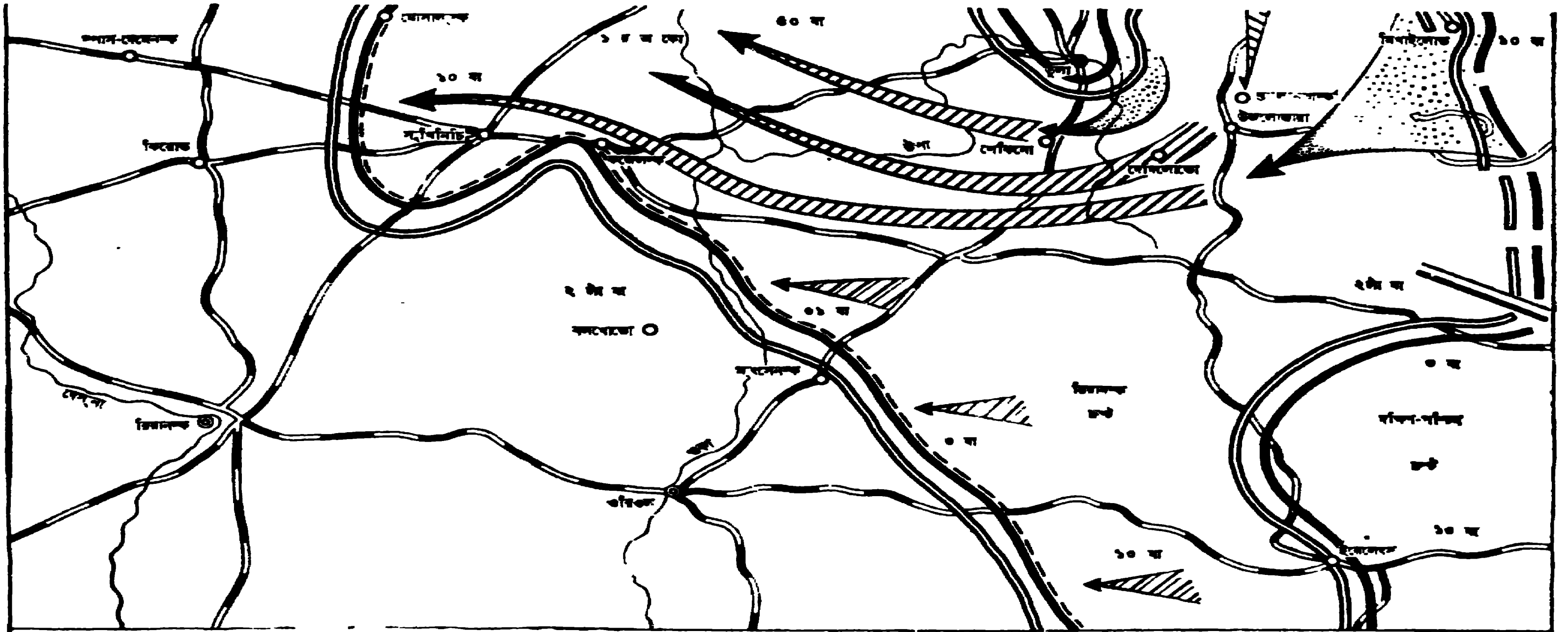
সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ অবলম্বিত ব্যবস্থাদির ফলে জার্মান অগ্রগতি ক্রমশই মন্থর হয়ে আসছিল। অক্টোবরের গোড়াতে নাৎসিদের আক্রমণাভিযানের গতি ছিল দিনে ২৫ কিলোমিটার, কিন্তু মাসের শেষ দিকে তা কমে গিয়ে ২-৩ কিলোমিটারে পৌঁছয়। ৩০ অক্টোবর নাগাদ মজাইস্ক ও ভলকলামস্কের পূর্বে ফ্রন্টটি সুস্থিরতা লাভ করে। মস্কো অভিমুখে প্রথম জার্মান আক্রমণাভিযানটি ব্যর্থ হয়। সোভিয়েত সৈন্যদের সুদৃঢ় প্রতিরক্ষার দরুন শত্রু বেশ দুর্বল হয়ে যায় আর তার আক্রমণকারী গ্রুপিংগুলো প্রশস্ত রণাঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ে। মস্কো অভিমুখে জার্মান আক্রমণে দু'সপ্তাহের বিরতি শুরু হল।

সর্বোচ্চ সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী এই বিরতির পূর্ণ সুযোগ নেন। সৈন্যদের প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাসের কাজ সম্পন্ন করা হয়, তাদের জনবল বৃদ্ধি করে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করা হয়। মস্কোর নিকটবর্তী অঞ্চলগুলোতে বহু যুদ্ধ-সীমা বিশিষ্ট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণের কাজ চলতে থাকে।

৭ নভেম্বর তারিখে মস্কোর রেড স্কোয়ারে সোভিয়েত সৈন্যদের ঐতিহ্যগত প্যারেডের বিপুল রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল। সারা দুনিয়ার মেহনতীরা এই ঘটনাটিকে আপন রাজধানী রক্ষার্থে সোভিয়েত জনগণের অনমনীয় সংকল্পের অভিব্যক্তি, তাদের শক্তির অভিব্যক্তি এবং বিজয়ে তাদের দৃঢ় বিশ্বাসের অভিব্যক্তি হিশেবে দেখে।

নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে সোভিয়েত সৈন্যরা তিখভিন ও রস্তভের কাছে পাল্টা-আক্রমণ আরম্ভ করে। এর উদ্দেশ্য ছিল — ওখানে শত্রুর যুদ্ধরত আক্রমণকারী গ্রুপিংগুলোকে বিধ্বস্ত করা এবং শত্রুকে ওগুলোর





নকশা ৪। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে — ১৯৪২ সালের জানুয়ারির মস্কো অঞ্চলের উপকণ্ঠে সোভিয়েত বাহিনীর পাল্টা-আক্রমণ

সাহায্যে তার 'সেণ্টার' গ্রুপের শক্তি বৃদ্ধি করার সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত করা।

১৫-১৬ নভেম্বর জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনী মস্কো অভিমুখে দ্বিতীয় — এবং এটাই শেষ — আক্রমণাভিযান আরম্ভ করে। ৫১টি ডিভিশন — যার মধ্যে ছিল ১৩টি ট্যাঙ্ক ও ৭টি মোটোরাইজ্‌ড ডিভিশন — নিয়ে গঠিত 'সেণ্টার' গ্রুপের বাহিনীগুলো দু'টি শক্তিশালী আক্রমণকারী গ্রুপিং দিয়ে উত্তর বরাবর — ভলকলামস্ক অঞ্চল থেকে ইয়াখরোমা ও নাগিন্‌স্কের দিকে (৩য় ও ৪র্থ ট্যাঙ্ক গ্রুপ) এবং দক্ষিণ বরাবর — তুলা অঞ্চল থেকে কাশিরা ও নাগিন্‌স্কের দিকে (২য় ট্যাঙ্ক বাহিনী) মস্কোর চারিপাশে এগোনোর এবং সোভিয়েত রাজধানীকে ঘিরে ফেলে এবং একসঙ্গে ফ্রণ্ট দিক থেকে আঘাত হেনে তাকে দখল করে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। ফ্রণ্ট দিক থেকে আক্রমণ চালাচ্ছিল ৪র্থ ফিল্ড আর্মি (১৮টি ডিভিশন)। 'সেণ্টার' গ্রুপের আক্রমণকারী গ্রুপিংগুলোকে সমর্থন জোগানোর দায়িত্ব পড়ে: উত্তর থেকে ৯ম বাহিনীর উপর আর দক্ষিণ থেকে ২য় বাহিনীর উপর।

সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর সদর-দপ্তর যথা সময়ে শত্রুর অবস্থা ও বলশক্তি আবিষ্কার করে তার দূরভিসন্ধি বুঝতে পারে এবং জনবল, ট্যাঙ্ক, আর্টিলারি ও বিমান দিয়ে পশ্চিম ফ্রণ্টটি সুদৃঢ়করণের উদ্দেশ্যে, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার, বিশেষত ট্যাঙ্কবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার, উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে এবং মস্কো অঞ্চলে রিজার্ভগুলো কেন্দ্রীভূত করার ব্যাপারে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এর ফলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অধিকতর দৃঢ় ও স্থায়ী হয়ে ওঠে। কিন্তু জনবলে ও যুদ্ধোপকরণে সাধারণ শ্রেষ্ঠতা তখনও ছিল শত্রুর দিকে: জনবলে প্রায় ২ গুণ, ট্যাঙ্কে ১·৫ গুণ, আর্টিলারিতে ২·৫ গুণ। কেবল বিমানের ক্ষেত্রেই শত্রু সোভিয়েত সৈন্যদের চেয়ে দেড় গুণ পিছিয়ে ছিল।

নাৎসিরা ভেবেছিল যে সোভিয়েত রাজধানীর অবস্থা খুবই নৈরাশ্যজনক এবং নিজেদের সাফল্যে তারা নিশ্চিত ছিল। ক্লিন-সোলনেচ্‌নোগর্স্ক ও স্তালিনোগর্স্ক-কাশিরা অভিমুখে কঠোর লড়াইয়ের পর শত্রু বিপুল ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে শহরের উত্তরে মস্কো-ভোলগা খালে আর ক্রিউকভোয় এবং দক্ষিণ দিক থেকে কাশিরায় পৌঁছতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু সে সোভিয়েত ফ্রণ্ট লাইন ভেদ করতে পারে নি। পশ্চিম ও কালিনিন ফ্রণ্টগুলোর, দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টের ডান পার্শ্বের এবং মস্কো

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সৈন্যরা প্রতিঘাত আর প্রতিআক্রমণের আশ্রয় নিয়ে শত্রুর প্রবল ট্যাঙ্ক হামলার মোকাবেলা করে। এ কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে জেনারেল ক. রকোসভস্কির ১৬শ বাহিনী ও জেনারেল ই. পান্‌ফিলোভের ৩১৬তম ডিভিশনের সৈন্যরা, জেনারেল ল. দভাতোরের অশ্বারোহী সৈনিকরা, কর্নেল ম. কাতুকোভের ১ম রক্ষী ট্যাঙ্ক ব্রিগেড ও অন্যান্য ইউনিটগুলো। সোভিয়েত যোদ্ধারা রাজধানীর নিকটবর্তী রণক্ষেত্রে লড়াই করে মৃত্যুবরণ করে অপরিসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দেয়। ওই দিনগুলোতেই জেনারেল পান্‌ফিলোভের ডিভিশনের বীর সৈনিকরা কোম্পানির রাজনৈতিক নেতা ভ. ক্লচ্‌কোভের পরিচালনাধীনে উপকথাসুলভ এক কীর্তির নজির রাখে। ক্লচ্‌কোভ তখন বলেছিলেন: 'রাশিয়া বিশাল, কিন্তু পিছু-হটার জায়গা নেই, পেছনে মস্কো।' তার এই উক্তিটিতে ব্যক্ত হয়েছিল মস্কোর সমস্ত রক্ষকের, সমস্ত সোভিয়েত স্বদেশপ্রেমিকের অনুভূতি ও চিন্তাভাবনা। এবং ২৮ জন যোদ্ধা ৫০টি জার্মান ট্যাঙ্কের সামনে পিছ-পা হয় নি, তারা ১৮টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করে দেয় এবং শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখে। সোভিয়েত যোদ্ধাদের অটলতা শত্রুকে বিস্মিত ও সন্ত্রস্ত করে দেয়।

ডিসেম্বরের গোড়াতে জার্মানরা নারাফমিনস্ক ও তুলা নিকটস্থ অঞ্চল থেকে মস্কোর কাছে পৌঁছার শেষ প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু সোভিয়েত সৈন্যরা শত্রুর এ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ করে দেয়। ফ্যাসিস্টরা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৫ ডিসেম্বর নাগাদ মস্কো অভিমুখে জার্মান আক্রমণাভিযান সর্বত্র রুখে দেওয়া হয়েছিল। শত্রুর আক্রমণ ক্ষমতা ফুরিয়ে এসেছিল।

নভেম্বর মাসে রাজধানীর মেহনতীরা রণাঙ্গনকে বিপুল সাহায্য জোগায়। খারাপ আবহাওয়ায়, শত্রুর বিমান বাহিনীর বোমাবর্ষণের মধ্যে মস্কোবাসীরা আত্মোৎসর্গী মনোভাব নিয়ে কলকারখানায় কাজ করছিল, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ উৎপাদন করছিল, রাজধানীর নিকটে ও খোদ রাজধানীতে প্রতিরক্ষা লাইন গড়ছিল। মস্কোর বাসিন্দারা পুরো প্রতিরক্ষা পর্বে সর্বমোট ৬৭৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ট্যাঙ্কবিরোধী পরিখা খনন করে, ৪৪৫ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রতিবন্ধক গড়ে, ১,৩০০ কিলোমিটারেরও বেশি দীর্ঘ কাঁটা তারের বেড়া স্থাপন করে, ৩৮০ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত লাইনে কংক্রিটের ট্যাঙ্কবিরোধী প্রতিবন্ধক গড়ে এবং ৩০ সহস্রাধিক গোলাবর্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করে। মস্কোর উপকণ্ঠে ভূপাতিত গাছপালা সৃষ্ট প্রতিবন্ধকের মোট দৈর্ঘ্য ছিল ১,৫২৮ কিলোমিটার। মস্কো জেলায় শত্রুর

পশ্চাদ্ভাগে সক্রিয় ছিল ৪১টি পার্টিজান দল, তারা স্থায়ী ফৌজগুলোকে বিপুল সহায়তা দেয়।

সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী মস্কোর উপকণ্ঠের লড়াইয়ে প্রতিরক্ষামূলক সংগ্রামে জয়ী হয়। সোভিয়েত রাজধানী অভিমুখে কেবল এক দ্বিতীয় আক্রমণাভিযানের সময়ই জার্মানরা হারায় দেড় লক্ষাধিক লোক, প্রায় ৮০০টি ট্যাঙ্ক, প্রায় ৩০০টি কামান ও ১,৫০০টি বিমান। বিমান থেকে বোমাবর্ষণের দ্বারা মস্কো ধ্বংসকরণের নাৎসি পরিকল্পনাটিও বাস্তবায়িত হল না। বিমানবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণের দরুন সুফল মিলল। নভেম্বর মাসে কেবল অল্প সংখ্যক জার্মান বিমানই শহরের সীমানা লঙ্ঘন করতে পেরেছিল। ১৯৪১ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত কালপর্যায়ের মধ্যে মস্কোর বিমানবিরোধী প্রতিরক্ষা বাহিনীর সৈন্যরা শত্রুর ১২২টি বিমান আক্রমণ প্রতিহত করে, — তাতে অংশ নিয়েছিল ৭,১৪৬টি প্লেন। শহরের আকাশ সীমা লঙ্ঘন করে ভেতরে ঢুকতে পেরেছিল কেবল ২২৯টি বিমান, অথবা হামলাগুলোতে অংশগ্রহণকারী সমস্ত বিমানের ৩ শতাংশের সামান্য বেশি।

সোভিয়েত সৈন্যরাও যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনী নাৎসি বাহিনীর মতো দুর্বল হয়ে পড়ে নি, বরং অনেক শক্তিশালীই হয়ে উঠল। দেশের অভ্যন্তর ভাগ থেকে ক্রমশই নতুন নতুন রিজার্ভ আসছিল, পূর্বাঞ্চলগুলো থেকে মস্কো অভিমুখে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা চলছিল অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ বোঝাই ট্রেনগুলো। রণাঙ্গনকে প্রয়োজনীয় সমস্তকিছু জোগানোর উদ্দেশ্যে সমগ্র সোভিয়েত জনগণ আত্মবিস্মৃত হয়ে খাটছিল। 'মস্কোর উপকণ্ঠে শুরু হবে শত্রুর পরাজয়!' — পার্টির এই স্লোগানটি দেশের অভ্যন্তর ভাগে সোভিয়েত মানুষকে আত্মোৎসর্গী শ্রমে, আর রণাঙ্গনে সোভিয়েত সৈন্যদের অভূতপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শনে অনুপ্রাণিত করেছিল। লাল ফৌজ পাল্টা-আক্রমণ আরম্ভ করার সুযোগ পেল।

সোভিয়েত বাহিনীগুলোর পাল্টা-আক্রমণ। মস্কোর উপকণ্ঠে বিজয়ের তাৎপর্য

ডিসেম্বর মাসের গোড়াতে পশ্চিমাভিমুখে সংগ্রামরত সোভিয়েত সৈন্যরা সর্বোচ্চ সদর-দপ্তর গঠিত রিজার্ভ ফর্ম্যাশন আর ইউনিটগুলোর মাধ্যমে যথেষ্ট সাহায্য পেল। কিন্তু প্রধান ক্ষেত্রগুলোতে তখনও শত্রুর

শ্রেষ্ঠতা থেকে গিয়েছিল। ১ ডিসেম্বর নাগাদ জার্মান-ফ্যাসিস্ট সৈন্যদের গ্রুপিংটিতে ছিল ১৭,০৮,০০০ সৈনিক আর অফিসার, প্রায় ১৩,৫০০ তোপ ও মর্টার কামান, ১,১৭০টি ট্যাঙ্ক, ৬১৫টি বিমান। তার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান সোভিয়েত বাহিনীতে ছিল ১১,০০,০০০ লোক, ৭,৬৫২ তোপ ও মর্টার কামান, ৭৭৪টি ট্যাঙ্ক (তার মধ্যে ২২২টি মাঝারি ও ভারি ট্যাঙ্ক), ১,০০০টি বিমান। অতএব, জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজ জনবলে সোভিয়েত বাহিনীকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল ১·৫ গুণ, আর্টিলারিতে — ১·৮ গুণ ও ট্যাঙ্কে — ১·৫ গুণ। কেবলমাত্র বিমানের ক্ষেত্রেই সোভিয়েত গ্রুপিং শত্রুর থেকে এগিয়ে ছিল (১·৬ গুণ)। পশ্চিম দিকের ফ্রন্ট-লাইন বিমান বাহিনীতে নতুন ধরনের বিমানের সংখ্যা ৪৭·৫ শতাংশে গিয়ে পৌঁছেছিল।

এই ভাবে, সোভিয়েত সৈন্যরা পাল্টা-আক্রমণ আরম্ভ করে কঠিন পরিস্থিতিতে — শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের সংখ্যাগত শ্রেষ্ঠতা ছিল না।

সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলী কালিনিন, পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম (ব্রিয়ানস্ক ফ্রন্টটি ৯.১১.৪১ তারিখে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল) ফ্রন্টগুলোর শক্তি দিয়ে পূর্ববর্তী সামরিক ক্রিয়াকলাপের সময় শত্রুর দুর্বল-হয়ে পড়া আক্রমণকারী গ্রুপিংটিকে বিধ্বস্ত করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। এ কাজে প্রধান ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল পশ্চিম ফ্রন্টকে। তার আশু কর্তব্য ছিল: রাজধানীর উত্তর-পশ্চিমে ও দক্ষিণে (ক্লিন, সোল্‌নেচ্‌নোগর্স্ক ও তুলা অঞ্চলে) শত্রুর গ্রুপিংটিকে বিধ্বস্ত করা এবং মস্কোকে বিপন্মুক্ত করা। কালিনিন ফ্রন্টের কাজ ছিল প্রবল আঘাত হেনে কালিনিন শহরটি অধিকার করা এবং পশ্চিম ফ্রন্টের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত জার্মান-ফ্যাসিস্ট সৈন্যদের পশ্চাদ্ভাগে পৌঁছা। দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের দায়িত্ব ছিল এরূপ: ইয়েলেৎস অঞ্চলে শত্রুকে পরাস্ত করা এবং তুলা অঞ্চলে তাকে ধ্বংস করার কাজে পশ্চিম ফ্রন্টের সৈন্যদের সহায়তা দেওয়া।

সোভিয়েত বাহিনীগুলোর পাল্টা-আক্রমণ আরম্ভ হয় ১৯৪১ সালের ৫-৬ ডিসেম্বর তারিখে — ২০০ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত রণাঙ্গনে। জার্মানদের জন্য এ ছিল এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। তা সম্ভব হয়েছিল পাল্টা-আক্রমণের পরিকল্পনার গোপনীয়তা রক্ষার ফলে (এ সম্পর্কে জানতেন সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীর অল্প সংখ্যক লোক), সৈন্যদের পুনর্বিন্যাস ও প্রসারণের গোপনতা বজায় রাখার মাধ্যমে। সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী শত্রুর অলক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তর ভাগ থেকে ফ্রন্ট লাইনে

অনেকগুলো মজুদ বাহিনী নিয়ে এসেছিলেন। বাহিনীগুলো ক্যামুফ্লেজ ব্যবস্থার কঠোর নিয়মশৃংখলা পালন করছিল, চলাচল করছিল কেবল রাত্রিবেলা। আগুন ধরানো, পাল্টা-আক্রমণের প্রস্তুতি সম্পর্কে কথাবার্তা বলা এবং বেতারালাপ চালানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সরবরাহ কেন্দ্র আর যাত্রাপথসমূহের ক্যামুফ্লেজও ফলপ্রসূ হয়েছিল।

বাহিনীগুলো ক্যামুফ্লেজ ব্যবস্থার নিয়মশৃংখলা কীভাবে পালন করছে সেদিকে খেয়াল রাখছিল সমস্ত স্তরের সদর-দপ্তরসমূহ। এই ব্যবস্থাদির কল্যাণে শত্রুর অনুসন্ধানী বিভাগ পাল্টা-আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত সোভিয়েত সৈন্যদেব গ্রুপিংটিকে খুঁজে বার করতে পারে নি। এমনকি জার্মান জেনারেল স্টাফের দৈনিক মানচিত্রে ৬ ডিসেম্বর তারিখে পশ্চিম ফ্রন্টের দশটি বাহিনীর মধ্যে কেবল সাতটিকে দর্শানো হয়েছিল (১ম আক্রমণকারী বাহিনী, ২০শ ও ১০ম বাহিনীগুলো চিহ্নিত হয় নি)।

উত্তরে তিখভিনের কাছে এবং দক্ষিণে রস্তভের নিকটে সোভিয়েত সৈন্যদের পাল্টা-আক্রমণ শত্রুকে দিশাহারা করতে ও তার শক্তিগুলোকে অচল করে দিতে সাহায্য করেছিল।

সোভিয়েত বাহিনীসমূহের প্রথম আঘাতেই জার্মান ইউনিটগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পশ্চাদপসরণ শুরু করতে বাধ্য হয়। গাল্‌ডের ৭ ডিসেম্বর লিখেছিল, 'এই দিনটির ঘটনাবলি আবার ভয়ংকর ও লজ্জাজনক।... সবচেয়ে ভয়ানক ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে ভের্মাখটের সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলী আমাদের বাহিনীগুলোর অবস্থা বুঝতে পারছে না এবং নীতিগত স্ট্রাটেজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবর্তে ফুটো বন্ধ করার কাজে লিপ্ত রয়েছে।'* তার মতে, এ ধরনের একটি সিদ্ধান্ত হতে পারত রুজা ও ওস্তাশকোভ যুদ্ধ-সীমায় 'সেণ্টার' গ্রুপের বাহিনীগুলোর পশ্চাদপসরণ সম্পর্কে নির্দেশ। কিন্তু হিটলার ঘটনা প্রবাহের এরূপ পরিবর্তন প্রত্যাশা করে নি। তাই সে বিলম্ব করছিল। কেবল ৮ ডিসেম্বর তারিখে — যখন ৩য় ও ৪র্থ ট্যাঙ্ক গ্রুপগুলোর অধিনায়কদ্বয় জেনারেল ক. রেইনগার্ড্‌ট ও জেনারেল এ. গিওপনের এবং ২য় ট্যাঙ্ক বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল গ. গুদেরিয়ান রিপোর্ট দিল যে লাল ফৌজের আঘাত ক্রমশই প্রবলতর হয়ে উঠছে ও তাদের অধিনস্থ বাহিনীগুলোর অগ্রগতি রোধ হয়ে গেছে — হিটলার সমগ্র

* গাল্‌ডের ফ.। সামরিক ডায়েরি। খণ্ড ৩, বই ২, পৃঃ ১০৩।

পূর্ব রণাঙ্গন জুড়ে জার্মান সশস্ত্র বাহিনীর স্ট্র্যাটেজিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয়ে ৩৯ নং নির্দেশটি স্বাক্ষর করে। মস্কো দখলের এবং দ্রুত যুদ্ধ সমাপ্তির ব্যাপারে জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলীর সমস্ত আশাভরসার পূর্ণ নিষ্ফলতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। উক্ত নির্দেশে রুশ শীতকে নাৎসি বাহিনীর আক্রমণাভিযানের ব্যর্থতার কারণ হিশেবে বর্ণনা করা হয়: 'পূর্ব রণাঙ্গনে ঠাণ্ডা শীতের অকাল আগমন এবং সেই হেতু সরবরাহ ব্যবস্থায় উদ্ভূত অসুবিধাসমূহ অনতিবিলম্বে সমস্ত বৃহৎ আক্রমণাভিযান বন্ধ করতে ও প্রতিরক্ষায় লিপ্ত হতে বাধ্য করছে।...'* অকাল শীতের কথা মোটেই বিশ্বাসজনক নয়। প্রধান আবহাওয়া দপ্তরের মহাফেজখানার কাগজপত্র দেখে জানা যায় যে ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে মস্কোর উপকণ্ঠে গড় তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৪-৬ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডের মতো। এটা অবশ্য সত্যি যে ৫ থেকে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাপমাত্রা কখনও কখনও মাইনাস ২৮ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডে পৌঁছে গিয়েছিল, কিন্তু হিমের এ প্রকোপ টিকেছিল অদীর্ঘ কাল। নাৎসিরা এটা স্বীকার করতে চায় নি যে তারা শীতের আগে যুদ্ধ শেষ করতে পারবে বলে আশা করেছিল এবং সেই হেতু তারা নিজের বাহিনীগুলোকে শীতকালীন পরিস্থিতিতে সামরিক ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রস্তুত করে নি।

ওই সময় সোভিয়েত সৈন্যদের পাল্টা-আক্রমণের গতি বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৭ ডিসেম্বরের মধ্যে মস্কোর উত্তরে ও উত্তর-পশ্চিমে আক্রমণরত সোভিয়েত ইউনিটগুলো শত্রুকে ৬০ কিলোমিটার অবধি, আর তুলা ও ইয়েলেৎস অঞ্চলগুলোতে ৯০ কিলোমিটার অবধি পশ্চিমে হটিয়ে দেয়। ওখানে ফ্যাসিস্ট ফৌজগুলো শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়। এর ফলে মস্কোর প্রতি সরাসরি হুমকি আর থাকল না। পাল্টা-আক্রমণের পরবর্তী পর্যায়ে সোভিয়েত সৈন্যরা দুশমনের কঠোর প্রতিরোধ দমন করে শক্তি ও সমরোপকরণের, বিশেষত ট্যাঙ্ক, কামান আর গোলাবারুদের অভাবের মধ্যে; হিম, পথাভাব ও গভীর তুষারের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সমগ্র রণাঙ্গন জুড়ে শত্রুর উপর নিরবচ্ছিন্ন আঘাত হানছিল। ২৫ ডিসেম্বর নাগাদ কালিনিন ফ্রন্টের সৈন্যরা আরও ২৫-৪০ কিলোমিটার এগিয়ে যায়।

পশ্চিম ফ্রন্ট তার ডান পার্শ্ব ও মধ্যাংশ নিয়ে লামা, রুজা ও নারা নদীগুলোর যুদ্ধ-সীমায় চলে যায়, আর বাঁ পার্শ্ব নিয়ে ওকা নদীর পূর্ব তীর এবং কালুগা শহরের কাছে গিয়ে পেঁাছে। দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের (১৮. ১২. ১৯৪১ থেকে ব্রিয়ানস্ক ফ্রন্ট নামে পরিচিত) ফৌজগুলো ওরিওল অভিমুখে পশ্চিমের দিকে ২০-৬০ কিলোমিটার অগ্রসর হয়ে চের্ন্, নভোসিল ও লিভ্‌নি শহরগুলোর উপকণ্ঠে উপনীত হয়। আক্রমণাভিযানের ফ্রন্ট ক্রমশই প্রশস্ত হচ্ছিল এবং জানুয়ারির গোড়ার দিকে তা ১,০০০ কিলোমিটারে পেঁাছিল। শত্রু তার সর্ব শক্তি প্রয়োগ করে সোভিয়েত অভিযান রুখতে চেষ্টা করছিল। রণাঙ্গনের অনেকগুলো জায়গায় লড়াই নির্মম চরিত্র ধারণ করে এবং দীর্ঘকালীন হয়ে উঠে, কিন্তু তা সত্ত্বেও পাল্টা-আক্রমণ অব্যাহত থাকে। ৮ জানুয়ারি নাগাদ র্জেভ শহরের পশ্চিমে ও কালুগার দক্ষিণে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহ বিদ্ধ হয়ে যায়। এতে সোভিয়েত সৈন্যদের পরবর্তী সার্বিক আক্রমণাভিযানের জন্য অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে ওঠে।

কালিনিন, পশ্চিম ও ব্রিয়ানস্ক ফ্রন্টগুলোর বাহিনীসমূহ তাদের কর্তব্য সম্পাদন করল। পাল্টা-আক্রমণ চালিয়ে তারা বিধ্বস্ত করে ৩৮টি ফ্যাসিস্ট ডিভিশন (যার মধ্যে ১১টি ট্যাঙ্ক ও ৪টি মোটোরাইজ্‌ড ডিভিশন ছিল), মুক্ত করে কালুগা ও কালিনিন জেলা শহরগুলো সহ ১১ হাজার জনপদ, তুলা অবরোধের সম্ভাবনা দূর করে। এই লড়াইয়ে জার্মানরা হারায় ৫ লক্ষ লোক, ১,৩০০ ট্যাঙ্ক, ২,৫০০ কামান ও ১৫ হাজার গাড়ি। শত্রুকে মস্কো থেকে ১০০-২৫০ কিলোমিটার দূরে হটিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

মস্কোর উপকণ্ঠে আরব্ধ পাল্টা-আক্রমণ পরে পরিণত হয় লাল ফৌজের সার্বিক আক্রমণাভিযানে, যা ১৯৪২ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত চলতে থাকে। ওই সময়ের মধ্যে সোভিয়েত সৈন্যরা শত্রুকে ভিতেব্‌স্ক অভিমুখে ২৫০ কিলোমিটার, গ্‌জাত্‌স্ক ও ইউখ্‌নোভ অভিমুখে ৮০-১০০ কিলোমিটার দূরে হটিয়ে দেয়, মস্কো ও তুলা জেলাগুলো, কালিনিন ও স্মোলেন্‌স্ক জেলা দু'টির অনেরগুলো অঞ্চল মুক্ত করে। লক্ষ লক্ষ সোভিয়েত নাগরিককে তারা ফ্যাসিস্ট দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়। শত্রু শোচনীয়ভাবে পর্যুদস্ত হয়। ১৬টি ডিভিশন ও ১টি ব্রিগেডকে একেবারে অকেজো করে দেওয়া হয়েছিল। ১ জানুয়ারি থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত বাহিনীগুলোর 'সেণ্টার' গ্রুপ ৩ লক্ষ ৩৩ সহস্রাধিক

লোক হারিয়েছিল।* দ্'দিক থেকে গ্রুপটিকে ঘিরে নিয়ে সোভিয়েত সৈন্যরা তাকে অস্ববিধাজনক সামরিক অবস্থায় ফেলে দিয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপ থেকে ১২টি ডিভিশন ও ২টি প্রহরী ব্রিগেড প্রেরণের ফলেই তা প্র্ণ বিপর্যয় এড়াতে পেরেছিল।

মস্কোর উপকণ্ঠের লড়াইয়ে লাল ফৌজ এক বড় রকমের সামরিক-রাজনৈতিক বিজয় অর্জন করল। এ বিজয় দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের এবং সমগ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতির উপর চূড়ান্ত প্রভাব ফেলে। এ বিজয় সমগ্র বিশ্বকে স্পষ্টরূপে দেখিয়ে দেয় সোভিয়েত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠতা, সোভিয়েত সমাজের নৈতিক-রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত ঐক্য। রাজধানীর নিকটে লড়াইয়ে লাল ফৌজ যুদ্ধের ছ'মাসের মধ্যে সেই প্রথম বার নাৎসি সৈন্যদের প্রধান গ্রুপিংকে সবচেয়ে বড় পরাজয় বরণ করতে বাধ্য করে। ফ্যাসিস্টদের 'ব্লিট্স্ক্রিগ' পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। সমগ্র বিশ্ব সমক্ষে লাল ফৌজ জার্মান বাহিনীর 'অপরাজেয়তা' সম্পর্কিত কাহিনীগুলোর অসারতা প্রমাণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিস্টরা প্রথম বৃহৎ পরাজয় বরণ করল।

জার্মান-ফ্যাসিস্ট সৈন্যদের পরাজয় নাৎসি বাহিনীর নেতৃমণ্ডলীতে বড় রকমের পরিবর্তন ঘটায়। জার্মানির স্থলসেনার সর্বাধিনায়ক জেনারেল-ফিল্ডমার্শাল ফন ব্রাউখিচকে ১৯ ডিসেম্বর 'অসুস্থতার' দরুন তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। স্থলসেনার নেতৃত্বভার গ্রহণ করল খোদ হিটলার। বাহিনীসমূহের 'সেণ্টার' গ্রুপের সর্বাধিনায়ক জেনারেল-ফিল্ডমার্শাল ফন বক ১৮ ডিসেম্বর পদচ্যুত হয়। ২৬ ডিসেম্বর কর্নেল-জেনারেল গুদেরিয়ানকে পদচ্যুত করা হয়। ৩য় ট্যাঙ্ক গ্রুপের অধিনায়ক কর্নেল-জেনারেল গিওপনেরকে সমস্ত পদবী ও পদক থেকে বঞ্চিত করা ও পদচ্যুত করা হয়। ৯ম বাহিনীর অধিনায়ক কর্নেল-জেনারেল স্ট্রাউস তাড়াহুড়ো নিজেকে অসুস্থ ঘোষণা করে। বাহিনীসমূহের 'উত্তর' ও 'দক্ষিণ' গ্রুপগুলোর সর্বাধিনায়কদের, ২০তম ল্যাপল্যাণ্ড বাহিনী ও ১৭শ বাহিনীর সেনাপতিদের এবং অনেকগুলো কোর আর ডিভিশনের কমাণ্ডারদের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটে। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৪২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ৩৫ জন নাৎসি জেনারেল পদচ্যুত হয়েছিল। ব্রিটিশ সামরিক ইতিহাসবিদ জ. ফ. স. ফুলের লিখেছেন, 'মার্না তীরের লড়াইয়ের

* Reinhardt K. Die Wende vor Moskau, S. 232.

পর লোকে জেনারেলদের এরূপ বিপর্যয় আর দেখে নি।'* সেনাপতিদের ছাঁটাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য বাহিনীতেও নির্যাতন চলে। এটা বললেই যথেষ্ট হবে যে মস্কোর উপকণ্ঠের লড়াইয়ের সময় জার্মান সামরিক আদালতগুলো ভের্মাখ্‌টের ৬২ সহস্রাধিক সৈনিক, নন-কমিশন্‌ড অফিসার আর অফিসারকে দণ্ডাদেশ দেয়।

মস্কোর উপকণ্ঠে সোভিয়েত সৈন্যদের অর্জিত বিজয়ের ছিল বিপুল আন্তর্জাতিক তাৎপর্য। সমগ্র বিশ্বে এই বিজয়কে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির অভিন্ন বিজয় বলে গণ্য করা হয়, তা স্বাধীনতাকামী জাতিসমূহকে প্রেরণা জোগায়, ফ্যাসিস্টদের দ্বারা দখলীকৃত দেশসমূহে প্রতিরোধ আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি করে এবং হিটলারবিরোধী জোট সুদৃঢ়করণে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

প্রগতিশীল ইতালীয় রাষ্ট্রকর্মী রবের্তো বাত্তালিয়া বলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম সামরিক সাফল্য আটলাণ্টিক মহাসাগরের উভয় পাশে অনিশ্চয়তা আর হতবুদ্ধিতার সুদীর্ঘ এক পর্বের অবসান সূচিত করে।** এই সাফল্যের তাৎপর্যটি আরও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা উইলিয়াম ফস্টার। তিনি লেখেন যে মস্কোর উপকণ্ঠে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর প্রতিআক্রমণ ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে জনগণের বৃহৎ আক্রমণাভিযানের প্রারম্ভ সূচিত করে।

ফ্যাসিজমের সঙ্গে জাতিসমূহের সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপুল অবদানের কথা ওই দিনগুলোতে স্বীকার করেছিলেন হিটলারবিরোধী জোটভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের বহু রাজনৈতিক ও সামরিক নেতা। স্তালিনের নামে প্রেরিত এক বার্তায় মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট লাল ফৌজের সাফল্য উপলক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বজনীন উল্লাসের কথা উল্লেখ করেন।*** ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি, যখন ব্রিটিশ ফৌজ দক্ষিণ-

* ফুলের জ.। ১৯৩৯-১৯৪৫ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ইংরেজী থেকে অনুবাদ। — মস্কো, ১৯৫৬, পৃঃ ১৬৯।

** বাত্তালিয়া র.। ইতালীয় প্রতিরোধ আন্দোলনের ইতিহাস (১৯৪৩ সালের ৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৫ সালের ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত)। ইতালিয়ান থেকে অনুবাদ। — মস্কো, ১৯৫৪, পৃঃ ৪৭।

*** ১৯৪১-১৯৪৫ সালের দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের সময় মার্কিন

পূর্ব এশিয়ায় ব্যর্থকাম হয়, উইনস্টন চার্চিল সামরিক সদর-দপ্তরগুলোর অধিকর্তাদের কাছে প্রেরিত এক স্মারক-পত্রে লেখেন: 'বর্তমানে যুদ্ধের গতিতে প্রধান হেতু হচ্ছে রাশিয়ায় হিটলারের পরাজয় ও ক্ষয়ক্ষতি।'* বিশিষ্ট ফরাসি সেনাপতি ও ইতিহাসবিদ আ. গাইওম বলেন যে মস্কোর উপকণ্ঠে বিজয় স্রেফ আপন অস্ত্রের সাহায্যে লাল ফৌজ অর্জিত সোভিয়েত বিজয়ই ছিল না, তা সমস্ত ফ্যাসিস্টবিরোধী দেশের জন্য প্রথম প্রতিশোধও ছিল। ফরাসী জেনারেল স্টাফের প্রাক্তন ডেপুটি-চিফ জেনারেল ল. শাসেন ঘোষণা করেন: 'মস্কোর উপকণ্ঠের লড়াই স্বাধীন বিশ্বকে বাঁচিয়েছে।'**

মস্কোর উপকণ্ঠে অর্জিত বিজয় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জাপানের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা অনেকটা শিথিল করে দেয়, — তার দশ লক্ষ সৈন্যের কুয়াণ্টুং বাহিনীটির নিশানা ছিল সোভিয়েত দেশ। মস্কো উপকণ্ঠের ঘটনাবলি তুরস্কের আগ্রাসী মহলগুলোকেও প্রকৃতিস্থ করে।

লাল ফৌজ বৃহৎ প্রতিরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক অপারেশন পরিচালনার অমূল্য অভিজ্ঞতা অর্জন করল, পরিণত হয়ে ও পোড় খেয়ে উঠল। যুদ্ধ কৌশলের বিচারে তার জন্য শিক্ষাপ্রদ ছিল গভীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গঠন, ফ্রন্টসমূহের গ্রুপের দ্বারা আক্রমণাভিযানের আয়োজন, শত্রুর উপর প্রবল প্রতিঘাত হানার কাজ, পাল্টা-আক্রমণের আকস্মিকতা, স্ট্র্যাটেজিক রিজার্ভসমূহের নিপুণ ও কালোচিত ব্যবহার, রাত্রিকালীন সফল ক্রিয়াকলাপ, বড় বড় প্যারাট্রুপার বাহিনীর প্রয়োগ, সর্বোচ্চ সদর-দপ্তরের তরফ থেকে, ফ্রন্ট ও বাহিনীসমূহের অধিনায়কদের তরফ থেকে, ইউনিট, সাব-ইউনিট আর ফর্ম্যাশনগুলোর কমান্ডারদের তরফ থেকে সুনিপুণ সৈন্য পরিচালনা।

স্থলসেনাকে সক্রিয় সহায়তা জোগাচ্ছিল সোভিয়েত বিমান বাহিনী, যা পশ্চিমাভিমুখে অন্তরীক্ষে সামরিক আধিপত্য অর্জন করেছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টদের ও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সভাপতির পত্রালাপ (পরে — সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সভাপতির পত্রালাপ)। খণ্ড ২। — মস্কো, ১৯৫৭, পৃঃ ১৬।

* বাটলের জ., গুয়াইয়ের জ.। বৃহৎ রণনীতি..., পৃঃ ২৪৬।

** Chassin L. Histoire Militaire de la Seconde Guerre Mondiale. 1939-1945. — Paris, 1947, p. 147.

প্রতিআক্রমণের সময় বিমান বাহিনী সর্বমোট প্রায় ১৬ হাজার বিমান-উড্ডয়ন সম্পন্ন করে। তার মধ্যে প্রায় অর্ধেক উড্ডয়ন সম্পন্ন হয়েছিল শত্রুর জ্যান্ত শক্তি ও সামরিক প্রযুক্তি ধ্বংসকরণের উদ্দেশ্যে। সোভিয়েত যোদ্ধারা বিপুল বীরত্ব ও উচ্চ মনোবলের পরিচয় দেয়।

মস্কোর উপকণ্ঠে শত্রুকে পর্যুদস্তকরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল সোভিয়েত পার্টিজানদের। জনসাধারণের সমর্থন পেয়ে তারা সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতায় শত্রুর সঙ্গে অটল ও নির্ভীক সংগ্রামে লিপ্ত থাকে।

১৯৪৪ সালে 'মস্কোর প্রতিরক্ষার জন্য' পদক প্রদানের ব্যবস্থা চালু হয়। এই পদক লাভ করে ১০ লক্ষাধিক লোক। শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামে রাজধানীর মেহনতীদের বিশিষ্ট অবদানের জন্য, তাদের সাহসিকতা ও শৌর্যের জন্য ১৯৪৭ সালের ৬ অক্টোবর মস্কো নগরী লেনিন অর্ডারে ভূষিত হয়। দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের বিজয়ের ২০তম বার্ষিকী দিবসে মস্কোকে 'বীর নগরী' নাম দেওয়া হয়।

ভের্মাখ্‌টের বাছাই-করা বাহিনীগুলোর পরাজয় জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষকে স্তম্ভিত করে দেয়। জার্মান জেনারেল ওয়েস্টফালের মতে, নাৎসি রণনীতিজ্ঞরা এটা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল যে 'পূর্বে অপরাজের বলে পরিগণিত জার্মান সৈন্য বাহিনী এবার ছিল ধ্বংসের মুখে।'* অনেক ফ্যাসিস্ট জেনারেলই নৈরাশ্যজনক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। 'মস্কোর লড়াই জার্মান বাহিনীগুলোকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রথম বড় রকমের পরাজয় এনে দিল, — স্বীকার করে ৪র্থ ফিল্ড আর্মির সদর-দপ্তরের প্রাক্তন অধিকর্তা জেনারেল গ. ব্লুমেনস্ট্রিট। — তার মানে ছিল সেই ব্লিট্‌সক্রিগের অবসান, যা হিটলারকে ও তার সশস্ত্র বাহিনীকে পোল্যান্ডে, ফ্রান্সে ও বলকান দেশগুলোতে এত চমৎকার সাফল্য এনে দিয়েছিল।... রাশিয়া অভিযান, এবং বিশেষত তার মোড় পরিবর্তনকারী পর্যায় — মস্কোর লড়াই, জার্মানির উপর রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে প্রথম প্রবলতম আঘাত হানে।'** পশ্চিম জার্মান সামরিক ইতিহাসবিদ ক. রেইনগার্ড্‌ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে 'হিটলারের পরিকল্পনাগুলো আর সেই সঙ্গে

* ওয়েস্টফাল জ. ও অন্যান্যরা। সর্বনাশা সিদ্ধান্তসমূহ। ইংরেজী থেকে অনুবাদ। — মস্কো: ভয়েন্‌ইজদাত, ১৯৫৮, পৃঃ ৬৪, ১০৮।

** ঐ, পৃঃ ১০৮।

জার্মানি কর্তৃক সফল যুদ্ধ পরিচালনার সম্ভাবনাসমূহও ১৯৪১ সালের অক্টোবরেই এবং বিশেষত ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে মস্কোর উপকণ্ঠে রুশ পাল্টা-আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যায়।... সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ ও সশস্ত্র বাহিনীর দৃঢ় প্রতিরোধের ফলে হিটলারের স্ট্র্যাটেজিক পরিকল্পনাগুলো একেবারে পণ্ড হয়ে যায়।...'* ফিল্ডমার্শাল ভ. কেইটেলকে নুরেমবার্গ মোকদ্দমার সময় যখন প্রশ্ন করা হয়, কবে সে 'বার্বারোসা' পরিকল্পনার ব্যর্থতার কথা বুঝতে আরম্ভ করেছিল তখন সে অনিচ্ছার সঙ্গে কেবল একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করল: 'মস্কো'। তারা ভেবেছিল যে মস্কোর উপকণ্ঠে তারা যুদ্ধ শেষ করবে, অথচ ওখানেই তাদের জন্য যুদ্ধ শুরু হয়েছিল মাত্র।

এখানে পশ্চিমের অন্যান্য গবেষকের কথা শোনা যাক। 'জেনারেল গুদেরিয়ান এবং আধুনিক ব্লিট্‌সক্রিগের ইতিহাস' নামক গ্রন্থের রচয়িতা ড. ব্র্যাডলি মনে করেন যে মস্কোর উপকণ্ঠে জার্মানদের পরাজয়ের মুহূর্ত থেকে 'জার্মান সৈন্য বাহিনীর জন্য ব্লিট্‌সক্রিগের দিন চিরতরে অতীতের গহ্বরে বিলীন হয়ে যায়।'** অন্য ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ ব. লিচ তাঁর 'রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মান রণনীতি, ১৯৩৯-১৯৪১' নামক বইটিতে ব্লিট্‌সক্রিগ পরিকল্পনা কেন ব্যর্থ হল এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে স্পষ্ট ভাষায় বলছেন: 'জার্মান নেতারা বিশ্বাস করেছিল যে তাদের ব্লিট্‌সক্রিগ সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাস্ত করতে পারবে এবং এখানেই তারা অতি মারাত্মক একটি ভুল করেছিল। তাদের প্রধান ভুলটি ছিল এই যে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের শক্তিকে ছোট করে দেখেছিল।'***

বিদ্যুৎগতি যুদ্ধের পরিকল্পনার ব্যর্থতার কারণগুলো সম্পর্কিত প্রশ্নটিকে ঘিরে আজও পাশ্চাত্য ইতিহাস বিজ্ঞানে তুমুল বাদানুবাদ চলছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুদ্ধে ফ্যাসিস্ট ব্লিট্‌সক্রিগের

নিষ্ফলতার কারণ সম্পর্কে পশ্চিমে, বিশেষত জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্রে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, এখন অনেক বইপুস্তকই লেখা হচ্ছে। তাতে আছে প্রচুর কল্পনা, ভণ্ডামি ও খোলাখুলি মিথ্যা কাহিনী। হিটলারের 'পরাজয়ের আকস্মিকতা' সম্পর্কে, 'সর্বনাশা ভুলত্রুটির' বিষয়েও অনেক 'যুক্তি' দেখানো হয় ওই সমস্ত রচনায়। বলাই বাহুল্য, ঐতিহাসিক তথ্য ও দলিলাদির দিকে দৃকপাত করা মাত্রই ওগুলোর ভিত্তিহীনতা স্পষ্ট হয়ে যায়।

যুদ্ধের 'ব্লিট্‌সক্রিগ' পরিকল্পনা নিষ্ফল হওয়ার কারণগুলি আলোচনা করার সময় বুর্জোয়া ইতিহাসবিদদের সাধারণ ঝোঁকের বৈশিষ্ট্য হল তার আসল কারণ বিকৃত করা কিংবা নীরব থাকা, সব ধরনের কল্পিত ভাষ্যে সেগুলি বদল করা, ভের্মাখ্‌ট, তার সামরিক কৌশল এবং সর্বপ্রথমেই 'ব্লিট্‌সক্রিগ' মতবাদের দোষ ঢাকা।

যেকোন পরিভাষায় লুকিয়ে রাখলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে 'ব্লিট্‌সক্রিগ' মতবাদের রাজনৈতিক সারমর্ম বদলে যায় না। সেটা ছিল আর আজও রয়েছে হামলাদারী যুদ্ধের মতবাদ।

মস্কোর উপকণ্ঠে জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাবাহিনীর পরাজয় শুধু হিটলারী স্ট্র্যাটেজির ভিত্তিহীনতা নয়, ফ্যাশিস্ট জার্মানীর সমস্ত রাজনীতির হঠকারিতা সম্পূর্ণভাবে খুলে দেখিয়েছে। নাৎসি স্ট্র্যাটেজিস্টদের প্রধান ভুল হল এই যে তারা শুধু লাল ফৌজের সঙ্গে সংগ্রাম করার ভরসা করেছিল, কিন্তু আসলে সারা সোভিয়েত জনগণের প্রতিক্রিয়ায় সম্মুখীন হয়েছিল।

মস্কোর কাছে মহাবিজয় কমিউনিস্ট পার্টির বিরাট সামরিক-সাংগঠনিক ও সামরিক-ভাবাদর্শমূলক কাজের কল্যাণে সম্ভব হয়। পার্টি নিজের চার পাশে সারা সোভিয়েত জনগণ, সৈন্যবাহিনী সুগঠিত করে বীরোচিত কীর্তির জন্য সৈনিকদের অনুপ্রাণিত করেছিল। কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় সোভিয়েত জনগণ তার পিতৃভূমির ওপর ফ্যাসিস্ট জার্মানির আকস্মিক আক্রমণের দুঃখজনক ফলাফল অতিক্রম করতে এবং জটিল ও নির্মম লড়াইয়ে শক্তির অনুপাত বদলাতে সক্ষম হয়। সোভিয়েত জনগণ, তার সশস্ত্র বাহিনী রাজধানীর প্রাচীরের কাছে সোভিয়েত দেশপ্রেমের উচ্চ নমুনা প্রদর্শন করে। রণাঙ্গনে গণশৌর্যে, দেশের পশ্চাদভাগে বিশাল পরিশ্রমে, উচ্চতম সংগঠন ও আত্মসংবরণে তারা শত্রুর খুবই প্রবল আক্রমণের প্রতিরোধ করতে পেরেছিল। তাছাড়া জনগণের ও

ফৌজের নৈতিক মনোবল উন্নত করার জন্য এই বিজয়ের গুরুত্ব ছিল খুবই বেশি।

সোভিয়েত জনগণ ও তার সশস্ত্র বাহিনীর জন্য ১৯৪১ সাল ছিল যুদ্ধের অতি কঠিন একটি বছর। নাটকীয় ঘটনাপূর্ণ ওই বছরটিতে প্রচুর প্রাণহানি ও বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়। তার সঙ্গে জড়িত কঠোরতম সংকটজনক অবস্থাগুলো, যখন প্রবল সংগ্রাম অবিশ্বাস্য রকমে তীব্র আকার ধারণ করছিল এবং সংগ্রামের উত্তেজনার মাত্রা উত্তুঙ্গে গিয়ে পেঁছেছিল। তবে ১৯৪১ সাল বহু বীরত্বপূর্ণ ঘটনারও সাক্ষী ছিল। এবং নাটকীয় নয় (যেমনটি সময় সময় সাহিত্যে দেখানো হয়ে থাকে), বীরত্বপূর্ণ ঘটনাবলিই ফ্যাসিস্ট বাহিনীগুলোর সঙ্গে তরুণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মহান সংগ্রামে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল।

ইতিহাসে আর কোন দৃষ্টান্ত নেই যখন একটি রাষ্ট্র যুদ্ধের গোড়াতে এরূপ জটিল ও কঠিন অবস্থায় পড়েও শেষ পর্যন্ত চতুরতম ও প্রবলতম এক শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ের এরূপ গৌরব অর্জন করেছিল।

১৯৪১ সালেই সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রমাণ করে দিয়েছিল যে সে হচ্ছে এক শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী। সোভিয়েত ইউনিয়ন এমন কাজ করেছিল যা পশ্চিমের অন্য কোন দেশের পক্ষে, অন্য কোন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। আক্রমণকারীর পথরোধ, তার পরিকল্পনাসমূহের ব্যর্থতা, জনবলে ও অস্ত্রবলে শত্রুর বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সাধন এবং, সবশেষে, মস্কোর উপকণ্ঠে তার প্রধান গ্রুপিংয়ের বিপর্যয়ের জন্য ব্লিট্‌সক্রিগ তত্ত্বের চিরাবসান ঘটে — এ সমস্ত কিছুই আন্তর্জাতিক জীবনে বিপুল সাড়া জাগায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাধারণ গতিতে আমূল পরিবর্তন আনে এবং ভবিষ্যতের বড় বড় বিজয়গুলোর জন্য দৃঢ় ভিত্তি রচনা করে।

৫। স্তালিনগ্রাদ এবং ককেশাসের প্রতিরক্ষা।

স্তালিনগ্রাদের প্রতিরক্ষা
(১৯৪২-এর ১২ জুলাই — ১৮ নভেম্বর)

১৯৪২ সালের মে নাগাদ সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে সাময়িক নিস্তব্ধতা নেমে এল। মস্কোর উপকণ্ঠে জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীর বিপর্যয়ে এবং শীতকালীন আক্রমণাভিযানের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে সোভিয়েত জনগণ

সাফল্যের সঙ্গে জাতীয় অর্থনীতিকে সামরিক চাহিদানুযায়ী পুনর্গঠিত করছিল। লাল ফৌজ পেতে লাগল বেশি পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, বিশেষত ট্যাঙ্ক, বিমান, রকেট মর্টার কামান ও আর্টিলারি, গোলাবারুদ। দেশের অভ্যন্তর ভাগে গঠিত হচ্ছিল নতুন নতুন স্ট্র্যাটেজিক রিজার্ভ।

সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেল। ১৯৪২ সালে ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার বিষয়ে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল। ওই বছরের জানুয়ারি মাসে ২৬টি দেশ একটি ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করে যাতে তারা সমস্ত শক্তি ও সঙ্গতি আগ্রাসী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে সংগ্রামের কাজে নিয়োজিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। সারা পৃথিবীতে, বিশেষত নাৎসি অধিকৃত দেশসমূহে ফ্যাসিস্টবিরোধী শক্তিগুলো তৎপর হয়ে উঠছিল।

জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান রণাঙ্গন বলে গণ্য করে ওখানে নতুন নতুন বাহিনী পাঠিয়ে যাচ্ছিল। দ্বিতীয় রণাঙ্গনের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ১৯৪২ সালের মে নাগাদ নাৎসিরা বাকী যুদ্ধক্ষেত্রগুলোতে নিজের সশস্ত্র বাহিনীর কেবল প্রায় ২০ শতাংশ রেখে দিয়ে পূর্ব রণাঙ্গনে কেন্দ্রীভূত করে ২১৭টি ডিভিশন ও ২০টি ব্রিগেড। জার্মানদের গ্রুপিংটিতে ছিল ৬০ লক্ষাধিক লোক, ৩,২০০টিরও বেশি ট্যাঙ্ক ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গান (স্বচালিত কামান), প্রায় ৫৭ হাজার তোপ ও মর্টার কামান, ৩,৪০০ বিমান।

সোভিয়েত সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলী বসন্ত কালে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টে বিদ্যমান পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে ঠিক করলেন যে ফ্যাসিস্ট সৈন্যরা গ্রীষ্মের গোড়াতে বৃহৎ আক্রমণাভিযান চালাতে পারে যুগপৎ দু'টি সবচেয়ে সম্ভাব্য দিকে: কেন্দ্রীয় ও দক্ষিণ অভিমুখে। মনে করা হচ্ছিল যে শত্রু প্রধান আঘাত হানবে মস্কো অভিমুখে। সেই জন্য ঠিক হল যে সক্রিয় স্ট্র্যাটেজিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা জার্মানদের আক্রমণাভিযান ব্যাহত করতে হবে, এবং কিছু খাস আক্রমণাত্মক অপারেশন চালাতে হবে যাতে সোভিয়েত মাটি থেকে হানাদারদের বহিষ্করণের উদ্দেশ্যে লাল ফৌজের পরবর্তী চূড়ান্ত আক্রমণাভিযানের জন্য পূর্বশর্ত গড়া যায়। ১৯৪২ সালের মে নাগাদ সংগ্রামী সোভিয়েত বাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা ছিল ৫০ লক্ষাধিক, প্রায় ৪,০০০ ট্যাঙ্ক, ৪৪ সহস্রাধিক তোপ ও মর্টার কামান, ২,২০০টির মতো বিমান। এই ভাবে, গ্রীষ্মের গোড়াতে জনবলে, আর্টিলারিতে ও বিমানে শ্রেষ্ঠতা ছিল শত্রুর দিকে। ট্যাঙ্কে লাল ফৌজের কিছুটা প্রাধান্য ছিল।

খারকভের নিকটে সোভিয়েত সৈন্যদের অভিযানের অসাফল্য এবং ক্রিমিয়ার পতন সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের দক্ষিণ পার্শ্বে পরিস্থিতি জটিল করে তোলে। ২৮-৩০ জুন তারিখে জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখে ব্যাপক আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপ শুরু করে। জার্মানরা দন নদীর পশ্চিমে সোভিয়েত সৈন্যদের বিধ্বস্ত করার, ককেশাসের তৈল সমৃদ্ধ অঞ্চলসমূহ দখল করার এবং স্তালিনগ্রাদ-আস্ত্রাখান লাইনে ভোলগায় পৌঁছার পরিকল্পনা নিয়েছিল। হিটলারের ৪১ নং নির্দেশে বলা হয়েছিল, 'আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সোভিয়েতের হাতে এখনও টিকে-থাকা জ্যান্ত শক্তিকে পুরোপুরিভাবে ধ্বংস করা, রুশদের যথাসম্ভব বৃহৎ সংখ্যক অতি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক-অর্থনৈতিক কেন্দ্র থেকে বঞ্চিত করা।'* ৬ লক্ষ ৫৫ হাজার সৈন্য, ৭৪০টি ট্যাঙ্ক, ১৪,২০০টি তোপ ও মর্টার কামান এবং সহস্রাধিক বিমান নিয়ে গঠিত ব্রিয়ানস্ক, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ ফ্রন্টগুলোর বিরুদ্ধে শত্রু তার বাহিনীসমূহের দু'টি গ্রুপকে ('A' ও 'B') খাড়া করে, — ওগুলোতে ছিল ৯ লক্ষ সৈনিক ও অফিসার, ১,২৬০টি ট্যাঙ্ক, ১৭ হাজার তোপ ও মর্টার কামান, ১.৬৪০টি বিমান। প্রায় মাসব্যাপী লড়াইয়ের পর জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীগুলো রস্তভ দখল করল, দনে পৌঁছল এবং তার বাঁ তীরে আক্রমণের কয়েকটি পাদভূমি অধিকার করল। কিন্তু তারা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টগুলোর ফৌজসমূহকে ঘিরে ফেলতে ও ধ্বংস করতে পারে নি, — হিটলারের পরিকল্পনার প্রথম অংশটি ব্যর্থ হয়ে গেল। তা সত্ত্বেও শত্রু দনবাস কয়লাঞ্চল নিয়ে নিল, দনের বৃহৎ বাঁকে পৌঁছে গেল এবং স্তালিনগ্রাদ ও উত্তর ককেশাসের জন্য সরাসরি হুমকি সৃষ্টি করল। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টগুলোর পশ্চাৎপদ বাহিনীগুলো অতি জটিল অবস্থায় পড়ল। জার্মানদের 'A' গ্রুপের বাহিনীসমূহ উত্তর ককেশাস অভিমুখে ধাবিত হয়। স্তালিনগ্রাদ অভিমুখে আক্রমণাভিযানে লিপ্ত হয় 'B' গ্রুপ, যার মেরুদণ্ড ছিল ৬ষ্ঠ ফিল্ড আর্মি (অধিনায়ক — কর্নেল-জেনারেল ফ. পাউল্যুস)। তাতে ছিল ইউরোপে ও সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে যুদ্ধের বিপুল অভিজ্ঞতা লব্ধ শ্রেষ্ঠ ফৌজগুলো। ১৭ জুলাই পর্যন্ত তাতে অন্তর্ভুক্ত ছিল ১৩টি ডিভিশন (প্রায় ২ লক্ষ ৭০ হাজার লোক, ৩ হাজার

* Hubatsch W. Hitlers Weisungen für die Kriegsführung. 1939-1945, S. 184.

তোপ ও মর্টার কামান এবং প্রায় ৫০০টি ট্যাঙ্ক)। তাদের সমর্থন জোগাচ্ছিল ৪র্থ বিমান বহরের প্লেনগুলো (১২০০টি জঙ্গী বিমান)।

স্তালিনগ্রাদ অভিমুখে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর সদর-দপ্তর নিজের রিজার্ভ থেকে প্রেরণ করে ৬২তম, ৬৩তম ও ৬৪তম বাহিনীগুলো। ১২ জুলাই তারিখে গঠিত হয় স্তালিনগ্রাদ ফ্রন্ট (অধিনায়ক মার্শাল সেমিওন তিমোশেঙ্কো, ২৩ জুলাই থেকে জেনারেল ভাসিলি গর্দোভ)। উপরোক্ত বাহিনীগুলো ছাড়া ফ্রন্টে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল পূর্ববর্তী লড়াইগুলোতে দুর্বল-হয়ে-পড়া আরও পাঁচটি বাহিনী এবং একটি বিমান বাহিনী। স্তালিনগ্রাদ ফ্রন্টের কর্তব্য ছিল — ৫২০ কিলোমিটার চওড়া এলাকায় প্রতিরক্ষা কার্যে লিপ্ত থেকে শত্রুর ভবিষ্যৎ অগ্রগতি রোধ করা। ফ্রন্ট যখন এ কাজে হাত দেয় তখন তার কাছে ছিল মাত্র ১২টি ডিভিশন (১ লক্ষ ৬০ হাজার লোক, ২,২০০টি তোপ ও মর্টার কামান এবং প্রায় ৪০০টি ট্যাঙ্ক)। ৮ম বিমান বাহিনীতে ছিল ৪৫৪টি প্লেন। এ ছাড়া, ওখানে সক্রিয় ছিল দূর পাল্লার বিমান বাহিনীর ১৫০-২০০টি বোমারু এবং বিমানবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ১০২তম বিমান ডিভিশনের ৬০টি ফাইটার প্লেন। শত্রু সোভিয়েত বাহিনীকে জনবলে ১·৭ গুণ, আর্টিলারি ও ট্যাঙ্ক ১·৩ গুণ, বিমানে ২ গুণেরও বেশি ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

স্তালিনগ্রাদ ফ্রন্টের আসল শক্তিসমূহ সমাবেশিত হয়েছিল দনের বৃহৎ বাঁকে, যেখানে প্রতিরক্ষা কার্যে লিপ্ত হয় ৬২তম ও ৬৪তম বাহিনীগুলো। তাদের উদ্দেশ্য ছিল — শত্রুকে নদী অতিক্রম করতে ও সবচেয়ে ছোট পথে স্তালিনগ্রাদের দিকে এগুতে না দেওয়া।

স্তালিনগ্রাদ অভিমুখে জার্মানরা আরও পাঠায় ৮ম ইতালীয় ও ৩য় রুমানীয় বাহিনীগুলো। শুরু হল ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্তালিনগ্রাদের লড়াই।

শত্রু মনে করেছিল যে পূর্ব রণাঙ্গনের দক্ষিণ অংশে আক্রমণাভিযান চলছিল ভের্মাখটের সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীর ৪১ নং নির্দেশ নির্ধারিত গতির চেয়ে অধিকতর দ্রুততার সঙ্গে। এ-বিষয়ে বলা হয়েছিল ২১ জুলাই তারিখের ৪৪ নং নির্দেশে: 'তিমোশেঙ্কোর বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে অপ্রত্যাশিত দ্রুত গতিতে ও সফলভাবে বিকাশমান অপারেশনগুলো এই আশা দিচ্ছে যে অদূর ভবিষ্যতে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ককেশাস থেকে, আর তার মানে, তেলের প্রধান উৎসসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হবে এবং ব্রিটিশ ও আমেরিকান সামরিক সামগ্রী পরিবহণ গুরুতরভাবে

ব্যাহত করা যাবে। এর দ্বারা এবং দনবাস কয়লাঞ্চলের সমগ্র শিল্পের ক্ষতি সাধনের দ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর এমন এক আঘাত হানা হবে যার পরিণাম হবে সুদূর প্রসারী।'*

সোভিয়েত সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জনগণ ও সৈন্য বাহিনীর সমগ্র প্রয়াস নিয়োগ করলেন ভোলগা তীরে প্রথমে শত্রুকে রুখা ও পরে বিধ্বস্ত করার কাজে। স্তালিনগ্রাদ অঞ্চলে প্রেরিত হলেন বিশিষ্ট পার্টি কর্মী, রাষ্ট্র নেতা আর সেনাপতিরা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, সোভিয়েত ইউনিয়নের গণ-কমিশনার পরিষদের উপসভাপতি ভ. মালিশেভ, সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের সহকারী গ. জুকোভ, জেনারেল স্টাফের অধিকর্তা আ. ভাসিলেভস্কি। সরাসরি ফ্রণ্টের পরিস্থিতিতে তাঁরা শত্রুকে প্রতিরোধ দানের জরুরী সমস্যাদি সমাধান করছিলেন। স্তালিনগ্রাদের দূরবর্তী ও নিকটবর্তী উপকণ্ঠগুলোতে নির্মিত হয় আত্মরক্ষা লাইন। খোদ স্তালিনগ্রাদে ট্যাঙ্ক উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ও শহরের উপকণ্ঠগুলো সুদৃঢ়করণের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল, রণাঙ্গনের চাহিদা মেটানোর জন্য সমস্ত জনবল ও সামরিক- প্রতিরক্ষা ক্ষমতাকে কাজে লাগানো হয়েছিল। সর্বত্র গঠিত হতে থাকে জন স্বেচ্ছা-বাহিনী, যাতে ভর্তি হয় ১৩,৬০০ লোক। ৮৩টি ধ্বংসকারী ব্যাটেলিয়ন গঠিত হয়, ইঞ্জিনিয়রিং বাহিনীগুলোর সঙ্গে প্রতিরক্ষামূলক নির্মাণকার্যে অংশগ্রহণ করে ২ লক্ষ ২৫ সহস্রাধিক স্তালিনগ্রাদবাসী।

কিন্তু শত্রু ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও স্তালিনগ্রাদের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। সে ককেশাসকে দেশের কেন্দ্রীয় অঞ্চলসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চেষ্টা করছিল। যেকোন উপায়ে জার্মান-ফ্যাসিস্ট সৈন্যদের পরবর্তী অগ্রগতি রোধ করা প্রয়োজন ছিল। ২৮ জুলাই প্রতিরক্ষা বিষয়ক গণ-কমিশনারের ২২৭ নং আদেশ প্রকাশিত হয়। 'এক পা-ও পিছু হটা চলবে না'—সৈন্যদের কাছে এরূপ দাবি হাজির করে এই আদেশটি। তাতে বলা হয়, অটলভাবে, শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে প্রতিটি অবস্থান, মাতৃভূমির প্রতি ইঞ্চি মাটি রক্ষা করতে হবে। কাপুরুষ, আতঙ্ক সৃষ্টিকারী ও নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম ঘোষণা করা হয়। ২২৭ নং আদেশটি সশস্ত্র সংগ্রাম চলাকালে এক বৃহৎ ভূমিকা পালন করে।

* Hubatsch W. Hitlers Weisungen für die Kriegsführung. 1939-1945, S. 194-195.

ওই সময় স্তালিনগ্রাদ ফ্রন্টের সৈন্যরা দনের বৃহৎ বাঁকে শত্রুর সংখ্যাগরিষ্ঠ বাহিনীগুলোর সঙ্গে কঠোর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। বীরত্বের সঙ্গে লড়ে ৬২তম ও ৬৪তম বাহিনীগুলোর যোদ্ধারা। শত্রুর ঝট করে ভোলগায় পৌঁছে যাওয়ার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছিল। প্রতিরক্ষারত বাহিনীসমূহের প্রতিঘাত আর প্রতিআক্রমণও এ কাজে আনুকূল্য করেছিল।

সোভিয়েত ফৌজের ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধ ক্ষমতা জার্মান- ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলীকে ককেশাস অভিমুখ থেকে স্তালিনগ্রাদ অভিমুখে ৪র্থ ট্যাঙ্ক বাহিনীকে প্রেরণ করতে বাধ্য করে, ওখানে স্থানান্তরিত হয়েছিল ৪র্থ বিমান বহরটিও। স্তালিনগ্রাদের উপকণ্ঠগুলোতে লড়াই ক্রমশই কঠোর হয়ে উঠছিল। এবার ফ্যাসিস্ট গ্রুপিংটি স্তালিনগ্রাদ রক্ষাকারী সোভিয়েত বাহিনীগুলোকে ট্যাঙ্কে ছাড়িয়ে যায় ৪ গুণ, আর্টিলারি ও বিমানে ২ গুণেরও বেশি। স্তালিনগ্রাদের উপকণ্ঠে নতুন নতুন জার্মান বাহিনী প্রেরিত হচ্ছিল ককেশাস থেকে। ২৩ আগস্ট পাউলুসের বাহিনীর সৈন্যরা সোভিয়েত প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে স্তালিনগ্রাদের উত্তরে ভোলগায় পৌঁছে যায়। ওই দিনই জার্মান বিমান বাহিনীর ব্যাপক হামলার ফলে শহরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। শত্রুর আক্রমণের প্রবলতা ক্রমশই বাড়ছিল। জেনারেলগণ র. মালিনোভ্স্কি, ক. মস্কালেঙ্কো, ন. ক্রিলোভ, ভ. চুইকোভ ও ম. শুমিলোভের বাহিনীসমূহের যোদ্ধারা অটল লড়াইয়ে লিপ্ত থেকে মাতৃভূমির সূচ্যগ্র মেদিনীও রক্ষা করছিল এবং ফ্যাসিস্টদের শোচনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছিল।

সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বরে সংগ্রাম চলছিল খোদ শহরে। প্রতিটি রাস্তা, প্রতি বাড়ির জন্য চলে ক্ষিপ্ত লড়াই। নৈশ লড়াইয়ের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। নিপুণভাবে লড়ছিল ঝঞ্ঝাক্রমণকারী গ্রুপগুলো আর স্নাইপাররা। ১৩ বার এক হাত থেকে অন্য হাতে যায় রেল স্টেশনটি। দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হয় সার্জেণ্ট পাভলোভের উপকথাসুলভ বাড়িটি, লেফটেনেণ্ট জাবলোত্নি-র বাড়িটি, ৪ নং ময়দা-কলটি। কিন্তু তা সত্ত্বেও শত্রু শহরের বড় একটি অংশ দখল করতে এবং কয়েকটি জায়গায় ভোলগায় পৌঁছে যেতে সমর্থ হয়।

১৯৪২ সালের ১৮ নভেম্বর স্তালিনগ্রাদ লড়াইয়ের প্রতিরক্ষা পর্বটি সমাপ্ত হয়। এ পর্বে জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীগুলোর প্রায় ৭ লক্ষ সৈনিক হতাহত হয়, তারা হারায় ২ সহস্রাধিক তোপ ও মর্টার কামান, সহস্রাধিক ট্যাঙ্ক ও স্বচালিত কামান, ১,৪০০টির বেশি জঙ্গী ও পরিবহণ প্লেন।

নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলীর দ্রুত স্তালিনগ্রাদ দখলের পরিকল্পনা এবং ১৯৪২ সালের সমগ্র গ্রীষ্ম-শরতকালীন অভিযানের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। সোভিয়েত সৈন্যরা প্রতিরক্ষা কার্যে সাহসিকতা ও দৃঢ়তা, উচ্চ সামরিক নৈপুণ্য ও বিপুল বীরত্বের পরিচয় দেয়। তারা স্তালিনগ্রাদ অঞ্চলে জার্মানদের যুদ্ধরত প্রধান গ্রুপিংটিকে নাস্তানাবুদ ও শক্তিহীন করে দেয়, যায় ফলে পাল্টা-আক্রমণ আরম্ভ করার পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে ওঠে।

ককেশাসের প্রতিরক্ষা
(১৯৪২ সালের ২৫ জুলাই — ৩১ ডিসেম্বর)

১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালীন অভিযানের সাধারণ পরিকল্পনা অনুসারে জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি সময়ে সরাসরি ককেশাস দখলের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করে (জার্মান সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীর ১৯৪২ সালের ২৩ জুলাই তারিখের ৪৫ নং নির্দেশ), যার সাঙ্কেতিক নাম ছিল 'এডেলভেইস'। এর উদ্দেশ্য ছিল — রস্তভের দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পূর্বে দনের অন্য পারে দক্ষিণ ফ্রন্টের পশ্চাদ্বর্তী বাহিনীগুলোকে ঘিরে ফেলা ও উত্তর ককেশাস অধিকার করে নেওয়া। পরে পশ্চিম ও পূর্ব থেকে বৃহৎ ককেশাস ঘিরে ফেলে বাহিনীগুলোর একটি গ্রুপ দিয়ে নভোরসিইস্ক ও তুআপ্সে শহর দুটি আর অন্যটি দিয়ে গ্রজ্নি ও বাকুর তৈল সমৃদ্ধ অঞ্চলসমূহ দখল করার কথা ছিল। একই সময়ে গিরিপথ দিয়ে জলবিভাজক পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করে ত্‌বিলিসি, কুতাইসি ও সুখুমি অঞ্চলসমূহে পৌছার পরিকল্পনা গড়া হচ্ছিল।

নাৎসিরা আশা করেছিল যে ট্রান্স-ককেশাসে ঢুকতে পারলে তারা ওখানে অবস্থিত কৃষ্ণ সাগরীয় নৌ-বহরের ঘাঁটিগুলো অকেজো করে দিয়ে কৃষ্ণ সাগরে নিজের পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে এবং তুরস্কের সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে (তুরস্কের ২৬ ডিভিশন সৈন্য ইতিমধ্যেই সোভিয়েত সীমান্তে মোতায়েন ছিল)। ফ্যাসিস্টদের হিসাব মতো, ককেশাসের জাতিসমূহের মধ্যে ঝগড়াবিবাদ শুরু হওয়ার কথা ছিল এবং এই সমস্ত ঝগড়াবিবাদকে কেন্দ্র করে তাদের বিশেষ আশাভরসা ছিল।

এই সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে শত্রু জেনারেল-ফিল্ডমার্শাল ভ. লিস্টের সেনাপতিত্বে বাহিনীসমূহের 'A' গ্রুপটিকে কাজে লাগায়। গ্রুপে ছিল: ১ম ও ৪র্থ ট্যাঙ্ক বাহিনী, ১৭শ ও ৩য় (রুমানীয়) বাহিনী ও ৪র্থ বিমান বহরের ইউনিটগুলো, সর্বমোট ১ লক্ষ ৬৭ হাজার লোক, ১,১৩০টি ট্যাঙ্ক, ৪,৫৪০টি তোপ ও মর্টার কামান, ১ হাজার বিমান। শত্রুর গ্রুপিংয়ের বিরুদ্ধে খাড়া ছিল দক্ষিণ ফ্রন্টের বাহিনীগুলো এবং উত্তর-ককেশীয় ফ্রন্টের শক্তির একাংশ — ৫১তম, ৩৭তম, ১২শ, ১৮শ, ৫৬তম বাহিনীগুলো ও ৪র্থ বিমান বাহিনী, যেগুলোতে ছিল ১ লক্ষ ১২ হাজার লোক, ১২১টি ট্যাঙ্ক, ২,১৬০টি তোপ ও মর্টার কামান, ১৩০টি বিমান। শত্রু দক্ষিণ ফ্রন্টের বাহিনীসমূহকে জনবলে ১·৫ গুণ, আর্টিলারিতে ২ গুণ, ট্যাঙ্কে ৯ গুণেরও বেশি এবং বিমানে প্রায় ৮ গুণ ছাড়িয়ে যায়।

সোভিয়েত বাহিনীসমূহের কর্তব্য ছিল — একরোখা প্রতিরক্ষা-মূলক লড়াইয়ে দুশমনকে নাজেহাল করা, রুখে দেওয়া এবং চূড়ান্ত আক্রমণাভিযান আরম্ভ করার জন্য পরিবেশ প্রস্তুত করা।

১৯৪২ সালের জুলাইয়ের শেষ দিক থেকে সাল্স্ক, স্তাভ্রপোল ও ক্রাস্নদার অভিমুখে কঠোর লড়াই শুরু হয়। জেনারেল র. মালিনোভ্স্কির পরিচালনাধীন দক্ষিণ ফ্রন্টের বাহিনীগুলো শত্রুর প্রবলতর শক্তির আঘাত সইতে না পেরে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। দু'দিনের মধ্যে নাৎসিরা ৮০ কিলোমিটার এগিয়ে যায়, আর তাদের ট্যাঙ্ক বাহিনীগুলো পৌঁছে যায় দনের ও সাল্স্কের স্তেপে এবং তাদের ককেশাসের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ার বিপদ দেখা দেয়। পরিস্থিতি বিবেচনা করে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর সদর-দপ্তর জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করল: ২৮ জুলাই উত্তর-ককেশীয় ও দক্ষিণ ফ্রন্টগুলোকে মার্শাল স. বুদিওন্নির সেনাপতিত্বে একটি ফ্রন্টে — উত্তর-ককেশীয় ফ্রন্টে যুক্ত করা হয়। এই ফ্রন্টের অধীনে চলে আসে কৃষ্ণ সাগরীয় নৌ-বহর ও আজভ সাগরের সামরিক ফ্লোটিল্যা। বাহিনীগুলোর কাজ ছিল — দনের দক্ষিণ তীর বরাবর হারানো অবস্থান পুনরুদ্ধার করা। খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করছিল ট্রান্স-ককেশীয় ফ্রন্টের (অধিনায়ক জেনারেল ই. তিউলেনেভ) সৈন্যরা, যারা লাজারেভস্কোয়ে থেকে বাতুমী পর্যন্ত কৃষ্ণ সাগরের উপকূল এবং সোভিয়েত-তুরস্ক সীমান্ত ও ইরানের উত্তরাঞ্চলগুলো রক্ষা করছিল।

গৃহীত ব্যবস্থাদির দ্বারা শত্রুর আক্রমণাভিযান কিছুটা ঠেকানো গেল, কিন্তু কয়েকটি জায়গায় সে তার অগ্রগতি অব্যাহত রাখে, মাইকোপ, ক্রাস্নদার, মজদোক দখল করে নেয় এবং কুবান ও তেরেক নদীগুলো পেরিয়ে যায়। তবে দুশমন গ্রজ্‌নিতে পোঁছতে পারে নি। সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে নাৎসিরা প্রধান ককেশাস পর্বতশ্রেণীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গিরিপথগুলো অধিকার করে নেয়। তাতে সুখুমি ও কুতাইসি শত্রু কবলিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। একরোখা প্রতিরোধের দ্বারা সোভিয়েত সৈন্যরা ওখানে ফ্যাসিস্টদের প্রতিরক্ষায় লিপ্ত হতে বাধ্য করে।

নভোরসিইস্ক অঞ্চলে কঠোর লড়াই শুরু হল। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে শত্রু ১০ সেপ্টেম্বর তারিখে শহরটি অধিকার করতে সক্ষম হল। সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সোভিয়েত সৈন্যরা একরোখা প্রতিরক্ষামূলক লড়াই চালিয়ে যায়। ওর্জনিকিদ্‌জে অভিমুখে শত্রুকে রুখে দেওয়া হয়েছিল ওর্জনিকিদ্‌জে শহরের উপকণ্ঠে, আর এর পর সোভিয়েত ফৌজের প্রবল প্রতিঘাতের পর তার প্রধান আক্রমণকারী গ্রুপিং — ১ম ট্যাঙ্ক বাহিনীটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রতিরক্ষায় লিপ্ত হতে বাধ্য হয়।

প্রধান ককেশাস পর্বতশ্রেণীর মধ্যভাগের গিরিপথগুলো দিয়ে জার্মানদের ট্রান্স-ককেশাসে ঢোকার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হল। সফল প্রতিঘাত হানার কাজে লিপ্ত সোভিয়েত ইউনিটগুলোর প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে ফ্যাসিস্টরা নভেম্বরের শেষ দিকে ওখানেও প্রতিরক্ষামূলক লড়াই আরম্ভ করতে বাধ্য হয়। নাৎসিরা তুআপ্‌সে অভিমুখে প্রধান ককেশাস পর্বতশ্রেণীও অতিক্রম করতে পারে নি। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত ওখানে কঠোর লড়াই চলছিল এবং শত্রু শোচনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আক্রমণাভিযান বন্ধ করে প্রতিরক্ষার দিকে মন দেয়।

এই ভাবে, ককেশাসের কঠিন প্রতিরক্ষা চলে পাঁচ মাস ধরে এবং সোভিয়েত সৈন্যরা জার্মানদের ট্রান্স-ককেশাস দখল করতে, গ্রজ্‌নি ও বাকুর তৈল সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলো করায়ত্ত করতে দিল না, শত্রুকে রুখে দিল এবং তার প্রভূত ক্ষতি ঘটাল, — লক্ষাধিক লোককে সে হারাল। এর ফলে নাৎসিরা ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে স্তালিনগ্রাদের উপকণ্ঠে — যেখানে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর পাল্টা-আক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছিল — শক্তি প্রেরণ করতে সমর্থ হয় নি।

ককেশাসের প্রতিরক্ষায় সোভিয়েত বাহিনীগুলোকে বিপুল সহায়তা জোগায় উত্তর ককেশাস, জর্জিয়া, আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার মেহনতীরা। শত্রু নিধনের জন্য তারা তাদের আত্মোৎসর্গী শ্রমের দ্বারা রণাঙ্গনকে প্রয়োজনীয় সমস্তকিছুই জোগাচ্ছিল, প্রতিরক্ষা লাইনসমূহ নির্মাণে অংশগ্রহণ করছিল, জন স্বেচ্ছা-বাহিনী, ধ্বংসকারী ও পার্টিজান দল, জাতীয় ফর্ম্যাশন ইত্যাদি গঠন করছিল। ককেশাস রক্ষা করছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত জাতির প্রতিনিধিরা। কঠোর সংগ্রামের আগুনে সুদৃঢ় ও পোড় খেয়ে উঠে সোভিয়েত দেশের সমস্ত জাতির সঙ্গে ককেশীয় জাতিসমূহের মৈত্রী।

মস্কো, স্তালিনগ্রাদ ও ককেশাসের প্রতিরক্ষা স্পষ্ট দেখিয়ে দিল সোভিয়েত যোদ্ধাদের দৃঢ়তা, সাহসিকতা, বীরত্ব, সোভিয়েত জেনারেল আর অফিসারদের সামরিক পারদর্শিতা। সমগ্র বিশ্ব সমাজতন্ত্রের জীবনীশক্তিতে ও অপরাজেয়তায় বিশ্বাস করতে শুরু করল।

সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে যুদ্ধের প্রতিরক্ষা পর্বে কেবল ভূখণ্ড রক্ষার জাতীয় সমস্যাবলিই সমাধান করা হচ্ছিল না, আন্তর্জাতিক সমস্যাবলিও সমাধান করা হচ্ছিল, — শত্রুর বিশ্বাধিপত্য লাভের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হচ্ছিল। এ প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের নেতারা বলেছিলেন যে রুশরা যদি মস্কো ও স্তালিনগ্রাদের নিকটে শত্রুকে দমন করতে না পারত তাহলে জার্মান সৈন্যদের আমেরিকা ও ইংলণ্ড আক্রমণের সম্ভাবনা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করত।*

৬। প্রশান্ত মহাসাগরে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানী আগ্রাসন (১৯৪১ সালের জুন — ১৯৪২ সালের অক্টোবর)

খাসান হ্রদ এবং খালখিন-গোল নদীর তীরে প্রাপ্ত তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বিবেচনা করে জাপানী সেনাপতিমণ্ডলী ঠিক করল যে প্রথমে তারা প্রশান্ত মহাসাগরে আধিপত্য লাভ করে নিজের পশ্চাদ্ভাগ সুদৃঢ় করে তুলবে এবং কেবল তারপরই সমস্ত শক্তি দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণ আরম্ভ করবে। তারা এই আশা পোষণ করছিল যে ওই সময়

* Leany W. I was There. — London, 1950, p. 100; Stettinius E. Roosevelt and the Russians. — Garden City, 1949, p. 7.

নাগাদ সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী ফ্যাসিস্ট জার্মানি কর্তৃক বিধ্বস্ত হয়ে যাবে।

প্রশান্ত মহাসাগরে প্রধান মার্কিন সামরিক নৌ-ঘাঁটি ও বিমান ঘাঁটিগুলোর উপর আকস্মিক আঘাত হানার, ওখানে অবস্থিত মার্কিন নৌ-বহর ও বিমান বাহিনীর প্রধান শক্তিসমূহকে ধ্বংস করে ঘাঁটিগুলো দখল করে নেওয়ার কথা ছিল। একই সঙ্গে দ্রুত গতিতে ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, বর্মা, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, নিউ গিনি ও সলোমন দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করারও পরিকল্পনা ছিল। এর পরে জাপানীদের ইচ্ছে ছিল কুরিল ও ম্যারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ, বিসমার্ক দ্বীপপুঞ্জ, ইন্দোনেশিয়ার সীমান্তে, মালয় ও বর্মার পশ্চিম সীমান্তে পৌঁছার, অধিকৃত যুদ্ধ-সীমা সুদৃঢ় করার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করার।

সমরবাদী জাপানের এরূপ পরিকল্পনা কার্যকর ছিল না, কেননা তাতে দেশের সীমিত সামরিক-অর্থনৈতিক সম্ভাবনার কথা বিবেচিত হয় নি। শক্তিশালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের সামরিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতার কথা বিচার করলে জাপানের পক্ষে সুদীর্ঘ যুদ্ধ চালানো সম্ভব ছিল না।

১৯৪১ সালের শেষের দিকে জাপানের সশস্ত্র বাহিনীতে ছিল: স্থল সেনা — ৯৯ ডিভিশন, ২৯টি স্বতন্ত্র ব্রিগেড, ১৮টি স্বতন্ত্র রেজিমেণ্ট (ক্রীড়নক রাষ্ট্রসমূহের সৈন্য বাহিনী এবং অনেকগুলো সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বাদ দিয়ে); সামরিক নৌ-বহর — ১০টি রণপোত, ১০টি বিমানবাহী জাহাজ, ৩৭টি ক্রুজার, ১১৩টি টর্পেডো জাহাজ, ৬৩টি ডুবো জাহাজ; বায়ু সেনা — ৬,৯৪৬টি বিমান, তার মধ্যে ৩,৭৪০টি জঙ্গী। ওগুলোর মধ্যে সামুদ্রিক বিমান বাহিনীরও ১,৭০০টি বিমান ছিল, যার ৫৭৫টি অবস্থিত ছিল বিমানবাহী জাহাজসমূহে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সামরিক ক্রিয়াকলাপের জন্য ছিল ২,২৭৫টি বিমান। ১ম লাইনে ছিল সর্বমোট ২,৬০০টি নতুন বিমান।

আক্রমণাত্মক পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে জাপানী সেনাপতিমণ্ডলী অপারেটিভ নৌ-ইউনিটগুলো গড়ল, যার মধ্যে ছিল আক্রমণকারী বিমানবাহী জাহাজ ইউনিট, ফিলিপাইন ইউনিট ও দক্ষিণ ইউনিট। এই সমস্ত সামুদ্রিক ইউনিটে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল নৌ-বহর আর বিমান বাহিনীর প্রধান শক্তিসমূহ। তাছাড়া প্রশান্ত মহাসাগরের অঞ্চলে

সামরিক ক্রিয়াকলাপের জন্য নির্ধারিত ছিল ১৫টি ডিভিশন, ৬টি ট্যাংক রেজিমেণ্ট, একটি মিশ্র গ্রুপ ও ঘাঁটির সৈন্যদল — সর্বমোট ৪ লক্ষ সৈনিক আর অফিসার।

মার্কিন ও ব্রিটিশ সেনাপতিমণ্ডলীর পরিকল্পনা ছিল এরূপ: প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বিদ্যমান শক্তির সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা জাপানীদের আক্রমণ প্রতিহত করা, আর নতুন বাহিনীগুলো এলে শত্রুকে বিধ্বস্ত করে দেওয়া।

১৯৪১ সালের শেষ দিকে, অর্থাৎ জাপানের সঙ্গে যুদ্ধের শুরুতে, প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডের সশস্ত্র বাহিনীগুলোতে ছিল ২২টি ডিভিশন (৩ লক্ষ ৭০ হাজারেরও বেশি লোক), ১১টি রণপোত, ৩টি বিমানবাহী জাহাজ, ৩৫টি ক্রুজার, ১০০টি টর্পেডো জাহাজ, ৬৯টি ডুবো জাহাজ, ১,৫২০টি বিমান (এর মধ্যে ২২০টি ছিল বিমানবাহী জাহাজগুলোতে)। এই সমস্ত শক্তি ছড়ানো ছিল প্রশান্ত মহাসাগর ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিশাল এক ভূখণ্ডে।

অতএব, প্রশান্ত মহাসাগরে সুবিধাজনক স্ট্র্যাটেজিক অবস্থানের অধিকারী জাপানের পক্ষে অল্প সময়ের মধ্যে নির্বাচিত দিকগুলোতে মিত্রদের উপর শক্তির যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করা সম্ভব ছিল। প্রভাবের ক্ষেত্র নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যে বিরোধিতার দরুন এবং এই হেতু মিত্র বাহিনীসমূহের এক অভিন্ন সেনাপতিমণ্ডলীর অনুপস্থিতির দরুন জাপান আরও বেশি স্ট্র্যাটেজিক শ্রেষ্ঠতা লাভ করল।

১৯৪১-১৯৪২ সালগুলোর কাল পর্যায়ে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য সামরিক অপারেশনগুলো ছিল: ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর তারিখে পার্ল হার্বারে মার্কিন সামরিক নৌ-ঘাঁটির উপর জাপানের আচমকা আক্রমণ, মালয় অপারেশন (১৯৪১ সালের ডিসেম্বর — ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারি), ১৯৪২-এর মে মাসে প্রবাল সাগরে ও জুলাই মাসে মিডওয়ে দ্বীপের কাছে সংঘটিত লড়াই, ১৯৪৪ সালের ফিলিপাইন আর জাভা অপারেশন।

পার্ল হার্বারের উপর হামলা

জাপানীদের এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বহরের মূল শক্তিসমূহ বিধ্বস্ত করে দেওয়া, প্রশান্ত মহাসাগরে

আধিপত্য লাভ করা এবং প্রধান স্ট্র্যাটেজিক অভিমুখে — দক্ষিণ সমুদ্রসমূহের এলাকায় আক্রমণাভিযানের সাফল্য নিশ্চিত করা। ১৯৪১ সালের ২৬ নভেম্বর জাপানী বিমানবাহী জাহাজগুলোর একটি ইউনিট — তাতে ছিল ৬টি বিমানবাহী জাহাজ (৩৫৩টি বিমান), ২টি রণপোত, ৩টি ক্রুজার, ১১টি ডেস্ট্রয়ার ও ৩টি ডুবো জাহাজ* — কুরিল দ্বীপপুঞ্জের ঘাঁটি ত্যাগ করে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ৭ ডিসেম্বর সকালের দিকে পার্ল হার্বার থেকে ৩৬০ কিলোমিটার উত্তরে গিয়ে পৌঁছে যায়। এই মার্কিন ঘাঁটিতে অবস্থিত ছিল ৯৪টি পোত ও সহায়ক জাহাজ, যার মধ্যে ছিল ৯টি রণপোত, ৮টি ক্রুজার, ২৯টি ডেস্ট্রয়ার, ৫টি ডুবো জাহাজ, ৯টি মাইন-প্ল্যান্টার ও ১০টি মাইন সুইপার। পার্ল হার্বারের বিমান বাহিনীতে ছিল ৩৯৪টি প্লেন, আর বিমানবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ছিল ২৯৪টি বিমানধ্বংসী কামান। গ্যারিসনে ছিল ৪২, ৯৫৯ জন লোক। কিন্তু ঘাঁটির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং নৌ ও বিমান অনুসন্ধান কার্য যথাযোগ্যরূপে সংগঠিত ছিল না। ৭ ডিসেম্বর জাহাজগুলোর বহু কর্মীকে তীরে যাওয়ার ছুটি দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে বিমানবাহী জাহাজগুলো থেকে অন্তরীক্ষে উত্থিত জাপানী প্লেনসমূহ বিমান বন্দর আর পোতাশ্রয়ের উপর আচমকা আঘাত হানতে এবং আমেরিকানদের প্রচুর ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছিল। অকেজো করে দেওয়া হয়েছিল ৯টি মার্কিন রণপোতের মধ্যে ৮টি (৪টি জলমগ্ন হয় ও ৪টি নষ্ট হয়), ৬টি ক্রুজার, ১টি ডেস্ট্রয়ার ও অনেকগুলো ছোট ছোট জাহাজ; ধ্বংস ও নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল ২৭২টি বিমান। মার্কিন সৈন্যদের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা ছিল ৩,৪০০। জাপানীরা হারায় কেবল ২৯টি বিমান, ১টি ডুবো জাহাজ ও ৫টি অতি ক্ষুদ্র ডুবো জাহাজ।

পার্ল হার্বারে অবস্থিত ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌ-বহরের প্রধান শক্তিসমূহ। ওখানে প্রবল হামলা হওয়ার ফলে জাপানের অনুকূলে শক্তির অনুপাতে তীব্র পরিবর্তন ঘটে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমাংশে ও দক্ষিণ সমুদ্রসমূহের এলাকায় তার পক্ষে দ্রুত গতির আক্রমণাভিযানের জন্য সুপরিস্থিতি গড়ে ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস

* তাছাড়া ডুবো জাহাজগুলোর একটি ইউনিটও ছিল যাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ২৭ খানা সাবমেরিন।

পরিচালিত তদন্ত থেকে জানা যায় যে পার্ল হার্বারে বিপর্যয়ের প্রধান কারণটি নিহিত ছিল ঘাঁটিস্থ মার্কিন সেনাপতিমণ্ডলীর নির্ভাবনায়।

পার্ল হার্বার অপারেশনের বৈশিষ্ট্য ছিল জাপানী সেনাপতিমণ্ডলী কর্তৃক পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপের দৃঢ়তা এবং উচ্চ গতিশীলতা। তবে জাপানী সেনাপতিমণ্ডলীর গুরুতর ভুলভ্রান্তিও হয়েছিল। যেমন, ওয়াহু দ্বীপের নিকটবর্তী অঞ্চলে নির্ভরযোগ্য অনুসন্ধান ব্যবস্থা না থাকাতে তারা মার্কিন বিমানবাহী জাহাজগুলো আবিষ্কার করতে পারে নি। ওগুলোর মধ্যে একটি জাহাজ — 'অ্যাণ্টারপ্রাইজ' — অবস্থিত ছিল প্রধান ঘাঁটি থেকে ২১০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, আর অন্যটি 'লেকসিংটন' — ৭০০ মাইল দূরে। এর দরুন জাপানীদের আঘাত এই বিমানবাহী জাহাজগুলোর উপর না পড়ে রণপোতগুলোর উপর পড়ল। অথচ, খোদ আমেরিকানরাই স্বীকার করেছিল, রণপোতগুলো 'আধুনিকতম জাপানী রণপোতের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার পক্ষে এবং নতুন মার্কিন দ্রুতগামী বিমানবাহী জাহাজের সঙ্গে চলাফেরা করার পক্ষে খুবই দুর্বল ছিল।'*

জাপানীরাও পার্ল হার্বারের ঘাঁটির উপর দ্বিতীয় বার আঘাত হানার সুযোগ নিল না, -- ওখানে কেন্দ্রীভূত ছিল বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, জ্বালানি (৪ লক্ষ টন ব্ল্যাক ওয়েল) ও অন্যান্য দ্রব্যাদি। এই সমস্ত জিনিসের ক্ষতিপূরণ করতে সুদীর্ঘ কালের প্রয়োজন হত এবং তাতে পার্ল হার্বারকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বাহিনীর ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করার কাজ অনেকটা সীমিত হয়ে পড়ত।

মালয় অভিযান

জাপানী সৈন্য ও নৌ-বহর এই অভিযানটি চালায় ১৯৪১-এর ৮ ডিসেম্বর থেকে ১৯৪২-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এর উদ্দেশ্য ছিল — স্ট্র্যাটেজিক কাঁচামাল সমৃদ্ধ এবং প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রদের স্ট্র্যাটেজিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সাধারণ ফ্রণ্টে বনিয়াদী অবস্থানের অধিকারী ব্রিটিশ মালয় দখল করা।

অভিযানের পরিকল্পনা অনুসারে বিপক্ষের বিমান বাহিনীকে দমন

করার ও আকাশে আধিপত্য লাভ করার উদ্দেশ্যে উত্তর মালয়ের বিমান বন্দরগুলোর উপর আকস্মিক বিমানাক্রমণ চালানোর এবং একই সঙ্গে বড় বড় নৌ-সৈন্যদল নামিয়ে ও মালয়ের পূর্ব আর পশ্চিম উপকূল বরাবর স্থলসেনার দ্বারা দ্রুত আক্রমণ চালিয়ে সিঙ্গাপুর অধিকার করে নেওয়ার কথা ছিল। অপারেশন সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত হয়েছিল জেনারেল ইয়ামাসিতার পরিচালনাধীন প্রায় ৭০ হাজার সৈন্যের ২৫তম জাপানী বাহিনীটি, প্রায় ৬০০টি জঙ্গী বিমান বিশিষ্ট ৩য় বিমান ইউনিটটি এবং নৌ-বহরের মালয় অপারেশন্যাল ফর্ম্যাশনটি যাতে ছিল ৯টি ক্রুজার, ১৬টি ডেস্ট্রয়ার, ১৬টি সাবমেরিন ও অনেকগুলো পরিবহণ আর সহায়ক জাহাজ।

ব্রিটিশ মালয় প্রতিরক্ষার কাজে লিপ্ত ছিল জেনারেল পের্সিভালের পরিচালনাধীন ৩টি ব্রিটিশ ডিভিশন ও স্বতন্ত্র ইউনিটগুলো, মোট ১ লক্ষ লোক। তাদের সমর্থন জোগাচ্ছিল পূর্ব নৌ-বহর যাতে ছিল ১টি রণপোত, একটি ব্যাট্‌ল ক্রুজার, ৩টি ক্রুজার, ৯টি ডেস্ট্রয়ার ও উপকূলীয় বিমান বাহিনীর প্রায় ২৫০টি বিমান। ইংরেজদের কাছে এক স্কোয়াড্রন ওলন্দাজ সাবমেরিনও ছিল। তাছাড়া, অপারেশন চলা কালে ব্রিটিশরা সিঙ্গাপুরে অতিরিক্ত ৪৫ হাজার লোক ও ১৪১টি বিমান প্রেরণ করেছিল।

সিঙ্গাপুর দুর্গে ছিল ৪০৬ মিলিমিটার অবধি ক্যালিবরের তোপ, ৫টি বিমান ঘাঁটি, বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ আর খাদ্যদ্রব্য। কিন্তু উপদ্বীপে অবতরণ বাহিনীবিরোধী ভালো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। স্থলসেনা, বিমান বাহিনী ও নৌ-বহরের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ছিল না বললেই চলে। ব্রিটিশ জেনারেল, অ্যাডমিরাল আর অফিসারদের পেশাগত দক্ষতার মান ছিল নিম্ন। সৈনিকরাও তেমন রণনিপুণ ছিল না।

আক্রমণের জন্য জাপানী সৈন্যদের প্রস্তুতি ও প্রসারণ কার্য সম্পন্ন হয় সময় মতো। সমুদ্র পথে অবতরণ বাহিনী প্রেরণ কালে তাদের নিরাপত্তা বিধান করে সাধারণ জাহাজ, সাবমেরিন আর ইন্দোচীনের বিমান ঘাঁটিসমূহ থেকে উন্নয়নকারী প্লেনগুলো। ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর কতা-বারু ও সঙ্‌খ্‌লা (সিনগোরা) অঞ্চলগুলোতে জাপানী ফৌজের অবতরণ আরম্ভ হয়ে যায়। উপকূল ভাগে জাপানী সৈন্যরা অবতরণের সময় ইংরেজদের তরফ থেকে বিশেষ প্রতিরোধ পায় নি। অবতরণ বাহিনীকে প্রতিরোধ দানের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সেনাপতিমণ্ডলী সিঙ্গাপুর থেকে শ্যাম উপসাগর অভিমুখে তাদের পূর্ব স্কোয়াড্রনটি প্রেরণ করে। তাতে ছিল রণপোত 'প্রিন্স অফ ওয়েলস', ব্যাট্‌ল ক্রুজার 'রিপাল্‌স' এবং ৪টি ডেস্ট্রয়ার।

কিন্তু স্কোয়াড্রন পাঠিয়ে কোন ফল হল না। ব্রিটিশ জাহাজগুলো অন্তরীক্ষ থেকে প্রতিরক্ষা ছাড়াই চলছিল। ওগুলোকে খুঁজে বার করে জাপানীরা ১০ ডিসেম্বর বিমান থেকে বোমা ফেলে রণপোত আর ব্যাট্‌ল ক্রুজারটি ডুবিয়ে দেয়। তাতে ইংরেজরা আরও বেশি দুর্বল হয়ে পড়ে।

একই সঙ্গে মালয়ের পশ্চিম ও পূর্ব উপকূল বরাবর আক্রমণাভিযানে লিপ্ত ২৫তম জাপানী বাহিনী ইংরেজদের তরফ থেকে প্রবল প্রতিরোধ পেল না। ১৯৪২ সালের ৩১ জানুয়ারি জাপানী সৈন্যরা ব্রিটিশ মালয়ের সবচেয়ে দক্ষিণের শহর জহর-বারু দখল করে নেয়। ব্রিটিশ আর মালয়ী ইউনিটগুলো সিঙ্গাপুরের দিকে হটে যায়, কিন্তু ওখানেও তারা বেশিকাল টিকতে পারে নি। ৮ ফেব্রুয়ারি জাপানীরা জহর প্রণালী পার হয়ে সিঙ্গাপুরে নামে, আর ১৫ ফেব্রুয়ারি দুর্গটি দখল করে ফেলে।

মালয় অভিযান চলা কালে জাপানীরা দূর প্রাচ্যে ব্রিটিশ সৈন্যের সবচেয়ে শক্তিশালী গ্রুপিংটিকে বিধ্বস্ত করে দেয়, উত্তরাভিমুখে বর্মার দিকে এবং দক্ষিণ-পূর্ব অভিমুখে নেদার্ল্যান্ডস ইন্ডিজের দিকে আক্রমণাভিযান চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে সুবিধাজনক স্ট্র্যাটেজিক অবস্থানগুলো নিয়ে নেয়। ১ লক্ষ ৪০ হাজার ইংরেজ সৈন্য হতাহত ও বন্দী হয়, আর জাপানীদের হতাহতের সংখ্যা ছিল প্রায় ১০ হাজার।

অপারেশনের সাফল্য এবং স্থলভাগ থেকে সিঙ্গাপুর দুর্গ অধিকার সম্ভব হয়েছিল বড় বড় নৌ-সৈনিকদলের আকস্মিক অবতরণের জন্য, বিমান ঘাঁটিগুলোতে ব্রিটিশ প্লেনগুলো ধ্বংস করে আকাশে আধিপত্য লাভের জন্য এবং জাপানী স্থলসেনাদের আক্রমণাভিযানের দ্রুত গতির জন্য। হতভম্ব ইংরেজরা অবতরণ বাহিনীবিরোধী প্রতিরক্ষা ও বিভিন্ন ধরনের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা সংগঠন করতে পারে নি এবং অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত বৃহৎ গ্যারিসন বিশিষ্ট সিঙ্গাপুর দুর্গ রক্ষা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

প্রবাল সাগরে এবং মিডওয়ে দ্বীপের কাছে লড়াই (১৯৪২)

প্রশান্ত মহাসাগরে এটাই ছিল জাপানী নৌ-বাহিনীর প্রথম লড়াই, যাতে কোন পক্ষই কোন পক্ষকে পরাস্ত করতে পারে নি। নিউ গিনি দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব অংশটি অধিকারের উপর বিপুল তাৎপর্য আরোপকারী জাপানীরা প্রবাল সাগরে অতি গুরুত্বপূর্ণ মর্স্‌বি বন্দরটি দখল করার

সিদ্ধান্ত নিল। মার্কিন সেনাপতিমণ্ডলী জাপানীদের এই পরিকল্পনাটি ব্যর্থ করে দিতে প্রয়াসী হল।

১৯৪২ সালের ৭-৮ মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্কোয়াড্রন (১৪৩টি বিমান সমেত ২টি বিমানবাহী জাহাজ, ৮টি ক্রুজার ও ১১টি ডেস্ট্রয়ার) এবং জাপানের স্কোয়াড্রনের (১২৫টি প্লেন সহ ১টি হালকা ও ২টি ভারী বিমানবাহী জাহাজ, ৯টি ক্রুজার, ১৫টি ডেস্ট্রয়ার ও অন্যান্য জাহাজ) মধ্যে এক নৌ-যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যটি ছিল এই যে সমর কৌশলের ইতিহাসে সেই প্রথম বার কোন জাহাজ থেকে বিপক্ষের কোন জাহাজের উপর তোপ দাগা হয় নি। লড়াই চালিয়ে যায় কেবল জাহাজের টর্পেডোবাহী বিমান আর বোমারুগুলো, যা আকাশ থেকে আক্রমণ চালিয়ে সর্বাগ্রে শত্রুর বিমানবাহী জাহাজগুলো ধ্বংস করতে চেষ্টা করছিল।

৭ মে সকাল বেলা আমেরিকানরা জাপানী স্কোয়াড্রন খুঁজে বার করে বিমানবাহী জাহাজের প্লেন থেকে বোমাবর্ষণ করে জাপানীদের 'সেখো' নামক হালকা বিমানবাহী জাহাজটি ডুবিয়ে দেয়। পরের দিন ক্ষতিগ্রস্ত হয় জাপানী বিমানবাহী জাহাজ 'সেকাকু' এবং মার্কিন বিমানবাহী জাহাজ 'ইয়র্কটাউন' ও 'লেক্সিংটন'। আমেরিকানরা সব মিলিয়ে হারায় ১টি বিমানবাহী জাহাজ, ১টি ট্যাঙ্কার, ১টি ডেস্ট্রয়ার, ৬৬টি বিমান ও ৫৪৩ জন লোক, আর জাপানীরা — ১টি বিমানবাহী জাহাজ, ১টি ডেস্ট্রয়ার, ৪টি ল্যান্ডিং ক্রাফ্‌ট, ৭৭টি প্লেন ও প্রায় ৯০০ জন লোক।

ক্ষতিগ্রস্ত এবং মার্কিন নৌ-বাহিনীর জাহাজের সংখ্যা সম্পর্কিত সঠিক তথ্য থেকে বঞ্চিত জাপানীরা পোর্ট-সম্‌বিতে সৈন্য নামাতে চাইল না। তারা অবতরণ করল তুলাগি দ্বীপে। জাপানী নৌ-বহরের অকৃতকার্যতায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে এই ব্যাপারটি যে মার্কিন সেনাপতিমণ্ডলী জাপানীদের পরিকল্পনার কথা জেনে ফেলেছিলেন, — আমেরিকানরা জাপানী সামরিক নৌ-বাহিনীর কোড বুঝতে সক্ষম হয়েছিল।

প্রবাল সাগরে লড়াইয়ের পর জাপানী সেনাপতিমণ্ডলী প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে সক্রিয় ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত থাকে এবং অ্যালিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিমাংশ ও মিডওয়ে দ্বীপে গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন সামরিক ঘাঁটি দখল করার প্রচেষ্টা চালায়; ওখানে মার্কিন নৌ-বহরের বিপুল শক্তি কেন্দ্রীভূত ছিল।

জাপানী সেনাপতিমণ্ডলীর পরিকল্পনা ছিল এরূপ: নৌ-সৈন্যদের আকস্মিক অবতরণ ঘটিয়ে মিডওয়ে দ্বীপ, কিস্‌কা ও আত্তু দ্বীপগুলো

দখল করা, বড় রকমের লড়াইয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌ-বাহিনীকে বিধ্বস্ত করা এবং তদ্দ্বারা সমুদ্রে নিজের আধিপত্য সুনিশ্চিত করা যাতে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্য ও উত্তর অংশে পরবর্তী স্ট্র্যাটেজিক উদ্দেশ্যগুলো হাসিল হয়।

অপারেশনের প্রস্তুতি পর্বে জাপানী সেনাপতিমণ্ডলী বিশেষ মনোযোগ প্রদান করে ক্রিয়াকলাপের আকস্মিকতার দিকে। এই উদ্দেশ্যে তারা অপারেটিভ ক্যামুফ্লেজের ব্যাপারে ও বিপক্ষকে মিথ্যা তথ্য সরবরাহের ব্যাপারে অনেকগুলো ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

এই ভাবে, প্রধান আঘাতের দিক থেকে আমেরিকানদের মনোযোগ ও শক্তি বিক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে অ্যালিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ অভিমুখে সামরিক ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ করার কথা ছিল ২৪ ঘণ্টা আগে। এ ছাড়া, আগে থেকেই ডুবো জাহাজগুলো নির্দিষ্ট অবস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমেরিকানরা জাপানীদের সংকেতাক্ষর জানত। তাই তারা ওদের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বন করল: মিডওয়ে দ্বীপের কাছে তারা ১৯টি ডুবো জাহাজ মোতায়েন করল এবং ৭০০ মাইল দূরত্বের মধ্যে বিমান থেকে অনুসন্ধান কার্য চালাতে লাগল। তাছাড়া, মিডওয়ে দ্বীপে সামরিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত ১২০টি বিমান, আর খোদ দ্বীপটির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে তোলা হয়েছিল। ১৯৪২ সালের ৪ থেকে ৬ জুন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩টি বিমানবাহী জাহাজ, ৮টি ক্রুজার, ১৪টি ডেস্ট্রয়ার ও ২৪টি ডুবো জাহাজ এবং জাপানের ১১টি রণপোত, ৫টি বিমানবাহী জাহাজ, ১৪টি ক্রুজার, ৫৮টি ডেস্ট্রয়ার ও ১০টি ডুবো জাহাজের মধ্যে সংঘটিত লড়াইয়ে আবারও — প্রবাল সাগরের লড়াইয়েরই মতো — জলবক্ষে ভাসমান কোন জাহাজই গোলাগুলি বিনিময় করে নি। আঘাত হানছিল বিমানবাহী জাহাজসমূহের বিমানগুলো।

মিডওয়ে দ্বীপের কাছে লড়াইয়ে জাপানীরা হারাল ৪টি বিমানবাহী জাহাজ, ১টি ভারী ক্রুজার, ৩৩২টি বিমান। আমেরিকানদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল অনেক কম: ১টি বিমানবাহী জাহাজ, ১টি ডেস্ট্রয়ার, ১৫০টি বিমান, যার মধ্যে ৩০টির ঘাঁটি ছিল মিডওয়ে দ্বীপে।

এই লড়াই চলাকালে মিত্র নৌ-বহর প্রথম বারের মতো এমন এক সাফল্য অর্জন করে যার ফলে তার পক্ষে অধিকতর অনুকূল এক পরিস্থিতি

গড়ে ওঠে। যুধ্যমান পক্ষগুলোর শক্তির অনুপাত প্রায় সমান হয়ে ওঠে এবং জাপান আক্রমণাভিযান ছেড়ে প্রতিরক্ষায় লিপ্ত হতে বাধ্য হয়।

১৯৪২ সালে প্রশান্ত মহাসাগরে পরবর্তী সামরিক ক্রিয়াকলাপগুলোর চরিত্র ছিল সীমিত। উত্তরে জাপানীরা অ্যালিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের আত্তু ও কিস্‌কা দ্বীপগুলো দখল করে নিল। প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে লড়াই চলছিল প্রধানত গুয়াডালক্যানাল দ্বীপের জন্য এবং নিউ গিনি দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব অংশের জন্য।

৭। উত্তর আফ্রিকায়, ভূমধ্যসাগরে ও আটলান্টিকে মিত্র শক্তিবর্গের সামরিক ক্রিয়াকলাপ (১৯৪১ সালের জুন — ১৯৪২ সালের অক্টোবর)

সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর বিশ্বাসহন্তা আক্রমণের পর নাৎসি নেতৃবৃন্দ সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনেই তাদের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান শক্তিসমূহ মোতায়েন রাখে। ওই সময় উত্তর আফ্রিকায় অবস্থিত ছিল কেবল ১০টি ইতালীয় ও জার্মান ডিভিশন।

ব্রিটিশ সেনাপতিমণ্ডলী অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ফ্যাসিস্ট জোটের ভূমধ্যসাগরীয় যোগাযোগ পথগুলোতে সামরিক ক্রিয়াকলাপের সক্রিয়তা বৃদ্ধি করে দেয়। এ ছাড়া, জেনারেল মণ্টগোমেরির সেনাপতিত্বে স্থল সেনাদের ৮ম বাহিনীতে (তাতে ছিল ৬টি ইনফেণ্ট্রি ও ১টি ট্যাঙ্ক ডিভিশন, ২টি ইনফেণ্ট্রি ও ৩টি ট্যাঙ্ক ব্রিগেড) ঐক্যবদ্ধ করে তারা ১৯৪১ সালের ১৮ নভেম্বর উত্তর আফ্রিকায় আক্রমণাভিযান আরম্ভ করে। ওখানে ইংরেজরা ইতালীয়-জার্মান ফৌজকে পরাস্ত করতে সক্ষম হল এবং ১৯৪২ সালের ১০ জানুয়ারি নাগাদ ওদের এল-আগেইলার দক্ষিণে অবস্থিত যুদ্ধ-সীমার দিকে হটিয়ে দিল। কিন্তু খোদ ইংরেজ বাহিনীগুলো ছোট ছোট দলে বিশাল এক ভূখণ্ডে ছড়ানো অবস্থায় ছিল। তাদের কেবল একটি ট্যাঙ্ক ব্রিগেড এল-আগেইলা অঞ্চলে পৌঁছেছিল। এর সুযোগ নিল জার্মান জেনারেল রমেল। ১৯৪২ সালের ২১ জানুয়ারি সে প্রবল প্রতিঘাত হানে এবং এতে তার উদ্দেশ্য হাসিল হয়। ইংরেজরা পশ্চাদপসরণ করতে আরম্ভ করল। আক্রমণাভিযান অব্যাহত রেখে জুলাই মাসের গোড়ার দিকে রমেলের সৈন্যরা এল-আলামেইনে পৌঁছে যায় এবং ওখানে মিত্র বাহিনীসমূহের আগে থেকে তৈরি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সম্মুখীন হয়ে

আক্রমণাভিযান বন্ধ করতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধ-সীমায় ফ্রন্ট সুস্থির হয়ে উঠে। তা ঘটে এই জন্যও যে ওই সময় ২য় জার্মান-ফ্যাসিস্ট বিমান বহরের ইউনিটগুলো ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে চলে গিয়েছিল।

এই ভাবে, ১৯৪০ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত কাল পর্যায়ের মধ্যে উত্তর আফ্রিকায় সামরিক ক্রিয়াকলাপ চলছিল পরিবর্তনশীল সাফল্যের সঙ্গে। এর কারণটি ছিল এই যে আক্রমণকারী পরিবেষ্টনের পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে বিপক্ষকে দমন করতে পারছিল না এবং বিপক্ষ এরূপ পরিস্থিতিতে সংগঠিতভাবে কেবল আগে থেকে তৈরি প্রতিরক্ষা লাইনেই সরে পড়ছিল না, প্রতিঘাতও হানতে পারছিল। সেই সঙ্গে যুধ্যমান উভয় পক্ষেরই প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে ধৈর্য, অটলতা ও দৃঢ়তার অভাব ছিল। পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিলেই সাধারণত আতঙ্ক সৃষ্টি হত এবং সৈন্যরা হুকুম ছাড়াই হটতে শুরু করত।

ভূমধ্যসাগরে ইতালির যোগাযোগ পথগুলোতে সংগ্রামের প্রবলতা খুব বৃদ্ধি পেয়ে গেল। উত্তর আফ্রিকায় অবস্থিত ইতালীয়-জার্মান ফৌজের জন্য যে-সমস্ত মালপত্র প্রেরিত হচ্ছিল ইংরেজরা ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে তার ৩৩ শতাংশ, অক্টোবর মাসে — ৬৩ শতাংশ এবং নভেম্বর মাসে — ৭০ শতাংশেরও বেশি জলমগ্ন করে দিতে সমর্থ হয়েছিল। এর ফলে ফ্যাসিস্টদের সামুদ্রিক যোগাযোগ পথগুলো প্রকৃত পক্ষে বন্ধ হয়ে যায় এবং নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলী আটলাণ্টিক মহাসাগর থেকে তাদের কিছু টর্পেডো বোট ও ১৭টি সাবমেরিন ভূমধ্যসাগরে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়।*

১৯৪১ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে জার্মান টর্পেডো বোট আর সাবমেরিনগুলো ইতালীয় নৌ-বহরের সঙ্গে মিলিত হয়ে ব্রিটিশ নৌ-বহরের উপর কয়েকটি প্রবল আঘাত হানে এবং তাকে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত করে: তিনটি রণপোত ও 'আর্ক রয়েল' নামক বিমানবাহী জাহাজটি সহ অনেকগুলো জাহাজ জলমগ্ন হয় অথবা সুদীর্ঘ কালের জন্য অকেজো হয়ে পড়ে। এর ফলে ভূমধ্যসাগরের পূর্বাংশে ইংরেজদের হাতে অটুট থাকে কেবল তিনটি ক্রুজার ও কয়েকটি ডেস্ট্রয়ার। সমুদ্র বক্ষে আধিপত্য চলে যায় ইতালীয়-জার্মান সেনাপতিমণ্ডলীর হাতে।

* রুগে ফ.। নৌ-যুদ্ধ। ১৯৩৯-১৯৪৫।

ওই কাল পর্যায়ে জার্মানদের ২য় বিমান কোরের ইউনিটগুলো মাল্টার উপর বেশকিছু আঘাত হানে। তাতে সমুদ্র বন্দর ও বিমান ঘাঁটিগুলো অকেজো হয়ে পড়ে। এ সমস্তকিছু ইংরেজদের কঠিন অবস্থাকে আরও জটিল করে তোলে। তারা তাদের নৌ-বহর দিয়ে স্থল বাহিনীকে সমর্থন জোগাতে অক্ষম হয়ে পড়ে। তাছাড়া উত্তর আফ্রিকায় যুদ্ধরত ফৌজের জন্য মালপত্র সরবরাহের সমস্যাটি সমাধানের কাজ তাদের জন্য অনেক জটিল হয়ে উঠল।

আটলাণ্টিকে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হতে থাকে মিত্র শক্তিবর্গের অনুকূলে, কেননা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই নাৎসিরা তাদের প্রায় সমগ্র বিমান বাহিনীকে পশ্চিম থেকে পূর্বে পাঠিয়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল লিখেছিলেন: 'হিটলারের রাশিয়া আক্রমণের পরিকল্পনাগুলো অচিরেই আমাদের অন্তরীক্ষে প্রয়োজনীয় অবকাশ দিল। এই নতুন কাজের জন্য হিটলারকে জার্মান সামরিক বিমান বহরের বড় একটি অংশ অন্যান্য ঘাঁটিতে স্থানান্তরিত করতে হয়েছিল এবং সেই হেতু মে মাস থেকে শুরু করে আমাদের জাহাজগুলোর বিরুদ্ধে শত্রুর বিমান বাহিনীর ক্রিয়াকলাপের আয়তন হ্রাস পায়।'*

অন্য যে-একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে আটলাণ্টিকে নৌ-যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইংরেজদের অবস্থা সহজ হয়েছিল তা হল নিজস্ব স্বার্থ রক্ষার্থে ও নৌ-যুদ্ধে ইংরেজদের সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গৃহীত ব্যবস্থাদি। ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে আইসল্যাণ্ডের রেইক-ইয়াভিক নৌ-ঘাঁটিতে ইংরেজদের স্থান নিল মার্কিন নৌ-বহর এবং সন্নিকটবর্তী সমগ্র অঞ্চলের প্রতিরক্ষার দায়িত্বভার গ্রহণ করল। অবশেষে, ইংরেজরা নিজেরাই সামুদ্রিক যোগাযোগ পথগুলোতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ়ীকরণ ও উন্নতকরণের উদ্দেশ্যে অনেকগুলো ব্যবস্থা অবলম্বন করল।

এই সবকিছুর ফলে আটলাণ্টিকে জার্মান সাবমেরিনের আক্রমণে ব্রিটেন ও নিরপেক্ষ দেশগুলোর জাহাজ ধ্বংসের পরিমাণ হ্রাস পেল। ১৯৪১ সালের এপ্রিলে যেখানে খোয়া গিয়েছিল ৬,৫৩,৯৬০ টন, সেখানে ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে তা কমে ১,২০,৯৭৫ টনে পৌঁছেছিল এবং

* Churchill W. The Second World War. Vol. III. — London, 1954, p. 130.

ওই বছরেরই নভেম্বর মাসে ক্ষতির পরিমাণটি হ্রাস পেয়ে ১,০৪,২১২ টনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১৯৪১ সালের শেষ দিক থেকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে নামার পরে, জার্মান নৌ-বহরের — এবং বিশেষত ডুবো জাহাজের — খোলাখুলি লড়াই আরম্ভ হয় আমেরিকান নৌ-শক্তির সঙ্গে। সামরিক ক্রিয়াকলাপ চলতে থাকে আমেরিকা মহাদেশের কাছে। জার্মান সাবমেরিনগুলো সাফল্যের সঙ্গে মার্কিন জাহাজগুলোকে টর্পেডো মেরে ডুবিয়ে দিচ্ছিল, কেননা আমেরিকানদের সাবমেরিনবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল ছিল। যেমন, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে ক্যারিবিয়ান সাগরে টর্পেডো মেরে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল ২৩টি তেলবাহী জাহাজ। জার্মান ডুবো জাহাজ এমনকি পানামা খালের এলাকায়ও অনুপ্রবেশ করে ওখানে অবস্থিত জাহাজগুলো ধ্বংস করছিল। নাৎসি সাবমেরিন বহরের বড় একটি অংশ কাজ করছিল ভূমধ্যসাগর ও বারেনৎস সাগরে, এবং উত্তর আটলাণ্টিকে — ইংলণ্ডের উপকূল অভিমুখে মার্কিন পরিবহণ জাহাজগুলোর যাতায়াত পথে।

১৯৪২ সাল ছিল জার্মান ডুবো জাহাজের ক্রিয়াকলাপের পক্ষে সবচেয়ে ফলপ্রসূ বছর। আটলাণ্টিকে ওগুলো ৫৫ লক্ষ টন পণ্য বহনক্ষম ১,০৩৮টি জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছিল। তবে বছরের শেষ দিকে অবস্থা অনেকটা বদলে যায়। মিত্রদের সাবমেরিনবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় জার্মানরা ১৯৪২ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ৬৪টি ডুবো জাহাজ হারায়, অথচ ওই বছরের প্রথমার্ধে ওরা হারিয়েছিল কেবল ২১টি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আটলাণ্টিকের নৌ-যোগাযোগ পথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের অবস্থা খারাপই থেকে গিয়েছিল।

৮। ফ্যাসিস্টবিরোধী জোট গঠন

ফ্যাসিস্ট জোট বিধ্বস্তকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এক ভূমিকা পালন করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র নীতি যা হিটলারবাদের দ্রুত পরাজয় ঘটানোর উদ্দেশ্যে বিশ্বের ফ্যাসিস্টবিরোধী শক্তিসমূহকে সংহত করেছিল।

১৯৪১ সালের ২৯ জুন তারিখে সোভিয়েত ইউনিয়নের গণ-কমিশনার পরিষদ ও সারা-ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি গৃহীত সিদ্ধান্তে এবং ১৯৪১ সালের ৩ জুলাই তারিখে রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা

পরিষদের সভাপতি ইওসিফ স্তালিনের ভাষণে বলা হয়েছিল: 'আমাদের পিতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য আমাদের এই যুদ্ধ মুক্তি ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার জন্য ইউরোপ আর আমেরিকার জাতিসমূহের সংগ্রামের সঙ্গে মিলিত হবে। এ হবে হিটলারের ফ্যাসিস্ট বাহিনীসমূহ কর্তৃক দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়ার বিরুদ্ধে এবং দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়ার হুমকির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত জাতিসমূহের সুদৃঢ় একটি জোট।'*

সোভিয়েত ইউনিয়ন হিটলারবিরোধী জোট গঠনের জন্য অক্লান্ত সংগ্রাম চালিয়ে যায়। এই কর্তব্যটি উপস্থিত করতে গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি এই লেনিনীয় নির্দেশটির দ্বারা পরিচালিত হয় যে 'একটি সাম্রাজ্যবাদী জোটের বিরুদ্ধে অন্য একটি সাম্রাজ্যবাদী জোটের সঙ্গে সামরিক চুক্তি সম্পাদন করা উচিত এরূপ অবস্থায় যখন এই চুক্তিটি সোভিয়েত শাসনের মূল নীতিগুলো লঙ্ঘন না করে তার অবস্থা সুদৃঢ় করতে এবং তার বিরুদ্ধে কোন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে...'**

ব্যাপক গণ-আন্দোলন, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে এবং পশ্চিম গোলার্ধে ফ্যাসিস্ট ফৌজের অভিযানের হুমকি পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের সরকারগুলোকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সামরিক জোট গড়তে বাধ্য করে। ১৯৪১ সালের ২২ জুন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল এবং ১৯৪১ সালের ২৪ জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট ফ্যাসিস্ট জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নকে সমর্থন দানের বিষয়ে নিজ নিজ সরকারের তরফ থেকে বিবৃতি প্রকাশ করেন। এ সমস্তকিছু বিশ্বের বৃহত্তম রাষ্ট্রগুলোকে — সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনকে — ফ্যাসিস্টবিরোধী জোটে ঐক্যবদ্ধকরণের জন্য বাস্তব ভিত্তি গড়ে তোলে। এই ভাবে হিটলারবিরোধী জোট গঠনের ঘটনাটি একটি অবধারিত ব্যাপারই ছিল।

হিটলারবিরোধী জোটের কূটনৈতিক ও আইনগত বিধিবদ্ধকরণের

কাজটি চলে কয়েক দফা এবং তা সম্পন্ন হয় ১৯৪২ সালের প্রথমার্ধে। জোট গঠনের ভিত্তিটি রচনা করেছিল পারস্পরিক সমর্থনের বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের সরকারগুলো কর্তৃক প্রকাশিত বিবৃতি।

১৯৪১ সালের ১২ জুলাই মস্কোয় জার্মানির বিরুদ্ধে সম্মিলিত ক্রিয়াকলাপের বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ব্রিটেনের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তাতে দুই পক্ষ পরস্পরকে সহায়তা দানের বিষয়ে, সমস্ত মিত্রের সম্মতি ব্যাতিরেকে জার্মানির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা না চালানোর বিষয়ে এবং তার সঙ্গে যুদ্ধ-বিরতি অথবা শান্তি চুক্তি সম্পাদন না করার বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিল। এ ছিল প্রথম সরকারী দলিল যা হিটলারবিরোধী জোট গঠনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল।

১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডনে সোভিয়েত ইউনিয়ন, বেলজিয়াম, চেকোস্লোভাকিয়া, গ্রীস, পোল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, নরওয়ে, যুগোস্লাভিয়া, লুক্সেমবুর্গ ও স্বাধীন ফ্রান্সের প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৪১ সালের ১৪ আগস্ট মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল স্বাক্ষরিত আটলাণ্টিক চার্টারটির মূল নীতিগুলো (নাৎসি নির্যাতনেব বিলোপ সাধন, আগ্রাসকের নিরস্ত্রীকরণ, জাতিসমূহকে অস্ত্রশস্ত্রের বোঝা থেকে মুক্তিদান, ফ্যাসিজমের পরাজয়ের পর সমস্ত দেশের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি) মেনে নিয়ে সোভিয়েত সরকার তাঁর বিবৃতিতে রক্তলোলুপ ফ্যাসিস্ট প্রশাসনের নির্যাতন থেকে ইউরোপের জাতিসমূহকে দ্রুত ও পূর্ণ মুক্তিদানের উদ্দেশ্যে স্বাধীনতাকামী জাতিসমূহের সমস্ত অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণের এবং তার সঠিক বণ্টনের জরুরী প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। সোভিয়েত প্রতিনিধি সম্মেলনে হিটলারবিরোধী জোটের উদ্দেশ্য ও কর্তব্যসমূহ সম্পর্কে সোভিয়েত সরকারের একটি ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। তাতে ফ্যাসিস্ট জোটের আগ্রাসনমূলক উদ্দেশ্য দেখানো হয় আর হিটলারবিরোধী জোটের দেশসমূহের প্রতি ফ্যাসিস্ট জার্মানি ও তার মিত্রদের দ্রুত ও চূড়ান্তভাবে পর্যুদস্ত করার উদ্দেশ্যে সমস্ত শক্তি ও সঙ্গতি সমাবেশকরণের জন্য আহ্বান জানানো হয়। ঘোষণাপত্রে আরও বলা হয়েছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিটি জাতির রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ও দেশের ভূখণ্ডগত অখণ্ডতার

অধিকার, নিজের বিচার-বিবেচনা অনুসারে রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার অধিকার সমর্থন করে।*

২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত তিন মিত্র শক্তির — সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে চলে মস্কো সম্মেলনটি, যাতে সমস্ত পক্ষ পারস্পরিক সামরিক-অর্থনৈতিক সহায়তার বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ড থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে সামরিক সরবরাহের বিষয়ে একটি প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ১৯৪১ সালের ৭ নভেম্বর মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুকূলে লেণ্ড-লিজ বিষয়ক আইনের ধারাটি জারি করেন। প্রেসিডেণ্ট তখন বলেন: 'এই সিদ্ধান্তটি আমাদের দেশকে সান্ত্বনাদানের সমস্ত প্রয়াসের অবসান ঘটাচ্ছে, একনায়কদের সঙ্গে মিটমাট করার জন্য সমস্ত আহ্বানের অবসান ঘটাচ্ছে, অত্যাচারের সঙ্গে ও নির্যাতনের শক্তির সঙ্গে আপোসের অবসান ঘটাচ্ছে।'** এর পর জার্মানি ও ইতালির প্রচার মাধ্যম রুজভেল্টকে 'যুদ্ধ প্ররোচক' বলে অভিহিত করতে থাকে, তবে সোভিয়েত ইউনিয়নে ও বিপুল সংখ্যায় অধিকাংশ দেশে মার্কিন সরকারের এই সিদ্ধান্তের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নকে সহায়তা প্রদানের জন্য আন্দোলন বিশেষ প্রবল আকার ধারণ করেছিল মস্কোর উপকণ্ঠের লড়াইয়ের সময়। ক্যাণ্টারবেরি গির্জার ডিন হ. জনসন বলেছিলেন, 'এই বৃহৎ লড়াইয়ে নির্ধারিত হবে মানবজাতির ভাগ্য।... এক দিকে — আলো ও প্রগতি, অন্য দিকে — অন্ধকার, প্রতিক্রিয়া, দাসত্ব ও মৃত্যু। রাশিয়া তার সমাজতান্ত্রিক স্বাধীনতা রক্ষা করতে গিয়ে আমাদের স্বাধীনতার জন্যও লড়ছে। মস্কো রক্ষা করতে গিয়ে সে লণ্ডনকেও রক্ষা করছে।'***

সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সেই সমস্ত পণ্য ও কাঁচামাল সরবরাহ করার সম্মতি প্রকাশ করল যা তার কাছে ছিল এবং যাতে

* দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র নীতি। দলিল ও কাগজপত্র। খণ্ড ১। — মস্কো, ১৯৪৬, পৃঃ ১৬৩-১৬৪।

** Stettinius, Edward R. Lend-Lease. Weapon for Victory. — New York, 1944.

*** Johnson H. Soviet Strength. — London, 1943, pp. 153-154.

আমেরিকা অভাব বোধ করতে পারত। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের অর্থনৈতিক সহায়তার পরিমাণ মোটেই ফ্যাসিস্ট জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপুল অবদানের উপযুক্ত ছিল না। ১৯৪১ সালে অক্টোবর-নভেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লেণ্ড-লিজ বিষয়ক আইনের ভিত্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রেরণ করে মাত্র ৫ লক্ষ ৪৫ হাজার ডলার মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র ও জিনিসপত্র, অথচ সমস্ত দেশে মার্কিন সরবরাহের মোট মূল্য ছিল ৭৪ কোটি ১০ লক্ষ ডলার, অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন পেয়েছিল সমগ্র মার্কিন সাহায্যের ০·১ শতাংশেরও কম। একই অবস্থা লক্ষ্য করা গিয়েছিল ইংলণ্ড প্রদত্ত সহায়তার ক্ষেত্রে। ১৯৪১ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সে সোভিয়েত ইউনিয়নে পাঠিয়েছিল: প্রটোকল দ্বারা নির্ধারিত ৮০০টি বিমানের পরিবর্তে ৬৬৯টি, ১,০০০টি ট্যাঙ্কের পরিবর্তে — ৪৮৭টি, ৬০০টি অ্যান্টিট্যাঙ্ক গানের পরিবর্তে ৩০১টি। কিন্তু আমেরিকা ও ইংলণ্ডের এমনকি এরূপ সাহায্যেরও ইতিবাচক তাৎপর্য ছিল এবং তা তিন মহাশক্তির পরবর্তী সম্মিলিত ও সমন্বিত ক্রিয়াকলাপের জন্য সম্ভাবনা সৃষ্টি করছিল।

হিটলারবিরোধী জোটের অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে আগ্রহী সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে অভিন্ন শত্রুর সঙ্গে সম্মিলিত সংগ্রামের বিষয়ে চেকোস্লোভাকিয়া ও পোল্যান্ডের লণ্ডনস্থ সরকারদের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত করে, আর সেপ্টেম্বর মাসে দ্য গলের নেতৃত্বাধীন স্বাধীন ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং ফ্যাসিজমের সঙ্গে সংগ্রামে ফরাসি জনগণকে সর্বাঙ্গীণ সহায়তা দানের সম্মতি প্রকাশ করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিচক্ষণ পররাষ্ট্র নীতির কল্যাণে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত দেশকে আলাদা করার ফ্যাসিস্ট নেতাদের পরিকল্পনাগুলো বানচাল করে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্যোগে গঠিত হয়েছিল শক্তিশালী হিটলারবিরোধী জোট। ১৯৪২ সালের গোড়ার দিক নাগাদ তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ২৬টি রাষ্ট্র, যারা ১৯৪২ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে ওয়াশিংটনে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারীভাবে যুদ্ধে নামার পর, 'জাতিসঙ্ঘের ঘোষণাপত্র' স্বাক্ষর করে। এর অংশগ্রহণকারীরা ফ্যাসিস্ট জোটের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য তাদের সমস্ত সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করতে এবং মিত্রদের সম্মতি ব্যতিরেকে ওই সমস্ত দেশের সঙ্গে পৃথক যুদ্ধ-বিরতি বা শান্তি চুক্তি সম্পাদন না করতে

অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। ফ্যাসিস্টবিরোধী জোট গঠনের অন্তিম পর্যায়টি ছিল — ১৯৪২ সালের ২৬ মে তারিখে লণ্ডনে ফ্যাসিস্ট জার্মানি ও ইউরোপে তার সহাপরাধীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জোটের বিষয়ে এবং যুদ্ধ সমাপ্তির পর সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহায়তার বিষয়ে ২০ বছরের একটি ইঙ্গো-সোভিয়েত চুক্তি সম্পাদন, আর ১৯৪২ সালের ১১ মে তারিখে ওয়াশিংটনে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় পারস্পরিক সহায়তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নীতিসমূহ সম্পর্কে সোভিয়েত-মার্কিন চুক্তি স্বাক্ষর।

জাতিসমূহের ফ্যাসিস্টবিরোধী ফ্রণ্ট বর্ধিত, সুদৃঢ় ও সংহত করার উদ্দেশ্যে, ফ্যাসিজমকে পরাস্তকরণের অভিন্ন কাজে হিটলারবিরোধী জোটের প্রত্যেক সদস্য যাতে যথাসম্ভব বেশি অবদান রাখতে পারে সেই উদ্দেশ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন সর্বপ্রকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার সশস্ত্র বাহিনী অটলভাবে সোভিয়েত দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে ফ্যাসিস্ট জার্মানির প্রধান শক্তিসমূহের প্রবল আক্রমণ প্রতিহত করছিল। সেই সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন হিটলারবিরোধী জোটভুক্ত দেশসমূহের প্রতি তার মিত্রসুলভ দায়িত্বও অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যাচ্ছিল।

কিন্তু পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহ যুদ্ধ পরিচালনার এবং যুদ্ধোত্তর বিশ্বের সমস্যাবলি সমাধানের ব্যাপারটিকে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সিদ্ধির কাজে লাগাতে প্রয়াসী ছিল। যেমন, হিটলারবিরোধী জোট গঠনের একেবারে শুরু থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়ন পশ্চিম ইউরোপে, ফ্রান্সের উত্তরে, ফ্যাসিস্ট জার্মানির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোর নিকটে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার প্রশ্নটি হাজির করেছিল। এই প্রশ্নটি সোভিয়েত সরকারের কর্তৃক উত্থাপিত হয়েছিল ১৯৪১ সালের ১৮ জুলাই। ওই দিন ইওসিফ স্তালিন উইনস্টন চার্চিলের কাছে প্রেরিত এক বার্তায় পশ্চিমে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকার জনসমাজ সোভিয়েত প্রস্তাবটিকে স্বাগত জানায় ও সমর্থন করে, কারণ তারা তাতে যুদ্ধের মেয়াদ হ্রাসকরণের, হতাহতের সংখ্যা হ্রাসকরণের এবং মানুষের লাঞ্ছনা লাঘবের বাস্তব সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকার শাসক মহলগুলো দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করল। ব্রিটিশ সরকার বুঝতে দিল যে সে ১৯৪১ ও ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলতে সক্ষম নয়।

১৯৪২ সালে সোভিয়েত সরকার ফের একাধিক বার এই প্রশ্নটি উত্থাপন করেন। '১৯৪২ সালে ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন গঠনের জরুরী

কর্তব্য সম্পাদনের বিষয়ে পূর্ণ সমঝোতা অর্জিত হয়েছে,' — বলা হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যে আলাপ-আলোচনার ফলাফলের বিষয়ে ১৯৪২ সালের ১২ জুন তারিখে প্রকাশিত ইশতেহারে।* কিন্তু এবারও চার্চিল আর রুজভেল্ট গৃহীত দায়িত্ব পালন করলেন না। এবং এ সমস্তকিছু ঘটছিল তখন, যখন ইংলন্ড ও আমেরিকায় সামাজিক ও রাজনৈতিক মহলগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি, ফ্যাসিস্ট জোটের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তার প্রয়াসের প্রতি নিজ নিজ দেশের জনগণের সহানুভূতি লক্ষ্য করে পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার জন্য, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে অধিকতর সক্রিয় সহযোগিতার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল। ১৯৪২ সালের ৩ এপ্রিল রুজভেল্ট চার্চিলকে লিখেছিলেন, 'আপনার জনগণ ও আমার জনগণ রুশদের উপর থেকে চাপ হ্রাস করার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার দাবি জানাচ্ছে, এবং তারা ভালোই জানে যে আজ আমরা একসঙ্গে যে-সংখ্যক জার্মানকে মারছি ও সাজসরঞ্জাম বিনষ্ট করছি রুশেরা তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক জার্মানকে হত্যা করছে ও সাজসরঞ্জাম নষ্ট করছে।'**

কিন্তু নেতিবাচক মুহূর্তগুলো সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের সম্মিলিত প্রয়াসে হিটলারবিরোধী জোট গঠনের ব্যাপারটি প্রমাণ করেছিল যে কেবল শান্তির সময়েই নয়, যুদ্ধকালের অতি জটিল পরিস্থিতিতেও বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতা চালানো সম্ভব।

* 'প্রাভদা' খবরের কাগজ, ১৯৪২, ১২ জুন।

** Feis H. Churchill, Roosevelt, Stalin. The War They Waged and the Peace They Sought. — Princeton, 1970, p. 58.

চতুর্থ অধ্যায়

যুদ্ধের গতিতে আমূল পরিবর্তন

১। স্তালিনগ্রাদের উপকণ্ঠে এবং ককেশাসে মহাবিজয় (১৯৪২ সালের ১৯ নভেম্বর — ১৯৪৩ সালের ৯ অক্টোবর)

সোভিয়েত জনগণের আত্মোৎসর্গী শ্রমের কল্যাণে ১৯৪২ সালের শেষ নাগাদ দেশে গড়ে ওঠে সুসংগঠিত ও দ্রুত বর্ধমান সামরিক উৎপাদন। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বরে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরের তুলনায় বিমান উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল ৩·৩ গুণ। ১৯৪২ সালের দ্বিতীয়ার্ধে সোভিয়েত বিমান বাহিনী প্রতি মাসে গড়ে ২,২৬০টি করে বিমান পাচ্ছিল, আর সারা বছরে নির্মিত হয়েছিল ২৫,৪৩৬টি বিমান। ট্যাংক উৎপাদনও দ্রুত বাড়ছিল। ১৯৪২ সালে নির্মিত হয়েছিল ২৪,৬৬৮টি ট্যাংক, তার মধ্যে ত-৩৪ মাঝারি ধরনের ট্যাংকগুলো ছিল ৫০ শতাংশেরও বেশি। ওই বছরই সোভিয়েত সৈন্যরা পেল ৩,২৩৭টি রকেট মর্টার কামান ('কাতিউশা'), ৭৭ ও ততোধিক মিলিমিটার ক্যালিবরের প্রায় ৩০,০০০টি তোপ, এবং ১২০ মিলিমিটার ক্যালিবরের মর্টার কামান উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল ৪ গুণ।

১৯৪২ সালের নভেম্বরের দিকে জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনী তাদের আগেকার সংখ্যাগত ও প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠতা হারিয়ে ফেলে, কিন্তু তা সত্ত্বেও শত্রু ছিল খুব শক্তিশালী এবং বিপজ্জনক। সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে তার কাছে ছিল ৬২ লক্ষ লোক, ৫১,৬৮০টি তোপ ও মর্টার কামান (বিমানধ্বংসী কামান ছাড়া), ৫,০৮০টি ট্যাংক ও অ্যাসল্ট গান, ৩,৫০০টি জঙ্গী বিমান। সোভিয়েত ফৌজে ওই সময় ছিল ৬৫ লক্ষ ৯১ হাজার লোক, ৭৭,৮৫১টি তোপ ও মর্টার কামান, ৭,৩৫০টি ট্যাংক ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গান, ৪,৫৪৪টি জঙ্গী বিমান।

অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সাজসরঞ্জাম প্রাপ্তির পরিমাণ বৃদ্ধির কল্যাণে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর সাংগঠনিক দিকগুলোও উন্নত হতে থাকে।

যেমন, গঠিত হল ব্যূহ ভেদকারী আর্টিলারি ডিভিশনগুলো, ট্যাংক ও বিমান বাহিনীগুলো। দেশের অভ্যন্তর ভাগে গঠিত হচ্ছিল নতুন নতুন রিজার্ভ ফৌজ। এ সমস্তকিছু স্তালিনগ্রাদের উপকণ্ঠে সোভিয়েত সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলী পরিকল্পিত স্ট্র্যাটেজিক আক্রমণাত্মক অপারেশনটি সম্পাদনের জন্য বাস্তব ভিত্তি গড়ে তুলছিল।

সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর সদর-দপ্তরের পরিকল্পনাটি ছিল এরূপ: জেনারেল ন. ভাতুতিন, জেনারেল ক. রকোসভস্কি ও জেনারেল আ. ইয়েরেমেঙ্কোর পরিচালনাধীন দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্ট, দন ফ্রন্ট (গঠিত হয় ২৮ সেপ্টেম্বর) ও স্তালিনগ্রাদ ফ্রন্টের শক্তি দিয়ে দন ও ভোলগা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে শত্রুর গ্রুপিংটিকে ঘিরে ফেলা ও ধ্বংস করে দেওয়া। দক্ষিণ-পশ্চিম ও স্তালিনগ্রাদ ফ্রন্টগুলোর কর্তব্য ছিল পরস্পরের দিকে প্রবল আঘাত হেনে জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের পার্শ্বদেশগুলো দখল করা এবং সোভেত্স্কি-কালাচ অঞ্চলে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে চারিদিকের বেষ্টনী সংকুচিত করা। দন ফ্রন্টের কর্তব্য ছিল এক আঘাতে দনের ডান তীরে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেওয়া আর অন্য আঘাতে — দনের ক্ষুদ্র বাঁকে জার্মান বাহিনীগুলোকে তার প্রধান স্তালিনগ্রাদ গ্রুপিংটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা। পাল্টা-আক্রমণের জন্য অক্টোবরের শুরু থেকে আরব্ধ প্রস্তুতি চলাকালে সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী শক্তিশালী আক্রমণকারী গ্রুপিংগুলো গড়েন। উভয় পক্ষের শক্তি বস্তুত পক্ষে সমান হয়ে যায়। তিনটি সোভিয়েত ফ্রন্টে ছিল ১১ লক্ষ ৬ হাজার লোক, ১৫,৫০০টি তোপ ও মর্টার কামান, ১,৪৬৩টি ট্যাংক ও সেলফ- প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গান, ১,৩৫০টি জঙ্গী বিমান। তাদের বিপক্ষে ছিল — বাহিনীসমূহের 'B' গ্রুপের (অধিনায়ক — জেনারেল-ফিল্ডমার্শাল ম. ভেইখ্স) ৩য় রুমানীয় বাহিনী, ৬ষ্ঠ জার্মান ফিল্ড ও ৪র্থ ট্যাংক আর্মি. ৪র্থ রুমানীয় বাহিনী, যেগুলোতে ছিল ১০ লক্ষ ১১ হাজার লোক, ১০,২৯০টি তোপ ও মর্টার কামান, ৬৭৫টি ট্যাংক ও অ্যাসল্ট গান, ১,২১৬টি জঙ্গী বিমান। এই ভাবে শত্রুর উপর সোভিয়েত ফৌজের শ্রেষ্ঠতা ছিল: লোকসংখ্যায় — ১·১ গুণ, তোপে ও মর্টার কামানে — ১·৫ গুণ, ট্যাংকে ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গানে — ২·২ গুণ, জঙ্গী বিমানে — ১·১ গুণ। তা অবস্থিত ছিল এমনভাবে যে আঘাতের দিকগুলোতে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রের মহড়া নেওয়ার কলাকৌশলের কল্যাণে শত্রুর উপর ওগুলোর শ্রেষ্ঠতা ২-৩ গুণ বেড়ে গিয়েছিল। স্তালিনগ্রাদের

উপকণ্ঠে আক্রমণকারী গ্রুপিংসমূহের পাল্টা-আক্রমণের প্রস্তুতি এবং সমাবেশ চলে এতই গোপনে যে তাদের হামলা শত্রু বাহিনীর পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল। এর এক সপ্তাহ আগে জার্মান স্থলসেনার সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলী হিটলারকে জানিয়েছিল যে দন অঞ্চলে ব্যাপক অপারেশন চালানোর মতো যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি বিপক্ষের নেই।

জার্মান জেনারেল স্টাফ বহু বিশেষ লক্ষণের ভিত্তিতে বুঝতে পারল যে স্তালিনগ্রাদ অভিমুখে তার গ্রুপিংয়ের বাঁ পার্শ্বের সম্মুখে সোভিয়েত সৈন্যের সংখ্যায় যথেষ্ট বৃদ্ধি ঘটেছে এবং তখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী এখানে শীতকালীন আক্রমণাভিযান আরম্ভ করবেন। কিন্তু, স্থলসেনার জেনারেল স্টাফের প্রাক্তন অধিকর্তা জেনারেল ক. সেইটস্লেরের মতে, ভের্মাখ্‌টের নেতৃবৃন্দ 'তখনও জানত না সুদূর প্রসারিত বাঁ পার্শ্বের কোন্ এলাকায় রুশরা আঘাত হানবে — স্তালিনগ্রাদের নিকটস্থ রুমানীয় এলাকায়, অধিকতর পশ্চিমে অবস্থিত ইতালীয় এলাকায়, অথবা হাঙ্গেরীয় এলাকায় যা আরও বেশি পশ্চিমের দিকে চলে গেছে'।* সেইটস্লের বলছে, জার্মান সেনাপতিরা ভেবেছিল যে রুমানীয় বাহিনীর উপরই আঘাতের সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু তারা সোভিয়েত আক্রমণাভিযান আরম্ভের দিনতারিখ কিছুতেই ঠিক করতে পারল না। আর স্তালিনগ্রাদের দক্ষিণ থেকে দ্বিতীয় আঘাতটি জার্মান সেনাপতিমণ্ডলীর জন্য ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এক ব্যাপার।

১৯৪২ সালের ১৯ নভেম্বর ৭টা ৩০ মিনিটের সময় তোপ দেগে বিশাল এক সংগ্রাম আরম্ভ হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। এ সংগ্রাম চলে দন ও ভোলগার মধ্যবর্তী বিরাট এক ভূখণ্ডে। আক্রমণাভিযানের প্রথম দিনেই দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের আক্রমণকারী গ্রুপিংটি দ্রুত গতিতে শত্রুর প্রতিরক্ষা লাইন ভেদ করে ৬ষ্ঠ জার্মান বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগে ২৫-৩৫ কিলোমিটার গভীরে চলে যায়। দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে উক্ত গ্রুপিং অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল স্তালিনগ্রাদ ফ্রন্টের মোবাইল ফর্ম্যাশনগুলো। ২৩ নভেম্বর দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্ট ও স্তালিনগ্রাদ ফ্রন্টের মোবাইল ফর্ম্যাশনগুলো সোভেত্‌স্কি নামক বসতি অঞ্চলে মিলিত হল। জার্মান-ফ্যাসিস্ট গ্রুপিংয়ের ৩ লক্ষ ৩০ হাজার লোকের ২২টি ডিভিশন ও ১৬০টি স্বতন্ত্র ইউনিট পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে।

* ওয়েস্টফাল জ. ও অন্যান্যরা। সর্বনাশা সিদ্ধান্তসমূহ, পৃঃ ১৬৫।

পুরো ডিসেম্বর মাস ধরে আকাশ থেকে যে-অবরোধ চালানো হয় তার ফলে জার্মান বিমান বাহিনীর সাহায্যে অবরুদ্ধ দুশমনকে জিনিসপত্র সরবরাহের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তখন শত্রুর ৭ শতাধিক বিমান ধ্বংস হয়েছিল।

অবরুদ্ধ ফৌজকে যেকোন উপায়ে রক্ষা করার ইচ্ছায় জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী তাড়াহুড়ো করে বাহিনীসমূহের 'দন' নামক নতুন একটি গ্রুপ গড়ল। ফিল্ডমার্শাল মানস্টেইনের পরিচালনাধীন ৩০ ডিভিশনের এই গ্রুপটির কর্তব্য ছিল -- সোভিয়েত ফ্রণ্ট ভেদ করা এবং অবরুদ্ধ জার্মান সৈন্যদের মুক্ত করা। ১২ ডিসেম্বর 'দন' গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত গটের ট্যাংক গ্রুপটি কতেলনিকোভো অঞ্চল থেকে স্তালিনগ্রাদ অভিমুখে আক্রমণাভিযান আরম্ভ করে। চার দিনের কঠোর লড়াইয়ের ফলে ফ্যাসিস্টরা বিপুল ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে অগ্রসর হতে সমর্থ হয়েছিল। পাউলুসের অবরুদ্ধ ফৌজ ও এদের মধ্যে দূরত্ব ছিল ৪৮ কিলোমিটার। ১৬ ডিসেম্বর তারিখে সর্বোচ্চ সদর-দপ্তরের নির্দেশে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টের ও ভরোনেজ ফ্রণ্টের বাঁ পার্শ্বের সৈন্যরা মধ্য দন অঞ্চলে শত্রুর উপর প্রবল আঘাত হানে, চির ও দন নদীগুলোতে ফ্যাসিস্টদের প্রতিরোধ দমন করে, ৮ম ইতালীয় বাহিনী ও 'দন' গ্রুপের বাঁ পার্শ্বকে বিধ্বস্ত করে দেয় এবং গটের গ্রুপিংয়ের বাঁ পার্শ্ব ও পশ্চাদ্ভাগের জন্য হুমকি সৃষ্টি করে। সম্মুখ দিক থেকে গটের গ্রুপটিকে মিশকোভা নদীর যুদ্ধ-সীমায় রুখে দিয়েছিল ২য় রক্ষী বাহিনী ও ৫১তম বাহিনীর সৈন্যরা। ডিসেম্বরের শেষে সোভিয়েত সৈন্যরা এই যুদ্ধ-সীমা থেকে শত্রুর উপর প্রবল আঘাত হানে এবং তার কতেলনিকোভো গ্রুপিংটিকে বিধ্বস্ত করে কতেলনিকোভো শহরটি দখল করে নেয়। অবরুদ্ধ ফৌজকে মুক্ত করার জন্য জার্মান সেনাপতিমণ্ডলী চালিত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরিবেষ্টনের ফ্রণ্টের বহির্ভাগের লাইনটি পাউলুসের বাহিনী থেকে ১২০-১৬০ কিলোমিটার দূরে সরে যায়।

এবার শত্রুর অবরুদ্ধ গ্রুপিংটির বিলোপ ঘটানোর সময় হল। সর্বোচ্চ সদর-দপ্তর এ কাজের দায়িত্ব দিল দন ফ্রণ্টের বাহিনীগুলোকে। পাউলুসের পরিবেষ্টিত ফৌজের প্রতিরোধ নিষ্ফল বিবেচনা করে সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী তাদের আত্মসমর্পণ করতে বলেন, কিন্তু পাউলুস তা করতে অস্বীকার করল। ১৯৪৩ সালের ১০ জানুয়ারি পরিবেষ্টিত জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীগুলোর বিলোপ সাধনের কাজ শুরু হয়। সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলীর পরিকল্পনা অনুসারে প্রথমে শত্রুকে ধ্বংস করার কথা

সাংকেতিক চিহ্ন

- আক্রমণাভিযানের গোড়ায় বিবদমান অবস্থান
- আঘাতের অভিমুখ
- অপারেশনের প্রথম দিনে সৈন্য বাহিনীর কর্তব্য
- অপারেশনের দ্বিতীয় দিনে সৈন্য বাহিনীর কর্তব্য
- অপারেশনের তৃতীয় দিনে সৈন্য বাহিনীর কর্তব্য

নক্সা ৫। স্তালিনগ্রাদের উপকণ্ঠে সোভিয়েত বাহিনীর পাল্টা-আক্রমণের পরিকল্পনা (১৯৪২-এর নভেম্বর)

ছিল অবরোধ বেষ্টনীর পশ্চিম অংশে, আর তারপর দক্ষিণ অংশে, এবং পরে বাকী গ্রুপিংটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করে ওগুলোর বিলোপ ঘটানোর কথা ছিল। কঠোর লড়াইয়ের মধ্যে সোভিয়েত সৈন্যরা অবরুদ্ধ জার্মান-ফ্যাসিস্ট ডিভিশনগুলোকে বিধ্বংস করে দেয় এবং জেনারেল-ফিল্ডমার্শাল পাউল্যুস ও তার সদর-দপ্তর সহ ৯১ হাজার সৈনিক ও অফিসারকে বন্দী করে; প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র আর সামরিক সাজসরঞ্জাম দখল করে নেয়। স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনী বিজয় লাভ করে এবং ফ্যাসিস্টদের ৩ লক্ষ ৩০ হাজার সৈন্যের গ্রুপিংটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

এই বিজয় সমগ্র বিশ্বকে দেখিয়ে দিল সোভিয়েত রাষ্ট্রের অবিনশ্বর পরাক্রম, সোভিয়েত মানুষের অদম্য মনোবল ও অপরিসীম বীরত্ব, সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমির প্রতি তাদের অফুরন্ত ভালোবাসা। স্তালিনগ্রাদের লড়াইয়ে বিজয় লাভ করে সমগ্র সোভিয়েত জনগণ, তবে তার জন্য রণাঙ্গনে তাদের বিপুল বীরত্বের পরিচয় দিতে হয়েছিল, আর দেশের অভ্যন্তর ভাগে লিপ্ত হতে হয়েছিল আত্মোৎসর্গী শ্রমে।

স্তালিনগ্রাদের উপকণ্ঠের লড়াই ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বৃহত্তম সামরিক-রাজনৈতিক ঘটনা। স্তালিনগ্রাদের লড়াই কেবল দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের নয়, গোটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরই গতিতে আমূল পরিবর্তন সূচিত করে। স্তালিনগ্রাদ ফ্যাসিস্ট জার্মানির পতন ডেকে আনে। স্তালিনগ্রাদ লড়াইয়ের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের মাটি থেকে নাৎসিদের ব্যাপক বিতাড়ন শুরু হয়। এবার স্ট্র্যাটেজিক উদ্যোগ চলে আসে সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলীর হাতে। স্তালিনগ্রাদ ছিল সোভিয়েত অস্ত্রশস্ত্রের শক্তি ও ক্ষমতার বিজয়। স্তালিনগ্রাদের উপকণ্ঠে অর্জিত বিজয় ফ্যাসিস্ট জার্মানিতে অন্ত্যেষ্টি কালীন ঘণ্টাধ্বনি রূপে প্রতিধ্বনিত হয়। বিলুপ্ত ৬ষ্ঠ জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীটির স্মৃতিতে ওখানে সরকারীভাবে তিন দিন ব্যাপী শোক পালন করতে বলা হয়েছিল। প্রাক্তন নাৎসি জেনারেল ওয়েস্টফাল স্বীকার করেছিল, 'স্তালিনগ্রাদের উপকণ্ঠে পরাজয় জার্মান জনগণ ও জার্মান সৈন্য বাহিনীকে সন্ত্রস্ত করে তোলে। জার্মানির সারা ইতিহাসে আগে কখনও এত বিপুল সংখ্যক সৈন্যের এরূপ ভয়ংকর মৃত্যু ঘটে নি।'*

পুরো ২০০টি দিন ও রাত ধরে চলে স্তালিনগ্রাদের মহাসমর। ফ্যাসিস্ট

* ওয়েস্টফাল জ. ও অন্যান্যরা। সর্বনাশা সিদ্ধান্তসমূহ, পৃঃ ২১০।

জোট ওই সময় সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে যুদ্ধরত সমস্ত শক্তির এক-চতুর্থাংশকে হারায়। শত্রু বাহিনীর হতাহত, বন্দী ও নিখোঁজ সৈনিক আর অফিসারের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় ১৫ লক্ষ। কেবল এক স্তালিনগ্রাদের উপকণ্ঠেই জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজ ১৯৪২ সালের ১৯ নভেম্বর থেকে ১৯৪৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হারিয়েছিল ৮ লক্ষাধিক লোক, ২ হাজারের মতো ট্যাঙ্ক ও অ্যাসল্ট গান, ১০ সহস্রাধিক তোপ ও মর্টার কামান, প্রায় ৩ হাজার জঙ্গী ও পরিবহণ বিমান, ৭০ সহস্রাধিক মোটর গাড়ি। ভের্মাখ্‌ট পুরোপুরিভাবে ৩২টি ডিভিশন ও ৩টি ব্রিগেড থেকে বঞ্চিত হয়, আর ১৬টি ডিভিশন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিল। কেবল স্তালিনগ্রাদের উপকণ্ঠে অবরুদ্ধ শত্রুর বিলোপসাধনের সময়ই বিধ্বস্ত হয়েছিল ২২টি জার্মান ডিভিশন। ওই সময়ের মধ্যে দন ফ্রণ্টের সৈন্যরা বন্দী করে ৯১ সহস্রাধিক জার্মানকে, যাদের মধ্যে আড়াই সহস্রাধিক অফিসার ও ২৪ জন জেনারেল ছিল। পরিবেষ্টিত গ্রুপিংয়ের বিলোপসাধনের পর রণক্ষেত্রে প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার নিহত নাৎসি সৈনিক ও অফিসারকে তুলে নিয়ে কবর দেওয়া হয়। সোভিয়েত সৈন্যরা ফের শত্রুর কাছ থেকে স্ট্র্যাটেজিক উদ্যোগ ছিনিয়ে নিল এবং যুদ্ধের শেষ অবধি তা টিকিয়ে রেখেছিল।

স্তালিনগ্রাদের উপকণ্ঠে সোভিয়েত জনগণ ও তার সশস্ত্র বাহিনীর মহৎ বীরকীর্তির কাহিনী মানবজাতি চিরকাল স্মরণ রাখবে। এখানে, উপকথাসুলভ বীর নগরীর প্রাচীর প্রান্তে অর্জিত হয়েছিল বিশ্ব-ঐতিহাসিক এক বিজয় যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেয় ফ্যাসিস্টবিরোধী জোটের রাষ্ট্রগুলোর জাতিসমূহের অনুকূলে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বিরাজমান সর্বজনীন উদ্দীপনার, হিটলারবিরোধী জোটভুক্ত দেশসমূহে বিপুল উল্লাসের সেই অবিস্মরণীয় দিনগুলোতে বহু রাষ্ট্র ও রাজনীতিজ্ঞ সোভিয়েত জনগণের বৃহৎ বিজয়ের উচ্চ মূল্য দেন। স্তালিনের কাছে প্রেরিত এবং ১৯৪৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রাপ্ত এক বার্তায় প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট স্তালিনগ্রাদের লড়াইকে মহাকাব্যোচিত সংগ্রাম বলে অভিহিত করেন যার চূড়ান্ত সাফল্য সমস্ত আমেরিকাবাসীকে বিমুগ্ধ করেছে।* পরে তিনি স্তালিনগ্রাদের উদ্দেশে একটি

* সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সভাপতির পত্রালাপ। খণ্ড ২। — মস্কো, ১৯৫৭, পৃঃ ৫২।

প্রশংসাপত্র প্রেরণ করেন: 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের তরফ থেকে আমি স্তালিনগ্রাদ নগরীকে এই প্রশংসাপত্রটি প্রদান করে তার নির্ভীক রক্ষকদের আচরণে আমাদের মুগ্ধতা প্রকাশ করছি। ১৯৪২ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৩ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত অবরোধ চলাকালে তারা যে সাহসিকতা, মনোবল আর আত্মত্যাগের পরিচয় দেয় তা চিরকাল সমস্ত স্বাধীন মানুষের মনকে অনুপ্রাণিত করবে। তাদের গৌরবময় বিজয় আক্রমণের তরঙ্গ থামিয়ে দেয় এবং তা আগ্রাসী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে মিত্র জাতিসমূহের যুদ্ধের এক সন্ধিক্ষণে পরিণত হয়।'*

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল স্তালিনগ্রাদের উপকণ্ঠে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর বিজয়কে এক বিস্ময়কর ঘটনা বলে বর্ণনা করেন। আর ইংলন্ডের রাজা স্তালিনগ্রাদকে একটি তলোয়ার উপহার দেন যেটার কীলকে রুশ ও ইংরেজীতে ক্ষোদাই করে লেখা হয়েছিল: 'ইস্পাতের মতো দৃঢ় স্তালিনগ্রাদবাসীদেরকে — ব্রিটিশ জনগণের গভীর প্রশংসার চিহ্ন স্বরূপ রাজা ৬ষ্ঠ জর্জের তরফ থেকে।'** লড়াই চলাকালে, বিশেষত তার সমাপ্তির পরে, ফ্যাসিস্ট জার্মানির সঙ্গে সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়নকে অধিকতর কার্যকর সহায়তা দানের জন্য পশ্চিমের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন খুব সক্রিয় হয়ে উঠে। যেমন, নিউ ইয়র্কের ট্রেড-ইউনিয়নগুলোর সদস্যরা স্তালিনগ্রাদে একটি হাসপাতাল নির্মাণের জন্য আড়াই লক্ষ ডলার সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সীবনকর্মীদের যুক্ত সঙ্ঘের সভাপতি বলেছিলেন: 'আমরা এই ভেবে গর্বিত যে নিউ ইয়র্কের শ্রমিকরা স্তালিনগ্রাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবে। ইতিহাসে স্তালিনগ্রাদ মহান এক জাতির অমর বীরত্বের প্রতীক হিশেবে বেঁচে থাকবে। নির্যাতনের বিরুদ্ধে মানবজাতির সংগ্রামে এই শহরের প্রতিরক্ষা ছিল এক মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা।... লাল ফৌজের প্রত্যেক সৈনিক আপন সোভিয়েত মাটিকে রক্ষা করতে ও নাৎসিদের হত্যা করতে গিয়ে আমেরিকান সৈনিকদের জীবনও রক্ষা করছে। সোভিয়েত জনগণের কাছে আমাদের ঋণের হিসাবের সময় এ কথাটি আমরা মনে রাখব।'***

* সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সভাপতির পত্রালাপ। খণ্ড ২। — মস্কো, ১৯৫৭, পৃঃ ২৮৮।

** ঐ, খণ্ড ১, পৃঃ ৯০।

*** 'প্রাভদা' খবরের কাগজ, ১৯৪৩ সালের ৩০ জুন।

এমনকি প্রাক্তন জার্মান-ফ্যাসিস্ট জেনারেলরা পর্যন্ত স্তালিনগ্রাদের উপকণ্ঠের লড়াইয়ের বিপুল সামরিক-রাজনৈতিক তাৎপর্য স্বীকার করেছে। এই লড়াইয়ের অংশগ্রহণকারী নাৎসি জেনারেল ডিওর লিখেছে: 'জার্মানির জন্য স্তালিনগ্রাদের উপকণ্ঠের লড়াই ছিল তার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় পরাজয়, আর রাশিয়ার জন্য — বৃহত্তম বিজয়। পল্‌তাভার কাছে (১৭০৯ সাল) রাশিয়া ইউরোপীয় মহাশক্তি বলে অভিহিত হওয়ার অধিকার অর্জন করেছিল। স্তালিনগ্রাদ তার দু'টি বৃহত্তম বিশ্বশক্তির একটিতে পরিণত হওয়ার সূত্রপাত ঘটায়।'*

আর খোদ হিটলার বলেছিল: 'আক্রমণাভিযানের মাধ্যমে পূর্বে যুদ্ধ সমাপ্তির সম্ভাবনা আর নেই।'**

স্তালিনগ্রাদের উপকণ্ঠে সোভিয়েত সৈন্যদের বিজয় ফ্যাসিস্ট জার্মানিকে কাঁপিয়ে তোলে। নাৎসি নেতৃমণ্ডলীতে গভীর সংকটের লক্ষণ দেখা দিল। স্তালিনগ্রাদ ফ্যাসিস্ট জোটে বিশৃঙ্খলা আর মতানৈক্য সৃষ্টি করে। স্তালিনগ্রাদের উপকণ্ঠে ইতালীয়, হাঙ্গেরীয় ও রুমানীয় বাহিনীগুলোর বিনাশ ঘটাতে ওই দেশসমূহের নেতাদের টনক নড়ল। রুমানীয় একনায়ক ই. আন্তনেস্কু স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল যে 'স্তালিনগ্রাদের উপকণ্ঠে লড়াইয়ের পর ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র দোল খেতে আরম্ভ করে'।*** ইতালি সামরিক-রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। হাঙ্গেরি ও রুমানিয়ায় অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক মতভেদ তীব্র আকার ধারণ করে। ফিনল্যান্ড যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে পড়ার জন্য একটি কারণ খুঁজছিল। জাপান সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণে বিরত থাকতে বাধ্য হয়।

স্তালিনগ্রাদের উপকণ্ঠে অর্জিত বিজয় নাৎসি জার্মানি অধিকৃত দেশসমূহে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনে প্রবল প্রেরণা জোগায়, ফ্যাসিস্টবিরোধী জোটভুক্ত জাতিসমূহের মনে গভীর শ্রদ্ধা ও পরমানন্দের উদ্রেক করে, নিরপেক্ষ দেশগুলোর অবস্থানকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে এবং বিশেষত তুরস্ককে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযানের পন্থা ত্যাগ করতে বাধ্য করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি এবং সোভিয়েত সরকার স্তালিনগ্রাদের রক্ষকদের বীরত্ব ও সাহসিকতার যোগ্য মূল্য দেন। শহরটি সম্মানজনক 'বীর-নগরী' নামে ভূষিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী 'স্তালিনগ্রাদের প্রতিরক্ষার জন্য' বিশেষ একটি পদক প্রতিষ্ঠা করেন, এই পদকে ভূষিত হয়েছে শহরের সাত লক্ষাধিক রক্ষক। ১৯৬৭ সালে ভোলগা তীরের বীর-নগরীতে লড়াইয়ের ২৫তম বার্ষিকী উপলক্ষে মামায়েভ টিলায় ভোলগা তীরের মহাবিজয়ের স্মৃতি রক্ষার্থে সুবিশাল এক স্মারক-সমাহার উদ্বোধিত হয়।

সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্তালিনগ্রাদের উপকণ্ঠের পাল্টা-আক্রমণ — বিশ্বের সামরিক ইতিহাসে যার কোন তুলনা নেই — ছিল সোভিয়েত সমর কৌশলের বড় এক সাফল্য, ফ্যাসিস্ট জার্মানির সমর কৌশলের উপর তার শ্রেষ্ঠতার সাক্ষ্য। প্রথমত, এ ছিল শত্রুর বৃহৎ এক গ্রুপিংয়ের পরিবেষ্টন ও বিলোপসাধনের উদ্দেশ্যে কয়েকটি ফ্রন্টের প্রথম সফল স্ট্র্যাটেজিক অপারেশন, যা বস্তুত সম্পন্ন হয়েছিল উভয় পক্ষের শক্তির সমতার পরিবেশে। দ্বিতীয়ত, এই অপারেশনে শক্তি ও সঙ্গতির, বিশেষত আর্টিলারি ও ট্যাঙ্কের সমাবেশ ঘটানো হয়েছিল অনেক বেশি পরিমাণে, যার ফলে প্রধান আঘাতের দিকগুলোতে যথেষ্ট শ্রেষ্ঠতা সৃষ্টি হয়। তৃতীয়ত, পাল্টা-আক্রমণে সেই প্রথম বার পূর্ণ আয়তনে আর্টিলারি আক্রমণ (প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণ, সমর্থন ও সহগমন) চালানো হয়েছিল। চতুর্থত, অপারেশনের সময় সফল বিমান হামলার, মোবাইল (ট্যাঙ্ক) বাহিনীগুলোর সঙ্গে বিমান বাহিনীর পারস্পরিক সহযোগিতা সংগঠনের প্রথম অভিজ্ঞতা লব্ধ হয়েছে, অন্তরীক্ষে আধিপত্য অর্জিত হয়েছে এবং আকাশ থেকে শত্রুর পরিবেষ্টিত বাহিনীগুলোকে অবরোধ করার কাজ সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। পঞ্চমত, সামরিক ক্রিয়াকলাপের আকস্মিকতা অর্জিত হয়েছিল এবং শত্রুকে পরিবেষ্টন করার উদ্দেশ্যে বাহিনীসমূহের মোবাইল গ্রুপ হিশেবে ট্যাঙ্ক ও মেকানাইজ্ড কোরগুলোকে সুনিপুণভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল।

স্তালিনগ্রাদের উপকণ্ঠে জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের পরাজয়ের ফলে ককেশাস সহ সর্বত্র সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর জন্য অতি অনুকূল এক

পরিস্থিতি গড়ে উঠে। ১৯৪৩ সালের ১ জানুয়ারি দক্ষিণ ফ্রন্ট (সাবেক স্তালিনগ্রাদ ফ্রন্ট) ও ট্রান্স-ককেশীয় ফ্রন্টের সৈন্যরা — ৮ম, ৪র্থ ও ৫ম বিমান বাহিনীর সমর্থনে কৃষ্ণ সাগরীয় নৌ-বহরের সক্রিয় সহায়তায় — উত্তর ককেশাসে শত্রুর প্রধান শক্তিসমূহকে প্রথমে বিচ্ছিন্ন ও পরে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ আরম্ভ করে।

নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলী তাদের সৈন্যদের পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ার সম্ভাবনায় শঙ্কিত হয়ে তাড়াহুড়ো করে ওদের মজদক অঞ্চল থেকে উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে সরিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করল। শত্রুর পশ্চাদনুসরণ করে সোভিয়েত সৈন্যরা তাকে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত করছিল। জানুয়ারির শেষ দিকে কঠোর লড়াই চালিয়ে তারা উত্তর দনেৎস নদীর কাছে, রস্তভের কাছে ও আজভ সাগরের উপকূলে পেঁছে যায়। জার্মান-ফ্যাসিস্ট গ্রুপিংটি দুই অংশে বিভক্ত হয়ে যায়: প্রধান শক্তিসমূহ তামান উপদ্বীপে হটে যেতে বাধ্য হয়, আর শত্রু সৈন্যের একাংশ রস্তভ হয়ে দনবাসে চলে যায়। এহেন পরিস্থিতিতে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর সদর-দপ্তর শক্তি পুনর্বিন্যাস করে। ১৯৪৩ সালের ২৪ জানুয়ারি সৈন্যদের উত্তরের গ্রুপটিকে উত্তর-ককেশীয় ফ্রন্টে রূপান্তরিত করা হয় (অধিনায়ক জেনারেল ই. মাস্‌লেন্নিকোভ)। ফেব্রুয়ারির গোড়াতে সৈন্যদের কৃষ্ণ সাগরীয় গ্রুপটিও তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়।

আক্রমণাভিযান অব্যাহত রেখে ফ্রন্টটি কুবান ও তামান উপদ্বীপ থেকে শত্রুকে তাড়ানোর এবং ক্রাস্নদার ও নভোরসিইস্ক মুক্ত করার কাজে লিপ্ত হয়। এই সমস্ত অঞ্চলে যে-লড়াই শুরু হয় তা কঠোর আকার ধারণ করে। জলকাদার জন্য, পথাভাব ও পশ্চাদ্ভাগের বিস্তৃতির জন্য অবস্থা আরও বেশি জটিল হয়ে উঠছিল। কুবানে শত্রুর প্রতিরোধ দমন করে দিয়ে সোভিয়েত সৈন্যরা ১২ ফেব্রুয়ারি তারিখে ক্রাস্নদার মুক্ত করে। তামান অভিমুখে সোভিয়েত ফৌজের পরবর্তী অগ্রগতি রোধ হয়ে যায়। নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলী যেন-তেন প্রকারে তামান উপদ্বীপ নিজের দখলে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তামান উপদ্বীপ ছিল গুরুত্বপূর্ণ একটি অপারেটিভ-স্ট্র্যাটেজিক পাদভূমি, জার্মানদের রণাঙ্গনের দক্ষিণ পার্শ্বের অন্যতম প্রধান অবস্থান। ওখানে, বিশেষত নভোরসিইস্কের কাছে, সুদৃঢ় দুর্গ নির্মিত হয়েছিল। তা মুক্তকরণের জন্য লড়াই শুরু হয় ফেব্রুয়ারি মাসে এবং সে লড়াই কঠোর ও দীর্ঘ চরিত্র ধারণ করে।

৩ ফেব্রুয়ারি রাত্রে এবং পরের দুদিন কৃষ্ণ সাগরীয় নৌ-বহর

নভোরসিইস্কের দক্ষিণ-পশ্চিমে, মিস্খাকো অঞ্চলে, নৌ-সৈন্যদের (আর্টিলারি ও ট্যাঙ্ক সহ ১৫ সহস্রাধিক লোক) নামায়। তারা অনতিবৃহৎ একটি পাদভূমি দখল করে নেয়, যা পরে নভোরসিইস্ক মুক্তকরণের সময় বৃহৎ ভূমিকা পালন করেছিল। আক্রমণের এই পাদভূমিটি ইতিহাসে 'মালায়া জেমলিয়া' ('ক্ষুদ্র ভূখণ্ড') নামে পরিচিত। এখানে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল মেজর স. কুনিকোভের নৌ-সৈনিক দলটি। এই পাদভূমির সাত মাস ব্যাপী বীরত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা হচ্ছে দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল পৃষ্ঠা। অনতিবৃহৎ ভূখণ্ডটি নিজ দখলে রেখে নৌ-সৈনিকরা নভোরসিইস্কে ট্রেঞ্চে গেড়ে বসা নাৎসিদের জন্য বাস্তব হুমকি সৃষ্টি করছিল এবং সেমেস্কায়া খাড়ি ব্যবহার করতে ওদের বাধা দিচ্ছিল।

ফ্যাসিস্টরা পাদভূমি পুনর্দখল করার জন্য এবং নৌ-সৈনিকদের সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা অবলম্বন করছিল। জলে স্থলে ও অন্তরীক্ষে কঠোর লড়াই শুরু হল। এমনও দিন ছিল যখন নাৎসি বিমান বাহিনী সহস্রাধিক বিমান-উড্ডয়ন করেছে; শত্রুর আর্টিলারি ১৯৪৩ সালের বসন্তে ও গ্রীষ্মে এখানে ১১টি ট্রেন বোঝাই গোলা খরচ করেছে। নাৎসিরা নিজেরাই হিসাব করে দেখেছে যে ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের প্রত্যেক যোদ্ধার পেছনে তারা কেবল এক হেভি আর্টিলারিরই কমপক্ষে পাঁচটি করে গোলা ব্যয় করেছে। কিন্তু যোদ্ধারা টিকে থাকে।

পরবর্তী আক্রমণাভিযান চলাকালে উত্তর-ককেশীয় ফ্রন্টের সৈন্যরা মে মাসের গোড়ার দিকে তামান উপদ্বীপে পৌঁছে যায় এবং ওখানে তারা শত্রুর আগে থেকে তৈরি প্রতিরক্ষা লাইনে, তথাকথিত 'নীল লাইনে', দৃঢ় প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। ১৯৪৩ সালের বসন্তে প্রতিরক্ষা লাইনটি ভেদ করার প্রচেষ্টা সফল হল না।

শত্রু তার স্থলসেনাকে সাহায্য করার জন্য বিমান বাহিনীর যথেষ্ট শক্তি প্রেরণ করে। কুবান অঞ্চলে প্রায় দু' মাস ধরে চলে বিরাট এক বায়ুযুদ্ধ। অন্তরীক্ষে আধিপত্য লাভের জন্য সংগ্রামে এ যুদ্ধের বৃহৎ তাৎপর্য ছিল এবং তাতে জিতেছিল সোভিয়েত বিমান বাহিনী। সোভিয়েত বিমানগুলো ৩৫ হাজার বিমান-উড্ডয়ন করে, শত্রুর ১১০০টিরও বেশি বিমান ধ্বংস করে দেয়, তার মধ্যে ৮০০টি ভূপাতিত হয়েছিল বায়ু যুদ্ধে।

তামান উপদ্বীপ ও নভোরসিইস্ক মুক্তকরণের জন্য পরবর্তী সামরিক ক্রিয়াকলাপ চলে ১৯৪৩ সালে হেমন্তে। উত্তর-ককেশীয় ফ্রন্টের সৈন্যরা শত্রুর তামান গ্রুপিংটির বিলোপ ঘটানোর দায়িত্ব পেয়েছিল। এই কর্তব্য

সম্পাদনের উদ্দেশ্যে স্থল ভাগে এবং সমুদ্র থেকে নভোরসিইস্কের উপর আকস্মিক আঘাত হানার কথা ছিল। এর পরে ভের্খ্‌নেবাকানস্কি অভিমুখে আক্রমণাভিযান চালিয়ে 'নীল লাইন' প্রতিরক্ষারত জার্মান গ্রুপিংটিকে দক্ষিণ দিক থেকে ঘিরে ফেলার সম্ভাবনা সৃষ্টি করার কথা ছিল। ১০ সেপ্টেম্বর আরম্ভ হল নভোরসিইস্ক-তামান অপারেশন। বন্দর ও শহরের উপর হামলা আরম্ভকারী স্থলসেনা ও অবতরণ জাহাজগুলোর আক্রমণাভিযানের সঙ্গে সঙ্গে শহরের পূর্ব দিকে আক্রমণ আরম্ভ করে ১৮শ বাহিনীর আক্রমণকারী গ্রুপটি এবং বীরত্বপূর্ণ তথাকথিত 'মালায়া জেমলিয়ার' নৌ-সৈনিকরা। স্থলসেনা, নৌ-বহর আর বিমান বাহিনীর সম্মিলিত প্রয়াসের ফলে জার্মানদের 'নীল লাইনটি' বিদ্ধ হয়ে যায় এবং ১৬ সেপ্টেম্বর নভোরসিইস্ক শহর মুক্তি লাভ করে।

মাতৃভূমির প্রতি বিশিষ্ট অবদানের স্মৃতিতে, শহরের মেহনতী মানুষ আর সোভিয়েত যোদ্ধাদের বিপুল বীরত্ব, সাহসিকতা ও দৃঢ়তার জন্য নভোরসিইস্ককে সম্মানজনক 'বীর-নগরী' নামটি দেওয়া হয়।

আক্রমণাভিযান অব্যাহত রেখে সোভিয়েত সৈন্যরা অক্টোবরের গোড়ার দিকে কুবান নদীর নিম্নাঞ্চল থেকে জার্মান-ফ্যাসিস্ট হানাদারদের তাড়িয়ে দেয় এবং ককেশাসে জার্মানদের শেষ পাদভূমি — তামান উপদ্বীপটি পুরোপুরিভাবে শত্রুমুক্ত করে। এই ভাবে, ককেশাসের জন্য লড়াইয়ে সোভিয়েত সৈন্যরা বড় রকমের জয় লাভ করে। এ ঘটনাটির বিপুল রাজনৈতিক ও স্ট্র্যাটেজিক তাৎপর্য ছিল। ককেশাসে আক্রমণাভিযানের সময় লাল ফৌজ লড়াই করতে করতে প্রায় ৮০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে এবং ২ লক্ষ বর্গকিলোমিটার আয়তনের ভূখণ্ডকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করে। জার্মানরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা হারায় ২ লক্ষ ৮১ হাজার সৈনিক ও অফিসার, ১,৩৫৬টি ট্যাঙ্ক, ২,০০০ বিমান, ৭ সহস্রাধিক তোপ ও মর্টার কামান, প্রায় ২২,০০০টি মোটর গাড়ি এবং প্রচুর পরিমাণ অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র আর জিনিসপত্র।

ককেশাসের জন্য লড়াইয়ে সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর বিজয় কেবল ককেশাস দখলের নাৎসি পরিকল্পনাই নয়, মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলোতে অনুপ্রবেশের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাটিও সম্পূর্ণরূপে বানচাল করে দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য রক্ষিত থাকে ককেশাসের ভূখণ্ড ও তার বিপুল অর্থনৈতিক সম্পদ।

স্তালিনগ্রাদের উপকণ্ঠে, দন নদীতে ও ককেশাসে অর্জিত বিজয় মধ্য

প্রাচ্যে এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে মিত্র শক্তিবর্গের অবস্থান অনেকটা সুদৃঢ় করে, উত্তর আফ্রিকায় জেনারেল রমেলের বাহিনীকে পরাস্ত করতে তাদের সাহায্য করে। হিটলারী সেনাপতিমণ্ডলী মধ্য প্রাচ্যে সামরিক ক্রিয়াকলাপের জন্য নির্বাচিত বিশেষ 'F' কোরটিকে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গন থেকে ওখানে পাঠাতে তো পারেই নি, উল্টে বরং তারা উত্তর আফ্রিকা থেকে তাদের বিমান বাহিনীর একটি অংশকে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল।

ফ্যাসিস্টরা আশা করেছিল যে তারা রুশ জাতি ও ককেশাসের জাতিসমূহের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পারবে। কিন্তু ককেশাসের জন্য লড়াইয়ে তাদের সে আশা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়। ককেশীয় জাতিসমূহ মহান রুশ জনগণ ও দেশের অন্যান্য জাতির সঙ্গে মিলে বুক পেতে সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমি রক্ষা করছিল। এটা বললেই যথেষ্ট হবে যে ট্রান্স-ককেশীয় ফ্রন্টের ফৌজগুলোর মধ্যে ছিল ১২টির মতো জাতীয় ফর্ম্যাশন যা গঠিত হয়েছিল ককেশীয় জাতিদের নিয়ে। ককেশাসের জাতিসমূহ একই স্বদেশপ্রেমিক প্রেরণার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে শত্রুকে পরাভূত করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বৈষয়িক ভিত্তি গড়ে দেয়। ককেশাসে উৎপাদিত হত মেশিনগান, সাবমেশিনগান, গোলাবারুদ, কামান এবং এমনকি বিমানও। সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর জন্য খাদ্যদ্রব্য ও পোশাকপরিচ্ছদ সরবরাহের কাজে ককেশাসের জাতিসমূহের বিপুল অবদান ছিল। উত্তর ককেশাসের সর্বত্র গঠিত হচ্ছিল পার্টিজান দল। ওগুলোতে ভর্তি হচ্ছিল রুশ, ইউক্রেনীয়, বেলোরুশ, জর্জীয়ান, আরমেনীয়, ওসেতিন, চেচেন, ইঙ্গুশ, কাবার্দিনরা এবং সোভিয়েত দেশের অন্যান্য বহু জাতির লোকেরা। কেবল এক ক্রাস্নদার প্রদেশেই লড়ছিল ৮৭টি পার্টিজান দল। কারাচাই ও চেরকেস স্বায়ত্তশাসিত জেলাগুলোর পর্বতাঞ্চলে পার্টিজানরা অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেয়।

ককেশাসের লড়াইকে স্তালিনগ্রাদের লড়াই থেকে আলাদা করে দেখা উচিত নয়। স্তালিনগ্রাদের লড়াই সংগ্রামের পুরো সময়টা ধরে ককেশাসে সামরিক ক্রিয়াকলাপের গতিকে খুবই প্রভাবিত করছিল। অন্য দিকে, ককেশাসের সামরিক ক্রিয়াকলাপ স্তালিনগ্রাদের লড়াইয়ের গতির উপর খুবই অনুকূল প্রভাব ফেলেছিল। সোভিয়েত সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলী সুনিপুণভাবে পরিচালনা করেন পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত এই লড়াইগুলো। ককেশাসের জন্য লড়াইয়ে সোভিয়েত সৈন্যরা বিভিন্ন অঞ্চলের পরিবেশে -- সমভূমিতে,

পর্বতের পাদদেশে ও পাহাড়পর্বতে — সামরিক ক্রিয়াকলাপের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা অর্জন করে, বিমান ও নৌ-বাহিনীর সঙ্গে, পার্টিজানদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করে। বহুমুখী এই সামরিক অভিজ্ঞতা পরে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছিল ক্রিমিয়া ও কার্পেথিয়ার জন্য লড়াইয়ে এবং ১৯৪৪ সালে কৃষ্ণ সাগরের উত্তর ও পশ্চিম উপকূল মুক্তকরণের কাজে।

নুরেমবার্গের বিচারাদালতে নাৎসি জল্লাদদের উপর মোকদ্দমা চলাকালে ওদের অভিযুক্ত করা হয় পূর্বপরিকল্পিত নির্যাতন ও নৃশংসতার জন্য, বহু জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার অভিপ্রায়ের জন্য। এ সমস্তকিছু নাৎসি জার্মানির পররাষ্ট্র নীতির পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছিল এবং তার অখণ্ডনীয় প্রমাণও দেওয়া হয়েছিল। কেবল এক ক্রাস্নদার ভূখণ্ডেই জার্মান-ফ্যাসিস্ট হানাদারেরা গুলি করে, ফাঁসি দিয়ে, মোবাইল গ্যাস-চ্যাম্বারে শ্বাসরোধ করে ও গেস্টাপোতে যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করেছিল ৬১,৫৪০ জন লোককে, যাদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল নারী, বৃদ্ধ ও শিশু; প্রায় ৩২ হাজার তরুণ-তরুণীকে ওরা দাসরূপে খাটানোর জন্য নিয়ে গিয়েছিল জার্মানিতে। উত্তর ককেশাসের ভূখণ্ডে ফ্যাসিস্টরা পরীক্ষা করেছিল ও প্রথম বারের মতো ব্যবহার করেছিল মোবাইল গ্যাস-চ্যাম্বার — অর্থাৎ একজস্ট গ্যাসের সাহায্যে শ্বাসরোধ করে মানুষ মারার জন্য বিশেষ সাজসরঞ্জামে সজ্জিত মোটর গাড়ি।

২। লেনিনগ্রাদের অবরোধ ভেদ
(১৯৪৩ সালের ১২-৩০ জানুয়ারি)

স্তালিনগ্রাদের উপকণ্ঠে এবং ককেশাসে সোভিয়েত সৈন্যদের বিজয় কেবল দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিম অভিমুখেই নয়, উত্তর-পশ্চিম অভিমুখেও অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। নাৎসিরা দক্ষিণ দিকে সমস্ত মজুদ বাহিনী টেনে এনে এখানে নিজের ফৌজগুলোর শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে নি। লেনিনগ্রাদে শত্রুর অবরোধ ভেদ করার সম্ভাবনা দেখা দিল। সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর সদর-দপ্তর এই অপারেশনটি পরিচালনার দায়িত্ব দিলেন লেনিনগ্রাদ ফ্রন্টকে (অধিনায়ক জেনারেল ল. গভোরভ) এবং ভল্‌খভ ফ্রন্টকে (অধিনায়ক জেনারেল ক. মেরেৎস্কোভ)। এ কাজে ফ্রন্ট দুটির বল্টিক নৌ-বহর ও দূর পাল্লার বিমান বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করার

নির্দেশ ছিল। অপারেশনের উদ্দেশ্য ছিল — প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার শ্লিসেলবুর্গ-সিনিয়াভিনো উচ্চতাংশ বরাবর সাক্ষাৎকালীন আঘাত হেনে লাদোগা হ্রদের দক্ষিণে শত্রুর গ্রুপিংটি বিধ্বস্ত করা, অবরোধ বেষ্টনী ভেদ করা এবং দেশের মধ্যাঞ্চলগুলোর সঙ্গে লেনিনগ্রাদকে যুক্তকারী স্থল-যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। লেনিনগ্রাদ ফ্রন্ট ও ভল্‌খভ ফ্রন্টের মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র ১৫ কিলোমিটার কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের সামনে ছিল দুরূহ এক কাজ। লেনিনগ্রাদের উপকণ্ঠে নাৎসিরা বিপুল শক্তির সমাবেশ ঘটিয়েছিল। জার্মানদের 'উত্তর' গ্রুপের ১৮শ বাহিনীর কাছে ছিল প্রায় ২৬টি ডিভিশন — তা শহর অবরোধ করেছিল দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে, ফিনিশ বাহিনীর কাছে ছিল ৪ ডিভিশনের বেশি সৈন্য — তা অবরোধের বেষ্টনীর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল উত্তর দিক থেকে, কারেলীয় যোজকে। জার্মান-ফিনিশ বাহিনীগুলোকে সমর্থন জোগাচ্ছিল ১ম বিমান বহরের প্লেনগুলো। শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা — বিশেষত শ্লিসেলবুর্গ-সিনিয়াভিনো উচ্চতাংশে — ছিল খুবই সুদৃঢ়। নাৎসিরা উচ্চতাংশটিকে একটি সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত অঞ্চলে পরিণত করে, ওখানে নির্মিত হয় ট্যাঙ্কবিরোধী ও ইনফেণ্ট্রিবিরোধী অনেক প্রতিবন্ধক; শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

ষোলোটি মাস লেনিনগ্রাদ নগরী জার্মান-ফ্যাসিস্ট হানাদারদের দ্বারা অবরুদ্ধ ছিল। প্রতিদিন মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছিল হাজার হাজার শহরবাসী। কিন্তু জলহীন আলোহীন ক্ষুধার্ত বীর নগরী অটল প্রতিরোধ দিয়ে যায় এবং সমগ্র দেশের সমর্থনে সমস্তকিছু সয়ে বিজয় লাভ করে।

অপারেশনের প্রস্তুতির সময় সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী নিজস্ব রিজার্ভ দিয়ে এবং অন্যান্য দিকের ফর্ম্যাশনগুলোর পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে প্রধান আঘাতের অভিমুখে যুদ্ধরত ৬৭তম ও ২য় আক্রমণকারী বাহিনীর ফৌজগুলোর যথেষ্ট শক্তি বৃদ্ধি করেন। এখানে শক্তির অনুপাত ছিল সোভিয়েত সৈন্যদের অনুকূলে: জনবলে — ৪·৫ গুণ, আর্টিলারিতে — ৬-৭ গুণ, ট্যাঙ্ক — ১০ গুণ এবং বিমানে — ২ গুণ।

আক্রমণাভিযান আরম্ভ হওয়ার রাত্রে সোভিয়েত বিমান বাহিনী শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপর, আর্টিলারির অবস্থান, পরিচালনা কেন্দ্র আর রেল জংশনগুলোর উপর ব্যাপক বোমাবর্ষণ করে। ১৯৪৩ সালের ১২ জানুয়ারী সকালে প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণ এবং বোমাবর্ষণের পর উভয় ফ্রন্টের আক্রমণকারী গ্রুপিংগুলো আক্রমণাভিযান শুরু করে। দিনের শেষে শত্রুর

প্রতিরোধ দমন করে তারা পরস্পরের দিকে ৩ কিলোমিটার করে অগ্রসর হয়।

শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করার কাজে পদাতিক বাহিনীকে আর ট্যাঙ্কগুলোকে উল্লেখযোগ্য সহায়তা জোগায় গোলন্দাজ এবং বিমান বাহিনী, বল্টিক নৌ-বহরের উপকূলস্থ তোপশ্রেণী ও জাহাজে অবস্থিত আর্টিলারি। সাত দিনের কঠোর লড়াইয়ের পর মুক্ত হয় শ্লিসেলবুর্গ শহর। ১৮ জানুয়ারি উভয় ফ্রন্টের সৈন্যরা মিলিত হয়ে যায়। লেনিনগ্রাদের অবরোধ বিদ্ধ হয়। লাদোগা হ্রদের দক্ষিণ তীর বরাবর তৈরি ৮-১১ কিলোমিটার চওড়া করিডরটি দেশের সঙ্গে লেনিনগ্রাদের সরাসরি স্থল-যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করল।

১৭ দিনের মধ্যে তীর বরাবর পাতা হয় রেলপথ ও মোটর সড়ক। ৬ ফেব্রুয়ারি ৩৬ কিলোমিটার দীর্ঘ শ্লিসেলবুর্গ — পলিয়ানি রেলপথ দিয়ে লেনিনগ্রাদ অভিমুখে ট্রেন চলতে শুরু করে। লাদোগা হ্রদের বরফ-পথও খোলা থাকে, ওটা রক্ষা করছিল ফাইটার বিমান বাহিনী। তাতে লেনিনগ্রাদের বাসিন্দাদের ও সোভিয়েত সৈন্যদের খাদ্যদ্রব্য, গোলাবারুদ ও সামরিক প্রযুক্তি সরবরাহের কাজ অনেকটা উন্নত ও সুসংগঠিত হয়ে উঠল।

লেনিনগ্রাদের অবরোধ ভেদ লেনিনগ্রাদের জন্য লড়াইয়ে এক সন্ধিক্ষণ সূচিত করে। এই স্ট্র্যাটেজিক অভিমুখে সামরিক ক্রিয়াকলাপের উদ্যোগ চলে আসে সোভিয়েত বাহিনীর হাতে।

১৯৪৩ সালের ১২ থেকে ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত কাল পর্যায়ে ভরোনেজ ফ্রন্টের সৈন্যরা ৮ম ইতালীয় ও ২য় হাঙ্গেরীয় বাহিনীগুলোকে পরিবেষ্টন ও বিধ্বস্তকরণের উদ্দেশ্যে সফল একটি অপারেশন পরিচালিত করে। এর নাম ছিল — ওস্ত্রগোজ্স্ক-রসোশ অপারেশন। দনবাস কয়লাঞ্চল মুক্তকরণের জন্য অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে উঠল।

১৯৪৩ সালের ২৪ জানুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ব্রিয়ানস্ক ও ভরোনেজ ফ্রন্টগুলোর সংলগ্ন পার্শ্বসমূহের সৈন্যরা ভরোনেজ-কাস্তরনোয়ে অপারেশন চালিয়ে শত্রুর ৪০ হাজার সৈন্যের একটি গ্রুপিংকে ঘেরাও করে ফেলে এবং ভরোনেজ শহর ও ভরোনেজ জেলা মুক্ত করে। ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম ফ্রন্টের সৈন্যরা জার্মানদের দেমিয়ানস্ক পাদভূমিটির বিলোপ ঘটায়, কিন্তু শত্রুর গ্রুপিংকে ঘেরাও করতে পারে নি,

কেননা অপারেশনটির জন্য যথেষ্ট শক্তি ও সঙ্গতি — বিশেষত বিমান ও ট্যাঙ্ক — জোগানো হয় নি।

কিছুটা পরে (১৯৪৩ সালের ২ মার্চ — ১ এপ্রিল) কালিনিন ও পশ্চিম ফ্রন্টগুলোর সৈন্যরা শত্রুর র্জেভ-ভিয়াজমা উদ্গতাংশটির বিলোপ ঘটিয়ে ১৩০ থেকে ১৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং তদ্দ্বারা মস্কোর স্ট্র্যাটেজিক অভিমুখে সোভিয়েত ফৌজের অবস্থান মজবুত করে।

ওই কাল পর্যায়ে দক্ষিণ দিকে ভরোনেজ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টগুলোর বাহিনীসমূহ কঠোর প্রতিরক্ষামূলক লড়াই চলাকালে পল্‌তাভা অঞ্চল থেকে খারকভ অভিমুখে শত্রুর প্রবল আক্রমণ প্রতিহত করে, আর ১৩ থেকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ফ্রন্টের সৈন্যরা নভগরদ-সেভের্স্কি শহর অঞ্চলে নাৎসিদের প্রবল প্রতিঘাত প্রতিরোধ করে। তবে তা করতে গিয়ে সোভিয়েত সৈন্যদের কিছুটা হটতে হয়েছিল। শত্রুর প্রতিঘাতের ফলে সৃষ্টি হল কুর্স্কের বাঁক। রণাঙ্গন সুস্থির হল।

৩। কুর্স্কের লড়াই
(১৯৪৩ সালের ৫ জুলাই — ২৩ আগস্ট)

স্তালিনগ্রাদের উপকণ্ঠে জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের পরাজয় এবং ১৯৪২-১৯৪৩ সালের শীতকালে লাল ফৌজের ব্যাপক আক্রমণাভিযান সমগ্র সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটায়। সোভিয়েত সৈন্যরা শত্রুকে ৬০০-৭০০ কিলোমিটার পশ্চিমে হটিয়ে দেয়, ৪ লক্ষ ৯০ সহস্রাধিক বর্গকিলোমিটার আয়তনের বিশাল এক ভূখণ্ড মুক্ত করে এবং শতাধিক জার্মান ডিভিশনকে বিধ্বস্ত করে দেয়। ১৯৪২ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৪৩ সালের মার্চ পর্যন্ত পূর্ব রণাঙ্গনে ভের্মাখট্ হারিয়েছিল ১৭ লক্ষ লোক, ৩ হাজার ৫ শতাধিক ট্যাংক, ৪,৩০০টি বিমান ও ২৪ হাজার কামান।

লাল ফৌজ জার্মান সামরিক যন্ত্রের উপর যে-সমস্ত আঘাত হানে তাতে 'তৃতীয় রাইখের' সামরিক ক্ষমতা বিনষ্ট হয়ে যায়। হিটলারী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পতন দেখে আশঙ্কিত নাৎসি নেতৃবৃন্দ আবার স্ট্র্যাটেজিক উদ্যোগ লাভ করতে, মিত্রদের ও নিরপেক্ষ দেশসমূহের সামনে নিজের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং নিজের অনুকূলে যুদ্ধের গতি ঘুরিয়ে দিতে চাইল।

নতুন, গ্রীষ্মকালীন আক্রমণাভিষানের জন্য প্রস্তুতি নিতে গিয়ে ফ্যাসিস্ট জার্মানি যুদ্ধবন্দী আর বিদেশী শ্রমিকদের উপর নিষ্ঠুরতম শোষণ চালিয়ে ১৯৪৩ সালে তোপ, মর্টার কামান আর ট্যাঙ্কের উৎপাদন বৃদ্ধি করে (১৯৪২ সালের তুলনায়) দ্বিগুণেরও বেশি, জঙ্গী বিমানের উৎপাদন বেড়েছিল ১·৭ গুণ। ভের্মাখ্ট পেল গ্রীষ্মকালীন অভিযানে সাফল্যের আশা প্রদানকারী 'টাইগার' ও 'প্যান্থার' নামক নতুন ভারী ট্যাঙ্ক, 'ফের্ডিনান্ড' নামক অ্যাসল্ট গান, এবং 'ফক্কে-উল্ফ-১৯০' ও 'হেনশেল-১২৯' নামক বিমানগুলো। দেশজোড়া সার্বিক সৈন্যযোজনের কাজ চালিয়ে নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলী তাদের সশস্ত্র বাহিনীর লোকসংখ্যা ১ কোটি ৩ লক্ষে নিয়ে যায়। কেবল সংগ্রামী সৈন্য বাহিনীতেই ছিল ৬৬ লক্ষ ৮২ হাজার লোক, এবং এদের মধ্যে ৪৮ লক্ষই — অর্থাৎ ৭১ শতাংশেরও বেশি — অবস্থিত ছিল সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে।

কুর্স্কের উম্গতাংশে আপন ফৌজের সুবিধাজনক অবস্থানের কথা বিবেচনা করে জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী ঠিক করেছিল যে উত্তর ও দক্ষিণ থেকে কুর্স্কের উম্গতাংশের মূল ভিত্তির উপর আঘাত হেনে কেন্দ্রীয় ও ভরোনেজ ফ্রন্টগুলোর সৈন্যদের ঘিরে ফেলবে ও ধ্বংস করবে, আর তারপর দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের পশ্চাস্তাগে আঘাত হানবে। এর পর উত্তর-পূর্ব অভিমুখে আক্রমণাভিযান চালিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। লেনিনগ্রাদ অভিমুখেও আক্রমণাভিযানের পরিকল্পনা ছিল।

'সিটাডেল' নামে অভিহিত এই অপারেশনটি পরিচালনার উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হয়েছিল ৫০টি ডিভিশন (১৬টি ট্যাঙ্ক আর মোটোরাইজ্ড ডিভিশন সহ) যাতে ছিল ৯ লক্ষাধিক লোক, ১০ হাজারের মতো তোপ ও মর্টার কামান, প্রায় ২,৭০০টি ট্যাঙ্ক ২,০৫০টির মতো বিমান। পশ্চিম জার্মান ইতিহাসবিদ সেইট্লের লিখেছেন যে জার্মানি এবং অধিকৃত ইউরোপের শিল্প যাকিছু উৎপাদন করতে সক্ষম ছিল তার সবটাই সমাবেশিত হয়েছিল কুর্স্ক অভিমুখে।

সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীও চূড়ান্ত আক্রমণাত্মক অপারেশনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্ম নাগাদ সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক-রাজনৈতিক অবস্থান ফ্যাসিস্ট জার্মানির তুলনায় আরও বেশি মজবুত হয়ে ওঠে। লাল ফৌজের বিজয়ে অনুপ্রাণিত সোভিয়েত জনগণ দেশের অভ্যন্তর ভাগে বীরত্বপূর্ণ শ্রমে নিযুক্ত ছিল। অর্থনীতির ক্ষেত্রে অর্জিত হয় নতুন নতুন সাফল্য। ১৯৪২ সালের তুলনায় মোট উৎপাদনের পরিমাণ

বৃদ্ধি পায় ১৭ শতাংশ। দেশের পূর্বাঞ্চলগুলোতে — উরালে, ভোলগা অঞ্চলে, সাইবেরিয়ায় ও মধ্য এশিয়ায় — উৎপাদনের পরিমাণ অনেকটা বেড়ে যায়। এখানে এটা বললেই যথেষ্ট হবে যে ১৯৪৩ সালে সোভিয়েত শিল্প প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ৩,০০০টি বিমান, ২ সহস্রাধিক ট্যাঙ্ক ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গান উৎপাদন করছিল। সৈন্যদের হাতে এল নতুন নতুন সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গান (সু-৭৬, সু-১২২, সু-১৫২) আর নতুন নমুনার গুলিবর্ষণকারী অস্ত্র। বিমান শিল্প উৎপাদন করে বিপুল সংখ্যক নতুন ফাইটার প্লেন: ইয়াক-৭, ইয়াক-৯, লা-৫। সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর রিজার্ভের গোলন্দাজ বাহিনীকে সম্পূর্ণ মেকানিক্যাল ট্র্যাকশনে নিয়ে আসা হয়। সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনী নিয়মিতভাবে পাচ্ছিল প্রয়োজনীয় সামরিক প্রযুক্তি, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, যথেষ্ট পরিমাণ পোশাকপরিচ্ছদ ও খাদ্যদ্রব্য। সোভিয়েত যোদ্ধাদের মনোবল ও রাজনৈতিক চেতনা আরও অনেক বৃদ্ধি পেল, তাদের সামরিক দক্ষতা আরও বেড়ে গেল।

১৯৪৩ সালের গ্রীষ্ম নাগাদ লাল ফৌজ সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে অবস্থিত নাৎসি বাহিনীকে ট্যাঙ্কে ১·৮ গুণ, আর্টিলারিতে প্রায় ২ গুণ, বিমানে ২·৮ গুণ ছাড়িয়ে যায়। তা সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলীকে বৃহৎ আক্রমণাত্মক অপারেশন আরম্ভ করার সুযোগ দিল। তবে কুর্স্কের কাছে আসন্ন জার্মান আক্রমণাভিযান সম্পর্কে সংবাদ পেয়ে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর সদর-দপ্তর প্রথম আক্রমণ আরম্ভ না করার সিদ্ধান্ত নিল। সদর-দপ্তর ঠিক করল যে আগে কুর্স্কের উদ্গতাংশ অঞ্চলে গভীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়তে হবে এবং প্রতিরক্ষামূলক লড়াইয়ে শত্রুকে নাজেহাল করে দুর্বল করে দিতে হবে, আর তারপর পাল্টা-আক্রমণ চালিয়ে শত্রু বাহিনীগুলোকে বিধ্বস্ত করে দিতে হবে। এই ভাবে, সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী ওই পরিস্থিতিতে জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীর আক্রমণকারী শক্তিগুলোকে বিধ্বস্তকরণের সবচেয়ে উপযুক্ত পদ্ধতিটি বেছে নিলেন যাতে সার্বিক আক্রমণাভিযানের উদ্দেশ্যে লাল ফৌজের জন্য সর্বাধিক অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে তোলা যায়। পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের গতি এরূপ সিদ্ধান্তের সঠিকতা প্রমাণ করে।

সর্বোচ্চ সদর-দপ্তরের পরিকল্পনা ছিল — কেন্দ্রীয় ও ভরোনেজ ফ্রন্টগুলোর সক্রিয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা জার্মান আক্রমণাভিযানের মোকাবেলা করা। উক্ত ফ্রন্ট দু'টির পশ্চাদ্ভাগে শক্তিশালী স্ট্র্যাটেজিক রিজার্ভ হিশেবে অবস্থান করছিল আরও একটি ফ্রন্ট — স্তেপ ফ্রন্ট। জার্মান-

ফ্যাসিস্ট আক্রমণকারী গ্রুপিংগুলো দুর্বল হয়ে পড়ার পর পাঁচটি ফ্রন্টের (পশ্চিম ফ্রন্টের বাঁ পার্শ্ব, ব্রিয়ানস্ক, কেন্দ্রীয়, ভরোনেজ ও স্তেপ ফ্রন্টের) শক্তি দিয়ে পাল্টা-আক্রমণ আরম্ভ করে শত্রুকে বিধ্বস্ত করার কথা ছিল। পরে নীপারের বাঁ তীরস্থ ইউক্রেনে, দনবাসে, পূর্ব বেলোরুশিয়ায় এবং কুবানে আক্রমণাভিযান চালানোর পরিকল্পনা ছিল।

এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সোভিয়েত সৈন্যরা কুর্স্কের উম্গতাংশে ইঞ্জিনিয়রিং দৃষ্টিকোণ থেকে অতি দৃঢ় এক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রস্তুত করে। তাতে ছিল মোট ২৫০-৩০০ কিলোমিটার গভীর আটটি আত্মরক্ষা লাইন। দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের বছরগুলোতে সোভিয়েত সৈন্যদের এর আগে আর কখনও এত মজবুত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়তে হয় নি। কেবল এক কেন্দ্রীয় ফ্রন্টের এলাকাতেই সৈন্য ও বাসিন্দারা খনন করেছিল ৫ হাজার কিলোমিটার ট্র্যাঞ্চ ও যোগাযোগ পথ। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটি সর্বাগ্রে ছিল ট্যাঙ্কবিরোধী। তার ভিত্তিতে ছিল ট্যাকটিক্যাল এলাকার সমগ্র গভীরতা জুড়ে (১৫ কিলোমিটার অবধি) অবস্থিত অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক স্ট্রং পয়েন্ট ও ট্যাঙ্কবিরোধী অঞ্চলসমূহ, আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোতে তা অবস্থিত ছিল আর্মি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সমগ্র গভীরতা জুড়ে (৩৫ কিলোমিটার অবধি)। অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক স্ট্রং পয়েন্টগুলোতে ছিল তোপ, মর্টার কামান, ট্যাঙ্ক, অ্যাসল্ট গান, ট্যাঙ্কবিরোধী রাইফেল। মাইন-বিস্ফোরক প্রতিবন্ধকেরও ব্যাপক প্রয়োগ হচ্ছিল।

প্রতিরক্ষা লাইন নির্মাণের কাজে বিপুল ভূমিকা পালন করেছিল কুর্স্ক, ওরিওল, ভরোনেজ ও খারকভ জেলাগুলোর মেহনতীরা, যারা প্রতিরক্ষামূলক কার্যে শত সহস্র লোককে প্রেরণ করেছিল। যেমন, কেবল এক জুন মাসেই প্রতিরক্ষামূলক নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করে কুর্স্ক জেলার ৩ লক্ষ লোক। একই সঙ্গে প্রবল লড়াই চলে অন্তরীক্ষে আধিপত্য লাভের জন্য, — সে লড়াই শুরু হয়েছিল বসন্ত কালে কুবানে।

শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ের প্রস্তুতি পর্বে বাহিনীগুলোতে অনেক প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পন্ন হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল — সৈন্যদের সামরিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা, শত্রুর নতুন অস্ত্রশস্ত্র অধ্যয়ন করা ও সে অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে সংগ্রামের পদ্ধতি আয়ত্ত করা। সমস্ত ইউনিট আর ফর্ম্যাশনে বিরাজ করছিল সামরিক উদ্দীপনা।

শক্তির অনুপাত ছিল সোভিয়েত সৈন্যদের অনুকূলে। ভরোনেজ ও কেন্দ্রীয় ফ্রন্টগুলোতে (অধিনায়ক জেনারেল ন. ভাতুতিন ও ক. রকোসভস্কি)

ছিল ১৩ লক্ষাধিক লোক, ১৯ সহস্রাধিক তোপ ও মর্টার কামান, ৩,৪৪৪টি ট্যাঙ্ক ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গান, ২,১৭০টি বিমান।

কাজের চরিত্র ও সামরিক ক্রিয়াকলাপের গতির বিচারে কুর্স্কের লড়াইকে দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়: প্রথমটি (১৯৪৩ সালের ৫—২৩ জুলাই) — কেন্দ্রীয় ও ভরোনেজ ফ্রন্টের সৈন্যদের দ্বারা সম্পাদিত স্ট্র্যাটেজিক প্রতিরক্ষামূলক অপারেশন; দ্বিতীয়টি (১৯৪৩ সালের ১২ জুলাই — ২৩ আগস্ট) — ওরিওলের আক্রমণাত্মক অপারেশনে পশ্চিম ফ্রন্টের বাম পার্শ্বের সৈন্যদের দ্বারা, ব্রিয়ানস্ক ও কেন্দ্রীয় ফ্রন্টের শক্তিসমূহের দ্বারা এবং বেলগোরদ-খারকভ অপারেশনে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতায় ভরোনেজ ও স্তেপ ফ্রন্টের শক্তিসমূহের দ্বারা সম্পাদিত পাল্টা-আক্রমণ।

২ জুলাই সোভিয়েত সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলী প্রাপ্ত গুপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ও ভরোনেজ ফ্রন্টের অধিনায়কদের এই মর্মে সতর্ক করে দেন যে ৩-৬ জুলাই জার্মান-ফ্যাসিস্ট গ্রুপিংগুলো আক্রমণাভিযান আরম্ভ করতে পারে এবং তাঁদের ফৌজকে লড়াইয়ের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত রাখতে বলেন। বন্দী জার্মানরা জানাল যে আক্রমণাভিযান আরম্ভ হবে ৫ জুলাই সকালে। শত্রুর আক্রমণকারী গ্রুপিংসমূহের সমাবেশ স্থলগুলোর উপর আচমকা গোলাবর্ষণের প্রস্তুতির পক্ষে এ সমস্তকিছুর বিপুল তাৎপর্য ছিল। কাউণ্টারপ্রিপারেশন ফায়ারের ফলে শত্রু যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর তার আক্রমণাভিযান দেড়-দু' ঘণ্টা দেরিতে শুরু হয়।

জার্মান-ফ্যাসিস্ট সৈন্যদের হামলা শুরু হয় ৫ জুলাই সকালে। ওরিওলের দক্ষিণের ও বেলগোরদের উত্তরের অঞ্চলগুলোতে সবচেয়ে কঠোর লড়াই বাধল। এখানে নাৎসিদের প্রধান আঘাতটি পড়ে জেনারেল ন. পুখোভের ১৩শ বাহিনীর সৈন্যদের উপর। আক্রমণরত এশিলনের আগে আগে চলছিল ভারী 'টাইগার' ট্যাঙ্কগুলো — প্রতিটি গ্রুপে ছিল ১০-১৫টি ট্যাঙ্ক, আর ওগুলোর সঙ্গে ছিল 'ফের্ডিনাণ্ড' অ্যাসল্ট গান। ভারী ট্যাঙ্কের পেছন পেছন গ্রুপে গ্রুপে চলছিল ৫০-১০০টি করে মাঝারি আকারের ট্যাঙ্ক ও পদাতিক সৈন্যবাহী আর্মার্ড পার্সোনেল কেরিয়ারগুলো। সোভিয়েত যোদ্ধারা ফ্যাসিস্টদের উপর তোপ ও ট্যাঙ্কবিরোধী রাইফেল থেকে দমকা গোলাবর্ষণ আরম্ভ করল, গ্রেনেড ও আগ্নেয় পদার্থের মিশ্রণযুক্ত বোতল ছুঁড়তে লাগল। সোভিয়েত ট্যাঙ্ক-যোদ্ধা, স্যাপার ও বৈমানিকরা চমৎকার লড়ছিল। সোভিয়েত বৈমানিকরা

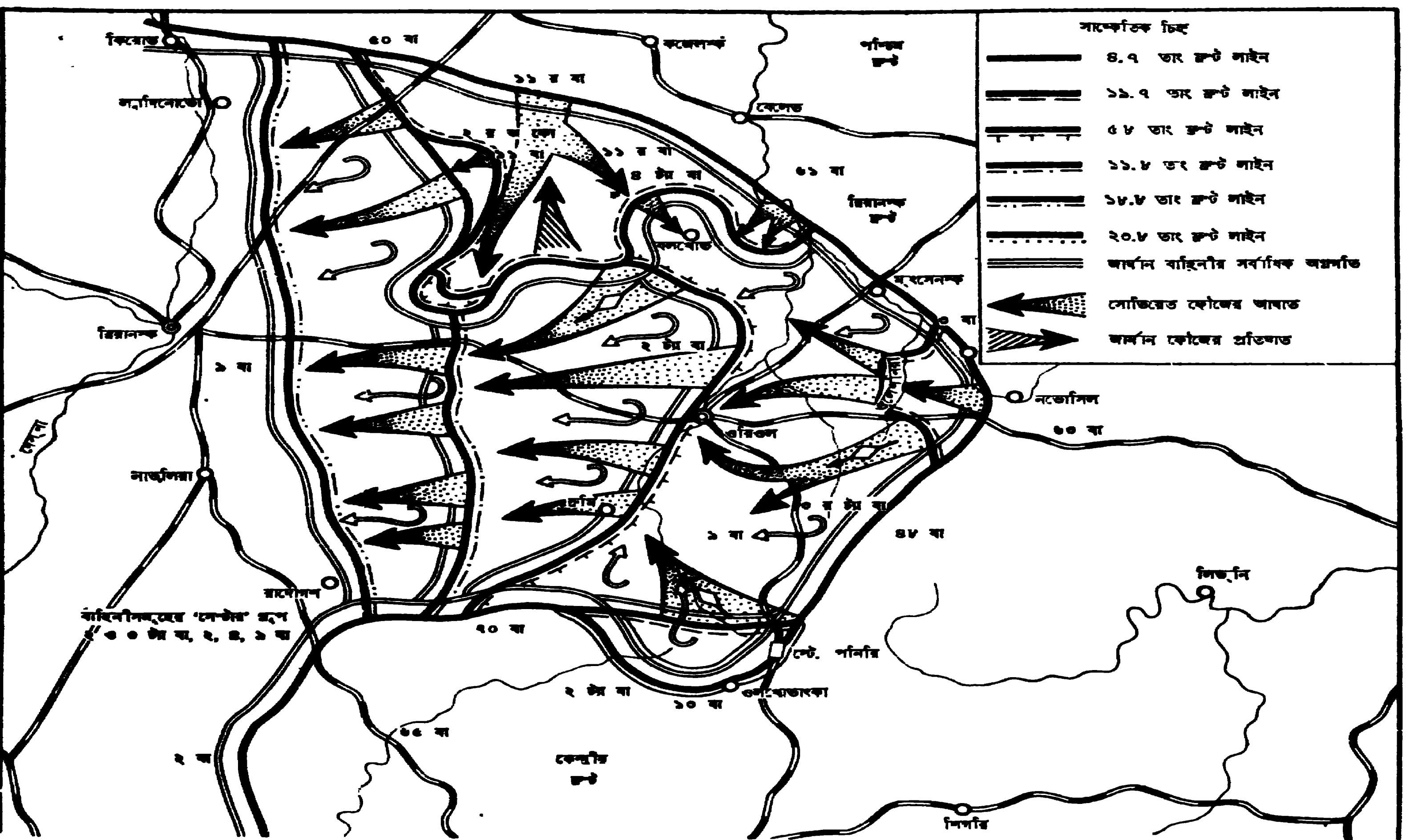
সেই প্রথম বার শত্রুর ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল অত্যধিক ধ্বংসাত্মক ক্ষমতাসম্পন্ন কিউমুল্যাটিভ বোমা।

দৃঢ় প্রতিরক্ষা ও প্রবল প্রতি-আক্রমণের ফলে সোভিয়েত সৈন্যরা জার্মান-ফ্যাসিস্ট ট্যাঙ্ক বাহিনীর ক্ষিপ্ত আক্রমণের গতিরোধ করে দিয়ে শত্রুকে শোচনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। পশ্চিম জার্মান ইতিহাসবিদ হেইম লিখেছেন যে আক্রমণরত জার্মান গ্রুপিংগুলো মাত্র কয়েক দিন পরেই অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতার সম্মুখীন হল, যদিও সৈন্যরা প্রাণপণ দিয়ে লড়ছিল। আক্রমণরত জার্মান ফর্ম্যাশনগুলো লড়তে লড়তে বিপক্ষের গভীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল এবং ক্রমশই তাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ৭ জুলাই থেকেই ক্রমবর্ধমান সোভিয়েত ট্যাঙ্ক বাহিনী জার্মান ফর্ম্যাশনগুলোকে হটিয়ে দিতে থাকে।

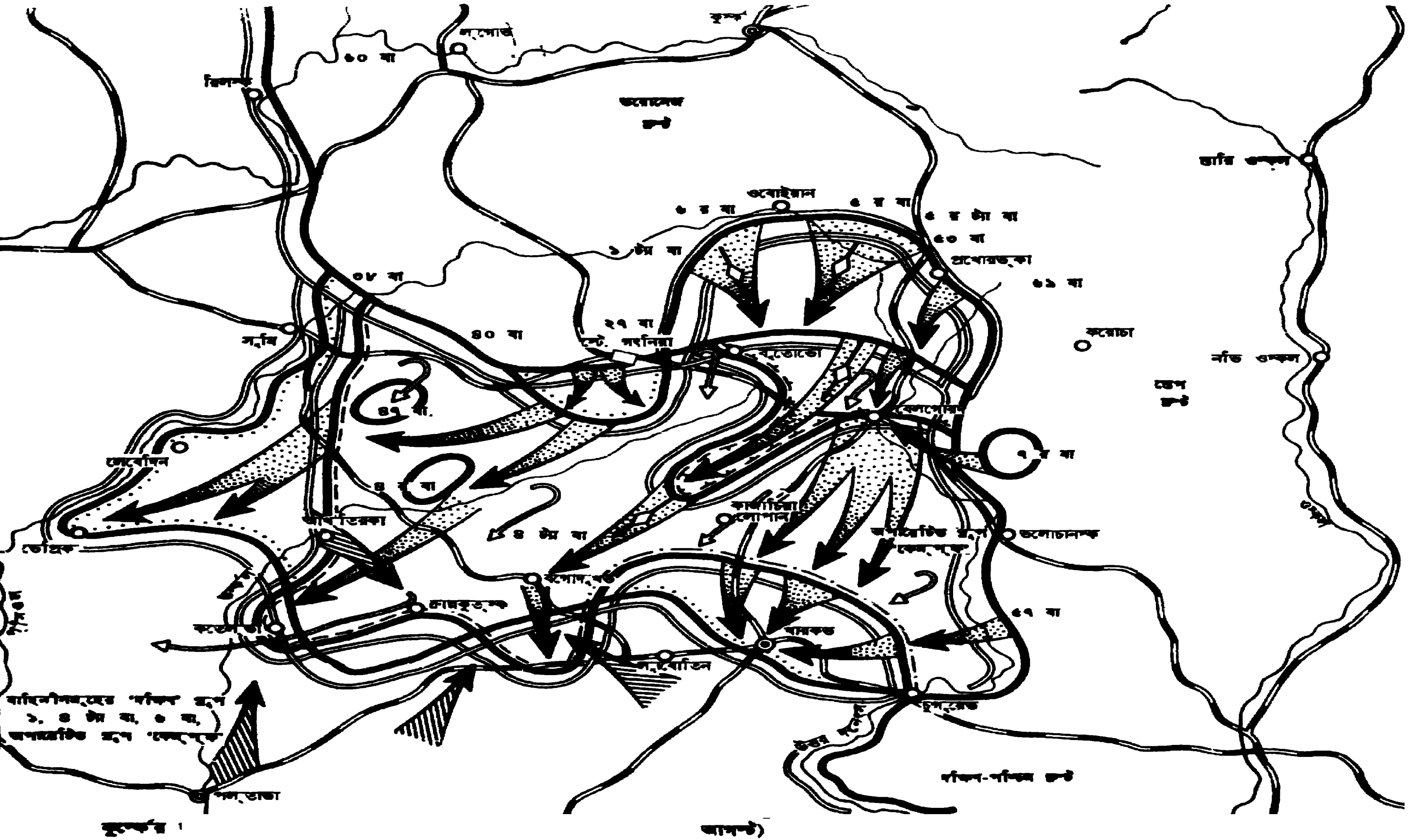
৯ জুলাই নাগাদ বাহিনীগুলোর 'সেণ্টার' গ্রুপের আক্রমণকারী গ্রুপিংটি কেবল ১০-১২ কিলোমিটার অগ্রসর হওয়ার পর কেন্দ্রীয় ফ্রণ্টের সৈন্যদের দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। শত্রু ৪২ হাজার লোক এবং ৮০০টি ট্যাঙ্ক হারায়। সোভিয়েত যোদ্ধারা অভূতপূর্ব দক্ষতা ও বিপুল বীরত্বের পরিচয় দিয়ে শত্রুর ট্যাঙ্ক বাহিনীগুলোকে হটিয়ে দেয়। যেমন, কর্নেল ভ. রুকোসুয়েভের ৩য় ফাইটার ব্রিগেডটি শত্রুর ৩০০টি ট্যাঙ্ককে রুখে দাঁড়িয়েছিল। ক্যাপ্টেন গ. ইগ্নাশেভের একটি মাত্র ব্যাটারি এক দিনে ১৯টি জার্মান ট্যাঙ্ক ধ্বংস করেছে।

কুর্স্কের দক্ষিণেও কঠোর লড়াই শুরু হয়। ওখানে লড়ছিল জার্মান বাহিনীসমূহের 'দক্ষিণ' গ্রুপটি। ভরোনেজ ফ্রণ্টের জেনারেল ই. চিস্তিয়াকোভ ও জেনারেল ম. শুমিলোভের ৬ষ্ঠ ও ৭ম সোভিয়েত রক্ষী বাহিনীর এবং জেনারেল ম. কাতুকোভের ১ম ট্যাঙ্ক বাহিনীর সৈন্যরা শত্রুর সঙ্গে দৃঢ় সংগ্রামে লিপ্ত হয়। প্রথম দিনই প্রধান আঘাতের অভিমুখে দুশমন সোভিয়েত ফৌজের অবস্থানে বিমান বাহিনীর সাহায্যে ৭০০টির মতো ট্যাঙ্ক পাঠায়। নাৎসিরা একটির পর একটি আক্রমণ চালিয়ে যায়। লড়াইয়ে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দেন ১ম ট্যাঙ্ক বাহিনীর ট্যাঙ্ক প্ল্যাটুনের কমাণ্ডার লেফটেনেণ্ট গ. বেসারাবোভ। তাঁর ট্যাঙ্কের যোদ্ধারা এক দিনে শত্রুর তিনটি 'টাইগার' ট্যাঙ্ক ধ্বংস করেছিল।

অন্তরীক্ষেও তুমুল লড়াই চলছিল। সাহসিকতা ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করে ২য়, ১৬শ ও ১৭শ বিমান বাহিনীগুলোর (অধিনায়ক জেনারেল স. ক্রাসোভস্কি, জেনারেল স. রুদেঙ্কো, জেনারেল ভ. সুদেৎস) বৈমানিকরা।



সাঙ্কেতিক চিহ্ন
৪.৭ তাং ফ্রন্ট লাইন
১৯.৭ তাং ফ্রন্ট লাইন
৫৮ তাং ফ্রন্ট লাইন
১১.৮ তাং ফ্রন্ট লাইন
১৮.৮ তাং ফ্রন্ট লাইন
২০.৮ তাং ফ্রন্ট লাইন
জার্মান বাহিনীর সর্বাধিক অগ্রগতি
সোভিয়েত ফৌজের আঘাত
জার্মান ফৌজের প্রতিঘাত
কিরোভ
৫০ বা
কজেলস্ক
পশ্চিম ফ্রন্ট
১১ র বা
ব্রিয়ানস্ক ফ্রন্ট
৬১ বা
ব্রিয়ানস্ক
৪ ট্যা বা
বোলখোভ
মৎসেনস্ক
২ ট্যা বা
১ বা
ওরিওল
নভোসিল
৬৩ বা
৩ বা
৪৮ বা
লিভ্‌নি
স্তে. পানির
ওলখোভাৎকা
১৩ বা
২ ট্যা বা
৭০ বা
৬৫ বা
কেন্দ্রীয় ফ্রন্ট
২ বা
লাজ্ঞিলরা
দেস্‌না


ভরোনেজ ফ্রন্ট
দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্ট
বাহিনীসমূহের 'দক্ষিণ' গ্রুপ
১, ৪ র্থ ব্য, ৬ ব্য,
অপারেটিভ গ্রুপ 'কেম্পফ'
পলতাভা

কুর্স্কের । আগস্ট)

৬ জুলাই তারিখে যুদ্ধের ইতিহাসে সেই প্রথম বার ফাইটার প্লেনের বৈমানিক লেফটেনেণ্ট আ. গরোভেৎস এক বায়ুযুদ্ধে ৯টি ফ্যাসিস্ট বিমানকে ভূপাতিত করেন। এখানেই ফ্যাসিস্ট বিমান ভূপাতিত করতে শুরু করেছিলেন ই. কজেদুব, যিনি তিন বার সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন এবং বর্তমানে সোভিয়েত বিমান বাহিনীর কর্নেল-জেনারেল।

ফ্যাসিস্টরা মজুদ বাহিনীগুলোকে সামরিক ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত করে ১১ জুলাই নাগাদ সোভিয়েত প্রতিরক্ষা ভেদ করে ৩৫ কিলোমিটার গভীরে ঢুকে পড়ে এবং প্রখোরভ্কা গ্রামের নিকটবর্তী অঞ্চলে পোঁছে যায়। ওদের মোকাবেলা করতে এগুতে থাকে জেনারেল ই. কনেভের স্তেপ ফ্রণ্টের ৫ম রক্ষী বাহিনী (অধিনায়ক জেনারেল আ. জাদোভ) ও ৫ম রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীর (অধিনায়ক জেনারেল প. রত্মিস্ত্রভ) সৈন্যরা, যারা ভরোনেজ ফ্রণ্টের ৬ষ্ঠ রক্ষী ও ১ম ট্যাঙ্ক বাহিনীগুলোর সঙ্গে মিলে শত্রুর উপর প্রবল প্রতিঘাত হানে। ফলে ১২ জুলাই প্রখোরভ্কার নিকটে বিরাট এক ট্যাঙ্ক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে উভয় পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করে ১,২০০টি ট্যাঙ্ক। এই লড়াইয়ে জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজ পরাস্ত হয়ে আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়।

ওই দিনই পশ্চিম ফ্রণ্ট ও ব্রিয়ানস্ক ফ্রণ্টের (অধিনায়ক জেনারেল ভ. সকোলভস্কি ও জেনারেল ম. পপোভ) সৈন্যরা প্রবল আক্রমণাভিযান আরম্ভ করে সাফল্যের সঙ্গে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে ফেলে এবং একদিনে ২৫ কিলোমিটার অগ্রসর হয়। কুর্স্কের বাঁকে সোভিয়েত বাহিনীর পাল্টা-আক্রমণ শুরু হল। 'সেণ্টার' গ্রুপের সদর-দপ্তরের প্রাক্তন অফিসার গ. গাকেনহোলট্স বলেছিল যে ১২ জুলাই আরব্ধ রুশ আক্রমণাভিযানের শক্তি এবং সর্বাগ্রে তার আঘাতের ক্ষমতা জার্মানদের জন্য ছিল নিষ্ঠুর আকস্মিকতা।

প্রখোরভ্কার কাছে বিধ্বস্ত জার্মান বাহিনীগুলো পশ্চাদপসরণ করতে শুরু করে। তাদের পশ্চাদনুসরণ করে প্রথমে ভরোনেজ ফ্রণ্টের, আর ১৯ জুলাই থেকে স্তেপ ফ্রণ্টের সৈন্যরা। ২৩ জুলাই নাগাদ শত্রুকে সেই অবস্থানে হটিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে-অবস্থান সে অধিকার করে ছিল কুর্স্কের লড়াইয়ের গোড়াতে।

পশ্চিম, ব্রিয়ানস্ক ও কেন্দ্রীয় ফ্রণ্টগুলোর সৈন্যরা একই সঙ্গে বিভিন্ন দিক থেকে ওরিওল অভিমুখে আক্রমণাভিযান চালিয়ে শত্রুকে তাড়াহুড়োর

মধ্যে ব্রিয়ানস্কের পূর্বে অবস্থিত প্রতিরক্ষা লাইনে হটে যেতে বাধ্য করে। ৫ আগস্ট মুক্ত হয় ওরিওল শহর, আর ১৮ আগস্ট নাগাদ সমগ্র ওরিওল উল্গতাংশ ফ্যাসিস্ট থেকে মুক্ত হয়।

স্থলসেনাকে বিপুল সমর্থন জোগায় সোভিয়েত বিমান বাহিনী। এই সমস্ত লড়াইয়ে উচ্চ স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দেন ফাইটার প্লেনের বৈমানিক আ. মারেসিয়েভ। উভয় পায়ের তলা কেটে ফেলার পরও তিনি আবার বিমান বাহিনীতে এসে যোগ দেন এবং শত্রুর তিনটি বিমান ভূপাতিত করেন। সোভিয়েত বৈমানিকদের পাশাপাশি বীরত্বের সঙ্গে লড়েছিল ফ্রান্সের 'নরম্যাণ্ডি' স্কোয়াড্রনটি যার বৈমানিকরা জুলাই-আগস্টে ৩৩টি ফ্যাসিস্ট বিমান ভূপাতিত করেছিল। আক্রমণাভিযানের ৩৭ দিনে সোভিয়েত সৈন্যরা শত্রুকে প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত করে ১৫০ কিলোমিটার অগ্রসর হয়।

ভরোনেজ ও স্তেপ ফ্রন্টের পাল্টা-আক্রমণও প্রবল হয়ে উঠেছিল। শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করা সম্ভব হয়েছিল রণাঙ্গনের প্রতি কিলোমিটারে অবস্থিত ২৩০-২৫০টি তোপ ও মর্টার কামান থেকে প্রবল প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণের পর। আর্টিলারির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করছিল বিমান বাহিনী। পদাতিক ফৌজ ও ট্যাঙ্কগুলো গোলন্দাজ বাহিনীর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ ও বিমান বাহিনীর ব্যাপক বোমাবর্ষণের দরুন সমর্থন পেয়ে দ্রুত শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহের প্রধান এলাকাটি ভেদ করে ৪ কিলোমিটার অবধি গভীরে চলে যায়। তারপর লড়াইয়ে ঢোকানো হয় ১ম ও ৫ম রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনী এবং স্বতন্ত্র ট্যাঙ্ক ও মেকানাইজ্‌ড কোরগুলো। তারা ট্যাকটিকেল এলাকা ভেদ করে অপারেটিভ গভীরতার দিকে ধাবিত হয়।

বেলগোরদ-খারকভ অভিমুখে দ্রুত আক্রমণাভিযান চালিয়ে সোভিয়েত সৈন্যরা সাফল্যের সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছিল। ৫ আগস্ট তারিখে তারা বেলগোরদ মুক্ত করে খারকভ অভিমুখে এগুতে শুরু করে এবং উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ দিক থেকে শহরটি ঘিরতে থাকে। ওরিওল ও বেলগোরদের মুক্তি উপলক্ষে দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের ইতিহাসে প্রথম বারের মতো সে দিন সন্ধ্যায় মস্কোয় তোপগুলো দেগে সোভিয়েত সৈন্যদের সম্মান জানানো হয়।

সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের ঘটনাবলি সারা পৃথিবীতে বিপুল সাড়া জাগায়। ১৯৪৩ সালের ২৯ জুলাই মার্কিন বেতারে ভাষণ দান কালে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বলেন: 'বর্তমান মুহূর্তে সবচেয়ে চূড়ান্ত লড়াই চলছে রাশিয়ায়।... এই গ্রীষ্মের অদীর্ঘ জার্মান আক্রমণাভিযান ছিল জার্মানদের মনোবল বৃদ্ধির আশাহীন প্রয়াস মাত্র। রুশরা এই

আক্রমণাভিযানের কেবল অবসানই ঘটায় নি, মিত্র জাতিসমূহের আক্রমণমূলক রণনীতির সঙ্গে সমন্বয় রেখে তারা নিজস্ব পরিকল্পনা অনুসারে অগ্রসরও হয়েছিল।... নিজেকে রক্ষা করতে গিয়ে রাশিয়া সারা পৃথিবীকে নাৎসিজমের কবল থেকে রক্ষা করার কথা ভাবছে। এই দেশটির কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে সে আমাদের সুপ্রতিবেশী ও প্রকৃত বন্ধুও হতে পারবে।'*

কুর্স্কের বাঁকে অর্জিত বিজয় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি ফ্যাসিস্টবিরোধী জোটের দেশগুলোর জাতিসমূহের সহানুভূতি বৃদ্ধি করে, অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সোভিয়েত জনগণের সঙ্গে তাদের সংহতি সুদৃঢ় করে। ওরিওল শহরের মুক্তির পর তার বাসিন্দাদের বন্ধুত্বপূর্ণ পত্রালাপ শুরু হয় ব্রিটিশ শহর হ্যাম্পস্ট্যাডের বাসিন্দাদের সঙ্গে। সোভিয়েত ইউনিয়নকে সহায়তা দান কমিটির অভিনন্দন পত্রে বলা হয়েছিল: 'ওরিওলের বাসিন্দারা, আপনাদের আমরা অভিনন্দন জানাই। আমাদের দুই মহান জনগণ চালিত কঠোর যুদ্ধে আমাদের মৈত্রী চিরকালের জন্য সুদৃঢ় হয়েছে ফ্যাসিজম ধ্বংসকারী আমাদের সন্তানদের রক্তের দ্বারা।

অবশেষে আমরা নিজেদের সামনে বিজয়ের আশা দেখতে পাচ্ছি। আমরা সবাই যুদ্ধ আনীত লাঞ্ছনা ভোগ করছি — সেই সঙ্গে আমরা শান্তির অপূর্ব উপহারও উপভোগ করছি। আমরা এই ভেবে গর্বিত যে আমরা উভয় জাতি হচ্ছি স্বাধীনতার অপরাজেয় সৈন্য বাহিনীর সদস্য।'**

১১ দিন ধরে ফ্যাসিস্টরা বগোদুখভ ও আখ্‌তিরকা অঞ্চলে প্রচণ্ড প্রতিঘাতের দ্বারা সোভিয়েত সৈন্যদের প্রবল আক্রমণ প্রতিহত করতে চেষ্টা করল, কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা সফল হল না। কঠোর লড়াইয়ে শত্রুর প্রতিঘাতকারী গ্রুপিংগুলো ভরোনেজ ফ্রণ্টের সৈন্যদের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়ে যায়। অন্য দিকে, স্তেপ ফ্রণ্টের ফর্ম্যাশনসমূহ একেবারে খারকভের কাছে পৌঁছে যায় এবং নৈশ ঝঞ্ঝাক্রমণে লিপ্ত হয়। ২৩ আগস্ট ইউক্রেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরটি জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের কবল থেকে মুক্ত হয়।

বেলগোরদ-খারকভ অপারেশনের ফলে শত্রুর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। সোভিয়েত সৈন্যরা ১৪০ কিলোমিটার অবধি গভীরে চলে যায় এবং

নীপারের বাঁ তীরস্থ ইউক্রেন আর দনবাস মুক্তকরণের উদ্দেশ্যে সার্বিক আক্রমণাভিযান চালানোর জন্য সুবিধাজনক একটি অবস্থান অধিকার করে নেয়। কুর্স্কের লড়াই শেষ হল।

কুর্স্কের লড়াই বিগত যুদ্ধের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও চূড়ান্ত ঘটনাগুলোর একটি বলে পরিচিত। এই বিশালাকার সংগ্রামে উভয় পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করে ৪০ লক্ষাধিক লোক (অর্থাৎ মস্কোর উপকণ্ঠের লড়াইয়ের চেয়ে দ্বিগুণ বেশি, স্তালিনগ্রাদের লড়াইয়ের চেয়ে দেড় গুণ বেশি), ৬৯ সহস্রাধিক তোপ ও মর্টার কামান, ১৩ সহস্রাধিক ট্যাঙ্ক ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গান, ১২ হাজারের মতো জঙ্গী বিমান। ভের্মাখ্‌টের তরফ থেকে এ লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিল শতাধিক ডিভিশন, যা ছিল সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে অবস্থিত সমস্ত সৈন্যের ৪৩ শতাংশেরও বেশি। কুর্স্কের লড়াইয়ে সংঘটিত হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্ববৃহৎ ট্যাঙ্ক-যুদ্ধ যাতে জয়ী হয়েছিল লাল ফৌজ। কুর্স্কের বাঁকে সোভিয়েত সৈন্যরা ৫০ দিনে বিধ্বস্ত করেছিল শত্রুর ৩০টি ডিভিশন, যার মধ্যে ৭টি ছিল ট্যাঙ্ক ডিভিশন। জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজ হারায় ৫ লক্ষ লোক, ১,৫০০টি ট্যাঙ্ক, ৩ হাজার তোপ ও ৩ হাজার ৭ শতাধিক বিমান। সোভিয়েত বিমান বাহিনী অন্তরীক্ষে পূর্ণ স্ট্র্যাটেজিক আধিপত্য লাভ করে এবং যুদ্ধের শেষ দিন অবধি সে আধিপত্য টিকে থাকে। জার্মানির ট্যাঙ্ক বাহিনীসমূহের ইনস্‌পেক্টর কর্নেল-জেনারেল গুদেরিয়ান স্বীকার করেছিল: 'সিটাডেল' অপারেশনের ব্যর্থতার ফলে আমরা চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করলাম। এত কষ্টে গঠিত ট্যাঙ্ক বাহিনীগুলো জনবলে ও প্রযুক্তিতে প্রভূত ক্ষয়ক্ষতির দরুন দীর্ঘ কালের জন্য অকেজো হয়ে পড়েছিল। পূর্ব রণাঙ্গনে প্রতিরক্ষামূলক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনার জন্য এবং মিত্র শক্তিবর্গের কথা মতো পশ্চিমে আগামী বসন্তে তাদের সৈন্যদের আগমন ঘটলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠনের জন্য ওগুলোর কালোচিত পুনর্গঠন কাজ সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছিল না... এবং পূর্ব রণাঙ্গনে আর উদ্বেগহীন সময় থাকল না। উদ্যোগ পুরোপুরিভাবে বিপক্ষের হাতে চলে যায়...'*

কুর্স্কের নিকটে অর্জিত বিজয় সমগ্র বিশ্বকে দেখিয়ে দেয় সোভিয়েত রাষ্ট্র ও তার সশস্ত্র বাহিনীর ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা, বিশ্ববাসীর কাছে প্রমাণ করে বুর্জোয়া সমর কৌশলের উপর সোভিয়েত সমর কৌশলের শ্রেষ্ঠতা।

* Guderian H. Erinnerungen eines Soldaten, S. 296.

সোভিয়েত সামরিক-রাজনৈতিক নেতৃমণ্ডলীর হাত থেকে স্ট্র্যাটেজিক উদ্যোগ ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী যে প্রচেষ্টা চালায় তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। কুর্স্কের কাছে পরাজয়ের পর সর্বোচ্চ নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলী চিরতরে আক্রমণাত্মক রণনীতি পরিত্যাগ করতে এবং সমগ্র সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে প্রতিরক্ষায় লিপ্ত হতে বাধ্য হয়। স্ট্র্যাটেজিক উদ্যোগ সম্পূর্ণরূপে সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর হাতে চলে এসেছিল। পশ্চিম জার্মান ইতিহাসবিদ ভ. হুবাচ লিখেছেন: 'পূর্ব রণাঙ্গনে জার্মানরা উদ্যোগ কেড়ে নেওয়ার শেষ চেষ্টা চালায়, কিন্তু তা নিষ্ফল হয়। অসফল 'সিটাডেল' অপারেশন জার্মান সৈন্য বাহিনীর অবসানের সূত্রপাত ঘটায়। তারপর থেকে পূর্বে জার্মান রণাঙ্গন আর কখনও সুস্থির হয় নি।'*

হিটলারের প্রচার মাধ্যম সোভিয়েত রণনীতিতে ঋতু বিবেচনা — মস্কো ও স্তালিনগ্রাদের লড়াই তো শীতকালেই হয়েছিল — সম্পর্কিত নানা কল্পকাহিনী রটিয়েছিল। কিন্তু কুর্স্কের লড়াইয়ে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সশস্ত্র বাহিনী এবার স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিল যে তারা বছরের যেকোন ঋতুতে শত্রুকে বিধ্বস্ত করতে সক্ষম, এবং তাদের সাফল্যের পেছনে রয়েছে উন্নততর প্রযুক্তিগত ভিত্তি ও পূর্বেকার অপারেশনগুলোর তুলনায় সেনাপতিদের সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকতর উচ্চ মান। যুদ্ধ কৌশল বিকাশের ক্ষেত্রে সোভিয়েত সমরবিজ্ঞান ও প্রয়োগ সামনের দিকে নতুন এক পদক্ষেপ করল।

কুর্স্কের বাঁকে লড়াইয়ের সমগ্র গতির উপর যে-ব্যাপারটি বিপুল প্রভাব ফেলেছিল তা হল এই যে সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী আগেই শত্রুর ভবিষ্যৎ আঘাতের দিক নির্ধারণ করতে এবং ওখানে নিজের বেশির ভাগ শক্তি ও সঙ্গতির সমাবেশ ঘটাতে পেরেছিলেন। সেই সঙ্গে, খোদ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বাধ্যতামূলক নয়, পূর্বকল্পিত চরিত্র ছিল। সোভিয়েত সৈন্যরা আগে থেকেই প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করে রেখেছিল। বাহিনীসমূহের প্রথম এশিলনগুলো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ট্যাকটিকেল অঞ্চলের দুটি এলাকা অধিকার করে। দ্বিতীয় এশিলনগুলো এবং বাহিনী ও ফ্রন্টসমূহের রিজার্ভগুলো তৃতীয় ও চতুর্থ এলাকায় মোতায়েন হয়। ট্যাঙ্ক বাহিনীগুলো ব্যবহৃত হচ্ছিল কেবল প্রতিঘাত হানার জন্যই নয়, জার্মানদের প্রধান আঘাতের অভিমুখে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ-সীমাগুলো টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যেও। সেই প্রথম ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হচ্ছিল প্রতিবন্ধক সৃষ্টিকারী মোবাইল

* Hubatsch W., Kriegswende 1943, S. 144.

ইউনিটগুলো যা শত্রুর ট্যাঙ্কগুলোর অভিযানের পথে বাধা সৃষ্টি করত।

সোভিয়েত ফৌজের প্রতিরক্ষার ভিত্তিতে ছিল ঘাঁটি ব্যবস্থা, যা রক্ষিত হত মজবুত অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক ব্যারিয়ার ও প্রতিবন্ধকের দ্বারা। ওই সমস্ত জায়গায় ছিল ট্যাঙ্কবিরোধী কামান ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গান।

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রগুলোর দৃঢ়তা নিশ্চিতকরণে বৃহৎ ভূমিকা পালন করেছিল প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাদির ক্যামুফ্লেজ। জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী কুর্স্কের বাঁকে সোভিয়েত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে এবং সোভিয়েত ফৌজের গ্রুপিংটির আকার নির্ণয় করতে পারে নি। ক্যামুফ্লেজ ব্যবস্থা প্রতিরক্ষারত ইউনিট আর ফর্ম্যাশনগুলোর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকটা হ্রাস করেছিল, কেননা শত্রুর স্থলসেনা ও বিমান বাহিনীর প্রবল আঘাতগুলো পড়েছিল সেই সমস্ত অঞ্চলে যেখানে সৈন্যরা ছিল না এবং এর ফলে আশানুরূপ ফল মেলে নি।

নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলী যে সোভিয়েত ফৌজের অপারেটিভ ক্যামুফ্লেজ ব্যবস্থার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারে নি তার প্রমাণ মেলে জার্মান জেনারেলদের উক্তিতে। ১৯শ ট্যাঙ্ক ডিভিশনের সেনাপতি জেনারেল গ. শ্‌মিড্‌ট লিখেছিল, 'এতদঞ্চলে (ওবোইয়ান ও করোচা। — লেখক) আক্রমণাভিযান আরম্ভ হওয়ার আগে পর্যন্ত রুশদের সুদৃঢ় ঘাঁটিগুলো সম্পর্কে আমরা খুব কমই জানতাম। এখানে আমরা যাকিছুর সম্মুখীন হয়েছিলাম তার চার ভাগের এক ভাগও কিন্তু প্রত্যাশা করি নি...'। 'সিটাডেল' অপারেশনটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জেনারেল ফ. মেল্লেন্টিন লিখেছিল, 'আক্রমণাভিযানের একেবারে গোড়াতে মাইন ক্ষেত্র রক্ষিত রুশ অবস্থানসমূহ ভেদ করা আমাদের পক্ষে যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে কঠিনই ছিল। সেই সমস্ত ভয়ঙ্কর প্রতি-আক্রমণও আমাদের জন্য অপ্রীতিকর আকস্মিক ব্যাপার ছিল যাতে অংশগ্রহণ করেছিল অতি বিপুল সংখ্যক সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ।... রুশদের নিখুঁত ক্যামুফ্লেজ ব্যবস্থার বিষয়ে আবারও দু'-একটা কথা বলা উচিত মনে করি। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রথম জার্মান ট্যাঙ্ক মাইনে লেগে ধ্বংস না হচ্ছিল অথবা প্রথম রুশ ট্যাঙ্কবিরোধী কামান থেকে গোলা বর্ষিত না হচ্ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত একটিও মাইন ক্ষেত্র, একটিও ট্যাঙ্কবিরোধী এলাকা আবিষ্কার করা সম্ভব ছিল না।'*

* মেল্লেন্টিন ফ.। ট্যাঙ্ক-যুদ্ধ। ১৯৩৯-১৯৪৫। — মস্কো, ১৯৫৭, পৃঃ ১৯৮-১৯৯।

কুর্স্কের নিকটে পাল্টা-আক্রমণ ছিল দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের সময় সোভিয়েত বাহিনী পরিচালিত তৃতীয় ও সর্ববৃহৎ পাল্টা-আক্রমণ। তাতে অংশগ্রহণ করেছিল ২২টি মিশ্র বাহিনী, ৫টি ট্যাঙ্ক বাহিনী, ৬টি বিমান বাহিনী এবং দূর পাল্লার বিমান বাহিনীর বিপুল পরিমাণ শক্তি।

সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সোভিয়েত সৈন্যদের আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপ কুর্স্কের লড়াইয়ে সাফল্য লাভে সহায়তা করেছিল। আগস্টের মাঝামাঝি সময়ের আগে আক্রমণাভিযান আরম্ভ করেছিল আটটি সোভিয়েত ফ্রন্ট। ওগুলোর প্রবল আঘাত জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলীর জরুরী মজুদ বাহিনীগুলোকে অচল করে দেয় এবং কুর্স্কের বাঁকে বৃহৎ শক্তি প্রেরণের সম্ভাবনা থেকে তাদের বঞ্চিত করে।

সংঘটিত লড়াইগুলোতে সোভিয়েত যোদ্ধারা প্রতিরক্ষায় তাদের অসাধারণ দৃঢ়তা এবং আক্রমণাভিযানে প্রবল উদ্যম প্রদর্শন করে। এটা ছিল বিজয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

কুর্স্কের নিকটে বিজয় লাভে বৃহৎ ভূমিকা পালন করেছিল সোভিয়েত পার্টিজানরা। নাৎসি অধিকৃত সোভিয়েত ভূখণ্ডে প্রতিশোধকামীরা যে 'রেল যুদ্ধ' চালিয়েছিল তাতে শত্রুর যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই ব্যাহত হয়: অল্প কালের মধ্যে ফ্যাসিস্টদের সমস্ত প্রধান রেল সড়কে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

কুর্স্কের নিকটে অর্জিত বিজয়ের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য বিপুল। সে বিজয় সারা পৃথিবীর কাছে প্রমাণ করে দেয় যে ফ্যাসিস্ট জার্মানির পতন অনিবার্য এবং তা বেশি দূরে নয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজের শক্তি দিয়ে ফ্যাসিজমকে পরাস্ত করতে সক্ষম।

কুর্স্কের বাঁকে জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের পরাজয় হিটলারী জোটের ভিতরে বিরোধ তীব্রতর করে তোলে, জার্মানির তাঁবেদার দেশসমূহে সংকটজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এবং ইতালিতে মুসোলিনির শাসনের উপর মারাত্মক আঘাত হানে। এবার যুদ্ধের গতি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুকূলে। ই. স্তালিন বলেছিলেন, 'স্তালিনগ্রাদের উপকণ্ঠের লড়াই যদি জার্মান-ফ্যাসিস্ট সৈন্য বাহিনীর পতনের ইঙ্গিত দিয়ে থাকে, তাহলে কুর্স্কের নিকটের লড়াই তাকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন করে।'*

---

* স্তালিন ই.। সোভিয়েত ইউনিয়নের দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধ প্রসঙ্গে। — মস্কো, ১৯৪৮, পৃঃ ১১৪।

কুর্স্কের বাঁকে সোভিয়েত সৈন্যদের বিজয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী গতিকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। ১৯৪৩ সালের জুলাইয়ের শুরুতে ইতালিতে ইঙ্গো-মার্কিন ফৌজ নামানোর পক্ষে সুবিধাজনক পরিস্থিতি গড়ে ওঠে। নাৎসি ফৌজের সুইডেন আক্রমনের পূর্বপ্রণীত পরিকল্পনাটি এই জন্য বাদ দিতে হয় যে শত্রুকে তার সমস্ত রিজার্ভ নিযুক্ত করতে হয়েছিল সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে। ১৯৪৩ সালের ১৪ জুন সুইডিশ রাষ্ট্রদূত মস্কোয় বলেছিলেন, 'সুইডেন ভালোই বুঝে যে এখনও যদি সে যুদ্ধে জড়িত না হয়ে থাকে তাহলে তা একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সাফল্যের কল্যাণে। সুইডেন এ জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে কৃতজ্ঞ এবং সে খোলাখুলিভাবে তা বলছে।'*

কুর্স্কের নিকটে হিটলারী বাহিনীর পরাজয় জার্মানি এবং নিরপেক্ষ দেশসমূহের মধ্যেকার সম্পর্কে আরও শীতলতা নিয়ে আসে। ওরা 'তৃতীয় রাইখের' জন্য কাঁচামাল ও অন্যান্য জিনিসপত্রের সরবরাহ কমিয়ে দিল।

কুর্স্কের বাঁকে সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর বিজয় ত্রাসত্বের বেড়াজালে আবদ্ধ ইউরোপের জাতিসমূহের মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রাম জোরদার করে তোলে, খোদ জার্মানি সহ সর্বত্র প্রতিরোধ আন্দোলনকে অধিকতর সক্রিয় করে তোলে।

কুর্স্কের কাছে জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের পরাজয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলন্ডের শাসক মহলগুলোর মতাবস্থানের উপর প্রভাব ফেলেছিল। কুর্স্কের লড়াইয়ের একেবারে চরম মুহূর্তে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সোভিয়েত সরকার প্রধানের কাছে প্রেরিত বিশেষ এক বার্তায় লিখেছিলেন: 'বিরাট বিরাট লড়াইয়ের এক মাসের মধ্যে আপনার সশস্ত্র বাহিনী আপন দক্ষতা, আপন বীরত্ব, আপন আত্মত্যাগ ও আপন দৃঢ়তার দ্বারা বহু কাল আগে পরিকল্পিত জার্মান আক্রমণাভিযান কেবল রোধই করে নি, তারা সফল পাল্টা-আক্রমণও আরম্ভ করে দিয়েছে এবং এর আছে সুদূরপ্রসারী পরিণাম।... সোভিয়েত ইউনিয়ন ন্যায়সঙ্গতভাবে তার বীরত্বপূর্ণ সাফল্যগুলো নিয়ে গর্ববোধ করতে পারে।'**

* 'মেজদুনারোদনায়া ঝিজন' (আন্তর্জাতিক জীবন) পত্রিকা, ১৯৫৯, নং ৯, পৃঃ ৯৫।

** সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সভাপতির পত্রালাপ, খণ্ড ১১, পৃঃ ৭৬।

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ১২ আগস্ট তারিখে সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকার প্রধানের কাছে একটি অভিনন্দন পত্র প্রেরণ করেন। তাতে তিনি উল্লেখ করেন যে 'এই রণাঙ্গনে জার্মান সৈন্য বাহিনীর পরাজয় হচ্ছে আমাদের চূড়ান্ত বিজয়ের নিশ্চয়তা'। ব্রিটিশ প্রবন্ধকার আলেকজান্ডার ভের্ট আরও যথাযথভাবে তাঁর মত প্রকাশ করেছেন: 'কুর্স্কের লড়াই জিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন বস্তুত পক্ষে যুদ্ধই জিতেছে।'

বুর্জোয়া ইতিহাসবিদরা প্রায়ই কুর্স্কের লড়াইয়ের ইতিহাস বিকৃত করে থাকে। যেমন তারা বলে যে কুর্স্কের বাঁকে জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীর আক্রমণাভিযানের সীমিত উদ্দেশ্য ছিল এবং 'সিটাডেল' অপারেশনের ব্যর্থতা স্ট্র্যাটেজিক তাৎপর্যবহ কোন ঘটনা বলে বিবেচিত হতে পারে না। কিন্তু এ ধরনের কথাবার্তা হচ্ছে সত্যের অপলাপ মাত্র। পশ্চিমের নিরপেক্ষ ইতিহাসবিদরা এ প্রসঙ্গে কী বলেন সে দিকে একটু নজর দেওয়া যাক। মার্কিন ইতিহাসবিদ ম. কেইডিন তাঁর 'টাইগারগুলো জ্বলছে' বইয়ে কুর্স্কের লড়াইকে 'মানবেতিহাসের বৃহত্তম স্থলযুদ্ধ' বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখছেন, 'জার্মানরা বলত যে তারা নাকি ভবিষ্যতে বিশ্বাস করত না। তবে এ বিষয়ে ইতিহাসের গভীর সন্দেহ আছে। সবকিছুরই নিষ্পত্তি হচ্ছিল কুর্স্কের উপকণ্ঠে। ওখানে যাকিছু ঘটেছিল তা ভবিষ্যৎ ঘটনা প্রবাহের গতি নির্ধারণ করেছিল।'* ঠিক এই চিন্তাটির প্রতিফলন ঘটেছে বইয়ের ভূমিকায়ও যেখানে বলা হচ্ছে যে কুর্স্কের উপকণ্ঠের লড়াই '১৯৪৩ সালে জার্মান সৈন্য বাহিনীর শিরদাঁড়া ভেঙ্গে দিয়েছিল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমগ্র গতি পাল্টে দিয়েছিল...। রাশিয়ার বাইরে কম লোকই এই বিস্ময়কর সংঘর্ষের সমগ্র ভয়াবহতা বুঝতে পারে। বস্তুত পক্ষে এমনকি আজও সোভিয়েত ইউনিয়ন জ্বালা অনুভব করে, কেননা সে দেখতে পাচ্ছে পশ্চিমী ইতিহাসবিদরা কীভাবে কুর্স্কের উপকণ্ঠে রুশ বিজয়ের তাৎপর্য খর্ব করে দেখাচ্ছে'।

কুর্স্কের লড়াইয়ে ভের্মাখ্‌টের পরাজয়ের কী কী কারণ থাকতে পারে? কারণগুলো ছিল এরূপ: সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা; সোভিয়েত যুদ্ধ কৌশলের শ্রেষ্ঠতা, সোভিয়েত যোদ্ধাদের বিপুল বীরত্ব ও সাহসিকতা। সোভিয়েত

ইউনিয়নের ও তার সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষমতা ছোট করে দেখা এবং নিজের ক্ষমতা বেশি বড় করে দেখার মধ্যেই ফ্যাসিস্ট জার্মানির স্ট্র্যাটেজির হঠকারিতার উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছিল।

কুর্স্কের নিকটে অর্জিত বিজয় আবারও প্রমাণ করে দিল যে সোভিয়েত জনগণ ও তার সশস্ত্র বাহিনী হচ্ছে এক অদম্য শক্তি। সামরিক দক্ষতায়, অস্ত্রশস্ত্রে ও রণনৈতিক নেতৃত্বে হিটলারের ভের্মাখ্‌টের উপর লাল ফৌজের শ্রেষ্ঠতা সমগ্র বিশ্বের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল।

৪। নীপারের জন্য লড়াই (১৯৪৩ সালের আগস্ট — ডিসেম্বর)

কুর্স্কের বাঁকে জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের পরাজয়ের ফলে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে শক্তির অনুপাত আরও বেশি বদলে যায় এবং তাতে সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনী লাভবানই হয়। কুর্স্কের লড়াইয়ে শত্রু বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৯৪৩ সালের আগস্টের শেষ দিকে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে অবস্থিত ২২৬টি জার্মান ডিভিশনের মধ্যে (তাতে ২৬টি ট্যাংক ও মোটোরাইজ্‌ড ডিভিশন ছিল) অধিকাংশ ট্যাংক ডিভিশন ও এক-তৃতীয়াংশ ইনফেণ্ট্রি ডিভিশন পূর্ববর্তী লড়াইগুলোতে যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সোভিয়েত পার্টিজানরা নিরবচ্ছিন্নভাবে শত্রুর যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর হামলা করছিল। নাৎসি সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলী সমগ্র রণাঙ্গন জুড়ে প্রতিরক্ষায় লিপ্ত হতে বাধ্য হয়। ফ্যাসিস্ট নেতৃবৃন্দ যেকোন উপায়ে ইউক্রেনে — এবং বিশেষত দনবাসে — টিকে থাকতে চেষ্টা করছিল। জেনারেল-ফিল্ডমার্শাল কেইটেল বলেছিল যে দনবাস ও মধ্য ইউক্রেন বেদখল হলে গুরুত্বপূর্ণ বিমান বন্দরগুলো হাতছাড়া হবে, খাদ্যদ্রব্য, কয়লা, বিদ্যুৎ শক্তি ও কাঁচামালের উৎসগুলো খুয়া যাবে। জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীগুলোকে হুকুম দেওয়া হয়েছিল যে ভেলিজ, ব্রিয়ানস্ক, সুমি যুদ্ধ-সীমায়, উত্তর দনেৎস ও মিউজ নদীগুলো বরাবর অবস্থানসমূহ দৃঢ় হস্তে ধরে রাখতে হবে। অভ্যন্তর ভাগে গঠিত হচ্ছিল স্ট্র্যাটেজিক প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ-সীমা — 'পূর্ব বাঁধ'। তা গঠিত হচ্ছিল নার্ভা নদী, প্স্কভ, ভিতেবস্ক, ওর্শা শহর, সজ নদী, নীপারের মধ্যাঞ্চল ও মলোচনায়া নদীর লাইনে। সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছিল নীপারের উঁচু

ডান তীরের দৃঢ় ঘাঁটিসমূহের উপর। নাৎসিদের হিসাব মতে, সোভিয়েত সৈন্যদের জন্য ওই ঘাঁটিগুলো ছিল অনতিক্রম্য বাধা।

কিন্তু এবার আর কিছুই সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর প্রবল আক্রমণাভিযান রুখতে সক্ষম ছিল না। মস্কো, স্তালিনগ্রাদ ও কুর্স্কের উপকণ্ঠে অর্জিত বিজয়ে অনুপ্রাণিত এবং দেশের অভ্যন্তর ভাগ থেকে রণাঙ্গনে অজস্র ধারায় নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রেরিত নতুন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত লাল ফৌজ আক্রমণাভিযান চালিয়ে যাচ্ছিল, পশ্চিমাভিমুখে অবিরাম শত্রুকে তাড়া করছিল।

কুর্স্কের লড়াইয়ের সময়েই সোভিয়েত সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলী ভেলিকিয়ে লুকি শহর থেকে আজভ সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রণাঙ্গনে প্রবল আক্রমণাভিযান চালানোর নির্দেশ দেন। প্রধান আঘাতটি হানা হচ্ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখে। কেন্দ্রীয় ফ্রন্ট (অধিনায়ক জেনারেল ক. রকোসভস্কি), ভরোনেজ ফ্রন্ট (অধিনায়ক জেনারেল ন. ভাতুতিন) ও স্তেপ ফ্রন্টের (অধিনায়ক জেনারেল ই. কনেভ) সৈন্য বাহিনীগুলো নীপারের মধ্যাঞ্চলে এলাকায় পৌঁছার উপায় খুঁজছিল, আর দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্ট (অধিনায়ক জেনারেল র. মালিনোভ্স্কি) ও দক্ষিণ ফ্রন্টের (অধিনায়ক জেনারেল ফ. তল্বুখিন) সৈন্যরা নীপারের নিম্নাঞ্চল ও ক্রিমিয়ায় পৌঁছতে চাইছিল। এর পর সৈন্যদের গতিতে থেকেই নীপার পার হয়ে তার পশ্চিম তীরস্থ ব্রিজ-হেডগুলো দখল করার কথা ছিল। সোভিয়েত সৈন্যদের গ্রুপিংয়ে ছিল ২৬ লক্ষ ৩৩ হাজার লোক, ৫১ হাজার ২০০টিরও বেশি তোপ আর মর্টার কামান, ২ হাজার ৪ শতাধিক ট্যাঙ্ক আর সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গান এবং ২,৮৫০টি জঙ্গী বিমান। একই সঙ্গে পশ্চিম ফ্রন্ট (অধিনায়ক জেনারেল ভ. সকোলভস্কি) ও কালিনিন ফ্রন্টের (অধিনায়ক জেনারেল আ. ইয়েরেমেঙ্কো) বাম পার্শ্বের সৈন্যদের কর্তব্য ছিল — স্মোলেন্স্ক অভিমুখে আক্রমণাভিযান চালানো এবং তদ্দ্বারা শত্রুকে রণাঙ্গনের এই অংশ থেকে দক্ষিণাভিমুখে শক্তি স্থানান্তরিত করার সুযোগ-সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত করা। দক্ষিণে স্থলসেনার আক্রমণাভিযানে সাহায্য করার কথা ছিল আজভ ফ্লোটিল্যা — আজভ সাগরের উত্তর উপকূলে নৌ-সৈন্যদের নামিয়ে। পার্টিজানদের কাজ ছিল — শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে ব্যাপক সংগ্রাম আরম্ভ করা, তার যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর আঘাত হানা ও নীপার নদী অতিক্রমণ কালে সোভিয়েত সৈন্যদের সহায়তা দেওয়া।

প্রধান আঘাতের অভিমুখে যুদ্ধরত সোভিয়েত সৈন্যদের বিরুদ্ধে

খাড়া ছিল নাৎসিদের শক্তিশালী একটি গ্রুপিং। তা গঠিত হয়েছিল জার্মানদের 'সেণ্টার' গ্রুপের (অধিনায়ক জেনারেল-ফিল্ডমার্শাল গ. ক্লিউগে) ২য় বাহিনী, 'দক্ষিণ' গ্রুপের (অধিনায়ক জেনারেল-ফিল্ডমার্শাল এ. মানস্টেইন) ৪র্থ ট্যাঙ্ক বাহিনী, ৮ম বাহিনী, ১ম ট্যাঙ্ক বাহিনী ও ৬ষ্ঠ বাহিনী নিয়ে। ওগুলোতে ছিল ১৪টি ট্যাঙ্ক ও মোটোরাইজ্ড ডিভিশন সহ ৬২টি ডিভিশন। গ্রুপিংয়ে ছিল সর্বমোট ১২ লক্ষ ৪০ হাজার লোক, ১২,৬০০টি তোপ ও মর্টার কামান, ২,১০০টি ট্যাঙ্ক ও অ্যাসল্ট গান, ২,১০০টি জঙ্গী বিমান। সোভিয়েত বাহিনীগুলো শত্রুকে জনবলে ২·১ গুণ, আর্টিলারিতে ৪ গুণ, ট্যাঙ্কে ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গানে ১·১ গুণ ও বিমানে ১·৪ গুণ ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

নীপারের জন্য লড়াই শুরু হয়েছিল ২৬ আগস্ট তারিখে কেন্দ্রীয় ফ্রণ্টের সৈন্যদের আক্রমণাভিযান দিয়ে। প্রধান আঘাত হানা হচ্ছিল সেভ্স্ক, নভগরদ-সেভের্স্কি অভিমুখে। সেভ্স্ক অঞ্চলে শত্রুর হাতে বিপুল শক্তি থাকাতে সে দৃঢ় প্রতিরোধ দিয়ে যাচ্ছিল। চার দিন ধরে কঠোর লড়াই চলে। তাতে সোভিয়েত সৈন্যরা শত্রুকে কেবল ২০-২৫ কিলোমিটার দূরে হটাতে সক্ষম হয়েছিল। কনতপ অভিমুখে আক্রমণাভিযানের গতি বৃদ্ধি করে তারা ৬০ কিলোমিটার এগিয়ে যায় এবং ১০০ কিলোমিটার জুড়ে ব্যূহভেদের এলাকা বিস্তৃত করে। জার্মান-ফ্যাসিস্ট সৈন্যরা দেস্না ও নীপার নদীগুলোর অপর তীরে হটতে আরম্ভ করে। গতিতে থেকে দেস্না অতিক্রম করে কেন্দ্রীয় ফ্রণ্টের ফৌজ সেপ্টেম্বর মাসের ২০ তারিখ নাগাদ গোমেল — ইয়াসনগরদক এলাকায় সজ ও নীপার নদীতে পৌঁছে যায়।

ভরোনেজ ও স্তেপ ফ্রণ্টের এলাকাগুলোতেও সোভিয়েত সৈন্যদের আক্রমণাভিযান সাফল্যের সঙ্গে চলছিল। ভরোনেজ ফ্রণ্টের প্রধান শক্তিসমূহ পল্তাভা-ক্রেমেনচুগ অভিমুখে আঘাত হানছিল এবং শত্রুর প্রবল প্রতিরোধ দমন করে ক্রমশই পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল। ২ সেপ্টেম্বর সুমি শহরটি দখল করে নিয়ে তারা কিয়েভ অভিমুখে আক্রমণাভিযান চালিয়ে যেতে লাগল। একই সঙ্গে স্তেপ ফ্রণ্টের সৈন্যরা ক্রাস্নগ্রাদ আর ভের্খ্নে-দ্নেপ্রভস্কের দিকে এগুতে থাকল।

সেপ্টেম্বরের গোড়ায় ভরোনেজ ও স্তেপ ফ্রণ্টের বাহিনীগুলোর প্রধান শক্তিসমূহ কেন্দ্রীভূত হয় কিয়েভ আর ক্রেমেনচুগ অভিমুখে। ভর্স্কলা, পসেল ও খরোল নদীগুলো বরাবর আগে থেকে প্রস্তুত যুদ্ধ-সীমায়

সোভিয়েত সৈন্যদের আক্রমণাভিযান রোধ করার জার্মান প্রয়াস ব্যর্থ হয়। আক্রমণাভিযানের শক্তি বৃদ্ধি করে স্তেপ ফ্রন্টের সৈন্যরা ২৩ সেপ্টেম্বর পল্‌তাভা শহর অধিকার করে ফেলে এবং ক্রেমেনচুগের দক্ষিণ-পূর্বে নীপারের তীরে পৌঁছে যায়। তার আগে, ২২ সেপ্টেম্বর তারিখে, পেরেয়াস্লাভ-খ্‌মেলনিৎস্কি অঞ্চলে নীপারে গিয়ে পৌঁছেছিল ভরোনেজ ফ্রন্টের সৈন্যরা, এবং ২৮ সেপ্টেম্বর তারা দারনিৎসা, (কিয়েভের উপনগরী) অঞ্চলে নীপারের তীরে গিয়ে হাজির হয়েছিল।

নীপারের বাম তীরস্থ ইউক্রেন মুক্তকরণের সঙ্গে সঙ্গে লাল ফৌজ দনবাসে ব্যাপক আক্রমণাভিযান আরম্ভ করে। ফ্যাসিস্ট নেতৃবর্গের কাছে জার্মানির সামরিক অর্থনীতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এক কয়লাঞ্চল হিশেবে দনবাসের সবচেয়ে বেশি তাৎপর্য ছিল। মিউজ নদীর তীরে গড়া হয় গভীর ও সুদৃঢ় এক প্রতিরক্ষা লাইন, আর জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজকে হুকুম দেওয়া হয় যেকোন উপায়ে এই লাইনটি টিকিয়ে রাখতে হবে ও নাৎসি রাইখের জন্য দনবাস রক্ষা করতে হবে।

সোভিয়েত সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলী দনবাস মুক্তকরণের দায়িত্বটি অর্পণ করলেন দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ ফ্রন্টগুলোর (অধিনায়ক জেনারেল র. মালিনোভ্‌স্কি ও জেনারেল ফ. তল্‌বুখিন) উপর। এই ফ্রন্ট দু'টি কুর্স্কের লড়াই চলাকালেই দনবাসকে শত্রুর কবল থেকে মুক্তকরণের কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিল। দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের সৈন্য বাহিনী উত্তর দনেৎস নদী অতিক্রম করে ইজিউম শহরের কাছে তার ডান তীরে আক্রমণের পাদভূমি প্রশস্ত করছিল। সে শত্রুর বৃহৎ শক্তিকে অচল করে দিয়ে মিউজ যুদ্ধ-সীমায় জার্মান গ্রুপিংকে শক্তি সঞ্চয় করতে দিচ্ছিল না। সেই সঙ্গে দক্ষিণ ফ্রন্টের সৈন্যরা ১৮ আগস্ট চূড়ান্ত আক্রমণাভিযানে লিপ্ত হয়ে অল্প কালের মধ্যে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে ফেলে এবং মোবাইল ফর্ম্যাশনগুলো নিয়ে দ্রুত গতি শত্রুর পশ্চাদ্ভাগের দিকে ধাবিত হতে থাকে। সেপ্টেম্বরের গোড়া থেকে জার্মানরা দনবাস থেকে নিজেদের সৈন্য অপসারণ শুরু করতে বাধ্য হয়। ৩০ আগস্ট সোভিয়েত সৈন্যরা তাগান্‌রগ শহর অধিকার করে নেয়, আর ৮ সেপ্টেম্বর মুক্ত হয় দনবাসের রাজধানী — স্তালিনো শহর (বর্তমানে দনেৎস্ক)।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিনগুলোতে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের আক্রমণাভিযান পুনরারম্ভ হয়, যার ফলে তার সৈন্যরা দ্‌নেপ্রপেত্রভস্ক শহরের নিকটে নীপার নদীতে পৌঁছে যায় এবং জাপরোঝিয়ের একেবারে কাছে

চলে আসে। দক্ষিণ ফ্রন্ট পেৌঁছে গেল মলোচনায়া নদী বরাবর আজভ সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত যুদ্ধ-সীমায়।

এই ভাবে, সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে লাল ফৌজ লয়েভ থেকে জাপরোঝিয়ে পর্যন্ত ৭৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ বিশাল রণাঙ্গনে নীপার নদীতে পেৌঁছল। এবার তাকে নীপার নদী পেরিয়ে নদীর ডান তীরস্থ ইউক্রেনে শত্রুকে বিধ্বস্ত করতে হবে।

সোভিয়েত সৈন্যদের দ্রুত গতির আক্রমণাভিযান নাৎসি সেনাপতিমন্ডলীকে তাড়াহুড়ো করে পূর্ব রণাঙ্গনে নতুন শক্তি প্রেরণে বাধ্য করে। রিজার্ভ খুঁজতে গিয়ে ফ্যাসিস্ট নেতৃবর্গ দক্ষিণ ইতালি থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিল, যাতে ফর্ম্যাশনগুলোকে — এবং সর্বাগ্রে ট্যাঙ্ক ফর্ম্যাশনগুলোকে — সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে পাঠানো যায়। এই ভাবে, সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর আক্রমণাভিযান ইতালিতে ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনীসমূহের সফল অগ্রগতিতে সাহায্য করেছিল। ওখানে ইঙ্গো-মার্কিন ফৌজের আগমন ঘটেছিল মুসোলিনির শাসন ব্যবস্থার পতনের পর।

পূর্ব রণাঙ্গনে আগত জার্মান সৈন্যরা অবিলম্বে ইউক্রেনের দিকে রওয়ানা দেয়, যেখানে নীপারের ডান তীরে গোমেল ও জাপরোঝিয়ের মধ্যবর্তী এলাকায় পাঁচটি জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনী — যার মধ্যে দু'টি ছিল ট্যাঙ্ক বাহিনী — প্রতিরক্ষা কার্যে লিপ্ত ছিল। দু'টি জার্মান ও একটি রুমানীয় বাহিনী মলোচনায়া নদী তীরে প্রতিরক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিল।

সোভিয়েত ফৌজের ছিল অতি কঠিন এক কাজ। নীপারের তীরে উপনীত অধিকাংশ ফর্ম্যাশনই সুদীর্ঘ লড়াইয়ে কাহিল হয়ে পড়েছিল, তাদের পশ্চাস্তাগগুলো পেছনে থেকে গিয়েছিল, গোলাবারুদের অভাব অনুভূত হচ্ছিল। অথচ তাদের প্রশস্ত জল বাধা অতিক্রম করে নীপারের উচ্চ ডান তীরে শত্রুর সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা লাইন ভেদ করতে হবে।

২২ সেপ্টেম্বর মুনেভো অঞ্চলে (কিয়েভের উত্তরে) পার্টিজানদের সহায়তায় প্রথমে নীপার অতিক্রম করে কেন্দ্রীয় ফ্রন্টের অগ্রবর্তী সাব-ইউনিটগুলো, আর পরের দিন — প্রধান শক্তিসমূহ। ফ্যাসিস্টরা সোভিয়েত সৈন্যদের নীপারে ফেলে দেওয়ার চেষ্টায় ক্ষিপ্ত প্রতিআক্রমণের আশ্রয় নেয়, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে ফ্রন্টের সৈন্যরা নদীর ডান তীরে ৯০ কিলোমিটার দীর্ঘ পাদভূমিতে সুদৃঢ় অবস্থান নিয়ে নেয় এবং এই অভিমুখে পরবর্তী আক্রমণাভিযানের উপযোগী পরিবেশ গড়ে

তোলে। ১৬ অক্টোবর ভরোনেজ ফ্রন্টের সৈন্যরাও নীপার অতিক্রম করে। পার্টিজানদের দ্বারা আগে থেকে প্রস্তুত সহায়ক সামগ্রী ব্যবহার করে সোভিয়েত যোদ্ধারা ভেলিকি বুক্রিন অঞ্চলে কিয়েভের দক্ষিণ-পূর্বে একটি ব্রিজ-হেড দখল করে নেয় এবং কঠোর লড়াইয়ে লিপ্ত থেকে মাসের শেষ নাগাদ তা ১১ কিলোমিটার অবধি প্রশস্ত এবং ৬ কিলোমিটার অবধি গভীর করে।

সেপ্টেম্বরের শেষে ভরোনেজ ফ্রন্টের সৈন্যরা লিউতেজ অঞ্চলে (কিয়েভের উত্তরে) অন্য একটি ব্রিজ-হেড অধিকার করে। ১০ অক্টোবর নাগাদ তা ১৫ কিলোমিটার অবধি প্রশস্ত ও ১০ কিলোমিটার অবধি গভীর করে।

২৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ক্রেমেনচুগ-দ্নেপ্রপেত্রভস্ক অঞ্চলে নীপার অতিক্রম করে স্তেপ ফ্রন্টের সৈন্যরা। প্রথম দিনেই কয়েকটি পাদভূমি দখল করে নিয়ে সোভিয়েত যোদ্ধারা শত্রুর মারাত্মক গোলাগুলিবর্ষণ ও নিরবচ্ছিন্ন প্রতিআক্রমণের মধ্যে অধিকৃত পাদভূমিগুলোকে মিলিয়ে একটি পাদভূমিতে পরিণত করে। রণাঙ্গন বরাবর ও গভীরতা বরাবর পাদভূমিটির দৈর্ঘ্য হয় যথাক্রমে ২৫ ও ১৫ কিলোমিটার।

দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের ফৌজগুলো সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে দ্নেপ্রপেত্রভস্কের দক্ষিণে নীপার নদী পেরিয়ে জার্মানদের জাপরোঝিয়ে ব্রিজ-হেডটির বিলোপ সাধনের জন্য ওখানে লড়াই আরম্ভ করে।

এই ভাবে, কেন্দ্রীয়, ভরোনেজ, স্তেপ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টগুলোর সৈন্যরা সাফল্যের সঙ্গে নীপার অতিক্রম করে এবং এর ফলে নীপারের তীরে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহটি — 'পূর্ব বাঁধের' সবচেয়ে সুদৃঢ় এই ক্ষেত্রটি — ভেদ করা সম্ভব হয়েছিল।

এই লড়াইয়ে সোভিয়েত সৈন্যদের শত্রুর ক্ষিপ্ত প্রতিঘাতগুলো (বিশেষত কিয়েভ অঞ্চলে) প্রতিহত করতে হয়েছিল। জার্মানদের এই প্রতিঘাতের উদ্দেশ্য ছিল — নীপার বরাবর নিজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। ৬ নভেম্বর তারিখে কিয়েভ নগরী জার্মান-ফ্যাসিস্ট হানাদারদের কবল থেকে মুক্ত হয়। করোস্তেন, জিতোমির ও ফাস্তভ অভিমুখে আক্রমণাভিযান চালিয়ে ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সৈন্যরা ১৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং নীপারের ডান তীরস্থ ইউক্রেনে কিয়েভ স্ট্র্যাটেজিক ব্রিজ-হেড গঠন করে। ১৯৪৩ সালের নভেম্বরের

দ্বিতীয়ার্ধে এবং ডিসেম্বরে ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী বৃহৎ ট্যাংক বাহিনীর পাল্টা-আক্রমণের দ্বারা এই পাদভূমিটির বিলোপ ঘটাতে এবং ফের কিয়েভ অধিকার করতে চেষ্টা করে। কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কঠোর প্রতিরক্ষামূলক লড়াইয়ে ফ্রন্টের সৈন্যরা শত্রুর পাল্টাআক্রমণ প্রতিহত করে দেয়।

ইউক্রেনের দক্ষিণেও — কিরোভোগ্রাদ ও ক্রিভয় রোগ অভিমুখে এবং নীপারের নিম্নাঞ্চলে — তুমুল লড়াই আরম্ভ হয়। তিন মাসব্যাপী লড়াইয়ে ২য় ও ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের বাহিনীগুলো শত্রুর সেতু-সম্মুখস্থ জাপরোঝিয়ে পাদভূমিটির বিলোপ ঘটায়, জাপরোঝিয়ে ও দ্নেপ্রপেত্রভস্ক মুক্ত করে এবং নীপারের অপর তীরে ফ্রন্ট বরাবর ৪৫০ কিলোমিটার ও গভীরতা বরাবর ১০০ কিলোমিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় বৃহৎ স্ট্র্যাটেজিক ব্রিজ-হেড প্রস্তুত করে।

ওই সময়ের মধ্যে ৪র্থ ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সৈন্যরা মলোচনায়া নদীতে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে ফেলে, মেলিতোপল মুক্ত করে, নীপারের প্রায় সমগ্র নিম্নাঞ্চল শত্রুমুক্ত করে এবং ক্রিমিয়ায় শত্রুকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। নীপারের জন্য সংগ্রাম চলাকালে সোভিয়েত সৈন্যরা আবারও নিজেদের উচ্চ নৈতিক ও সামরিক গুণাবলির — সাহসিকতা, অটলতা ও আক্রমণাত্মক উদ্যমের পরিচয় দেয়। এই সংগ্রাম ইতিহাসের জন্য রাখল সোভিয়েত যোদ্ধারের উচ্চ দক্ষতার, তাদের বিপুল বীরত্বের অসংখ্য উদাহরণ।

নীপারের জন্য লড়াইয়ে স্থলসেনাকে সাহায্য করে বিমান বাহিনী। কেবল এক সেপ্টেম্বর মাসেই তা ৯০ সহস্রাধিক বিমান-উড্ডয়ন সম্পন্ন করে, নিজের সৈন্যদের দ্বারা নীপার অতিক্রমণের কাজ সুনিশ্চিত করে, শত্রুর ঘাঁটিগুলোর উপর ৯,৫৭০ টন বিমান-বোমা নিক্ষেপ করে এবং ৫৫ সহস্রাধিক রকেট শেল ছোঁড়ে। দেশের বিমানবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সৈন্যরা রণাঙ্গন সন্নিকটস্থ যোগাযোগ পথগুলো ও নীপারের পাড়ি-ব্যবস্থা রক্ষা করছিল। আজভ ফ্লোটিল্যা আজভ সাগরের উত্তর উপকূল বরাবর ট্যাকটিকেল সৈন্যদলের অবতরণ ঘটায়।

নীপারের জন্য লড়াই চলাকালে সোভিয়েত সৈন্যরা জার্মান বাহিনীসমূহের 'দক্ষিণ' গ্রুপের প্রধান শক্তিসমূহকে ও 'সেণ্টার' গ্রুপের শক্তির একাংশকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করে, ১৬০টি শহর সহ ৩৮ সহস্রাধিক জনপদ মুক্ত করে।

সেতু নির্মাণে ও পাড়ি-ব্যবস্থা স্থাপনে সোভিয়েত যোদ্ধাদের বিপুল সহায়তা জোগায় পার্টিজানরা ও ইউক্রেনের বাসিন্দারা। কেবল ইউক্রেনের পার্টিজানরাই সোভিয়েত সৈন্যদের নীপারে পেঁছার প্রাক্কালে নীপারের ১২টি পাড়ি-ব্যবস্থা, প্রিপিয়াতের ১০টি ও দেস্নার ৩টি পাড়ি-ব্যবস্থা দখল করে ও টিকিয়ে রাখে।

নীপারের জন্য লড়াই চলাকালে লাল ফৌজ নীপার নদী বরাবর সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গঠনের নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলীর পরিকল্পনাটি বানচাল করে দেয়, শত্রুকে জনবলে ও সামরিক প্রযুক্তিতে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং সমগ্র ডান তীরস্থ ইউক্রেনের পূর্ণ মুক্তির জন্য ও পশ্চিম ইউক্রেন আর দক্ষিণ পোল্যান্ডে পেঁছার জন্য পরিবেশ গড়ে তোলে। মাতৃভূমি ফেরৎ পেল ইউক্রেনের সমৃদ্ধতম কৃষি অঞ্চলসমূহ এবং দেশের অতি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও কয়লা অঞ্চল — দনবাস। যুদ্ধের গতিতে আমূল পরিবর্তন সূচিত হল।

নীপারের জন্য লড়াইয়ে সোভিয়েত যুদ্ধ কৌশল আরও বেশি বিকাশ লাভ করল। প্রস্তুতি ও উচ্চ গতিতে আক্রমণাভিযান পরিচালনার অভিজ্ঞতার দ্বারা, ফ্রন্টসমূহের মধ্যে সুস্পষ্ট পারস্পরিক সহযোগিতা সংগঠনের অভিজ্ঞতার দ্বারা, স্ট্র্যাটেজিক রিজার্ভ ব্যবহারের অভিজ্ঞতার দ্বারা এবং গভীরে প্রয়াস বৃদ্ধিকরণের অভিজ্ঞতার দ্বারা সোভিয়েত যুদ্ধ কৌশল সমৃদ্ধ হয়। সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনী যেমন সুসঙ্গত প্রস্তুতি নিয়ে তেমনি গতিতে থেকে দক্ষতার সঙ্গে একাধিক বড় বড় জল বাধা অতিক্রম করে। আর্টিলারি ও বিমান বাহিনীকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে এবং নিপুণভাবে মাইন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে শত্রুর প্রতিঘাত প্রতিহত করার, নৈশ সামরিক ক্রিয়াকলাপ সংগঠন ও পরিচালনা করার এবং একটি অপারেশনেল অভিমুখ থেকে অন্যটিতে ফৌজ পুনর্বিন্যাস করার অভিজ্ঞতাও অর্জিত হয়েছিল।

অক্টোবরের গোড়াতে সোভিয়েত সৈন্যরা ভিতেব্স্ক, ওর্শা, মগিলেভ ও গোমেল-বব্রুইস্ক্ অভিমুখে আক্রমণাভিযান পুনরারম্ভ করে এবং বছরের শেষ দিকে বেলোরুশিয়ার অনেকগুলো পূর্বাঞ্চল মুক্ত করে।

১৯৪৩ সালে লাল ফৌজের গ্রীষ্ম-হেমন্তকালীন প্রবল আক্রমণাভিযানটি চলে প্রায় পাঁচ মাস। তা চমৎকার সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত হয়।

৫। ১৯৪২-১৯৪৩ সালে উত্তর আফ্রিকায় ও ভূমধ্যসাগরে মিত্র বাহিনীসমূহের সামরিক ক্রিয়াকলাপ

এল-আলামেইন অপারেশন (১৯৪২ সালের ২৩ অক্টোবর — ৪ নভেম্বর)

১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসের শেষ দিকে জেনারেল-ফিল্ডমার্শাল এ. রমেলের সেনাপতিত্বে 'আফ্রিকা' নামক জার্মান-ইতালীয় ট্যাঙ্ক বাহিনীর ফর্ম্যাশনগুলো এল-আলামেইনের দক্ষিণ-পশ্চিমে ৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি প্রতিরক্ষা লাইন অধিকার করে ছিল। এই প্রতিরক্ষা লাইনটির পার্শ্বগুলো অবস্থিত ছিল উত্তরে ভূমধ্যসাগরে, আর দক্ষিণে — কাতারা দুর্গম গহ্বরে। প্রতিরক্ষা লাইনের অগ্রবর্তী এলাকায় ছিল মাইন ক্ষেত্র আর কাঁটা তারের বেড়া। প্রস্তুত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মোট গভীরতা ছিল ১৫-২০ কিলোমিটার, তবে সৈন্যরা কেবল প্রধান এলাকাতেই অবস্থান করছিল।

রমেলের সৈন্য বাহিনীতে ছিল ৪টি জার্মান ও ৮টি ইতালীয় ডিভিশন, সর্বমোট প্রায় ৮০ হাজার লোক, ৫৪০টি ট্যাঙ্ক, ১,২১৯টি কামান ও ৩৫০টি বিমান।

মিশরের ভূখণ্ডে সমস্ত মিত্র ফৌজকে ঐক্যবদ্ধকারী ৮ম ব্রিটিশ বাহিনীর (অধিনায়ক জেনারেল বার্নাড মণ্টগোমেরি) কাছে ছিল ১০টি ডিভিশন ও ৪টি স্বতন্ত্র ব্রিগেড, সর্বমোট ২ লক্ষ ৩০ হাজার লোক, ১,৪৪০ ট্যাঙ্ক, ২,৩১১টি কামান, ১,৫০০টি বিমান।* জনবলে ও যুদ্ধোপকরণে শ্রেষ্ঠতা ছিল ৮ম বাহিনীর হাতে: জ্যান্ত শক্তিতে — ২·৮ গুণ, ট্যাঙ্কে — ২·৬ গুণ, কামানে — ১·৯ গুণ, বিমানে — ৪·২ গুণ। এরূপ শ্রেষ্ঠতা মিত্রদের সফল আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনার জন্য অনুকূল শর্ত গড়ে দিচ্ছিল।

এই অভিযানটির উদ্দেশ্য ছিল: মরুগহ্বরের কাছে অবস্থিত বাম পার্শ্বে শত্রুর শক্তিসমূহকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে এল-আলামেইনের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল থেকে সাদি-হামিদ অভিমুখে সমুদ্র সন্নিকটস্থ ডান পার্শ্বের উপর প্রধান আঘাত হানা, প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করা, ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলের

* ৮ম বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ব্রিটিশ, অস্ট্রেলীয়, ভারতীয়, নিউজিল্যাণ্ডীয়, দক্ষিণ-আফ্রিকীয়, গ্রীক ও ফরাসি ডিভিশন আর ব্রিগেডগুলো।

সাংকেতিক চিহ্ন

- ২০.১০ ৪২ তারিখে এল-আলামেইনের কাছে ফ্রন্ট লাইন
- ২৩.১০-৮.১২.৪২ তারিখে ব্রিটিশ ফৌজের আক্রমণাভিযান
- ৮-১১.১২.৪২ তারিখে ইঙ্গো-মার্কিন ফৌজের অবতরণ
- ইতালীয়-জার্মান ফৌজ স্থানান্তর
- ইঙ্গো-মার্কিন ফৌজের অগ্রগতি
- ২৫.১২.৪২ তারিখে ফ্রন্ট লাইন
- ৮.১১.৪২-১১.২.৪৩ তারিখে ব্রিটিশ ফৌজের আক্রমণাভিযান
- ৬.২ ৪৩ তারিখে ইতালীয়-জার্মান ফৌজের প্রতিরক্ষা লাইন
- ১৪-২২.২.৪৩ তারিখে ইতালীয়-জার্মান বাহিনীর প্রতিঘাত
- ইতালীয়-জার্মান ফৌজের পশ্চাদপসরণ
- ২০.৩-২০.৪.৪৩ তারিখে মিত্র বাহিনীসমূহের আক্রমণাভিযান
- ১৯৪৩ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে ফ্রন্ট লাইন
- ৬-১৩.৫.৪৩ তারিখে মিত্র বাহিনীসমূহের আক্রমণাভিযান
- ইতালীয়-জার্মান ফৌজের আত্মসমর্পণের এলাকা

নকশা ৬। ১৯৪২ সালের হেমন্তে ও ১৯৪৩ সালের বসন্তে উত্তর আফ্রিকায় সামরিক ক্রিয়াকলাপ

দিকে ঠেলে দেওয়া এবং জার্মান-ইতালীয় সৈন্যের সমুদ্রোপকূলবর্তী গ্রুপিংটিকে বিধ্বস্ত করা।

অপারেশনের পরিকল্পনা প্রস্তুতি কালে ব্রিটিশ সেনাপতিমণ্ডলী বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন আক্রমণের আকস্মিকতার দিকে। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা অপারেটিভ ক্যামুফ্লেজের ব্যাপারে ও শত্রুকে মিথ্যা তথ্যাদি সরবরাহের ব্যাপারে বেশকিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। ওই ব্যবস্থাগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া যাক।

মরুভূমিতে আক্রমণাভিযানের জন্য সৈন্যদের প্রস্তুতি কার্য গোপন রাখা খুবই কঠিন। এ ব্যাপারটি বিবেচনা করে মিত্র শক্তিবর্গের সেনাপতিমণ্ডলী প্রধান আঘাতের অভিমুখ ও আক্রমণাভিযান আরম্ভের সময় সম্পর্কে শত্রুকে বিভ্রান্ত করার কাজে বিশেষ মনোযোগী হলেন। এই উদ্দেশ্যে পশ্চাদ্ভাগে, অপ্রধান অভিমুখে — ৮ম বাহিনীর বাম পার্শ্বে, ট্যাংক ফৌজ সমাবেশের দৃশ্য অনুকরণ করা হয়, জ্বালানি ভাণ্ডারের ও পাইপ লাইনের প্রতিরূপ এবং অন্যান্য মিথ্যা নিশানা গড়া হয়। অপারেটিভ ক্যামুফ্লেজ ব্যবস্থাগুলো ভালো ফল দিল। জার্মান-ইতালীয় সেনাপতিমণ্ডলী তাদের রিজার্ভের অর্ধেকটা — দু'টি ট্যাংক ডিভিশন — মোতায়েন করল রণাঙ্গনের দক্ষিণ পার্শ্বে।

২০ থেকে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত ব্রিটিশ বিমান বাহিনী প্রবল প্রাগাক্রমণ বোমাবর্ষণ করল, বিমান ঘাঁটিগুলোর উপর এবং ইতালীয়-জার্মান ফৌজের সমাবেশ স্থলসমূহের উপর আঘাত হানল।

২৩ অক্টোবর রাত ৯টা ৪০ মিনিটের সময় প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণ শুরু হয়, — প্রতি কিলোমিটারে ৫০টি করে কামান ছিল। গোলাবর্ষণ চলে ২০ মিনিট। তাতে সামান্য ফল মিলেছিল — শত্রুর গোলাবর্ষণ কেন্দ্রগুলো ধ্বংস করা গেল না।

প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণ সমাপ্ত হওয়ার পর মিত্র শক্তিবর্গের ৩০তম কোরের পদাতিক ডিভিশনগুলো আর্টিলারির সমর্থন পেয়ে আক্রমণ আরম্ভ করে। রাতের পরিস্থিতিতে এবং মরুভূমির পরিস্থিতিতে — যেখানে যথেষ্ট সংখ্যক দিক নির্ণায়ক চিহ্ন ছিল না — যাতে সৈন্যদের দিকভ্রম না ঘটে সেই উদ্দেশ্যে ব্রিগেডগুলোর মধ্যবর্তী সীমা নির্ধারক রেখাসমূহ বরাবর বিমান-বিধ্বংসী কামান থেকে ট্রেসার শেল বর্ষণ করা হচ্ছিল।

এ ছাড়া, দিক নির্ণায়ক চিহ্ন হিশেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল সার্চ লাইট

আলোকিত মোবাইল টাওয়ারগুলো। মাইন ক্ষেত্রগুলোতে মাইনমুক্ত প্রবেশ পথগুলো চিহ্নিত হয়েছিল জলন্ত তেলের কানিস্তারা দিয়ে।

পরের দিন সকালের দিকে মিত্র বাহিনীগুলো শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ভেতরে কিছুটা প্রবেশ করতে পারল। পরে ব্যূহ বিদারণের কাজ চলে অতি মন্থর গতিতে। সেই জন্য ২৪ অক্টোবর তারিখেই ৮ম বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল মণ্টগোমেরি লড়াইয়ে তাঁর দ্বিতীয় এশিলনটিকে (১০ম কোর) ঢোকালেন। পরিকল্পনা অনুসারে, উক্ত এশিলনটির কাজ ছিল আক্রমণাভিযানের সাফল্য অর্জনের জন্য শক্তি জোগানো। তবে তাতেও আশানুরূপ ফল মিলল না। পরবর্তী তিন দিনে ১০ম ও ৩০ম কোরগুলোর ইউনিটসমূহ মাত্র ৩-৫ কিলোমিটার অগ্রসর হতে পেরেছিল। তার উপর, জার্মান-ইতালীয় সেনাপতিমণ্ডলী ইতিমধ্যে বুঝে ফেলেছিল যে দক্ষিণ পার্শ্বে ইংরেজরা আঘাত হানছিল কেবল মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে, এবং সেজন্য তারা নিজেদের ট্যাঙ্ক ইউনিটগুলোকে ওখান থেকে মিত্র ফৌজের প্রধান আঘাতের অভিমুখে নিয়ে এসেছিল।

মণ্টগোমেরি সাময়িকভাবে আক্রমণাভিযান বন্ধ রাখার এবং লড়াই থেকে ১০ম কোরকে ও ৩০তম কোরের নিউজিল্যাণ্ডীয় পদাতিক ডিভিশনটিকে বের করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ওই কোর ও ডিভিশনকে আরও জনবল ও সামরিক প্রযুক্তি দিয়ে পরিপূর্ণ করা। ২৭ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর তারিখের মধ্যে পশ্চাদ্ভাগে ফৌজ অপসারণ ও তা পরিপূর্ণকরণের কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়।

সঙ্গে সঙ্গেই সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকায় মিত্র বাহিনীগুলো শত্রুর কয়েকটি ব্যাটেলিয়নকে ঘিরে ফেলে এবং তাতে তার প্রতিরক্ষা ব্যূহ বিদারণের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারটি রমেলকে অনতিবিলম্বে ওখানে তার শেষ রিজার্ভটি — একটি মাত্র ট্যাঙ্ক ডিভিশন — পাঠাতে বাধ্য করে।

শক্তির পুনর্বিন্যাসের পর ৮ম বাহিনীর সৈন্যরা প্রধান আঘাতের অভিমুখে আক্রমণাভিযান পুনরারম্ভ করে। আক্রমণাভিযান শুরু হয় ৪ ঘণ্টা ব্যাপী প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণের পর, তাতে সহায়তা জোগায় জাহাজগুলোর আর্টিলারি। তখন অন্তরীক্ষে ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর পূর্ণ আধিপত্য ছিল। তবে ৮ম বাহিনী সাফল্য অর্জন করতে পারল না। জার্মানরা ট্যাঙ্ক ফৌজ দিয়ে প্রতিঘাত হানল। সে প্রতিঘাত প্রতিহত হলেও ইংরেজরা আঘাতের প্রধান অভিমুখে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহ বিদারণের কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হল না। কেবল দক্ষিণ দিকে — ৪র্থ ভারতীয় ইনফেণ্ট্রি

ডিভিশনের (এই ডিভিশনটি ৪ নভেম্বর সকালের দিকে ৮ কিলোমিটার অগ্রসর হয়েছিল) আক্রমণাভিযানের এলাকায় শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ভাঙন দেখা দেয় এবং প্রধান মিত্র বাহিনীগুলো তা ব্যবহার করে। জার্মান ফৌজের সমুদ্রোপকূলীয় গ্রুপিংয়ের ডান পার্শ্বটির পাশ কেটে চলে গিয়ে তারা ভাঙনের দিকে ধাবিত হয়। নিজেদের ফৌজ বাঁচানোর উদ্দেশ্যে রমেল মিশর থেকে হটে যাওয়ার হুকুম দেয়। সে ইতালীয়দের সমস্ত মোটর গাড়ি নিয়ে নেয়। জার্মান মিত্রদের দ্বারা অদৃষ্টের হাতে পরিত্যক্ত ৪টি ইতালীয় ডিভিশন আত্মসমর্পণ করল। ফ্যাসিস্ট ইতালির পররাষ্ট্র মন্ত্রী গালিয়াৎসো চিয়ানো তার ডায়েরিতে লিখেছিল যে রমেল এমনকি তার মিত্রের ফর্ম্যাশনগুলোকে গোলাগুলিবর্ষণের ভেতর থেকে অপসারণ করারও চেষ্টা করে নি, সে ইতালীয় ইনফেন্ট্রি ডিভিশনগুলোকে মরুভূমির মাঝখানে ফেলে চলে যায়। এর ফলে ৩০ হাজারের মতো ইতালীয় সৈনিক আর অফিসার বন্দী হয়।

এল-আলামেইনের নিকটে ৮ম ব্রিটিশ বাহিনীর বিজয় ছিল পশ্চিমী মিত্রদের জন্য প্রথম উল্লেখযোগ্য সাফল্য। তা ১৯৪০-১৯৪৩ সালের উত্তর-আফ্রিকীয় অভিযানে পট-পরিবর্তন ঘটায় মিত্রদের অনুকূলে।

এল-আলামেইনের অপারেশনে জার্মান-ইতালীয় বাহিনীর ৭০ শতাংশের মতো লোক হতাহত ও বন্দী হয়। তারা তাদের ট্যাংক ও তোপের বেশির ভাগই ওখানে হারায়।

বুর্জোয়া ইতিহাসবিদরা এল-আলামেইন অভিযানের তাৎপর্যটি খুবই বাড়িয়ে দেখায়। উইনস্টন চার্চিল এটাকে যুদ্ধের 'অদৃষ্ট পরিবর্তন' বলে বর্ণনা করেন। ব্রিটিশ সামরিক ইতিহাসবিদ জ. ফুলের মনে করেন যে মিত্রদের স্বার্থ রক্ষার্থে এটাই ছিল সবচেয়ে চূড়ান্ত স্থলযুদ্ধ।*

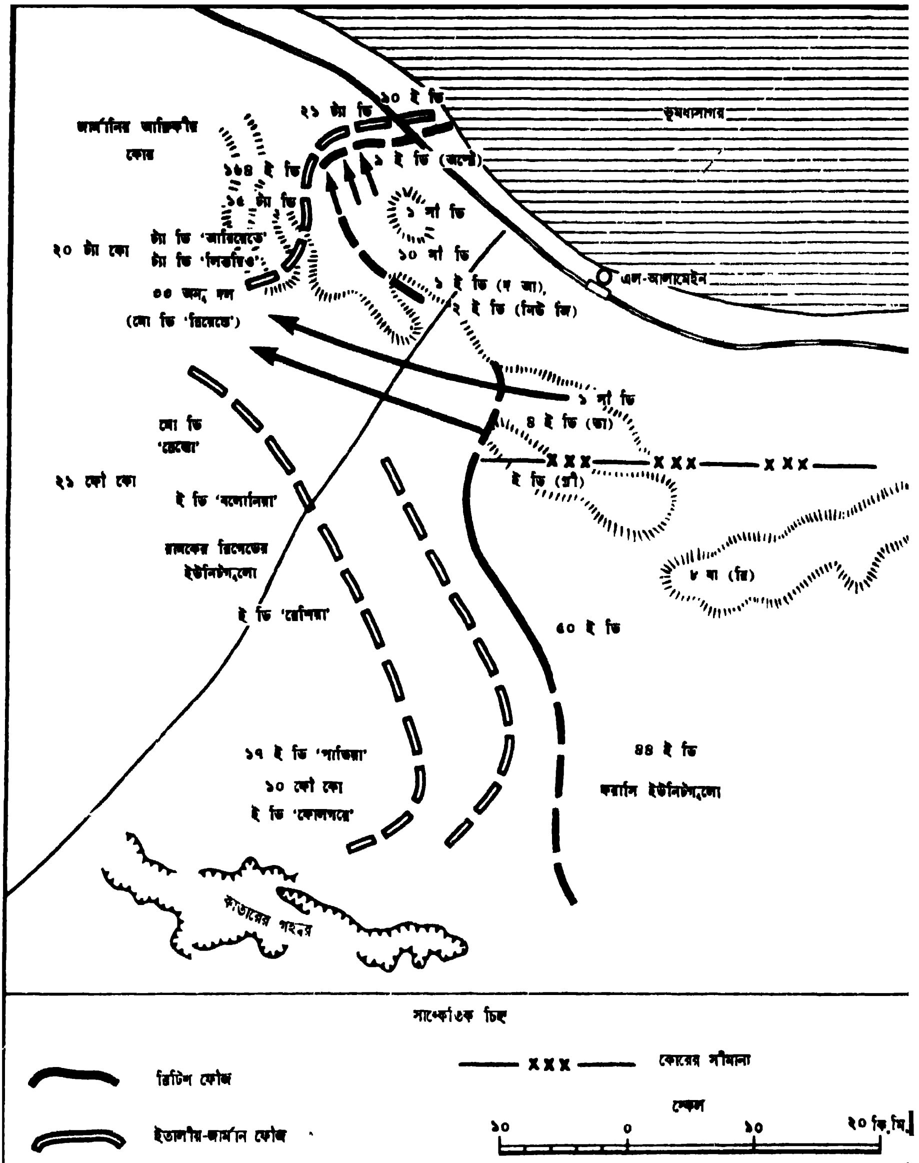
প্রকৃত পক্ষে তথ্য ও দলিলাদি কিন্তু অন্য কথা বলে। এল-আলামেইনের লড়াই নিঃসন্দেহেই কেবল উত্তর আফ্রিকায়ই নয়, সমগ্র ভূমধ্য-সাগরীয় রণাঙ্গনেও সামরিক ক্রিয়াকলাপের গতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু যুদ্ধের অদৃষ্ট নির্ধারিত হচ্ছিল সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে যেখানে কেন্দ্রীভূত ছিল জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের প্রধান শক্তিসমূহ। যেখানে এল-আলামেইনের কাছে রমেলের বাহিনীতে ছিল মোট ৮০ হাজার লোক; লড়াই চলাকালে ৫৫ হাজার সৈন্য নিহত, আহত

* ফুলের জ.। ১৯৩৯-১৯৪৫ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।... পৃঃ ৩১৩।

নকশা ৭। এল-আলামেইনের কাছে লড়াই (১৯৪২-এর অক্টোবর-নভেম্বর) (ক) এল-আলামেইনের কাছে সৈন্য বিন্যাস

ও বন্দী হয়, ৩২০টি ট্যাঙ্ক আর প্রায় ১ হাজার কামান খুয়া যায়, সেখানে স্তালিনগ্রাদের উপকণ্ঠে কেবল পাল্টা-আক্রমণের পর্বেই ভের্মাখ্‌ট হারায়, যেমনটি আগেই বলা হয়েছে, ৮ লক্ষাধিক লোক, ২ হাজার ট্যাঙ্ক ও অ্যাসল্ট গান, ১০ হাজার তোপ ও মর্টার কামান, ৩ হাজার জঙ্গী ও পরিবহণ বিমান।

এল-আলামেইনের লড়াই গভীরতার দিক থেকে বড় এক ভূখণ্ড



(খ) ১৯৪২ সালের ২ নভেম্বর ইতালীয়-জার্মান ফৌজের অরক্ষিত সংযোগস্থলে ব্রিটিশ ইউনিটসমূহের আক্রমণাভিযান

জুড়ে চললেও রণাঙ্গন বরাবর তার ব্যাপ্তির দৈর্ঘ্য কিন্তু কমই ছিল (৬০ কিলোমিটার) এবং একটি বাহিনীর শক্তি লড়াইয়ে লিপ্ত ছিল। ৮ম ব্রিটিশ বাহিনীর সামরিক ক্রিয়াকলাপের প্রধান রূপ ছিল — একটি অংশে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করার উদ্দেশ্যে ফ্রন্ট্যাল অ্যাটাক এবং পরে গভীরে সে অ্যাটাকের প্রবলতা বৃদ্ধি।

যুদ্ধ কৌশলের ক্ষেত্রে এই অপারেশনটি নতুন কী দিল, এর বৈশিষ্ট্যই

বা কী কী? সর্বাগ্রে তা এই সিদ্ধান্ত উপনীত হতে সাহায্য করে যে আধুনিক যুদ্ধে বালু এবং গরম জলবায়ু ট্যাংক ও মেকানাইজ্ড বাহিনীর পক্ষে কোন বাধা নয়। অনুরূপ পরিস্থিতিতেও ওই সমস্ত বাহিনী বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। এল-আলামেইন অপারেশনের সময় অপারেশনেল-ট্যাকটিকেল কর্তব্য সম্পাদনের জন্য ব্রিটিশ বিমান বাহিনী ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং সামরিক বিমান বাহিনীকে দু'টি ধরনে — ট্যাকটিকেল ও স্ট্র্যাটেজিকেল ধরনে — বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি ধরনের বিমান বাহিনী কেন্দ্রীয় পরিচালনা ব্যবস্থার দ্বারা ঐক্যবদ্ধ ছিল।

ব্রিটিশ সেনাপতিমণ্ডলী মোটের উপর রমেলের জার্মান আফ্রিকীয় কোরটি অবরোধ ও ধ্বংস করতে পারেন নি. যদিও তার জন্য সমস্ত সুযোগ-সম্ভাবনাই ছিল। অভিযানে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন ধরনের ফৌজের মধ্যে তেমন সুশৃংখল পারস্পরিক সহযোগিতা ছিল না; আক্রমণাভিযানের আগে লড়াই মাধ্যমে অনুসন্ধান কার্য চালানো হয় নি; তাড়াহুড়োর মধ্যে লড়াইয়ে নিযুক্ত ব্রিটিশ সাঁজোয়া কোরটি এমনকি ট্যাকটিকেল সাফল্যও লাভ করে নি। এই সমস্ত কারণে ও অন্যান্য কিছু কারণে, শক্তি ও যুদ্ধোপকরণে যথেষ্ট শ্রেষ্ঠতা সত্ত্বেও, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ট্যাকটিকেল এলাকা ভেদকরণের গতি দিনে ১-২ কিলোমিটারের বেশি ছিল না, আর অভিযান চলছিল ধীরে ধীরে।

সিসিলি দ্বীপে সৈন্য অবতরণ
(১৯৪৩ সালের ১০ জুলাই-১৭ আগস্ট)

১৯৪৩ সালের জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয়ার্ধে কাসাব্লাঙ্কা শহরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের প্রতিনিধিদের এক অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তে বলা হয় যে পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত আবার স্থগিত রাখা হচ্ছে, আর ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মে সিসিলিতে সৈন্য অবতরণের অপারেশন পরিচালিত হবে যাতে পরে মিত্র শক্তিবর্গের বাহিনীগুলো সরাসরি ইতালির ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে পারে।

অপারেশনের শুরুর দিকে সিসিলিতে ছিল দু'টি জার্মান (একটি ট্যাঙ্ক ও একটি মোটোরাইজ্ড) ও ৯টি ইতালীয় ডিভিশন, — ওগুলো ৬ষ্ঠ ইতালীয় বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৫৫ হাজার, এ ছাড়া সিসিলির বিমান ঘাঁটিগুলোতে ছিল ৬০০টি প্লেন।

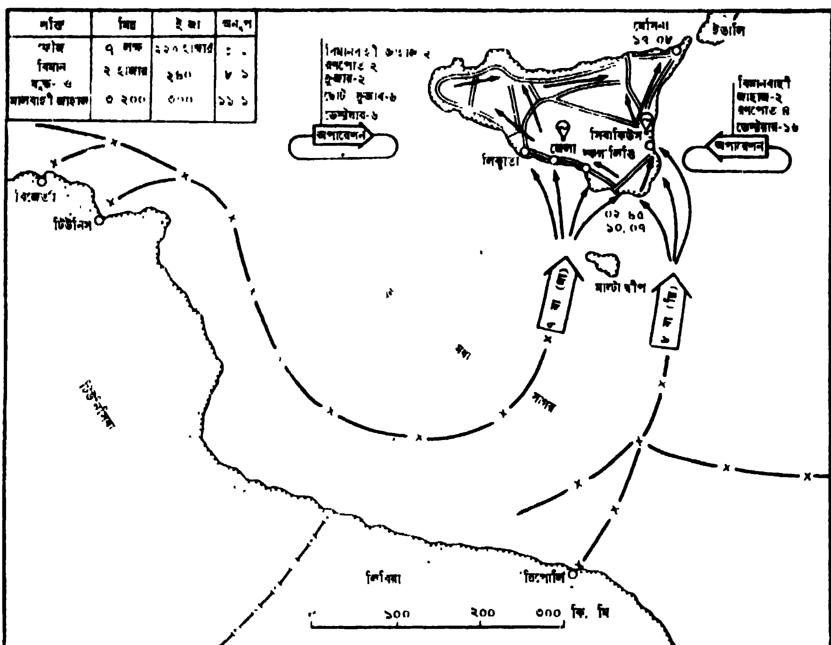
এই ফৌজের মধ্যে দুটি ইতালীয় ডিভিশন প্রশস্ত রণাঙ্গন জুড়ে — দক্ষিণ উপকূল বরাবর ২০০ কিলোমিটার জুড়ে — প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নিয়ে ছিল। মিত্র সেনাপতিমণ্ডলী এই এলাকাতেই নৌ-সৈন্য নামানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

দ্বীপের অ্যান্টিল্যান্ডিং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল দুর্বল। তার ভিত্তি গঠিত হয়েছিল উপকূলবর্তী তোপশ্রেণী নিয়ে, যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বন্দরগুলোর প্রবেশ পথ রক্ষা করছিল। ইতালীয় সামরিক নৌ-বাহিনী দ্বীপ প্রতিরক্ষার কাজে অংশ নিচ্ছিল না।

মিত্র সেনাপতিমণ্ডলী সিসিলি অধিকারের দায়িত্ব দিলেন ৭ম মার্কিন ও ৮ম ব্রিটিশ বাহিনী নিয়ে গঠিত ১৫শ গ্রুপটিকে (অধিনায়ক — ইংরেজ জেনারেল হ্যারল্ড আলেকজাণ্ডার)। তাতে ছিল মোট ৪ লক্ষ ৭৮ হাজার লোকের ১৩টি শক্তিশালী ডিভিশন, ৪ সহস্রাধিক জঙ্গী ও ৯০০টি পরিবহণ বিমান। সৈন্য অবতরণের অপারেশন সম্পন্ন হয় নৌ-বহরের বিপুল শক্তির দ্বারা — ১,৩৮০টি যুদ্ধ জাহাজ ও পরিবহণ জাহাজের দ্বারা, তার ভেতরে ছিল ৬টি রণপোত, ২৬টি ক্রুজার, শতাধিক ডেস্ট্রয়ার ও ১,৮০০টিরও বেশি অবতরণ উপকরণ।

অতএব, শক্তিতে শ্রেষ্ঠতা — এবং বেশ বড় রকমের শ্রেষ্ঠতা — ছিল মিত্র বাহিনীর হাতে। দুই মার্কিন লেখক চ. নিমিৎস ও এ. পোটার লিখেছেন, 'সিসিলি ছিল সারশূন্য বাদাম। এর অন্যতম কারণ ছিল খারাপ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং তার কম গভীরতা। প্রধান ত্রুটিটি ছিল ইতালীয়দের নিচু মনোবল।... দেশের সামরিক অবস্থাকে তারা নৈরাশ্যজনক বলে গণ্য করত এবং ইঙ্গো-মার্কিন ফৌজের আক্রমণকে তারা এমনকি স্বাগতও জানিয়েছিল, — এই আক্রমণ তাদের যুদ্ধ থেকে বার করে দেবে, আর ঘৃণ্য জার্মানদের — ইতালি থেকে।'*

অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল — সিসিলি দখল করা এবং মহাদেশীয় ইতালিতে ঢোকার জন্য ব্রিজ-হেড গড়া। প্রথমে সিসিলির দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে নৌ ও বায়ু সেনা নামানোর কথা ছিল। আর তারপর উত্তরাভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হয়ে মেসিনা বন্দর অধিকার করার এবং আপেনিনজ উপদ্বীপ



নকশা ১২। সিসিলি দ্বীপে অবতরণ অভিযান (১৯৪৩ সালের ১০ জুলাই-১৭ আগস্ট)

থেকে শত্রু সৈন্যদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে ওদের ধ্বংস করার পরিকল্পনা ছিল।

মিত্র বাহিনীগুলো এরূপ দায়িত্ব পেল: ৭ম মার্কিন বাহিনী (অধিনায়ক জেনারেল প্যাটন) ১১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ রণাঙ্গনে জেলা, লিকাতা ও স্কগ্‌লেত্তি অঞ্চলে অবতরণ করবে। ৮ম ব্রিটিশ বাহিনী (অধিনায়ক জেনারেল-ফিল্ডমার্শাল মণ্টগোমেরি) অবতরণ করবে ৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ রণাঙ্গনে সিরাকিউসের দক্ষিণে অবস্থিত এক অঞ্চলে। বিমান বাহিনীর অবতরণ ডিভিশনগুলোর কাজ ছিল জেলা অঞ্চলে ৮২তম মার্কিন ডিভিশনের ও সিরাকিউস অঞ্চলে ১ম ব্রিটিশ ডিভিশনের সৈন্যদলগুলোর অবতরণের সময় রণাঙ্গনের পার্শ্বদেশগুলো রক্ষা করা।

মিত্র শক্তিবর্গের সামরিক নৌ-বহরকে দু'টি অপারেশনেল ফর্ম্যাশনে বিভক্ত করা হয়: পশ্চিম ও পূর্ব ফর্ম্যাশনে। প্রথমটির কাজ ছিল — মার্কিন ফৌজের, দ্বিতীয়টির কাজ ছিল — ব্রিটিশ ফৌজের নির্বিঘ্ন অবতরণ সুনিশ্চিত করা।

ভূমধ্যসাগরে মিত্রদের সশস্ত্র বাহিনীগুলোর সর্বাধিনায়ক ছিলেন জেনারেল আইজেনহাওয়ার। তাঁর তিনজন সহকারীও ছিলেন: স্থল

বাহিনীতে জেনারেল আলেকজান্ডার, বিমান বাহিনীতে চিফ এয়ার মার্শাল টেডার ও নৌ-শক্তিতে অ্যাডমিরাল ক্যানিংহ্যাম।

ল্যান্ডিং অপারেশনের প্রস্তুতি কার্য চালানো হয় উত্তর আফ্রিকার বন্দরগুলোতে এবং তা চলে ৬ মাস ধরে, ১৯৪৩ সালের জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত। ৭ম মার্কিন বাহিনীর ইউনিটগুলোকে জাহাজগুলোতে তোলা হয় ওরান, আলজিয়ের্স ও বিজের্তা বন্দরে, আর ৮ম বৃটিশ বাহিনীর ইউনিটগুলোকে — বেনগাজি, আলেকজেন্দ্রিয়া, পোর্ট সৈয়দ, হাইফা ও বেরুট বন্দরে।

অপারেশনের প্রস্তুতির গোপনীয়তা রক্ষার্থে মিত্ররা সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাই অবলম্বন করেছিল। ল্যান্ডিং অপারেশনের প্রস্তুতি চলে নাকি সার্দিনিয়া দ্বীপ আক্রমণের তোড়জোড়ের মধ্যে। এর উদ্দেশ্য ছিল — দেজিনফর্ম্যাশনের দ্বারা ইতালীয়-জার্মান সেনাপতিমণ্ডলীর মনে মিথ্যা ধারণা বদ্ধমূল করা। জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলীকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে ১৯৪৩ সালের ৩০ এপ্রিল স্পেনের উপকূলের কাছে সমুদ্রে একটি লাশ ফেলা হয়। রয়েল নেভির কল্পিত অফিসার মেজর মার্টিনের লাশটির সঙ্গে ছিল দলিলাদি ও গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র। এই অফিসারটি নাকি ব্রিটেন থেকে উত্তর আফ্রিকায় যাচ্ছিলেন। লাশের সঙ্গে বর্তমান জাল কাগজপত্রে ইঙ্গো-মার্কিন ফৌজের সম্ভাব্য অভিযানের কথা বলা হচ্ছিল: ভূমধ্যসাগরের পূর্বাংশে — পেলোপনেসের উপকূলের দু'টি এলাকায় সৈন্য অবতরণ করবে, ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমাংশে — সিসিলি অভিমুখে মনোযোগ বিক্ষিপ্তকারী সামরিক ক্রিয়াকলাপ চলবে ও সার্দিনিয়ায় অবস্থিত শত্রু সৈন্যের উপর প্রধান হানা হবে।

৭ মে স্পেনিশ কর্তৃপক্ষ লাশটি আবিষ্কার করল। তারা অনতিবিলম্বে নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলীকে তাদের আবিষ্কারের খবর দিল। নাৎসিরা জাল দলিলগুলোকে খাঁটি বলে ধরে নিয়েছিল এবং মিত্র শক্তিবর্গের মিথ্যা সংবাদে বিশ্বাস করেছিল।* ৯ জুলাই, অর্থাৎ মিত্রদের সিসিলি অপারেশনের প্রাক্কালে, জেনারেল-ফিল্ডমার্শাল কেইটেল বাহিনীসমূহের 'দক্ষিণ' ও 'দক্ষিণ-পূর্ব' গ্রুপগুলোর অধিনায়কদের জানাল যে সার্দিনিয়া ও সিসিলি আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ইঙ্গো-মার্কিন ফৌজের একটি অংশ ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলগুলোতে প্রেরিত হয়েছে। ওদের উদ্দেশ্য — গ্রীসে অবতরণের

* Schröder I. Italiens Kriegsaustritt, 1943, S. 113, 114.

জন্য প্রস্তুতি চালানো এবং পরে গ্রীসে অবতরণ করা।*

মিত্র শক্তির অবতরণ আরম্ভ হওয়ার এক সপ্তাহ আগে শুরু হল প্রাগাক্রমণ বোমাবর্ষণ। বিমান থেকে জোর বোমাবর্ষণ চলে সিসিলি ও সার্দিনিয়ার বিমান ঘাঁটিগুলোর উপর এবং বিভ্রান্ত করার জন্য দক্ষিণ ইতালির সমুদ্র বন্দরগুলোর উপরও। এর ফলে লিভোর্নো, স্পেৎসিয়া, ফোজা, চিভিতাভেকিয়া ও নেপ্ল্সের মতো বন্দরগুলো সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়, বিপুল সংখ্যক শান্তিপ্রিয় বাসিন্দা নিহত হয়।

নিরাপদ সমুদ্র অতিক্রমণের উদ্দেশ্যে মিত্ররা শত্রুর কোন প্রতিরোধ ব্যতিরেকেই টিউনিসিয়ান প্রণালীতে পান্তেলেরিয়া ও লাম্পেদুজা দ্বীপগুলো দখল করে নেয়।

মিত্র সেনাপতিমণ্ডলী সৈন্যদের বিশেষ প্রস্তুতির দিকে গভীর মনোযোগ দিচ্ছিল। একাধিক সমুদ্রে জাহাজের উপর এই সৈন্যদের মহড়া চলে এবং তা চলা কালে তারা তীরেও অবতরণ করে। রাত্রির অন্ধকারে বিমান থেকে লাফ দেওয়ার ব্যাপারে প্যারাশুটিস্টদের ট্রেনিংয়ের কাজে প্রচুর সময় ব্যয়িত হয়। সমুদ্র ও আকাশ থেকে সৈন্য অবতরণ শুরু হওয়ার কথা ছিল ৯ থেকে ১০ জুলাই রাত্রে, ১৫ মিনিটের প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণের পর।

অপারেশনেল ক্যামুফ্লেজের উদ্দেশ্যে সমস্ত অবতরণ বাহিনী প্রথমে উত্তর আফ্রিকার উপকূল ধরে ত্রিপোলি অভিমুখে চলে এবং পরে দক্ষিণ দিকে ঘুরে মাল্টা দ্বীপের পাশ কেটে সিসিলি অভিমুখে রওয়ানা দেয়।

রাত দুটোর সময় মিত্রদের দুটি ল্যান্ডিং ডিভিশন নামানো হয়। জোর বাতাস বইছিল, তার উপর ল্যান্ডিং অপারেশনের কাজ সুসংগঠিত ছিল না, এবং এর ফলে মার্কিন প্যারাশুটিস্টরা আক্রমণের সমগ্র এলাকায় ১০০ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। তারা তাদের কর্তব্য পালন করতে — অর্থাৎ জেলার উত্তরে অবস্থিত ইতালীয় বিমান বন্দরটি অধিকার করতে পারল না। ব্রিটিশ ল্যান্ডিং বাহিনীর অবস্থাও খুব একটা সুবিধাজনক ছিল না। সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র-সমেত ১৩৩টি গ্লাইডারের মধ্যে কেবল ১২টি লক্ষ্য স্থলে — সিরাকিউসের দক্ষিণে এক খালের সেতুর কাছে — নামতে পেরেছিল এবং নৌ-সৈন্যদের অবতরণে সহায়তা দিয়েছিল। ৪৭টি

* KTB/OKW, Bd. III, S. 763.

গ্লাইডার সমুদ্রে পড়ে আর বাকীগুলো দ্বীপের বিভিন্ন স্থানে অবতরণ করে।*

৮ম ব্রিটিশ বাহিনীর ইউনিটগুলো (ইনফেণ্ট্রি ডিভিশন-৬, ল্যাণ্ডিং ডিভিশন-১, ট্যাঙ্ক ডিভিশন-২ ও ইনফেণ্ট্রি ব্রিগেড-১) ১০ জুলাই তারিখে সাফল্যের সঙ্গে, বস্তুত পক্ষে শত্রুর প্রতিরোধ ছাড়াই, সিসিলির দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে, ইতিপূর্বে ল্যাণ্ডিং ইউনিট অধিকৃত সিরাকিউস ও পাকিনো এলাকায় অবতরণ করে।

প্রথম দিনেই ইংরেজরা রণাঙ্গনের দৈর্ঘ বরাবর ১০০ কিলোমিটার ও গভীরতার দিকে ১০-১৫ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত একটি ব্রিজ-হেড গড়ে নিল। মণ্টগোমেরি লিখেছিলেন, 'আমাদের অবতরণ বাহিনীর প্রথম ইউনিটগুলো পূর্ণ ট্যাকটিকেল আকস্মিকতা রক্ষা করে নেমেছিল এবং শত্রুকে এতই বিহ্বল ও বিশৃঙ্খল করে দিয়েছিল যে কোন সংগঠিত প্রতিরোধ দানে সক্ষম ছিল না।' প্রকৃত পক্ষে সেরা জার্মান ফর্ম্যাশনগুলো মোতায়েন ছিল প্রধানত দ্বীপের একেবারে পশ্চিম ভাগে। তারা ভেবেছিল যে মিত্র ফৌজ তার সৈন্যদের ওখানেই নামাবে, যেহেতু ওই জায়গাটি উত্তর আফ্রিকার বন্দরগুলোর নিকটে ছিল।

৮ম ব্রিটিশ বাহিনীর অবতরণের সময়ই সিসিলির দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে অবতরণ করে ৭ম মার্কিন বাহিনী (ইনফেণ্ট্রি ডিভিশন-৪, ল্যাণ্ডিং ডিভিশন-১, ট্যাঙ্ক ডিভিশন-১)। দিনের শেষে তার ইউনিট-গুলো জেলা ও লিকাতা শহরে প্রবেশ করে।

১১ জুলাই রাত্রিবেলা আমেরিকানরা জেলা অঞ্চলে অবস্থিত বিমান ঘাঁটি দখলের উদ্দেশ্যে ২,০০০ প্যারাশুটিস্টের একটি বাহিনী নামাতে শুরু করল। কিন্তু এবারও মিত্রদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল: সিসিলির উপকূলের কাছে প্লেন নিজেদেরই বিমানবিধ্বংসী তোপশ্রেণীর গোলাবর্ষণের সম্মুখীন হয় এবং নিজেদেরই ফাইটারগুলোর দ্বারা আক্রান্ত হয়। ১৪৪টি প্লেনের মধ্যে ২৩টি ভূপাতিত হয়, আর যে-সমস্ত বিমান রক্ষা পেয়েছিল ওগুলোর অর্ধেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে কোন রকমে টিউনিসিয়ায় তাদের ঘাঁটিতে পৌঁছতে পেরেছিল।** বায়ুসেনারা শোচনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল।

* ব্র্যাডলি ও.। সৈনিকের স্মৃতিকথা। ইংরেজী থেকে অনুবাদ। — মস্কো: বিদেশী সাহিত্য প্রকাশন, ১৯৫৭, পৃঃ ১৪৮।

** Craven W., Cate J. The Army Air Forces in World War II. Vol. II, pp. 453-454.

১২ জুলাই সকাল বেলা ৭ম মার্কিন বাহিনী ও ৮ম ব্রিটিশ বাহিনীর প্রথম ইউনিটগুলোর অবতরণ কাজ সম্পন্ন হল। মিত্ররা দ্বীপের অভ্যন্তরে আক্রমণাভিযান চালানোর সুযোগ পেল। ইতালীয় কমিউনিস্টদের নেতা পালমিরো তোগলিয়াতি এই ঘটনাগুলো সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'ইতালীয় সৈন্য বাহিনী ভালোভাবেই জানত যে পরের স্বার্থ রক্ষার জন্য, কেবল অল্প কালের জন্য ফ্যাসিস্ট সরকারের আয়ু বৃদ্ধির জন্য লড়ছে' কেউই বিজয়ের আশা করছিল না। তাই তারা প্রকৃত অভ্যুত্থান আরম্ভ করল। ইউনিটকে ইউনিট আত্মসমর্পণ করছিল, তারা মিত্রদের দিকে চলে যাচ্ছিল, সেই জার্মান অফিসারদের হত্যা করছিল যাদের অধীনে ছিল।*

পরের দিন মার্কিন ও ব্রিটিশ বাহিনীগুলো পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হল এবং দুই সারিতে উত্তর দিকে মেসিনা বন্দর অভিমুখে অগ্রসর হতে লাগল। মেসিনা বন্দর মাধ্যমেই ইতালীয়-জার্মান ফৌজের প্রায় সমস্ত সরবরাহ চলছিল। আক্রমণাভিযান চলছিল ধীরে ধীরে এবং তার সারমর্ম ছিল — শত্রুকে ঠেলে সরানো। ইতালীয় সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করছিল, আর জার্মানরা — অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক প্রযুক্তি সমেত মেসিনা প্রণালীর দিকে হটে যাচ্ছিল। মিত্র শক্তিবর্গের স্থলসেনার মন্থরতা ও অন্তরীক্ষে পূর্ণ আধিপত্যের অধিকারী তাদের বিমান বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা জার্মান সেনাপতিমণ্ডলীকে সিসিলি থেকে আপেনিনজ় উপদ্বীপে পরিকল্পিতভাবে ৫০ সহস্রাধিক সৈন্য অপসারণের সুযোগ দিল।

১৭ আগস্ট সকালবেলা, সিসিলিতে অবতরণ বাহিনীর নামার ৩৯ দিন পরে, মিত্র ফৌজ মেসিনায় প্রবেশ করল। তার জন্য তারা দিনে গড়ে ৫ কিলোমিটার করে অতিক্রম করে ২২০ কিলোমিটার পথ। কয়েক হাজার জার্মান সৈন্য নিহত ১৩,৫০০ আহত এবং ৫,৫০০ বন্দী হয়েছিল। ইতালীয় সৈন্যের বেশির ভাগই বন্দী হয়। মিত্রদের ৫,৫৩০ জন সৈন্য নিহত, ১৪,৪০০ জন আহত হয় এবং ২,৮৭০ জন নিখোঁজ হয়ে যায়।

এইভাবে, স্থলসেনা, নৌ-সেনা ও বায়ুসেনার সম্মিলিত প্রয়াসে সম্পন্ন হল ইঙ্গো-মার্কিন ফৌজের সিসিলীয় অপারেশন। এটা ছিল অন্যতম প্রথম অপারেশন যাতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল বিশেষ অবতরণ সরঞ্জাম এবং প্রশান্ত মহাসাগরের ল্যান্ডিং অপারেশনগুলোর সঙ্গে তুলনায় এটা

* এরকলি ম.। নাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইতালি। ইতালীয় ভাষা থেকে অনুবাদ। — মস্কো, ১৯৪৪, পৃঃ ১৪।

ছিল অধিকতর বৃহৎ অভিযান। তাতে অংশগ্রহণ করে ১৩টি ডিভিশন ও ৩টি ব্রিগেড। বিমান বাহিনীর অবতরণ ফৌজ ব্যবহারের ফলে (অবতরণ কার্য সংগঠনে ভুলত্রুটি এবং বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও) নৌ-সৈন্যদের অবতরণের কাজ অনেকটা সহজ হয়। সিসিলীয় ল্যাণ্ডিং অপারেশন পরিচালনার মাধ্যমে মিত্ররা বিভিন্ন রকমের সশস্ত্র বাহিনীর যৌথ ক্রিয়াকলাপ সংগঠনের অভিজ্ঞতা অর্জন করল। পরে তারা এই অভিজ্ঞতা বৃহত্তর নর্ম্যাণ্ডি অভিযানে কাজে লাগাতে পেরেছিল।

অনেক বুর্জোয়া ইতিহাসবিদ সিসিলীয় অপারেশনের তাৎপর্য বাড়িয়ে দেখাতে গিয়ে বলে যে হিটলার নাকি কুর্স্ক অভিমুখে আক্রমণাভিযান বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সিসিলিতে মিত্র বাহিনীর অবতরণের কারণে, এই জন্য নয় যে তার সৈন্যরা সোভিয়েত বাহিনীর সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করতে পারে নি। কিন্তু আসলে ব্যাপারটি হচ্ছে অন্য রকম। সিসিলিতে ছিল কেবল দু'টি জার্মান ডিভিশন এবং ওখানে মিত্র ফৌজের অবতরণ কোনক্রমেই ফ্যাসিস্ট জার্মানির পক্ষে হুমকি সৃষ্টি করে নি ও পূর্বে স্ট্র্যাটেজিক পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে পারে নি। আর যদি জার্মান ফৌজ স্থানান্তরণের কথা ওঠে তাহলে উল্লেখ করতে হয় তারা প্রেরিত হয়েছিল ইতালিতে নয়, সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে। ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৪ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত নাৎসিরা পশ্চিম ইউরোপ থেকে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে প্রেরণ করে ২৮টি ডিভিশন ও ৫টি ব্রিগেড।

সিসিলীয় অপারেশন সমাপ্ত হওয়ার পর ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনীর সামরিক ক্রিয়াকলাপ ছিল এরূপ। ৩ সেপ্টেম্বর প্রবল প্রাগাক্রমণ বোমাবর্ষণের পর দু'টি ব্রিটিশ ডিভিশন মেসিনা প্রণালী অঞ্চলে দক্ষিণ ইতালিতে অবতরণ করে। ইতালীয় সাম্রাজ্যবাদীরা মিত্র শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অযৌক্তিকতা লক্ষ্য করে এবং দেশে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার ইচ্ছায় মুসোলিনিকে ক্ষমতাচ্যুত করে গ্রেপ্তার করে রাখে। ফ্যাসিস্ট পার্টি ভেঙে দেওয়া হল। ৩ সেপ্টেম্বর তারিখে মার্শাল বাদোলিয়ো ও আইজেনহাওয়ারের মধ্যে ইতালির আত্মসমর্পণের বিষয়ে এবং মিত্র সেনাপতিমণ্ডলীর হাতে ইতালীয় নৌ ও বিমান বাহিনীকে তুলে দেওয়ার বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

কয়েক দিন বাদে — ইতালি এবং মিত্র শক্তিবর্গের মধ্যে যুদ্ধ-বিরতি বিষয়ক দলিলটি প্রকাশিত হওয়ার দিনে — জার্মান-ফ্যাসিস্ট সৈন্যরা

ফ্রান্স থেকে উত্তর ইতালি আক্রমণ করে। যুদ্ধ থেকে ইতালির বেরিয়ে যাওয়ার জবাবে নাৎসিরা ইতালীয় সৈন্য বাহিনীকে নিরস্ত্র করে দেয়।

মিত্র শক্তিবর্গের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে জার্মানরা সমগ্র উত্তর ও মধ্য ইতালি, রোম এবং নেপ্‌ল্‌স অধিকার করে নেয়। কেবল ১৯৪৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর জেনারেল এ. ক্লার্কের ৫ম মার্কিন বাহিনীর ৬ষ্ঠ মার্কিন কোর (৪টি ইনফেণ্ট্রি ডিভিশন) ও ১০ম ব্রিটিশ কোর (দু'টি ইনফেণ্ট্রি ডিভিশন ও একটি সাঁজোয়া ডিভিশন) সালের্নো অঞ্চলে অবতরণ করে। অবতরণের সময় সমুদ্র থেকে নিরাপত্তা বিধান করছিল ৬টি রণপোত, ৭টি বিমানবাহী জাহাজ ও ১৫টি ক্রুজার। মিত্র ফৌজের আক্রমণের এলাকায় প্রতিরক্ষা কার্যে লিপ্ত ছিল ১৬শ জার্মান ট্যাঙ্ক ডিভিশন।

সমুদ্রে ও অন্তরীক্ষে আমেরিকান আর ইংরেজদের পূর্ণ আধিপত্য সত্ত্বেও মিত্রদের সৈন্য অবতরণের কাজ চলছিল অতি মন্থর গতিতে। এর দরুন জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী সালের্নো অঞ্চলে দু'টি ট্যাঙ্ক ও একটি মোটোরাইজ্‌ড ডিভিশন পাঠাতে সক্ষম হল। ফলে সালের্নো অঞ্চলে দীর্ঘ লড়াই চলে (২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) এবং এতে জার্মান সেনাপতিমণ্ডলী দক্ষিণ ইতালি থেকে নিজের সৈন্যদের নেপ্‌ল্‌সের উত্তরে সান্‌গ্র ও কারিলিয়ানো নদীদ্বয় বরাবর আগে থেকে প্রস্তুত প্রতিরক্ষা লাইনে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেল।

২৩ সেপ্টেম্বর থেকে মিত্র সৈন্যরা শত্রুকে ধীরে ধীরে উত্তরাভিমুখে হটিয়ে দিতে শুরু করল। ৫ নভেম্বর তারিখে ৮ম ব্রিটিশ ও ৫ম মার্কিন বাহিনীগুলো ওই সমস্ত প্রতিরক্ষা লাইনে পৌঁছে যায়। নভেম্বর-ডিসেম্বরে মিত্র ফৌজগুলো কয়েক বার জার্মানদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করার ও রোমের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা চালায়। কিন্তু শক্তিতে শ্রেষ্ঠতা সত্ত্বেও তারা উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে নি এবং ডিসেম্বরের শেষে প্রতিরক্ষায় লিপ্ত হয়। ১৯৪৩ সালে ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনীর আক্রমণাভিযানমূলক ক্রিয়াকলাপ এখানেই সমাপ্ত হয়।

মিত্রদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হল না। রোম অবধি পৌঁছতে তখনও অনেক বাকী। ইতালিতে সুদীর্ঘ লড়াইয়ের বাস্তব সম্ভাবনা দেখা দিল। অথচ ইঙ্গো-মার্কিন সেনাপতিমণ্ডলী অপারেশনগুলো পরিচালনায় অধিকতর দৃঢ়তা দেখালে পরিস্থিতি অন্য রকম হতে পারত। ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ ও যুদ্ধ-তাত্ত্বিক লিড্‌ডেল গার্ট নাৎসি জেনারেল কেসেলরিঙয়ের একটি উক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছেন (জেনারেল এই কথাটি বলেছিল যুদ্ধের

পরে): 'মিত্র শক্তিবর্গ যদি রোমে বায়ুসেনা পাঠাত এবং সালের্নো অপারেশনের পরিবর্তে এতদঞ্চলে যদি সমুদ্র থেকে নৌ-সেনা নামাত তাহলে তা আমাদের ইতালির সমগ্র দক্ষিণাংশ ত্যাগ করতে বাধ্য করত।'*

১৯৪৩ সালের হেমন্তে ব্রিটিশ সৈন্যরা এজিয়ান সাগরে কয়েকটি ছোট ছোট দ্বীপ দখল করে নেয়। এই অপারেশনের পর বলকানে অধিকতর ব্যাপক আক্রমণাভিযান আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল। ১৯৪৩ সালের অক্টোবরের গোড়াতে রুজভেল্টের কাছে প্রেরিত এক চিঠিতে চার্চিল লেখেন: 'আমি মনে করি যে ইতালি ও বলকান উপদ্বীপ সামরিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে অখণ্ড একটি ক্ষেত্র, এবং ঠিক এই অঞ্চলেই আমাদের সক্রিয় ক্রিয়াকলাপ চালানো উচিত।'** মার্কিন ইতিহাসবিদ ম. মেটলফ বলেছেন, 'রডোস্ দ্বীপ দখলের ব্যাপারটিকে ভূমধ্যসাগরের পূর্বাংশে ও পরে বলকানে অনেকগুলো অপারেশন আরম্ভের দিকে প্রাথমিক পদক্ষেপ বলে গণ্য করা সম্ভব ছিল।'***

নেপল্সের দক্ষিণে ইঙ্গো-মার্কিন ফৌজের সহায়তায় মার্শাল বাদোলিয়োর ক্ষমতা টিকে ছিল। ওখানে রোম থেকে পলায়ন করে ইতালির রাজা ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ এবং ইতালীয় সরকারের সদস্যরা। সমগ্র উত্তর ও মধ্য ইতালি জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল। ওখানে প্রতিষ্ঠিত হয় নয়া-ফ্যাসিস্ট ক্রীড়নক এক সরকার। এস-এস বাহিনীর কর্মী ওত্তো স্কোরসেনির পরিচালনাধীন প্যারাশুটিস্টরা গ্রান সাসো পর্বতে (আবরুৎসো অঞ্চল) বন্দিদশায় অবস্থানরত মুসোলিনিকে মুক্ত করে এবং ভিয়েনায় নিয়ে যায়, আর তারপর হিটলারের সদর-দপ্তরে। এর পর মুসোলিনিকে পাঠানো হয় উত্তর ইতালির সালো শহরে, সেখানে সে নাৎসিদের নির্দেশে ফ্যাসিস্ট 'সামাজিক প্রজাতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ফ্যাসিস্ট পার্টিও 'প্রজাতান্ত্রিক' পার্টি নামে অভিহিত হতে লাগল। তবে এসব ছলচাতুরি কিন্তু এই সত্য ঘটনাটি গোপন করতে পারে নি যে নবপ্রতিষ্ঠিত ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রটি ('সালো প্রজাতন্ত্র') টিকে ছিল জার্মান হানাদারদের বন্দুকের জোরে।

মুসোলিনি অবশ্য হিটলারের আস্থা রক্ষা করতে চেষ্টার ত্রুটি করছিল না। সে 'সামাজিক প্রজাতন্ত্রের' সমস্ত বৈষয়িক সম্পদ ও জনবল নাৎসিদের হাতে তুলে দেয়। জার্মান হানাদারদের সমর্থন জোগানোর জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হচ্ছিল। জনগণের ঘৃণ্য শাসন ব্যবস্থা রক্ষার উদ্দেশ্যে ফ্যাসিস্টরা অবাধ প্রচারকার্য চালায় এবং জনগণকে এই বলে মিথ্যা আশা দিতে থাকে যে যুদ্ধ সমাপ্তির পর আমূল সামাজিক পরিবর্তন ঘটানো হবে ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের গণতন্ত্রীকরণ শুরু হবে। সেই সঙ্গে ইতালীয় নয়া-ফ্যাসিস্টরা সর্বপ্রকার অসন্তোষ কঠোর হস্তে দমন করছিল; ফের প্রতিষ্ঠিত হয় জরুরী ট্রিবুন্যাল। মুসোলিনি সেই ফ্যাসিস্ট সর্দারদের উপরও প্রতিশোধ নিতে ভুলে নি যারা জুলাই মাসে বৃহৎ ফ্যাসিস্ট পরিষদে তার বিরোধিতা করেছিল। ভেরোনা শহরে অনুষ্ঠিত বিচারে 'বিশ্বাসঘাতকদের' কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পাঁচজন— এদের মধ্যে মুসোলিনির জামাতা ও প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী চিয়ানোও ছিল — মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

জার্মান-ফ্যাসিস্ট হানাদার আর মুসোলিনির নয়া-ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে ইতালীয় দেশপ্রেমিকরা সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে। ৯ সেপ্টেম্বর তারিখে রোমে গঠিত হয় জাতীয় মুক্তি কমিটি, যা সমস্ত ফ্যাসিস্টবিরোধী দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে। ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলনের প্রধান সংগঠনকারী ও প্রেরণাদায়ক শক্তি ছিল ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টি। তা জনগণকে মিত্র জাতিসমূহের সঙ্গে জার্মান-ফ্যাসিস্ট হানাদারদের বিরুদ্ধে দেশজোড়া সংগ্রামে লিপ্ত হতে আহবান জানায়। কমিউনিস্ট পার্টি নাৎসি অধিকৃত ভূখণ্ডে ব্যাপক সংখ্যক স্থানীয় জাতীয়-মুক্তি পরিষদ ও সশস্ত্র পার্টিজান বাহিনী গঠনের জন্য সক্রিয় কার্যকলাপ চালায়।

উত্তর ও মধ্য ইতালিতে গঠিত হতে থাকে গ্যারিবাল্ডি নামাঙ্কিত পার্টিজান ব্রিগেডগুলো। তাদের অধিনায়ক ছিলেন ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃমণ্ডলীর সদস্য লুইজি লনগো; কমিউনিস্ট সেক্কিয়া ছিলেন কমিসার। 'ন্যায়পরতা ও স্বাধীনতা' নামক পার্টিজান দলগুলোর নেতৃত্বে ছিলেন অ্যাকশন পার্টির অধিনায়ক ফেরুচ্চো পারি। সমস্ত পার্টিজান দোলগুলোর ক্রিয়াকলাপ সমন্বিত করছিল উত্তর ইতালির জাতীয় মুক্তি পরিষদ যাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল পাঁচটি ফ্যাসিস্টবিরোধী পার্টির প্রতিনিধিরা।

দক্ষিণ ইতালিতে প্রতিরোধ আন্দোলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা

ছিল নেপ্‌ল্‌সের সেপ্টেম্বর বিদ্রোহ। এতে অংশগ্রহণ করে প্রাক্তন সামরিক কর্মচারী, শ্রমিক আর বুদ্ধিজীবীরা। 'চার দিন ব্যাপী' কঠোর পথ-লড়াইয়ের পর অভ্যুত্থানকারীরা জার্মান গ্যারিসনকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে।

ইতালির ভূখণ্ডে ইঙ্গো-মার্কিন এবং জার্মান সৈন্যদের মধ্যে লড়াই চলতে থাকে। কিন্তু অধিকতর শক্তিশালী মিত্র বাহিনীগুলো যথেষ্ট সক্রিয় ছিল না। 'সবাই মিত্রদের দ্রুত ও চূড়ান্ত ক্রিয়াকলাপ প্রত্যাশা করছে, কিন্তু তাদের কোন তাড়া নেই। মনে হচ্ছে যে ইঙ্গো-মার্কিন সেনাপতিমণ্ডলী কেবল যুদ্ধ থেকে ইতালির বেরিয়ে যাওয়া এবং সামরিক ও বাণিজ্যিক নৌ-বহরের বেশির ভাগ জাহাজ দখল করা নিয়েই সন্তুষ্ট।'*

ইতালীয় রণাঙ্গনে অপারেশন এক দীর্ঘকালীন ব্যাপারে পরিণত হয়। নাৎসিরা উত্তর ও মধ্য ইতালিকে নিজেদের হাতছাড়া হতে দিল না। ওখানে তাদের কাছে ছিল ২১টি ডিভিশন ও ৩৭০টি প্লেন।

১৩ অক্টোবর বাদোলিয়োর সরকার অবশেষে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন তখন ইতালিকে যুধ্যমান পক্ষ বলে স্বীকার করল। ফ্যাসিস্ট জোট থেকে ইতালির বহির্গমন ও মিত্র জাতিসমূহের সঙ্গে তার মিলন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্যাসিস্ট জার্মানিকে আরও বেশি বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তৃতীয় রাইখ তার প্রধান মিত্রকে হারাল। জার্মানি অভিমুখে ইঙ্গো-মার্কিন ফৌজের চূড়ান্ত অভিযানের জন্য অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে উঠল। কিন্তু মিত্র শক্তিবর্গ পূর্বেকার মতোই দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলতে দেরি করছিল।

৬। ১৯৪৩ সালে প্রশান্ত মহাসাগরে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মিত্র বাহিনীগুলোর সামরিক ক্রিয়াকলাপ

১৯৪৩ সালের গোড়ায় রুজভেল্ট ও চার্চিল সোভিয়েত সরকারকে জানালেন: 'প্রশান্ত মহাসাগরে আমাদের অভিপ্রায় হচ্ছে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে রাবাউল থেকে জাপানীদের বিতাড়িত করা এবং তারপর জাপান অভিমুখে সফল আক্রমণাভিযান চালিয়ে যাওয়া।'**

* কার্শাই এ.। বেখ্‌টেসগাডেনের ডেরা থেকে বার্লিনের বাঙ্কার পর্যন্ত। — মস্কো, ১৯৬৮, পৃঃ ২২৩।

** সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সভাপতির পত্রালাপ, খণ্ড ২। — মস্কো, ১৯৫৭।

জাপানী সেনাপতিমণ্ডলী ১৯৪৩ সালে এশিয়া মহাদেশে নিজের অবস্থান মজবুত করার, প্রশান্ত মহাসাগরে, বিশেষত বাইরের যুদ্ধ-সীমাগুলোতে, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। জাপানের সামরিক নৌ-বাহিনী দূরপ্রাচ্যের জলাঞ্চলে সোভিয়েত জাহাজগুলোর বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন প্ররোচনায় লিপ্ত ছিল; কুয়াণ্টুং বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৯৪২ সালের মতোই জাপানী সমরবাদীরা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল এবং জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীর প্রতীক্ষিত বিপুল সাফল্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত দেশের উপর আক্রমণ আরম্ভ করার পরিকল্পনা গড়ছিল।

১৯৪৩ সালের গ্রীষ্ম কালে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর হামলার জন্য জাপানের প্রস্তুতির বিষয়ে প্রমাণ বহন করেছে টোকিও মোকদ্দমার দলিলাদি। যেমন, কুয়াণ্টুং বাহিনীর কোড বিভাগের প্রাক্তন কর্মী মেজর মাৎসুমুরা কুসুয়ো সাক্ষ্যদান কালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কুয়াণ্টুং বাহিনীর আগ্রাসনের প্রস্তুতির সঙ্গে জড়িত কার্যাদির এরূপ বর্ণনা দিয়েছে: '১৯৪৩ সালের আগস্ট মাসে কুয়াণ্টুং বাহিনীর সদর-দপ্তরের যোগাযোগ বিভাগের অধিকর্তা লেফটেনেণ্ট-কর্নেল তমুরা মোরিও আমায় এবং কোড বিভাগের চিফ মেজর কোবাইয়াসিকে বললেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সামরিক ক্রিয়াকলাপ শুরু হলে আমরা যেন দ্রুত কোড পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত থাকি। লেফটেনেণ্ট-কর্নেল তমুরা আমাদের জানালেন যে কুয়াণ্টুং বাহিনীর সেনাপতিমণ্ডলী প্রধান সদর-দপ্তরের নির্দেশে সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে আচমকা আক্রমণ আরম্ভ করবে যাতে উদ্যোগ ব্যবহার করে গোড়াতেই তার শক্তি বিনষ্ট করে দেওয়া যায়।'*

কুর্স্কের লড়াইয়ের ফলাফল — যে-লড়াইয়ে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী চমৎকার বিজয় লাভ করেছিল — জাপানী সেনাপতিমণ্ডলীকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধানো থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করে। কিন্তু জাপানের তরফ থেকে সম্ভাব্য হুমকি রয়েছে দেখে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ দূর প্রাচ্যে ১২ লক্ষাধিক সৈন্য, ১৩ সহস্রাধিক তোপ ও মর্টার কামান, প্রায় ২,৫০০টি ট্যাঙ্ক এবং ৩ সহস্রাধিক বিমান রাখতে বাধ্য ছিল।

* অক্টোবর বিপ্লবের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় মহাফেজখানা, সূচক ৭৮৬৭, তালিকা ১, নং ১৯৭, পৃঃ ৯-১০।

প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানীরা ১৯৪৩ সালের বসন্ত কালে গৃহীত 'Z' আর 'V' সাঙ্কেতিক নামযুক্ত পরিকল্পনাটি অনুসারে স্ট্র্যাটেজিক প্রতিরক্ষা আরম্ভ করার এবং এই লাইনটি বরাবর তাদের অধিকৃত অবস্থান টিকিয়ে রাখার কথা ভাবছিল: অ্যালিউশিয়ান, ওয়েক, মার্শাল, গিলবার্ট দ্বীপগুলো, বিসমার্ক দ্বীপপুঞ্জ, টিমোর; জাভা, সুমাত্রা, আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপমালা। বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হচ্ছিল দক্ষিণের সমুদ্রসমূহের অঞ্চল এবং কুরিল, ম্যারিয়ানা ও ক্যারোলিন দ্বীপপুঞ্জ দখলে রাখার দিকে।

১৯৪২ সালের শেষ নাগাদ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপসমূহে জাপানের সশস্ত্র বাহিনীতে ছিল ৬০ ডিভিশন সৈন্য, প্রায় ২১০টি যুদ্ধ-জাহাজ (তার মধ্যে ৬টি বিমানবাহী জাহাজ), ৪,৬০০টি বিমান। এই রণাঙ্গনগুলোতে মিত্রদের কাছে, কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডের কাছে, ছিল ৩৫ ডিভিশন সৈন্য, প্রায় ১৭০টি যুদ্ধ-জাহাজ (তার মধ্যে ১০টি বিমানবাহী জাহাজ) ও প্রায় ৩,৫০০টি বিমান।

এই রণাঙ্গনে ব্রিটেন সামরিক ক্রিয়াকলাপ চালাচ্ছিল প্রধানত তার অধিরাজ্য আর উপনিবেশসমূহের সৈন্যদের দিয়ে। যেমন, অস্ট্রেলিয়া পাঠাল ৫ লক্ষ সৈন্যের একটি বাহিনী, আর ভারতীয় বাহিনীগুলোতে ছিল ২০ লক্ষ লোক, যাদের মধ্যে আড়াই লক্ষ লড়ছিল আফ্রিকায় আর মধ্য প্রাচ্যে। পাঁচটি ভারতীয় ডিভিশন জাপানীদের সঙ্গে লড়ছিল বর্মায়, আর বাকীগুলো ট্রেনিং নিচ্ছিল।

১৯৪৩ সালে প্রশান্ত মহাসাগরে অপারেশনগুলোর উদ্দেশ্য ছিল সীমিত। প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরাংশে মিত্ররা অ্যালিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের আত্তু ও কিস্‌কা দ্বীপগুলো দখল করার সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের পরিকল্পনা অনুসারে, প্রথম আত্তু অধিকার করার ও তদ্দ্বারা কিস্‌কা দ্বীপের গ্যারিসনকে সরবরাহ ঘাঁটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার কথা ছিল।

আত্তু দ্বীপ দখল করার দায়িত্ব দেওয়া হয় ৭ম মার্কিন ডিভিশনকে (১১ হাজার সৈন্য), নৌ-বহরের ৮ম অপারেশনেল ফর্ম্যাশনকে (এটা গঠিত হয়েছিল ৩টি পুরনো রণপোত, ১টি এসকোর্ট অ্যায়ারক্রাফট কেরিয়ার, ৬টি ক্রুজার, ১৯টি ডেস্ট্রয়ার ও ৫টি ট্রুপ-কেরিয়ার নিয়ে) এবং ১১শ বিমান বাহিনীকে যাতে ছিল ২৬৩টি প্লেন। প্রথমে ঠিক করা হয় যে অপারেশন আরম্ভ হবে ১ মার্চ, তবে পরে তারিখ বদলিয়ে ৭ মে করা হয়। ১১ মে পর্যন্ত জাহাজগুলো আত্তু দ্বীপের অঞ্চলে চাল চালতে থাকে। খারাপ আবহাওয়ার দরুন জাপানীরা মিত্রদের নৌ-সৈন্যের বিরুদ্ধে

বিমান বাহিনীকে ব্যবহার করতে পারে নি। প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণের পর সৈন্যরা দু'টি জায়গায় অবতরণ করে। ২,৫৭৬ জন লোক নিয়ে গঠিত আত্তু দ্বীপের গ্যারিসনটি আমেরিকানদের কঠোর প্রতিরোধ দেয় এবং প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। ৩০ মে নাগাদ দ্বীপে লড়াই শেষ হয়। মিত্রদের ৩ সহস্রাধিক লোক হতাহত ও অসুস্থ হয়।*

আত্তু দ্বীপের পতন কিস্‌কা দ্বীপের রক্ষকদের নিরুপায় অবস্থায় ফেলছে বুঝতে পেরে জাপানী সেনাপতিমণ্ডলী কিসকার গ্যারিসনকে অপসারণ করার নির্দেশ দিল। ২৯ জুলাই ২টি জাপানী ক্রুজার ও ১০টি ডেস্ট্রয়ার কুয়াশার মধ্যে চুপি চুপি কিস্‌কা খাড়িতে গিয়ে ঢুকে, ৪৫ মিনিটের মধ্যে দ্বীপের গ্যারিসনকে (৫,১০০ লোক) জাহাজে তুলে নেয় এবং বিপক্ষের অলক্ষ্যে ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই পারামুশির দ্বীপে (কুরিল দ্বীপপুঞ্জ) ফিরে আসে।

১৬ আগস্ট, বহু দিন ব্যাপী প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণ ও বোমাবর্ষণের পর, আমেরিকানরা কিস্‌কা দ্বীপে ৩৪ হাজার সৈন্যের একটি অবতরণ বাহিনী নামায় এবং কেবল তখনই তারা আবিষ্কার করল যে দ্বীপটি জাপানীদের দ্বারা পরিত্যক্ত। ১৯৪৩ সালে প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরাংশে সামরিক ক্রিয়াকলাপ এখানেই সমাপ্ত হয়। অ্যালিউশিয়ান অপারেশনের সময় জাপানীরা ৩টি ডুবো জাহাজ হারায়, আর আমেরিকানদের একটি ডেস্ট্রয়ার ও একটি ট্রুপ-ক্যারিয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ ও মধ্য অঞ্চলগুলোতেও মিত্রদের সামরিক ক্রিয়াকলাপের সীমিত চরিত্র ছিল। ওখানে আলাদা আলাদা দ্বীপের জন্য সুদীর্ঘ স্থানীয় লড়াই চলছিল এবং জাপানী গ্যারিসনগুলোর সরবরাহ যোগাযোগ পথে মাঝেমধ্যে নৌ-সৈন্যদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটছিল। মিত্ররা সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, নিউ গিনির দক্ষিণ-পূর্ব অংশ, নিউ ব্রিটেনের পশ্চিমাংশ ও গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জ দখল করে নিতে সক্ষম হল। জাপানের সামনে এই প্রথম বারের মতো প্রশান্ত মহাসাগরে অধিকৃত অবস্থান হারানোর বাস্তব সম্ভাবনা দেখা দিল।

জাপানী যোগাযোগ পথগুলোতে সংগ্রাম চালানোর জন্য মিত্ররা বিমান

* শের্মান ফ.। প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে মার্কিন বিমানবাহী জাহাজগুলো। ইংরেজী থেকে অনুবাদ। — মস্কো, ১৯৫৬, পৃঃ ১১৩, ১১৫।

আর ডুবো জাহাজ ব্যবহার করছিল। কিন্তু বিমান বাহিনীর ব্যবহার সীমিত ছিল, তার ক্রিয়াকলাপের তেমন উল্লেখযোগ্য কোন ফল ছিল না। জাপানীদের পরিবহণ কাজ প্রধানত রাত্রিবেলাই চলত। সেই জন্য আমেরিকানরা তাদের 'বি-২৪' বোমারুগুলোতে ও 'কাটালিনা' নামক ফ্লায়িং বোটগুলোকে র‍্যাডার সজ্জিত করতে লাগল। ১৯৪৩ সালের শেষ দিকে যোগাযোগ পথের সংগ্রামে মাঝেমধ্যে মার্কিন বিমানবাহী জাহাজও ব্যবহৃত হচ্ছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডুবো জাহাজগুলো (১৯৪৩ সালের শেষ দিকে প্রশান্ত মহাসাগরে ওগুলোর সংখ্যা ছিল ১২৩) ক্রমশই তাদের সামরিক ক্রিয়াকলাপের এলাকা বিস্তৃত করছিল: ফেব্রুয়ারি মাসে ওগুলো দেখা দিল পীত সাগরে, আর জুলাই থেকে — জাপান সাগরে। প্রতি মাসে জাপানের সামুদ্রিক যোগাযোগ পথে একই সময়ে সামরিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত থাকত গড়ে ২০টি থেকে ৩০টি মার্কিন ডুবো জাহাজ। ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ওগুলো কর্তব্য পালন করছিল একা একা, আর অক্টোবর থেকে — গ্রুপে গ্রুপে: কাজে বেরত দু'টি দল, প্রতিটিতে তিনটি করে সাবমেরিন।

১৯৪৩ সালে জাপানের বাণিজ্যিক নৌ-বহরের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১৮ লক্ষ ৩ হাজার ব্রুটো-টন, তার মধ্যে এপ্রিল থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ডুবো জাহাজের আক্রমণে যে-ক্ষতি হয়েছিল তার পরিমাণই ছিল ১১ লক্ষ ৩২ হাজার ব্রুটো-টন।

এই ভাবে, প্রশান্ত মহাসাগরে সামরিক ক্রিয়াকলাপের সীমিত চরিত্র সত্ত্বেও কিছুটা পরিবর্তন ঘটছিল মিত্রদের অনুকূলেই। এর দরুন ১৯৪৩ সালের হেমন্তে জাপান সরকারকে চূড়ান্তভাবে স্ট্র্যাটেজিক প্রতিরক্ষা নীতি অনুসরণ করতে হয়।

চীন আর বর্মায়ও সামরিক ক্রিয়াকলাপের সীমিত চরিত্র ছিল। চীনা রণাঙ্গনে জাপানী ফৌজের অপারেশনগুলো সফল হল না। এক বছরের মধ্যে জাপনীরা চীনের মুক্তিপ্রাপ্ত অঞ্চলগুলোর বিরুদ্ধে ১৫০টি পিটুনি অভিযান চালায়, কিন্তু তাতে উদ্দেশ্য হাসিল হয় নি। জার্মান-ফ্যাসিস্ট হানাদারদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর বিজয়ে অনুপ্রাণিত চীনা জনগণ জাপানী আগ্রাসকদের বিরুদ্ধে নিজেদের সংগ্রাম জোরদার করে তুলতে প্রয়াসী ছিল। চীনের ৮ম ও ৪র্থ গণবিপ্লবী বাহিনীগুলো পার্টিজান দলসমূহের সঙ্গে মিলে ৮ কোটি লোক অধ্যুষিত একটি ভূখণ্ড মুক্ত করে।

বর্মায় সামরিক ক্রিয়াকলাপের আয়তন আরও বেশি সীমিত ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর ক্রিয়াকলাপের সরকারী ইতিহাসে ন্যায়সঙ্গতভাবে বলা হচ্ছে: '১৯৪৪ সালের একেবারে জুন মাস পর্যন্ত ব্রহ্মদেশীয় যুদ্ধের ইতিহাস অনেকাংশে ছিল একটির পর একটি রণনৈতিক পরিকল্পনা পরিবর্তনের কাহিনী, তার কারণ আমেরিকান ও ইংরেজরা সম্পূর্ণ বিভিন্ন উদ্দেশ্য অনুসরণ করছিল। ভারতের স্বার্থকে কেউ কোথাও গ্রাহ্যই করছিল না, আর বর্মার ইচ্ছাকে কেউ আমলই দিচ্ছিল না।'*

১৯৪৩ সালের গোড়ায় ইংরেজরা কেবল দু'টি গুরুত্বহীন অভিযান চালায়: জানুয়ারি-মে'তে আরাকান উপকূলে রেইনফোর্সড একটি ডিভিশনের শক্তিতে এবং ফেব্রুয়ারি-এপ্রিলে মধ্য বর্মায় একটি ব্রিগেড দিয়ে। আরাকান অপারেশন সফল হল না। মধ্য বর্মায় ৭৭তম ভারতীয় ব্রিগেড জাপানীদের পশ্চাদ্ভাগে হানা দেয় এবং বেশকিছু আত্মঘাতমূলক ক্রিয়াকলাপ চালায়, কিন্তু অবশেষে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শক্তি হারিয়ে ভারতে প্রত্যাবর্তন করে। ১৯৪৩ সালের মে মাসে বর্মায় বর্ষা শুরু হয়। রণাঙ্গনে পূর্ণ নিস্তব্ধতা নেমে এল। ১৯৪৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধে প্রধানত কাজ করছিল বিমান বাহিনী। জাপানীরা অন্তরীক্ষে আধিপত্য লাভের জন্য সংগ্রাম চালাচ্ছিল। সে সংগ্রাম চলে পুরো শুষ্ক মরশুম। কিন্তু বর্মায় বৃহৎ সামরিক ক্রিয়াকলাপের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও জাপানী সেনাপতিমণ্ডলী এ দেশে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে পারল না। বর্মা রণাঙ্গনের অপারেশনগুলো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পরিস্থিতি পরিবর্তনের উপর বিশেষ কোন প্রভাব ফেলল না।

* Prasad S. and Others. The Reconquest of Burma. V. I. Calcutta, 1958, p. XXV.

পঞ্চম অধ্যায়

চূড়ান্ত বিজয়গুলোর বছর

যুদ্ধের প্রথম আড়াই বছর ধরে লাল ফৌজের আত্মোৎসর্গী সংগ্রাম সোভিয়েত ইউনিয়নের শক্তির পরিচয় দিল এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার অবস্থান সুদৃঢ় করল। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকার এবং ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সবার সংগ্রামে তার অবদানের স্বীকৃতির অভিব্যক্তি ঘটেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের মস্কো সম্মেলনের (১৯৪৩ সালের ১৯-৩০ অক্টোবর) যুদ্ধাবসান ত্বরিতকরণ বিষয়ক সিদ্ধান্তে এবং তেহেরান সম্মেলনে গৃহীত ফ্যাসিস্ট জার্মানির বিরুদ্ধে সম্মিলিত ক্রিয়াকলাপের প্রবলতা বৃদ্ধিকরণ বিষয়ক এবং ১৯৪৪ সালের মে মাসে পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন উদ্বোধন বিষয়ক সিদ্ধান্তে। মস্কো সম্মেলন এবং বিশেষ করে তেহেরান সম্মেলনের (১৯৪৩ সালের ২৮ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত) সিদ্ধান্তসমূহ হিটলারবিরোধী জোট ভাঙনের ফ্যাসিস্ট পরিকল্পনাগুলোর পূর্ণ ব্যর্থতারও প্রমাণ দেয়।

ফ্যাসিস্ট জোটে অবস্থা সুবিধের ছিল না। নিরপেক্ষ দেশসমূহে ফ্যাসিস্ট জার্মানির প্রভাব খুবই কমে গিয়েছিল। ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইতালি হিটলারী জোট থেকে বেরিয়ে পড়ে। তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলোতে — ফিনল্যান্ড, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরিতে — অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুবই জটিল হয়ে উঠে। এই দেশসমূহের ব্যাপক মেহনতী মানুষ কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট জার্মানির স্বপক্ষে যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে পড়ার জন্য সংগ্রাম জোরদার করে তুলছিল।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে অবস্থাও ফ্যাসিস্ট জার্মানির পক্ষে ছিল না। এবং তা ১৯৪৪ সালে তার শিল্প মোটামুটিভাবে সামরিক উৎপন্ন দ্রব্যের সমস্ত প্রধান ক্ষেত্রে উৎপাদনের সর্বোচ্চ সূচকের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও। জুলাই

নাগাদ জার্মানির সামরিক উৎপাদনের মান ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বরের তুলনায় ৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এরূপ বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল সমগ্র জার্মান অর্থনীতির উপর প্রচণ্ড চাপ দেওয়ার ফলে, জার্মানিতে বলপূর্বক তাড়িয়ে নিয়ে আসা বিদেশী শ্রমিকদের নির্মম শোষণের ফলে, অধিকৃত দেশসমূহে নির্লজ্জ লুণ্ঠন চালানোর ফলে।

কিন্তু ফ্যাসিস্ট জার্মানিতে উৎপাদন বৃদ্ধির গতি (চরম রাশিতে) সোভিয়েত ইউনিয়নে উৎপাদন বৃদ্ধির গতির চেয়ে অধিকতর মন্থর ছিল। যেমন, ১৯৪২-১৯৪৪ সালে সোভিয়েত ট্যাঙ্ক শিল্প উৎপাদন করল ৭৭,৭০৮টি ট্যাঙ্ক ও অ্যাসল্ট গান। ঠিক ওই সময়ের মধ্যেই নাৎসি জার্মানিতে উৎপাদিত হয়েছিল ৪৬ হাজার ট্যাঙ্ক ও অ্যাসল্ট গান। ১৯৪২ — ১৯৪৪ সালে জার্মানিতে নির্মিত হয়েছিল ৭৭,৯৭০টি বিমান, আর সোভিয়েত ইউনিয়নে — ৯২,৭৭৫টি। অন্যান্য ধরনের অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রেও জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়নের চেয়ে অনেক পিছিয়ে ছিল। সেই জন্য ১৯৪৪ সালে ফ্যাসিস্ট জার্মানি নিজের বৈষয়িক সম্পদ ও জনবল সমাবেশের ক্ষেত্রে চরম সীমায় পৌঁছলেও যুদ্ধোপকরণে শ্রেষ্ঠতা কিন্তু পুরোপুরিভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের হাতেই ছিল, এবং এ ব্যাপারটি লাল ফৌজের বিজয়ের পথে ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ।

সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনী আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠল। ১৯৪৪ সালের ১ জানুয়ারি নাগাদ তার লোকসংখ্যা ছিল (অভ্যন্তরীণ সামরিক অঞ্চলসমূহ ছাড়া) ৮৫ লক্ষ ৬২ হাজার, যার মধ্যে স্থল বাহিনীতে ছিল — ৭৩ লক্ষ ৩৭ হাজার, বিমান বাহিনীতে — ৫ লক্ষ ৩৬ হাজার, নৌ-বহরে — ৩ লক্ষ ৯১ হাজার, দেশের বিমানবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বাহিনীতে — ২ লক্ষ ৯৮ হাজার। সংগ্রামী সৈন্য বাহিনীতে ছিল ৬৩ লক্ষ ৫৪ হাজার লোক, সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর সদর-দপ্তরের রিজার্ভে — প্রায় ৪ লক্ষ ৮৮ হাজার। বিপুল সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন ছিল সোভিয়েত দূর প্রাচ্যে, ট্রান্স-বৈকাল অঞ্চলে ও ট্রান্স-ককেশাসে।

১৯৪৩ সালের ১ ডিসেম্বর নাগাদ ফ্যাসিস্ট জার্মানিতে ভের্মাখ্‌টের হাতে ছিল ১ কোটি ১ লক্ষ ৬৯ হাজার লোক, যার মধ্যে স্থল বাহিনীতে ছিল ৭০ লক্ষ ৯০ হাজার, বিমান বাহিনীতে — ১৯ লক্ষ ১৯ হাজার, নৌ-বহরে — ৭ লক্ষ ২৬ হাজার, এস-এস বাহিনীতে — ৪ লক্ষ ৩৪ হাজার। সংগ্রামী সৈন্য বাহিনীতে ছিল ৬৬ লক্ষ ৮২ হাজার লোক, আর রিজার্ভ বাহিনীতে — ৩৪ লক্ষ ৮৭ হাজার। ১৯৪৪ সালের গোড়ার দিকে

সংগ্রামী স্থল বাহিনীর দুই-তৃতীয়াংশ শক্তি কেন্দ্রীভূত ছিল সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে: ৬৩% ডিভিশন (১৯৮টি ডিভিশন ও ৬টি ব্রিগেড), ৭১% তোপ ও মর্টার কামান, ৭৩% ট্যাঙ্ক ও অ্যাসল্ট গান। এই রণাঙ্গনে অবস্থিত ছিল জার্মানির মিত্র রাষ্ট্রসমূহের সমস্ত সংগ্রামী ফৌজ -- ৩৮টি ডিভিশন ও ১২টি ব্রিগেড। বাকি ১১৬টি জার্মান ডিভিশন ও ২টি ব্রিগেড মোতায়েন করা হয়েছিল এভাবে: নরওয়েতে — ১৩টি ডিভিশন, ডেনমার্কে — ৬টি, হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সে — ৪৭টি, ইতালিতে — ২১টি, আলবানিয়া, যুগোস্লাভিয়া ও গ্রীসে — ২১টি ডিভিশন ও ১টি ব্রিগেড, ভেরমাখ্টের সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলির (জার্মানি, অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ও পোল্যান্ডে) — ৮টি ডিভিশন ও ১টি ব্রিগেড।

অন্যান্য সমস্ত যুদ্ধরত দেশের সঙ্গে তুলনায় সবচেয়ে অনুকূল পরিস্থিতিতে অবস্থিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি বিকাশের উচ্চ মাত্রায় পৌঁছেছিল। ১৯৪৩ সালে মার্কিন সামরিক শিল্প উৎপাদন করেছিল ৮৫ হাজার ৯০০টি বিমান, ৩৮ হাজার ৫০০টি ট্যাঙ্ক ও অ্যাসল্ট গান, সমস্ত ধরনের ও ক্যালিবরের ২ লক্ষ ২০ হাজার ৯০০টি তোপ, ২৬ হাজার ৮০০টি মর্টার কামান, নির্মাণ করেছিল প্রধান শ্রেণীর ২৬২টি যুদ্ধ-জাহাজ। ১৯৪৩ সালের শেষ দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীতে লোকসংখ্যা ছিল ১ কোটি ৪ লক্ষ ৪০ হাজার, যার মধ্যে ৭৪ লক্ষ ৮২ হাজার ছিল স্থল ও বিমান বাহিনীতে, ২৯ লক্ষ ৫৮ হাজার — নৌ-বহরে ও নৌ-বাহিনীতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর দুই-তৃতীয়াংশ অবস্থিত ছিল দেশের ভূখণ্ডে। মার্কিন বাহিনীর ৯০টি ডিভিশনের মধ্যে কেবল ৩১টি ছিল যুদ্ধক্ষেত্রগুলোতে (ইউরোপে — ১৬টি, উত্তর আফ্রিকায় — ২টি, প্রশান্ত মহাসাগরে ও এশিয়ায় — ১৩টি)।

ইংলণ্ডের সামরিক শিল্প ওই বছরে উৎপাদন করে ২৬ হাজার ৩০০টি বিমান, ৭ হাজার ৫০০টি ট্যাঙ্ক ও অ্যাসল্ট গান, সমস্ত ধরনের ১ লক্ষ ১৮ হাজার ২০০টি তোপ, ১৭ হাজার ১০০টি মর্টার কামান, প্রধান শ্রেণীর ৮৫টি যুদ্ধ-জাহাজ। ১৯৪৩ সালের শেষ দিকে ব্রিটেনের সশস্ত্র বাহিনীতে ছিল ৪৪ লক্ষ ৩৫ হাজার লোক, তার মধ্যে স্থল বাহিনীতে ছিল ২৬ লক্ষ ৮০ হাজার, বিমান বাহিনীতে — ৯ লক্ষ ৯৯ হাজার, নৌ-বহরে — ৭ লক্ষ ৫৬ হাজার। ব্রিটেনের অধিরাজ্য আর উপনিবেশগুলোর সশস্ত্র বাহিনীসমূহও ব্রিটিশ সেনাপতিমণ্ডলীর অধীনে ছিল। ওই সময় ওগুলোতে মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল ৪০ লক্ষাধিক (কানাডার — ৬ লক্ষ ৮০

হাজার, অস্ট্রেলিয়ার — ৬ লক্ষ ৯৫ হাজার, নিউ জিল্যান্ডের — ১ লক্ষ ৩০ হাজার, দক্ষিণ-আফ্রিকীয় ইউনিয়নের — প্রায় ৩ লক্ষ ও ভারতের — ২০ লক্ষ ২৩ হাজার। আফ্রিকার ঔপনিবেশিক বাহিনীসমূহের ছিল ৩ লক্ষ ৫০ সহস্রাধিক লোক)।

ব্রিটিশ সশস্ত্র বাহিনীর অর্ধেকেরও বেশি অবস্থিত ছিল খোদ ইংলণ্ডের ভূখণ্ডে। ব্রিটিশ স্থল বাহিনীর ৩৭টি ডিভিশন ও ২১টি স্বতন্ত্র ব্রিগেডের মধ্যে ২৪টি ডিভিশন ও ৬টি ব্রিগেড অবস্থিত ছিল ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে, ১২টি ডিভিশন ও ১২টি ব্রিগেড — ভূমধ্যসাগরীয় রণাঙ্গনে, ১টি ডিভিশন ও ৩টি ব্রিগেড — ভারতে। ব্রিটিশ সরকার অধিরাজ্য আর উপনিবেশসমূহের সৈন্যদের বড় একটি অংশকে রাখে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে — নিজের অধীন ভূখণ্ডগুলো রক্ষার উদ্দেশ্যে।

জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী কর্তৃক সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে প্রধান শক্তিসমূহ মোতায়েন এটাই প্রমাণ করেছিল যে তাদের জন্য এই রণাঙ্গনটিই ছিল সর্বপ্রধান। সঙ্গে সঙ্গেই ইউরোপে ইঙ্গো-মার্কিন ফৌজের ক্রিয়াকলাপের চরিত্রটি ছিল সীমিত। যেমন, ১৯৪৪ সালের গোড়ার দিকে মিত্রদের (ইংরেজ ও আমেরিকানদের) ১ কোটি ৩৫ লক্ষ সৈন্যের মধ্যে ইতালীয় রণাঙ্গনে নাৎসিদের ২০টি ডিভিশনের বিরুদ্ধে লড়ছিল কেবল ১৬টি ব্রিটিশ ও ৯টি মার্কিন ডিভিশন। এই ভাবে, পশ্চিমী মিত্রদের সশস্ত্র বাহিনীর কেবল অনতিবৃহৎ একটি অংশই ফ্যাসিস্ট জোটের সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে সামরিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত ছিল।

১৯৪৩ সালের শেষ দিকে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে বিদ্যমান অনুকূল পরিস্থিতি ১৯৪৪ সালে সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীকে নিজের দেশের সমগ্র ভূখণ্ড ফ্যাসিস্ট হানাদারদের কবল থেকে মুক্ত করার, শত্রুর ভূখণ্ডে সামরিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ে যাওয়ার এবং নাৎসি দাসত্ব থেকে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের জাতিসমূহকে মুক্তকরণের কাজ আরম্ভ করার সুযোগ দিল। লাল ফৌজের ক্রিয়াকলাপে কী-ই বা আনুকূল্য করছিল?

১৯৪১-১৯৪৩ সালের অভিযানগুলোতে যেখানে সংগ্রাম চলছিল স্ট্র্যাটেজিক উদ্যোগের জন্য, সেখানে ১৯৪৪ সালের অভিযানগুলোতে পূর্ণ স্ট্র্যাটেজিক উদ্যোগ ছিল লাল ফৌজের হাতে এবং তা তাকে বিভিন্ন অভিমুখে ও বিস্তৃত রণাঙ্গনে অনেকগুলো সুসংগঠিত ও পরস্পর সম্পর্কিত আক্রমণাত্মক অপারেশন চালানোর সুযোগ দেয়। এরূপ ক্রিয়াকলাপের ফলে জার্মান সেনাপতিমণ্ডলী তাদের শক্তি ও যুদ্ধোপকরণ বিকেন্দ্রীভূত

করতে, ওগুলোকে অংশে অংশে লড়াইয়ে ঢোকাতে বাধ্য হয় এবং এর দরুন আক্রমণরত সোভিয়েত সৈন্যদের বিরুদ্ধে বড় রকমের কোন পাল্টা-ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে নি।

জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী তাদের যুদ্ধ পরিচালনার পরবর্তী পরিকল্পনাসমূহে হিটলারবিরোধী জোটে ভাঙন ধরানোর আশা পোষণ করছিল। ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মে ও হেমন্তে শোচনীয় পরাজয় সত্ত্বেও নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলী ভাবছিল যে ওই ভাঙন আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত জার্মান বাহিনী সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘকালীন প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম। তদনুযায়ী ১৯৪৪ সালের জন্য জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলীর পরিকল্পনা ছিল সমগ্র সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে অটল আত্মরক্ষায় লিপ্ত হওয়া এবং গভীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও স্বাভাবিক যুদ্ধ-সীমাসমূহের উপর নির্ভর করে অধিকৃত অবস্থানগুলো টিকিয়ে রাখা। সেই সঙ্গে নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলী নীপার নদীর পশ্চিম তীরে সোভিয়েত ফৌজের আক্রমণের পাদভূমিগুলোর বিলোপ ঘটানোর, ক্রিমিয়ায় আটকে-পড়া নিজের গ্রুপিংটির সঙ্গে মিলিত হওয়ার এবং এই ভাবে 'পূর্ব বাঁধ' বরাবর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার কথা ভাবছিল। কিন্তু যুদ্ধ চলাকালে হিটলারবিরোধী জোটে মতভেদ সৃষ্টির উপর হিটলারের ভরসা জার্মান-ফ্যাসিস্ট নেতৃবৃন্দের হঠকারিতারই পরিচয় দেয়। তারা এটা মনে রাখল না যে স্বাধীনতাকামী জাতিসমূহের মৌলিক স্বার্থসমূহের অভিন্নতা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের গঠনমূলক পররাষ্ট্র নীতি যুদ্ধের পর্যায়ে জোটটি টিকিয়ে রাখার সুযোগ দিচ্ছিল। নাৎসিদের পরিকল্পনাটি ত্রুটিযুক্ত এই জন্যও যে তারা আগের মতোই সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনী ও সোভিয়েত যুদ্ধ কৌশলকে খাট করে দেখছিল এবং নিজেদের সৈন্য বাহিনীকে, বিশেষত জার্মান যুদ্ধ কৌশলকে বড় করে দেখছিল।

সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর সাফল্য এবং ইউরোপের জাতিসমূহের ক্রমবর্ধমান মুক্তি সংগ্রামের প্রভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন প্রতীক্ষা নীতি ছেড়ে, গৌণ রণাঙ্গনগুলোতে স্বল্প শক্তি দিয়ে সামরিক ক্রিয়াকলাপ চালানোর নীতি ছেড়ে ইউরোপ, এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরে অধিকতর সক্রিয় লড়াইয়ে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়।

১। সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের পার্শ্বদেশসমূহে জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের পরাজয়।

লেনিনগ্রাদ-নভগরদ অপারেশন

(১৯৪৪ সালের ১৪ জানুয়ারি — ১ মার্চ)

কুর্স্কের লড়াইয়ে এবং নীপারের জন্য লড়াইয়ে জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের পরাজয়ের ফলে ১৯৪৪ সালের গোড়ার দিকে লেনিনগ্রাদ ও নভগরদের উপকণ্ঠে আক্রমণাভিযান চালানোর পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে ওঠে। এই আক্রমণাভিযানের উদ্দেশ্য ছিল — জার্মান বাহিনীসমূহের 'উত্তর' গ্রুপটিকে (১৬শ ও ১৮শ বাহিনীকে) বিধ্বস্ত করা, লেনিনগ্রাদ নগরীর অবরোধ পুরোপুরি তুলে নেওয়া এবং হানাদারদের কবল থেকে লেনিনগ্রাদ জেলাকে মুক্ত করা।

সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর সদর-দপ্তর অপারেশন পরিচালনার দায়িত্ব দেয়: লেনিনগ্রাদ ফ্রন্টের (অধিনায়ক জেনারেল ল. গভোরভ) ২য় আক্রমণকারী বাহিনীকে, ৪২তম ও ৬৭তম বাহিনীকে; ভল্খভ ফ্রন্টের (অধিনায়ক জেনারেল ক. মেরেৎস্কোভ) ৮ম, ৫৪তম ও ৫৯তম বাহিনীকে, ২য় বল্টিক ফ্রন্টের (অধিনায়ক জেনারেল ম. পপোভ) ১ম আক্রমণকারী বাহিনী ও ২২তম বাহিনীকে; বল্টিক নৌ-বহরকে, লাদোগা ও ওনেগা হ্রদের ফ্লোটিল্যা, দূর পাল্লার বিমান বাহিনীকে এবং পার্টিজান বাহিনীকে। সোভিয়েত ফৌজে ছিল ১২ লক্ষ ৫২ হাজার লোক, ২০,১৮৩টি তোপ ও মর্টার কামান, ১,৫৮০টি ট্যাঙ্ক ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গান, ১,৩৮৬টি জঙ্গী বিমান।

সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর পরিকল্পনাটি ছিল এরূপ: অর্ধ-অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদ ও নভগরদ অঞ্চলগুলো থেকে লেনিনগ্রাদ ও ভল্খভ ফ্রন্টের দুটি শক্তিশালী গ্রুপিংয়ের এককালীন আঘাতের সাহায্যে ১৮শ জার্মান বাহিনীর পার্শ্ববর্তী গ্রুপিংগুলোকে বিধ্বস্ত করা এবং কিন্গিসেপ ও লুগা শহর অভিমুখে আক্রমণাভিযান চালিয়ে তার প্রধান শক্তিসমূহকে বিধ্বস্তকরণের কাজ সমাপ্ত করা ও লুগা নদীর যুদ্ধ-সীমায় পৌঁছা। পরে এই সমস্ত ফ্রন্টের সৈন্যদের কাজ ছিল নার্ভা ও পস্কভ অভিমুখে আক্রমণাভিযান চালানো, ২য় বল্টিক ফ্রন্টের সঙ্গে সহযোগিতায় শত্রুর ১৬শ বাহিনীকে পরাস্ত করা এবং লেনিনগ্রাদ জেলাকে সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত করা।

জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল খুবই দৃঢ়। তাতে

ছিল মাইন ক্ষেত্র আর কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে আচ্ছাদিত ফেরোকংক্রিটের এবং কাঠ ও মাটির গুলিবর্ষণ কেন্দ্রগুলো। ফ্যাসিস্টদের কাছে বৃহৎ ক্যালিবরের বিপুল সংখ্যক কামানও ছিল যেগুলো দিয়ে তারা লেনিনগ্রাদের উপর গোলাবর্ষণ করছিল। জার্মান বাহিনীসমূহের 'উত্তর' গ্রুপটিতে (অধিনায়ক জেনারেল-ফিল্ডমার্শাল গ. কিউখলের, জানুয়ারির শেষ দিক থেকে — করনেল-জেনারেল গ. লিণ্ডেমান) ছিল ৭ লক্ষ ৪১ হাজার লোক, ১০,০৭০টি তোপ ও মর্টার কামান, ৩৮৫টি ট্যাঙ্ক ও অ্যাসল্ট গান, ৩৭০টি বিমান। সোভিয়েত সৈন্যরা শত্রুকে জনবলে ১·৭ গুণ, আর্টিলারিতে ২ গুণ, ট্যাঙ্ক ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গানে ৪·১ গুণ ও জঙ্গী বিমানে ৩·৭ গুণ ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

অপারেশনের প্রস্তুতি পর্বে সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী ফ্রণ্টগুলোর ভেতরে পুনর্বিন্যাসের কাজ সম্পাদন করেন। বল্টিক নৌ-বহর ১৯৪৩ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৪৪ সালের জানুয়ারির মধ্যে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম সহ ২য় আক্রমণকারী বাহিনীটিকে ওরানিয়েনবাউম পাদভূমিতে নিয়ে যায়।

সামরিক ক্রিয়াকলাপের চরিত্র বিচার করলে লেনিনগ্রাদ-নভগরদ অপারেশনকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্যায়ে (১৪-৩০ জানুয়ারি) লেনিনগ্রাদ ফ্রণ্টের সৈন্যরা বল্টিক নৌ-বহরের সহায়তায় শত্রুর দীর্ঘকালীন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করে তার ক্রাস্নোয়ে সেলো-রপ্‌শা গ্রুপিংটিকে বিধ্বস্ত করে দেয় এবং ৩০ জানুয়ারি তারিখে লুগা নদীর তীরে শত্রুর আগে থেকে প্রস্তুত প্রতিরক্ষা লাইনে পেণছে যায়। ওই সময় ভল্‌খভ ফ্রণ্টের সৈন্যরা শত্রুর নভগরদ গ্রুপিংটিকে বিধ্বস্ত করে নভগরদ শহরটি করায়ত্ত করে নেয় এবং লুগা শহরের অভিমুখে আক্রমণাভিযান আরম্ভ করে। উভয় ফ্রণ্টের প্রয়াসে মস্কোর সঙ্গে লেনিনগ্রাদকে সংযুক্তকারী রেলপথটি শত্রুমুক্ত করা হয়। ২য় বল্টিক ফ্রণ্ট তার সক্রিয় ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে শত্রুর ১৬শ বাহিনীটিকে অচল করে দিয়ে তাকে লেনিনগ্রাদ ও নভগরদের উপকণ্ঠে প্রেরিত হতে দেয় নি।

অপারেশনের দ্বিতীয় পর্যায়ে (৩১ জানুয়ারি-১৫ ফেব্রুয়ারি) লেনিনগ্রাদ ফ্রণ্ট তার প্রয়াস নিয়োগ করে পশ্চিমাভিমুখে, কিন্‌গিসেপের দিকে, আর শক্তির একাংশ দিয়ে আঘাত হানে লুগা অভিমুখে। ভল্‌খভ ফ্রণ্ট তার প্রধান আঘাত হানে লুগা শহরের দক্ষিণ-পূর্ব পাশ দিয়ে। ১৬ ফেব্রুয়ারি সোভিয়েত সৈন্যরা লুগা প্রতিরোধ কেন্দ্রটি দখল করে নিয়ে

সোভিয়েত এস্তোনিয়ার মাটিতে পা দেয় এবং পস্কভ অভিমুখে আক্রমণাভিযান আরম্ভ করে।

তৃতীয় পর্যায়ে (১৬ ফেব্রুয়ারি-১ মার্চ) লেনিনগ্রাদ ফ্রন্টের সৈন্যরা ২য় বল্টিক ফ্রন্টের সঙ্গে (আক্রমণাভিযানের এলাকা হ্রাস পাওয়ার দরুন ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে ভল্‌খভ ফ্রন্টটি ভেঙে দেওয়া হয়, আর তার ফৌজকে লেনিনগ্রাদ ও ২য় বল্টিক ফ্রন্টের অধীনস্থ করা হয়) ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় লিপ্ত হয়ে আক্রমণাভিযান চালিয়ে জার্মানদের ১৮শ বাহিনীকে পুরোপুরিভাবে এবং ১৬শ বাহিনীর বড় একটি অংশকে বিধ্বস্ত করে দিয়ে পস্কভ-ওস্ত্রভ্ সুদৃঢ় অঞ্চলে এবং তার দক্ষিণে নভোর্জেভ ও পুস্তোশ্‌কা যুদ্ধ-সীমায় পৌঁছে যায়। শত্রুকে লেনিনগ্রাদ থেকে ২২০-২৮০ কিলোমিটার দূরে হটিয়ে দেওয়া হয়।

লেনিনগ্রাদ-নভগরদ অপারেশনের ফলে শত্রুর ২০টিরও বেশি ডিভিশন বিধ্বস্ত হয়, লেনিনগ্রাদের অবরোধের পূর্ণ অবসান ঘটানো হয়, লেনিনগ্রাদ জেলার প্রায় পুরোটা ও কালিনিন জেলার একাংশ মুক্ত হয়। কারেলীয় যোজকে এবং বল্টিক উপকূলে শত্রুকে পরাস্ত করার জন্য অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে তোলা হয়। লেনিনগ্রাদের উপকণ্ঠে সোভিয়েত সৈন্যদের অর্জিত বিজয়ের তাৎপর্য ছিল কেবল লেনিনগ্রাদের জন্যই নয়, নাৎসি হানাদারদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের সমগ্র সংগ্রামের জন্যও।

এই বিজয় বিদেশেও বিপুল সাড়া জাগায়। ব্রিটিশ সংবাদপত্র 'স্টার' ওই দিনগুলোতে লিখেছিল: 'সমস্ত স্বাধীন জাতি ও নাৎসিদের দ্বারা দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ সমস্ত পরাধীন জাতি বুঝতে পারছে লেনিনগ্রাদের নিকটে জার্মানদের পরাজয় নাৎসি পরাক্রম হ্রাসকরণের জন্য কীরূপ ভূমিকা পালন করেছে। লেনিনগ্রাদ অনেক আগেই বর্তমান যুদ্ধের বীর নগরীসমূহের মধ্যে নিজের যোগ্য আসন অধিকার করে নিয়েছে। লেনিনগ্রাদের উপকণ্ঠের লড়াই জার্মানদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। তা তাদের বুঝতে দিল যে তারা হচ্ছে প্যারিস, ব্রাসেল্‌স, অ্যামস্টার্ডাম, ওয়ার্শো ও ওস্‌লোর স্রেফ সাময়িক মালিক।'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট ১৯৪৪ সালের মে মাসে তাঁর দেশের জনগণের তরফ থেকে লেনিনগ্রাদকে বিশেষ একটি প্রশংসাপত্র প্রেরণ করেন 'তার বীর যোদ্ধাদের, তার বিশ্বস্ত নরনারী আর শিশুদের স্মৃতিতে যারা আপন জনগণের বাকী অংশ থেকে দখলদারদের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়েও... সাফল্যের সঙ্গে নিজেদের প্রিয় নগরীটি রক্ষা

করছিল... এবং তদ্দ্বারা সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়নের জাতিসমূহের অদম্য মনোবলের পরিচয় দিচ্ছিল...'*

লেনিনগ্রাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চলে ৯০০টি দিন ও রাত। নাৎসিরা অনাহার অবরোধ, বর্বরোচিত বোমাবর্ষণ ও গোলাবর্ষণের দ্বারা শহরবাসীদের মেরে ফেলতে চেয়েছিল। তারা লেনিনগ্রাদের উপর ফেলেছিল ১ লক্ষ ৭ সহস্রাধিক উগ্র বিস্ফোরক বোমা আর আগুনে বোমা, দেড় লক্ষ গোলা। কিন্তু লেনিনগ্রাদবাসীরা সমগ্র দেশের সহায়তায় সমস্তকিছু সইতে ও বিজয়ী হতে সক্ষম হয়। তাদের দৃঢ়তা ও বীরত্ব সোভিয়েত মানুষের, সোভিয়েত সৈনিক ও নাবিকদের উচ্চ মনোবলের, সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমির প্রতি তাদের আনুগত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহন করে। অনাহারের মধ্যে, গোলা ও বোমাবর্ষণের ফলে লক্ষ লক্ষ লেনিনগ্রাদবাসীর মৃত্যু চিরকাল ফ্যাসিজমের এক মহাপরাধ বলে গণ্য হবে।

লেনিনগ্রাদ-নভগরদ অপারেশনের সময় বনাকীর্ণ ও জলাময় অঞ্চল এবং নম্র শীতের পরিবেশে শত্রুর দীর্ঘকালীন সুদৃঢ় ও গভীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করা হয়েছিল। আঘাত হানা হচ্ছিল অর্ধ-অবরুদ্ধ শহর এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী ব্রিজ-হেড থেকে। এই অপারেশনে শিক্ষাপ্রদ হচ্ছে অভিন্ন স্ট্র্যাটেজিক কর্তব্য পালনরত ফ্রণ্টগুলো, নৌ-বহর আর পার্টিজানদের মধ্যে নিখুঁত পারস্পরিক সহযোগিতা সংগঠন। নৌ-বহর সৈন্য অস্ত্রশস্ত্র আর সামরিক প্রযুক্তি পরিবহণ করছিল এবং বাহিনীর আক্রমণাভিযানের সময় তোপ দেগে সহায়তা করছিল। পার্টিজানরা বাহিনীসমূহের সদর-দপ্তরগুলোর পরিকল্পনা অনুসারে শত্রুর যোগাযোগ ব্যবস্থা বিনষ্ট করছিল, তার প্রশাসন সংস্থা, গুদাম ইত্যাদি ধ্বংস করছিল। অপারেশনের সাফল্যে সহায়তা করে ফ্রণ্টসমূহের প্রধান আঘাতের অভিমুখে শক্তিশালী গ্রুপিং গঠন, গভীর সৈন্যবিন্যাস, দ্বিতীয় এশিলনগুলোর সুনিপুণ ব্যবহার এবং নিরবচ্ছিন্ন সৈন্য পরিচালনা।

নীপারের ডান তীরস্থ ইউক্রেনে জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীর পরাজয় (১৯৪৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর — ১৯৪৪ সালের ১৭ এপ্রিল)

এই স্ট্র্যাটেজিক আক্রমণাত্মক অপারেশনটি পরিচালিত হয় ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ইউক্রেনীয় ও ২য় বেলোরুশ ফ্রণ্টসমূহের সৈন্যদের দ্বারা। এর

* দু'বার অর্ডার প্রাপ্ত লেনিনগ্রাদ। — লেনিনগ্রাদ, ১৯৪৫, পৃঃ ৩৯।

উদ্দেশ্য ছিল — জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীর (১০০টি ডিভিশন বিশিষ্ট 'দক্ষিণ' ও 'A' গ্রুপগুলোর) স্ট্র্যাটেজিক ফ্রন্টের দক্ষিণ পার্শ্ব বিধ্বস্ত করা, নীপারের ডান তীরস্থ ইউক্রেন মুক্ত করা এবং বলকান উপদ্বীপ আর পোল্যাণ্ড অভিমুখে আক্রমণাভিযানের জন্য অনুকূল পরিবেশ গড়া।

সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলীর পরিকল্পনাটি ছিল এরূপ: প্রথমে পার্শ্বগুলোতে ও কেন্দ্রস্থলে (লুৎস্ক, রোভনো, কর্সুন-শেভচেংকভস্কি, ক্রিভয় রোগ ও নিকোপল অঞ্চলে) শত্রুকে পরাস্ত করা এবং সোভিয়েত বাহিনীর দিকে মুখ-করে-থাকা উদ্‌গতাংশগুলো বিলোপ করা, আর তারপর প্রবল আঘাত হেনে ডান তীরস্থ ইউক্রেনে জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের সমগ্র প্রতিরক্ষা লাইন ছিন্ন করা এবং ফ্যাসিস্ট সৈন্যদের অংশে অংশে ধ্বংস করা।

ডান তীরস্থ ইউক্রেনে সংগ্রামরত শত্রুসৈন্যের সংখ্যা ছিল ১৮ লক্ষ। তাদের কাছে ছিল ১৬,৮০০টি তোপ ও মর্টার কামান, ২,২০০টি ট্যাঙ্ক ও অ্যাসল্ট গান, ১,৪৬০টি বিমান। সোভিয়েত বাহিনীতে ছিল ২২ লক্ষাধিক লোক, ২৮,৬৫৪টি তোপ ও মর্টার কামান, ২,০১৫টি ট্যাঙ্ক ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গান, ২,৬০০টি জঙ্গী বিমান। শক্তির অনুপাত ছিল সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর অনুকূলে: জনবলে — ১·৩ গুণ, আর্টিলারিতে — ১·৭ গুণ, বিমানে — ১·৮ গুণ। কেবল ট্যাঙ্কেই সোভিয়েত সৈন্যরা শত্রুর থেকে সামান্য পিছিয়ে ছিল।

এই স্ট্র্যাটেজিক দিকটিতে সোভিয়েত সৈন্যদের আক্রমণাভিযানের প্রস্তুতির একাধিক বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমত, এ প্রস্তুতি চলছিল অতি জটিল পরিস্থিতিতে, যখন সোভিয়েত ইউনিট আর ফর্ম্যাশনগুলো নীপার তীরে অধিকৃত ব্রিজ-হেডগুলো প্রসারণের জন্য কঠোর লড়াইয়ে লিপ্ত ছিল, আর ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের প্রধান শক্তিসমূহ কিয়েভ অভিমুখে শত্রুর প্রবল প্রতিঘাত প্রতিহত করছিল। দ্বিতীয়ত, সৈন্যদের প্রস্তুতি চলছিল বসন্তের গোড়াতে, জলকাদা আর পথাভাবের পরিস্থিতিতে। গোলন্দাজ বাহিনীকে সহায়তা দানের জন্য ইনফেন্ট্রি আর ইঞ্জিনিয়রিং সাব-ইউনিটসমূহ থেকে লোক নিয়ে ইউনিট আর ফর্ম্যাশনগুলোতে বিশেষ বিশেষ দল গঠন করা হয়। আর্মি আর ডিভিশনের গোদামগুলোকে যথাসম্ভব সৈন্যদের কাছাকাছি স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

তৃতীয়ত, অপারেশনগুলোর প্রস্তুতি সমাপ্ত হয় অল্প সময়ের মধ্যে। এ উদ্দেশ্যে সৈন্য পুনর্বিন্যাসের ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও জানানোর কাজে সময় বাঁচানো হয়, আগে থেকেই মূল অঞ্চলে ইঞ্জিনিয়রিং কাজকর্ম সম্পন্ন করা

হয় এবং পরিচালন কেন্দ্রগুলোকে সৈন্যদের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া হয়।

বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হচ্ছিল যোদ্ধাদের নৈতিক-মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতির দিকে, কারণ ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্ম থেকে ফ্রন্টসমূহের সৈন্যরা প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে কঠোর আক্রমণাত্মক লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। এ ছাড়া মুক্ত অঞ্চলসমূহ থেকে বাহিনীতে মনোনীত বিপুল সংখ্যক নতুন সৈন্যের সামরিক ট্রেনিং আর রাজনৈতিক শিক্ষার দিকেও গভীর মনোযোগ দেওয়া হচ্ছিল।

ডান তীরস্থ ইউক্রেনে স্ট্র্যাটেজিক অপারেশন পরিচালিত হয়েছিল দুটি ধাপে। প্রথম ধাপে — শীতকালে (১৯৪৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর — ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ) — ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের (অধিনায়ক জেনারেল ন. ভাতুতিন) সৈন্যরা গোড়াতে জিতোমির শহরের নিকটে পাল্টা-আক্রমণ চালায়, এবং এর ফলে কর্সুন-শেভচেংকভস্কি উদ্‌গতাংশে নাৎসিদের ঘিরে ফেলার পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে ওঠে। তারপর ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের (অধিনায়ক জেনারেল ই. কনেভ) সৈন্যরা ৫ থেকে ১৬ জানুয়ারির মধ্যে কিরোভোগ্রাদ অপারেশন চালিয়ে কিরোভোগ্রাদ শহরটি মুক্ত করে।

১ম ও ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সৈন্যরা ২৪ জানুয়ারি থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কর্সুন-শেভচেংকভস্কি অঞ্চলে শত্রুর বৃহৎ একটি গ্রুপিংকে পরিবেষ্টন ও ধ্বংসকরণের অপারেশনটি সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করে। এখানে শত্রুর কাছে ছিল ১০টি ডিভিশন ও ১টি মোটোরাইজ্‌ড ব্রিগেড। এই সৈন্যদের থেকে অনতিদূরে, উমান ও কিরোভোগ্রাদ অঞ্চলে অবস্থিত ছিল শত্রুর আরও ৮টি ট্যাঙ্ক ডিভিশন।

দ্রুত নাৎসিদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে সোভিয়েত সৈন্যরা ২৮ জানুয়ারি দিনের শেষ দিকে শত্রুর ৯০ হাজার সৈন্যের একটি গ্রুপিংয়ের পরিবেষ্টন সম্পন্ন করে। নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলী ঠিক করল যেকোন উপায়ে অবরুদ্ধ গ্রুপিংটিকে মুক্ত করতে হবে। ফেব্রুয়ারির গোড়ায় পরিবেষ্টন লাইনের বহির্ভাগে কঠোর লড়াই আরম্ভ হয়। ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সোভিয়েত ট্যাঙ্ক ও ইনফ্যান্ট্রি বাহিনীগুলো জার্মানদের বড় বড় ট্যাঙ্ক শক্তির প্রবল প্রতিঘাত প্রতিহত করে, শত্রুর ট্যাঙ্ক গ্রুপিংকে নাস্তানাবুদ ও শক্তিহীন করে দেয় এবং প্রাথমিক অবস্থান স্থলে হটে গিয়ে প্রতিরক্ষায় লিপ্ত হতে বাধ্য করে।

পরিবেষ্টন লাইনের অভ্যন্তর ভাগে সোভিয়েত সৈন্যরা আক্রমণাত্মক



নকশা ১০। দক্ষিণ তীরস্থ ইউক্রেন এবং ক্রিমিয়ার মুক্তি (১৯৪৪-এর জানুয়ারি-মে)

ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে শত্রুর শক্তিগুলোকে বিচ্ছিন্ন ও অংশে অংশে ধ্বংস করতে থাকে। ১৪ ফেব্রুয়ারি মুক্ত হয় কর্সুন-শেভচেঙ্কভস্কি, আর ১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে জার্মানদের অবরুদ্ধ গ্রুপিংটি প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। কর্সুন-শেভচেঙ্কভস্কির 'অগ্নিকুণ্ডে' শত্রুর সব মিলিয়ে ৫৫ হাজার লোক নিহত হয়, ১৮ সহস্রাধিক সৈন্য বন্দী হয়, বিপুল পরিমাণ সামরিক প্রযুক্তি বিনষ্ট হয়। সোভিয়েত সৈন্যরা আরও ১৫টি শত্রু ডিভিশনকে — তার মধ্যে ৮টি ট্যাঙ্ক ডিভিশন ছিল — পরাস্ত করে। এ ছিল নীপার তীরের প্রকৃত স্তালিনগ্রাদ। নিজ সৈন্যদের যুদ্ধক্ষমতার লোপ দেখে ১ম জার্মান-ফ্যাসিস্ট ট্যাঙ্ক বাহিনীর সেনাপতিমণ্ডলী রিপোর্ট দিয়েছিল: 'এটা মনে রাখা উচিত যে ২৮ জানুয়ারি থেকে পরিবেষ্টনের মধ্যে অবস্থানরত এই সৈন্যরা সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে নিজেদের সামনে স্তালিনগ্রাদের অদৃষ্ট দেখতে পেয়েছিল।' এর পরে তাতে বলা হয়েছিল যে 'কেবল অল্প লোকই একাধিক বার এরূপ অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে।'*

কর্সুন-শেভচেঙ্কভস্কি অপারেশনের সময় সোভিয়েত সৈন্যরা অল্প সময়ে এবং বসন্তের জলকাদার মধ্যে শত্রুর বৃহৎ গ্রুপিং পরিবেষ্টনের কাজে উচ্চ দক্ষতার পরিচয় দিল। এখানকার রণকৌশলে নতুনত্ব ছিল — পরিবেষ্টন লাইনের বহির্ভাগে শত্রুর প্রবল প্রতিঘাত প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে ইনফেন্ট্রি কোরগুলো দিয়ে দৃঢ়ীকৃত ট্যাঙ্ক বাহিনীসমূহ ব্যবহার।

কর্সুন-শেভচেঙ্কভস্কি অপারেশনের সঙ্গে সঙ্গে একই সময়ে পরিচালিত হয় লুৎস্ক-রোভনো এবং নিকোপল-ক্রিভয় রোগ অপারেশনগুলো।

লুৎস্ক-রোভনো অপারেশনটি পরিচালিত হয় ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের ডান পার্শ্বের সৈন্যদের দ্বারা — ২৭ জানুয়ারি থেকে ১১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। দক্ষিণ পোলেসিয়ের বনাকীর্ণ-জলাময় অঞ্চল এবং শত্রুর অখণ্ড প্রতিরক্ষা লাইনের অনুপস্থিতি সোভিয়েত সৈন্যদের সামরিক প্রস্তুতিকে ও সামরিক ক্রিয়াকলাপের চরিত্রকে প্রভাবিত করে। অপারেশনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয় অতি অল্প সময়ে (মাত্র তিন দিনের) মধ্যে। শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করা হয় বিমান বাহিনীর সমর্থন ছাড়া এবং কম সংখ্যক তোপের সাহায্যে, — রণাঙ্গনের ১ কিলোমিটারে প্রায় ২০টি তোপ ও মর্টার কামান ছিল। এই অপারেশনে বৃহৎ ভূমিকা পালন করে ১ম ও ৬ষ্ঠ অশ্বারোহী কোরগুলো। তারা শত্রুকে বিস্মিত করে দিয়ে সার্নি অঞ্চল থেকে ঘোরানো পথে হঠাৎ

লুৎস্কে এসে পৌঁছয়, শহরটি অধিকার করে নেয় এবং কভেলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করে দেয়। লুৎস্ক-রোভনো অপারেশনের ফলে ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের ডান পার্শ্বের সৈন্যরা লুৎস্ক, দুবনো, ইয়ামপোল ও শেপেতভ্কা যুদ্ধ-সীমায় পৌঁছে যায় এবং পশ্চিম ইউক্রেনে জার্মানদের সমগ্র গ্রুপিংয়ের সঙ্গে তুলনায় অধিকতর সুবিধাজনক অবস্থান দখল করে নেয়। সোভিয়েত সৈন্যদের বিপুল সহায়তা দেয় পার্টিজানরা। কেবল ১৫ জানুয়ারি থেকে ৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই তারা ধ্বংস করে ৭ সহস্রাধিক জার্মান সৈনিক ও অফিসারকে, এ ছাড়া তাদের হাতে ধ্বংস হয় ৯টি নাৎসি বিমান, ৬২টি ট্যাঙ্ক এবং শত্রুর অন্যান্য সামরিক প্রযুক্তি। লুৎস্ক-রোভনো অপারেশন সম্পন্ন হওয়ার ফলে জার্মান সেনাপতিমণ্ডলী কর্সুন-শেভচেঙ্কভস্কি গ্রুপিংকে দৃঢ়করণের জন্য তার ৪র্থ ট্যাঙ্ক বাহিনীটিকে ব্যবহার করতে পারে নি। এতে উক্ত গ্রুপিংটিকে বিধ্বস্ত করার কাজের জটিলতা অনেক সহজ হয়।

নিকোপল-ক্রিভয় রোগ অপারেশন পরিচালিত হয় ৪র্থ ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সৈন্যদের সহায়তায় ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের ফৌজের দ্বারা — ৩০ জানুয়ারি থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। প্রথমে শত্রুকে ছত্রভঙ্গ করার উদ্দেশ্য, আপোস্তলভো অভিমুখে ৪৬তম ও ৮ম রক্ষী বাহিনীগুলোর পার্শ্ববর্তী ফৌজসমূহ প্রধান আঘাত হানছিল আর তারপর ৪র্থ ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সঙ্গে সহযোগিতায় শত্রুর নিকোপল গ্রুপিংটিকে অবরোধ ও ধ্বংস করার উদ্দেশ্য ছিল। এই অপারেশনের সময় সোভিয়েত সৈন্যরা একই সঙ্গে ছ'টি এলাকায় আক্রমণাভিযান চালায়, এবং তা বিস্তৃত রণাঙ্গনে শত্রুকে অচল করে দেয় ও প্রধান আঘাতের অভিমুখ সম্পর্কে তার মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। কিন্তু জলকাদা ও পথাভাবের পরিস্থিতিতে সামরিক ক্রিয়াকলাপের জন্য সৈন্যদের যথেষ্ট প্রস্তুতি না থাকায় আক্রমণাভিযানের গতি হ্রাস পায় (দিনে ৪ কিলোমিটার) এবং আর্টিলারি আর সরবরাহ ব্যবস্থা পিছিয়ে পড়ে। শত্রুর নিকোপল গ্রুপিংটিকে পরিবেষ্টন ও ধ্বংস করতে না পারার পেছনে এটাই ছিল প্রধান কারণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও সোভিয়েত সৈন্যরা নীপার তীরে শত্রুর একটি পাদভূমির বিলোপ ঘটাতে এবং ইউক্রেনের গুরুত্বপূর্ণ শিল্প কেন্দ্র ক্রিভয় রোগ আর নিকোপল মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিল।

ডান তীরস্থ ইউক্রেনের জন্য সংগ্রামের প্রথম ধাপে লাল ফৌজ অর্জিত বিজয়ের ফলে দক্ষিণে শত্রুর চূড়ান্ত পরাজয়ের জন্য এবং ডান তীরস্থ

ইউক্রেনের পূর্ণ মুক্তির জন্য অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে উঠে। জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল বিপুল এবং তা ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ে: ৪০ টিরও বেশি ডিভিশন একেবারে জীর্ণ হয়ে যায় আর ১৬-১৭টি ডিভিশন সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়।

দ্বিতীয় ধাপে — বসন্ত কালে (১৯৪৪ সালের ৪ মার্চ — ১৭ এপ্রিল) — প্রায় একই সঙ্গে সমগ্র ডান তীরস্থ ইউক্রেন জুড়ে সোভিয়েত সৈন্যদের আক্রমণাভিযান আরম্ভ হয়। ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের (জেনারেল ন. ভাতুতিন নিহত হলে ১ মার্চ থেকে অধিনায়ক নিযুক্ত হন মার্শাল গেওর্গি জুকোভ) সৈন্যরা ৪ মার্চ থেকে ১৭ এপ্রিলের মধ্যে প্রস্কুরোভ-চের্নোভ্‌সি অপারেশনটি সম্পন্ন করে। প্রথম দিনেই তারা শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে, ৭-১১ মার্চ তারিখে তার্নোপল-প্রস্কুরোভ যুদ্ধ-সীমায় পৌঁছে যায় এবং শত্রুর প্রবল প্রতিঘাত প্রতিহত করে, আর মার্চের শেষে ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের সহায়তায় কামেনেৎস-পদোলস্ক শহরের উত্তরে শত্রুর ২০ ডিভিশন সৈন্যের বৃহৎ একটি গ্রুপিংকে ঘিরে ফেলে। কিন্তু বসন্তের জলকাদা সৃষ্ট অতি জটিল পরিস্থিতিতে সৈন্যরা যথা সময়ে সুদৃঢ় অভ্যন্তরীণ ও বহির্দিকস্থ পরিবেষ্টন লাইনগুলো গড়তে পারে নি, যার ফলে শত্রুর বিপুল সংখ্যক সৈন্য বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে পড়তে সমর্থ হয়েছিল। ১৭ এপ্রিল ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের সৈন্যরা কার্পেথিয়া পর্বতের পাদদেশে পৌঁছে যায় এবং জার্মানদের স্ট্র্যাটেজিক ফ্রণ্টকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দেয়।

২য় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের সৈন্যরা ৫ মার্চ থেকে ৬ এপ্রিল পর্যন্ত উমান-বতোশানি অপারেশনে ব্যাপৃত ছিল। প্রথম দিনেই শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহ বিদ্ধ হয়ে যায়। পরে দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখে আঘাত চালিয়ে সোভিয়েত সৈন্যরা নিস্টার নদী অতিক্রম করে, বিস্তৃত রণাঙ্গনে সীমান্তবর্তী নদী প্রুতের তীরে পৌঁছে এবং গতিতে থেকে নদীটা পেরিয়ে রুমানিয়ার মাটিতে পা দেয়।

৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের সৈন্যদের দ্বারা পরিচালিত বেরেজনেগোভাতয়ে-স্নিগিরেভকা অপারেশনে (৬-১৮ মার্চ) ৬ষ্ঠ জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীর বহু শক্তি বিধ্বস্ত হয়। কিন্তু তখন শত্রু বাহিনীকে ঘেরা ও ধ্বংস করার সম্ভাবনা হাতছাড়া হয়ে যায়। এর কারণটি ছিল এই যে জেনারেল প্লিয়েভের অশ্বারোহী-মেকানাইজ্‌ড গ্রুপটি বাশতান্‌কা অঞ্চল থেকে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হওয়ার ও নিকোলায়েভ দখল করার পরিবর্তে জার্মানদের ৭৯তম

ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। এর ফলে অনেক সময় নষ্ট হয়, এবং পরিকল্পিত পরিবেষ্টনের এলাকা থেকে শত্রু তার প্রধান শক্তিসমূহকে সরিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

ওদেসা অপারেশনের (১৮ মার্চ-১২ এপ্রিল) সময় ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের অশ্বারোহী ও ট্যাংক ফর্ম্যাশনগুলোর ক্রিয়াকলাপ চলছিল দ্রুত গতিতে। রাজদেলনায়া শহরটি অধিকার করে নেওয়ার পর তারা শত্রুর ওদেসা গ্রুপিংটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দেয়, আর তারপর দক্ষিণ দিকে ঘুরে উপকূল বরাবর ওদেসা অভিমুখে পশ্চাদপসরণরত জার্মান গ্রুপিংয়ের পশ্চাদ্ভাগে গিয়ে হানা দেয়, এবং ফ্রন্ট দিক থেকে যুদ্ধরত ফর্ম্যাশনগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা করে ১০ এপ্রিল শহরটি দখল করে নেয়।

এই অপারেশনের ফলে মুক্ত হয় কৃষ্ণ সাগর তীরের বড় বন্দর — ওদেসা, আর সোভিয়েত সৈন্যরা নিস্টার নদী পেঁছে যায় এবং বেন্দেরি শহরের দক্ষিণে গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্রিজ-হেড অধিকার করে নেয়।

ডান তীরস্থ ইউক্রেনে সোভিয়েত ফৌজের বিজয়ের বিপুল রাজনৈতিক ও রণনৈতিক তাৎপর্য ছিল। সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী ক্রিভয় রোগের ধাতু শিল্প ও লৌহ আকরিক সমৃদ্ধ, নিকোপলের ম্যাঙ্গানিজ আকরিক সমৃদ্ধ এবং নীপার ও প্রুত নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের উর্বর জমি সমৃদ্ধ ডান তীরস্থ ইউক্রেনকে পুরোপুরিভাবে মুক্ত করল। সোভিয়েত মোলদাভিয়ার বড় একটি অংশও মুক্ত করা হয়েছিল।

নিস্টার নদীতে ও উত্তর রুমানিয়ায় পেঁছার ফলে ক্রিমিয়া, মোলদাভিয়া, পশ্চিম ইউক্রেনিয়া ও বেলোরুশিয়ায় জার্মান-ফ্যাসিস্ট সৈন্যদের বিধ্বস্তকরণের জন্য, এবং বলকান অভিমুখে সোভিয়েত ফৌজের আক্রমণাভিযানের পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে উঠল।

নীপারের ডান তীরস্থ ইউক্রেনে স্ট্র্যাটেজিক আক্রমণাত্মক অপারেশনটি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বৃহত্তম অপারেশনগুলোর একটি। তা চলে প্রায় ৪ মাস ধরে ১,৩০০-১,৪০০ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ২৫০-৪৫০ কিলোমিটার গভীর এক রণাঙ্গন জুড়ে। উভয় পক্ষ থেকে এই অপারেশনে অংশগ্রহণ করে প্রায় ৪০ লক্ষ লোক, ৪৫ হাজার ৪০০টি তোপ ও মর্টার কামান, ৪ হাজার ২০০টি ট্যাংক ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গান, ৪ সহস্রাধিক বিমান। এটা ছিল একমাত্র অপারেশন যাতে সোভিয়েত ফৌজের তরফ থেকে একই সঙ্গে লড়ছিল ৬টি ট্যাংক বাহিনীর সবগুলো।

এই অপারেশনে শিক্ষাপ্রদ ব্যাপার হচ্ছে এই যে বসন্তকালীন প্লাবন ও নদীতে বরফ ভাঙাচলার পরিস্থিতিতে সোভিয়েত সৈন্যরা গতিতে থেকে অনেকগুলো নদী — তার মধ্যে ছিল ইনগুলেৎস, দক্ষিণ বুগ, নিস্টার আর প্রুতের মতো নদীগুলো — অতিক্রম করেছিল। সোভিয়েত বিমান বাহিনী খারাপ আবহাওয়া সত্ত্বেও ১৯৪৪ সালের শীতে ও বসন্তে ৬৬ সহস্রাধিক বিমান-উড্ডয়ন (শত্রুর বিমান বাহিনীর চেয়ে ২ গুণ বেশি) করেছে; বায়ুযুদ্ধে ও বিমান ঘাঁটিগুলোতে ১ হাজার ৪ শতাধিক জার্মান বিমান ধ্বংস করেছে।

স্থল সেনাকে বিপুল সহায়তা প্রদান করেছিল সামরিক পরিবহণ বিমান বাহিনী। এপ্রিল মাসের ১৭ দিনে তা ৪,৮১৭ বিমান-উড্ডয়ন সম্পন্ন করে, সৈন্যদের জন্য ৬৭০ টন জ্বালানি ও গোলাবারুদ পরিবহণ করে এবং ৫ সহস্রাধিক নতুন সৈনিক ও আহত সৈনিককে স্থানান্তরিত করে।

ক্রিমিয়ায় জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীর বিধ্বস্ত

ক্রিমিয়ায় জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে ৪র্থ ইউক্রেনীয় ফ্রণ্ট (অধিনায়ক জেনারেল ফ. তল্বুখিন) এবং স্বতন্ত্র উপকূলীয় বাহিনীর (অধিনায়ক জেনারেল আ. ইয়েরেমেংকো) সৈন্যরা। তাদের সহায়তা করেছিল কৃষ্ণ সাগরীয় নৌ-বহর। অপারেশনটি চলে ১৯৪৪ সালের ৮ এপ্রিল থেকে ১২ মে পর্যন্ত।

অপারেশনের উদ্দেশ্য ছিল শত্রুর ১৭শ বাহিনীকে বিধ্বস্ত করা এবং ক্রিমিয়া মুক্ত করা।

সোভিয়েত বাহিনীতে ছিল ৪ লক্ষ ৭০ হাজার লোক, ৫,৯৮২টি তোপ ও মর্টার কামান, ৫৫৯টি ট্যাংক ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গান, ১,২৫০টি বিমান।

ক্রিমিয়া প্রতিরক্ষায় লিপ্ত ১৭শ জার্মান বাহিনীর (অধিনায়ক জেনারেল এ. ইয়েনেক্ক) কাছে ছিল ১২টি ডিভিশন (তার মধ্যে ৭টি রুমানীয়), ২ অ্যাসল্ট গান ব্রিগেড, সমর্থন দানকারী বিভিন্ন ইউনিট। তাতে ছিল ১ লক্ষ ৯৫ সহস্রাধিক লোক, প্রায় ৩,৬০০টি তোপ ও মটার কামান, ২১৫টি ট্যাংক ও অ্যাসল্ট গান, ১৪৮টি বিমান।

অভিন্ন অভিমুখে সমন্বিত আঘাতের ফলে (সেভাস্তপোল অভিমুখে উত্তর থেকে আঘাত হানছিল ৪র্থ ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের সৈন্যরা ও পূর্ব

থেকে — স্বতন্ত্র উপকূলীয় বাহিনীর সৈন্যরা) ১৭শ জার্মান-রুমানীয় বাহিনীটি পুরোপুরিভাবে বিধ্বস্ত ও বন্দী হয়। শত্রু ১ লক্ষ লোক হারায়, তার মধ্যে ৬১,৫৮৭ জনকে বন্দী অবস্থায়। তাছাড়া উদ্বাসনের সময় বিপুল সংখ্যক জার্মান আর রুমানীয় সৈন্য ও অফিসার সমুদ্রের জলে ডুবে মারা যায়। এটা লক্ষণীয় যে ১৯৪১-১৯৪২ সালে ফ্যাসিস্ট বাহিনীর সেভাস্তপোল দখল করতে যেখানে ২৫০ দিন লেগেছিল, সেখানে ১৯৪৪ সালে সোভিয়েত সৈন্যরা সে কাজ করেছিল স্রেফ পাঁচ দিনে, আর সমগ্র ক্রিমিয়া মুক্ত করেছিল ৩৫ দিনে।

ক্রিমিয়ার মুক্তি কৃষ্ণ সাগরের উপকূলের পরিস্থিতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক নৌ-বহর ক্রিমিয়ায় তার ঘাঁটিগুলো পুনরুদ্ধার করল এবং রুমানিয়া ও বুলগেরিয়ায় শত্রুর নৌ-বহরের বিরুদ্ধে ভালোভাবে লড়ার সুযোগ পেল।

ভিবর্গ-পেত্রজাভদস্ক অপারেশন
(১৯৪৪ সালের ১০ জুন — ৯ আগস্ট)

বাল্টিক নৌ-বহর এবং লাদোগা ও ওনেগা হ্রদের ফ্লোটিল্যার সঙ্গে সহযোগিতায় এই অপারেশনটি পরিচালনা করে কারেলীয় ফ্রন্টের বাম পার্শ্ব ও লেনিনগ্রাদ ফ্রন্টের ডান পার্শ্বের সৈন্যরা। এর উদ্দেশ্য ছিল — ফিনিশ ফৌজের বড় একটি গ্রুপিংকে বিধ্বস্ত করা, লেনিনগ্রাদের উপর থেকে বিপদ দূর করা এবং হানাদারদের কবল থেকে স্বায়ত্তশাসিত কারেলো-ফিন প্রজাতন্ত্রকে মুক্ত করা।

দক্ষিণ কারেলিয়ায় ও কারেলীয় যোজকে প্রতিরক্ষা কার্যে লিপ্ত ছিল ১৫টি ডিভিশন, ৮টি ইনফেণ্ট্রি ও ১টি অশ্বারোহী ব্রিগেড নিয়ে গঠিত ফিনিশ বাহিনীর প্রধান শক্তিসমূহ। ওগুলোতে ছিল ২ লক্ষ ৬৮ হাজার লোক, ১,৯৩০টি তোপ ও মর্টার কামান, ১১০টি ট্যাঙ্ক ও অ্যাসল্ট গান, ২৪৮টি জঙ্গী বিমান।

অপারেশনে অংশগ্রহণের জন্য নির্ধারিত সোভিয়েত বাহিনীর কাছে ছিল ৪১টি ডিভিশন, ৫টি ইনফেণ্ট্রি ব্রিগেড ও ৪টি সুদৃঢ় ঘাঁটির সৈন্যদল, যেগুলোতে ছিল প্রায় সাড়ে চার লক্ষ লোক, প্রায় ১০ হাজার তোপ ও মর্টার কামান, ৮ শতাধিক ট্যাঙ্ক ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গান, ১,৫৪৭টি বিমান। এই ভাবে শক্তির অনুপাত ছিল সোভিয়েত ফৌজের অনুকূলে:

জনবলে — ১·৭ গুণ, আর্টিলারিতে ⁄ ৫·২ গুণ, ট্যাঙ্কে ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গানে — ৭·৩ গুণ এবং বিমানে — ৬·২ গুণ।

প্রথমে লেনিনগ্রাদ ফ্রন্টের ডান পার্শ্বের সৈন্যরা বল্টিক নৌ-বহরের সঙ্গে সহযোগিতায় জুন মাসে কারেলীয় যোজকে শত্রুর একটি গ্রুপিংকে বিধ্বস্ত করে, আর তারপর কারেলীয় ফ্রন্টের বাম পার্শ্বের সৈন্যরা লাদোগা ও ওনেগা হ্রদগুলোর নৌবহরের সঙ্গে সহযোগিতায় আগস্টের শেষে কারেলিয়ায় শত্রুকে পরাস্ত করে।

শত্রুর দীর্ঘকালীন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভাঙনের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে জড়িত ভিবর্গ-পেত্রজাভদ্স্ক অপারেশনটি চলছিল বনাকীর্ণ-জলাময় ও হ্রদপূর্ণ অঞ্চলের কঠিন পরিস্থিতিতে। এই অপারেশনের ফলে লাল ফৌজ শত্রুর বৃহৎ শক্তিকে বিধ্বস্ত করে, ভিবর্গ ও পেত্রজাভদ্স্ক মুক্ত করে, শত্রু সৈন্যদের ফিনল্যান্ডের অভ্যন্তরে তাড়িয়ে দেয় এবং এই ভাবে স্বায়ত্তশাসিত কারেলো-ফিন প্রজাতন্ত্রের বড় একটি অংশকে মুক্ত করে।

উত্তর থেকে লেনিনগ্রাদের আর কোন বিপদ রইল না। সোভিয়েত ইউনিয়ন আবার লেনিনগ্রাদ ও মুর্মানস্ক শহরের মধ্যে রেল সড়কটি এবং বল্টিক সাগর আর শ্বেত সাগরকে সংযুক্তকারী খালটি ব্যবহার করার সুযোগ পেল।

সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের উত্তরাংশে স্ট্র্যাটেজিক পরিস্থিতিতে চূড়ান্ত পরিবর্তন ঘটে সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুকূলে। ফিনল্যান্ড যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হয়। ১৯৪৪ সালের ৪ সেপ্টেম্বর সে সামরিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করে, আর ১৯ সেপ্টেম্বর নাৎসি জোট থেকে বেরিয়ে যায় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি সম্পাদিত করে। ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট উরহো কেক্কনেন ১৯৭৪ সালে বলেছিলেন যে এই চুক্তিটিকে ‘স্বাধীন ফিনল্যান্ডের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা বলে গণ্য করা যেতে পারে। তা সম্পূর্ণ নতুন এক যুগের সূচনা করে যখন আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটে’।*

১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসে ফিনল্যান্ডে নতুন সরকার গঠিত হয় যাতে কমিউনিস্টরাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। দেশের ইতিহাসে সে এক

অভূতপূর্ব ঘটনা। এই সরকারকে নেতৃত্ব দেন প্রখ্যাত প্রগতিশীল রাজনীতিজ্ঞ ও রাষ্ট্রনেতা ইউখো পাসিকিভি। ১৯৪৪ সালের ৬ ডিসেম্বর ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তিনি তাঁর সরকারের আশু কর্তব্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছিলেন: ''আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের জনগণের মৌলিক স্বার্থে এরূপ পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করা উচিত যা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে চালিত হবে না। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে পূর্ণ আস্থার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শান্তি, বোঝাপড়া ও সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক হচ্ছে সেই প্রথম নীতি যা আমাদের রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপে মেনে চলা উচিত।'*

জার্মান-ফ্যাসিস্ট সৈন্যরা ফিনল্যাণ্ড থেকে চলে যাওয়ার সময় অনেকগুলো জনপদ বিনষ্ট করে, হাজার হাজার লোককে গৃহহীন করে, প্রায় ১৬ হাজার বাড়ি, ১২৫টি স্কুল, ১৬৫টি গির্জা ও অন্যান্য সামাজিক ভবন জ্বালিয়ে দেয়, ৭০০টি বড় বড় সেতু ধ্বংস করে। ফিনল্যাণ্ডের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১২ কোটি ডলারেরও বেশি। ফ্যাসিস্ট জার্মানি তার প্রাক্তন মিত্রের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করল।

স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধার নীতিতে এবং ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার নীতিতে বিশ্বাসী সোভিয়েত ইউনিয়ন ফিনল্যাণ্ডকে কেবল রাজনৈতিকই নয়, অর্থনৈতিক সহায়তাও দিয়েছিল। ফিনল্যাণ্ডের ভূখণ্ডে সোভিয়েত ফৌজ প্রেরণ করা হয় নি। ফিনল্যাণ্ডের কাছ থেকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফিনিশ সশস্ত্র বাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়নের যে-ক্ষতি করেছিল সেই অর্থ তা কেবল আংশিকভাবে পূরণ করেছিল।

২। জার্মান বাহিনীসমূহের 'সেণ্টার' ও 'উত্তর ইউক্রেন' গ্রুপগুলোর ধ্বংস

বেলোরুশ অপারেশন

(১৯৪৪ সালের ২২ জুন — ২৯ আগস্ট)

১৯৪৪ সালের শীতকালীন সামরিক ক্রিয়াকলাপে শোচনীয় পরাজয়ের পর জার্মান সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলী নিজেদের সৈন্য বাহিনীতে বড়

* পাসিকিভির নীতি। ইউখো কুস্তি পাসিকিভির প্রবন্ধ ও বক্তৃতা। ১৯৪৪-১৯৫৬ সাল। ফিনিশ ভাষা থেকে অনুবাদ। — মস্কো, ১৯৫৮, পৃঃ ১৬।

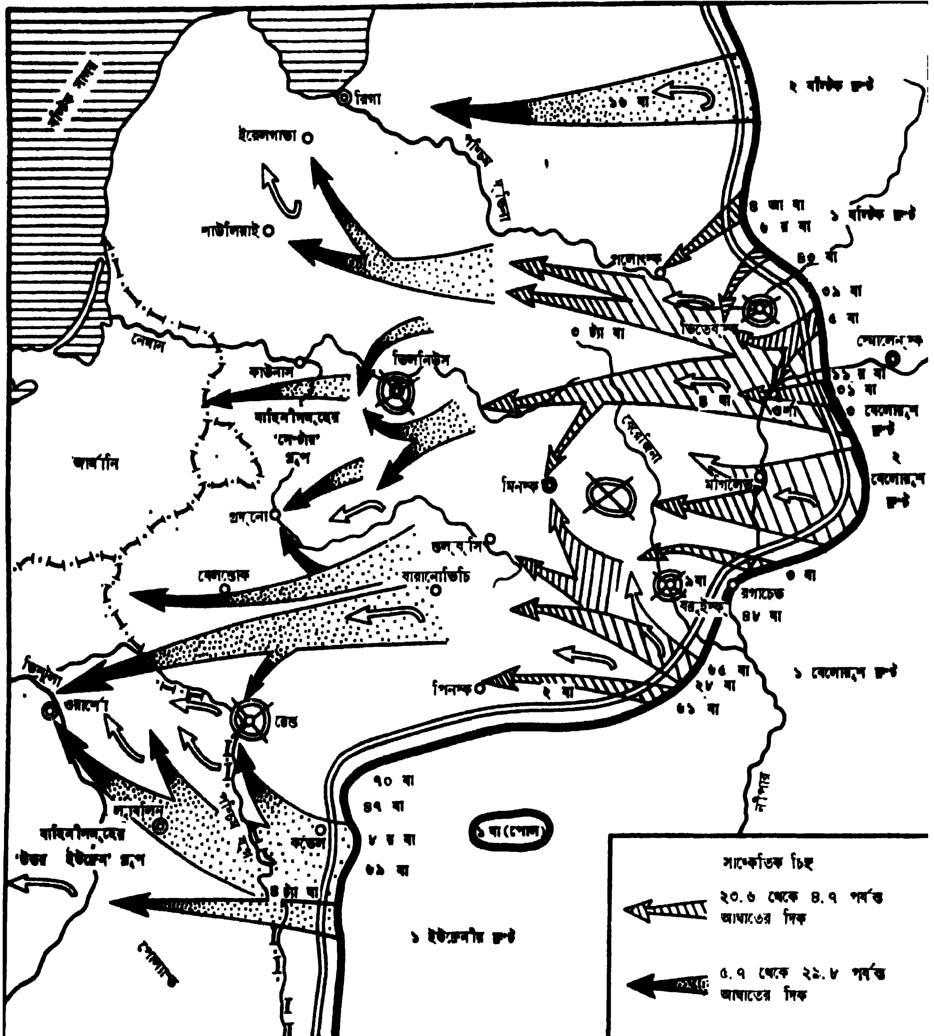
রকমের পুনর্বিন্যাস কার্য সম্পন্ন করে, আবার দেশজোড়া সৈন্যযোজন শুরু করে এবং ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকাল নাগাদ জার্মান সৈন্য বাহিনীর লোকসংখ্যা মোটামুটি বছরের গোড়ার দিককার সংখ্যার কাছাকাছি (ডিভিশনের হিসাবে) নিয়ে যেতে সমর্থ হয়।

ফ্যাসিস্ট জোটের অধীনস্থ ৩২৬টি ডিভিশনের মধ্যে ২৩৯টি (তার মধ্যে ২৩টি ট্যাঙ্ক ও ৭টি মেকানাইজ্ড ডিভিশন) ১৯৪৪ সালের জুনে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে অবস্থিত ছিল। এই ডিভিশনগুলোর মধ্যে ১৮১টি ছিল ফ্যাসিস্ট জার্মানির, ৫৮টি ডিভিশন — তার তাঁবেদার রাষ্ট্রসমূহের। সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টে সেই সঙ্গে লড়ছিল ২০তম জার্মান পার্বত্য বাহিনীর শক্তির একাংশ, ৩টি বিমান বহর এবং উত্তরে, বল্টিক ও কৃষ্ণ সাগরে অবস্থিত সামরিক নৌ-বাহিনীর গ্রুপিংগুলো। এই সমস্ত ফৌজে ছিল ৪৩ লক্ষ লোক, ৫৯ হাজার তোপ ও মর্টার কামান, ৭,৮০০টি ট্যাঙ্ক ও অ্যাসল্ট গান, ৩,২০০টি জঙ্গী বিমান।

প্রধান শক্তিসমূহকে, বিশেষত ট্যাঙ্ক ডিভিশনগুলোকে নাৎসিরা রেখেছিল প্রিপিয়াৎ নদীর দক্ষিণে। এর কারণটি হচ্ছে এই যে ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মের দিকে জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী দক্ষিণে সোভিয়েত সৈন্যদের নতুন আঘাতের অপেক্ষা করছিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী বেলোরুশিয়ায় পরবর্তী আক্রমণাভিযান পরিচালনার পরিকল্পনা করছিলেন।

সাড়ে চার হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ বিশাল সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে সোভিয়েত পক্ষ থেকে লড়ছিল ১১টি ফ্রণ্ট-ফর্ম্যাশন,৩টি নৌ-বহর, ২টি ফ্লোটিল্যা ও বিমানবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ২টি ফ্রণ্ট। সোভিয়েত বাহিনীর অধীনে ছিল ৪৬১টি ইনফেণ্ট্রি, এয়ারবোর্ন ল্যাণ্ডিং ও অশ্বারোহী ডিভিশন, ২১টি ট্যাঙ্ক ও মেকানাইজ্ড কোর এবং অন্যান্য বহু সমর্থনকারী ইউনিট আর ফর্ম্যাশন। ওগুলোতে ছিল ৬৬ লক্ষ লোক, ৯৮,১০০টি তোপ ও মর্টার কামান, ৭,১০০টি ট্যাঙ্ক ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গান, প্রায় ১২,৯০০টি জঙ্গী বিমান।

১৯৪৪ সালের গ্রীষ্ম ও শরতের সামরিক ক্রিয়াকলাপের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল — সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূখণ্ড থেকে শত্রু বিতাড়ন সম্পন্ন করা, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের জাতিসমূহকে নাৎসি দাসত্বের কবল থেকে মুক্তকরণের কাজ শুরু করা এবং যুদ্ধকে ফ্যাসিস্ট জার্মানির ভূখণ্ডে নিয়ে যাওয়া।



নকশা ১১। বেলোরুশ অপারেশন (১৯৪৪ সালের জুন-আগস্ট)

ঠিক হয়েছিল যে প্রধান আঘাত হানা হবে স্ট্র্যাটেজিক ফ্রণ্টের কেন্দ্রস্থলে, বেলোরুশিয়ায়, যা জার্মানির প্রবেশ পথগুলো রোধ করে রেখেছিল। এখানে অবস্থিত ছিল শত্রুর বৃহৎ এক শক্তি — বাহিনীসমূহের 'সেণ্টার' গ্রুপটি। পশ্চিম ইউক্রেনিয়ায় অবস্থিত সোভিয়েত সৈন্যদের আঘাতের সঙ্গে এই আঘাতটির মিলিত হওয়ার কথা ছিল। এই ভাবে সোভিয়েত সৈন্যদের প্রধান গ্রুপিংটিকে পূর্ব প্রাশিয়ার সীমান্তে ও পোল্যাণ্ডে পৌঁছে দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছিল। বেলোরুশিয়ায় ও পশ্চিম ইউক্রেনিয়ায় আক্রমণাভিযানের সাফল্য নিশ্চিত করছিল বল্টিক উপকূলের সামরিক ক্রিয়াকলাপ।

পরবর্তী অপারেশনগুলো (ইয়াস্‌সি-কিশিনেভ অপারেশন, পেত্‌সামো-কির্কেনেস অপারেশন ও বল্টিক উপকূল মুক্তকরণের অপারেশন) পরিচালনা করার কথা ছিল পূর্ববর্তী অপারেশনসমূহের ফলাফল বিবেচনা করে এবং সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে নির্দিষ্ট অপারেশনেল-স্ট্র্যাটেজিক পরিস্থিতি বিচার করে।

১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালের জন্য জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলীর পরিকল্পনাটি ওই বছর শীতকালীন সামরিক ক্রিয়াকলাপের পরিকল্পনারই মতো অবাস্তব ছিল: জার্মানির সীমান্ত থেকে দূরে লাল ফৌজের বিরুদ্ধে ততদিন পর্যন্ত সুদীর্ঘ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া যতদিন না, এক দিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ড এবং, অন্য দিকে, সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সম্পর্কে ভাঙন দেখা দিচ্ছে। নাৎসি ফৌজকে নির্দেশ দেওয়া হয়: গভীর ও সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে অধিকৃত অবস্থানগুলো অটলভাবে টিকিয়ে রাখতে হবে।

১৯৪৪ সালের গ্রীষ্ম নাগাদ জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী বেলোরুশিয়ায় সুদৃঢ় বহু এলাকা বিশিষ্ট গভীর একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ট্যাকটিকেল অঞ্চলটি গঠিত হয়েছিল মোট ৮-১২ কিলোমিটার গভীর দুটি এলাকা নিয়ে। এর পরে ছিল ৪টি প্রধান ও কয়েকটি মধ্যবর্তী প্রতিরক্ষা এলাকা, যা অবস্থিত ছিল নীপার, দ্রুৎ, বেরেজিনা নদীগুলো বরাবর। ভিতেব্‌স্ক, ওর্শা, মগিলেভ, জ্‌লবিন, বরিসভ ও বব্রুইস্ক্‌ শহরগুলোকে দৃঢ় দুর্গে পরিণত করা হয়েছিল। বেলোরুশিয়ায় ফ্যাসিস্ট-জার্মান ফৌজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় মোট গভীরতা ছিল ২৫০-২৭০ কিলোমিটার।

১ম বল্টিক ফ্রণ্ট, ৩য়, ২য় ও ১ম বেলোরুশ ফ্রণ্টের সৈন্যদের সম্মুখে ১,১০০ কিলোমিটার দীর্ঘ রণাঙ্গনে প্রতিরক্ষায় লিপ্ত ছিল শত্রুর বৃহৎ একটি গ্রুপিং: 'উত্তর' গ্রুপের ১৬শ বাহিনীর ডান পার্শ্বের ফর্ম্যাশনগুলো; ৩য় ট্যাঙ্ক বাহিনী, ৪র্থ, ৯ম ও ২য় ফিল্ড আর্মি নিয়ে গঠিত 'সেণ্টার' গ্রুপ (অধিনায়ক জেনারেল-ফিল্ডমার্শাল এ. বুশ) এবং 'উত্তর ইউক্রেনিয়া' গ্রুপের ৪র্থ ট্যাঙ্ক বাহিনীর বাম পার্শ্বের ফর্ম্যাশনগুলো — সর্বমোট ৬৩টি ডিভিশন ও ৩টি ব্রিগেড। ওগুলোতে ছিল ১২ লক্ষ লোক, ৯,৫০০টিরও বেশি তোপ ও মর্টার কামান, ৯০০ ট্যাঙ্ক ও অ্যাসল্ট গান। ৬ষ্ঠ বিমান বহরের প্রায় ১,৩৫০টি বিমান এবং ১ম ও ৪র্থ বিমান বহরগুলোর কিছুটা শক্তি স্থলসেনাকে আকাশ থেকে সমর্থন জোগাচ্ছিল।

সোভিয়েত সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর পরিকল্পনাটি ছিল এরূপ: চারটি কেন্দ্রীয় ফ্রণ্টের শক্তি দিয়ে একই সঙ্গে ছ'টি দিকে শত্রুর প্রতিরক্ষা লাইন ভেদ করা, ভিতেব্স্ক ও বব্রুইস্ক্ অঞ্চলে প্রথমে তার বৃহৎ পার্শ্ববর্তী গ্রুপিংগুলোকে ঘিরে ফেলে ধ্বংস করা আর তারপর আক্রমণাভিযানের গতি বৃদ্ধি করে মিনস্কের পূর্বে ৪র্থ জার্মান বাহিনীর প্রধান শক্তিসমূহকে অবরোধ করে বিধ্বস্ত করা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পশ্চিম সীমান্ত অভিমুখে এগিয়ে চলা।

১ম বল্টিক ফ্রণ্টের অধিনায়ক ছিলেন জেনারেল ই. বাগ্রামিয়ান, ৩য় বেলোরুশ ফ্রণ্টের অধিনায়ক — জেনারেল ই. চের্নিয়াখোভস্কি, ২য় বেলোরুশ ফ্রণ্টের — জেনারেল গ. জাখারোভ, ১ম বেলোরুশ ফ্রণ্টের — জেনারেল ক. রকোসভ্স্কি, এবং ১ম বেলোরুশ ফ্রণ্টে অন্তর্ভুক্ত নবগঠিত পোলিশ ফৌজের ১ম বাহিনীটির সেনাপতি ছিলেন জেনারেল স. পপলাভস্কি। সর্বোচ্চ সদর-দপ্তর বেলোরুশিয়ার পার্টিজান ফর্ম্যাশনসমূহকে নির্দেশ দিল শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর আঘাতের প্রবলতা বৃদ্ধি করতে, শত্রুর মজুদ শক্তিকে অচল করে দিতে এবং নিজেদের বাহিনীগুলোর আক্রমণাভিযানে সহায়তা করতে। ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে বেলোরুশিয়ায় লড়ছিল ১ লক্ষ ৪৩ হাজার পার্টিজান।

চারটি সোভিয়েত ফ্রণ্টের কাছে ছিল ১৪ লক্ষাধিক লোক, ৩১ হাজার তোপ ও মর্টার কামান, ৫,২০০টি ট্যাঙ্ক ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গান। উক্ত ফ্রণ্টসমূহের সৈন্যদের আকাশ থেকে সমর্থন জোগাচ্ছিল ৩য়, ১ম, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ১৬শ বিমান বাহিনীগুলো — সর্বমোট ৫ সহস্রাধিক জঙ্গী বিমান। দূর পাল্লার বিমান শক্তি (অধিনায়ক এয়ার মার্শাল আ. গলোভানোভ) এবং বিমানবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বিমান শক্তিও এই অপারেশনে অংশগ্রহণ করেছিল। সৈন্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা করছিল পার্টিজানরা। ফ্রণ্টসমূহের ক্রিয়াকলাপের সমন্বয় সাধন করছিলেন সর্বোচ্চ সদর-দপ্তরের প্রতিনিধিদ্বয় — মার্শাল গেওর্গি জুকোভ ও মার্শাল আলেক্সান্দর ভাসিলেভস্কি।

সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী কর্তৃক অপারেশনে নিযুক্ত এই বিপুল পরিমাণ শক্তি ও যুদ্ধোপকরণ শত্রুর উপর সোভিয়েত ফৌজের শ্রেষ্ঠতা নিশ্চিত করল: জনবলে — ২ গুণ, তোপ ও মর্টার কামানের ক্ষেত্রে — ৩·৮ গুণ, ট্যাঙ্ক ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গানের ক্ষেত্রে — ৫·৮ গুণ, বিমানের ক্ষেত্রে — ৩·৯ গুণ।

সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টের মধ্যস্থলে সৈন্যের বিশাল এক গ্রুপিং গড়া এবং শত্রুর কাছে তা গোপন রাখা — এ ছিল অতি জটিল কাজ যার জন্য প্রচুর প্রয়াসের প্রয়োজন ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল আ. ভাসিলেভস্কি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'সৈন্যদের আসন্ন পুনর্বিন্যাসের সঙ্গে এবং দেশের অভ্যন্তর ভাগ থেকে বেলোরুশ অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্তকিছু প্রেরণের সঙ্গে জড়িত ব্যবস্থাদির জন্য প্রয়োজন হয়েছিল পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির, জেনারেল স্টাফের, প্রতিরক্ষা বিষয়ক জন কমিশনার পরিষদের কেন্দ্রীয় বিভাগসমূহের এবং যোগাযোগ বিষয়ক জন কমিশনার দপ্তরের পরিচালকমণ্ডলীর বিপুল পরিশ্রম ও মনোযোগ। বিশাল এই কাজটি পরিচালনা করার কথা ছিল কঠোর গোপনীয়তার মধ্যে যাতে শত্রু আসন্ন গ্রীষ্মকালীন অপারেশনের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতিমূলক কাজকর্মের বিষয়ে কোনকিছু জানতে না পারে।'*

নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলী যাতে এ কথা বিশ্বাস করে যে ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মে লাল ফৌজ প্রধান আঘাত হানবে দক্ষিণে এবং বল্টিক উপকূলে সেই উদ্দেশ্যে সোভিয়েত জেনারেল স্টাফ ৩ মে তারিখেই ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের অধিনায়ককে এরূপ নির্দেশ দেয়: 'শত্রুর জন্য মিথ্যা তথ্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে অপারেশনেল ক্যামুফ্লেজের ব্যাপারে ব্যবস্থাদি গ্রহণের দায়িত্বটি আপনাকে দেওয়া হচ্ছে। দেখাতে হবে যে ফ্রণ্টের ডান পার্শ্বে ট্যাংক ও আর্টিলারি সমর্থিত আট-নয়টি ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের সমাবেশ ঘটছে।...'

অনুরূপ নির্দেশ প্রেরিত হয়েছিল ৩য় বল্টিক ফ্রণ্টের অধিনায়কের কাছে। তা অনুসারে ফ্রণ্ট চেরেখা নদীর পূর্ব দিকে ক্যামুফ্লেজ ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে।

উভয় ফ্রণ্টে অপারেশনেল ক্যামুফ্লেজের সঙ্গে জড়িত কাজকর্ম সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী শত্রুকে ফাঁকি দিতে সক্ষম হলেন। এমনকি বেলোরুশ অপারেশন আরম্ভ হওয়ার দিন কয়েক আগেও জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী মনে করছিল যে সোভিয়েত সৈন্যরা প্রধান আঘাত হানবে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের দক্ষিণ পার্শ্বে। তারা প্রিপিয়াৎ নদীর দক্ষিণে মোতায়েন করেছিল তখন তাদের অধীনে থাকা

৩০টি ট্যাঙ্ক ও মোটোরাইজ্‌ড ডিভিশনের ২৪টিকে। ১৯৪৪ সালের ১৯ জনুন জন্‌খোফেনে এক শিক্ষামূলক জমায়েতের সময় কেইটেল বলেছিল যে রণাঙ্গনের মধ্যাঞ্চলে রুশদের উল্লেখযোগ্য কোন আক্রমণাভিযান হবে বলে তার মনে হয় না।

এই ভাবে, বেলোরুশ অপারেশনে অপারেশনেল ক্যামুফ্লেজের উদ্দেশ্য হাসিল হল। তা অনেকাংশে লাল ফৌজের সামরিক ক্রিয়াকলাপের সাফল্য নির্ধারিত করে।

সার্বিক আক্রমণাভিযান আরম্ভ হওয়ার এক দিন আগে লড়াই মাধ্যমে অনুসন্ধান কার্য চালানো হয়। ৪৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ রণাঙ্গনে যুগপৎ কাজ করছিল ৪৫টি অনুসন্ধানী সাব-ইউনিট। ১১শ রক্ষী বাহিনী ও ৩১তম বাহিনীর এলাকায় (মিনস্ক রাজপথের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে) নিষ্ক্রিয়তা সত্ত্বেও লড়াই মাধ্যমে অনুসন্ধান কার্যের উদ্দেশ্য মোটামুটি হাসিল হয়েছিল — শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অগ্রবর্তী লাইন, তার গোলাগুলিবর্ষণ ব্যবস্থা (ফায়ার সিস্টেম), তার একটি গ্রুপিং ঠিক করা হয়েছিল। তাছাড়া শত্রু সোভিয়েত ফৌজের অগ্রবর্তী ব্যাটেলিয়নগুলোর সামরিক ক্রিয়াকলাপকে সার্বিক আক্রমণাভিযানের সূচনা বলে গণ্য করে তার ডিভিশনের ও কোরেরই মজুদ শক্তির বৃহৎ একটি অংশ খরচ করে ফেলে।

২৩ জুন সকাল বেলা প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণ ও বোমাবর্ষণের পর ১ম বল্টিক, ৩য় ও ২য় বেলোরুশ ফ্রন্টের সৈন্যরা আক্রমণাভিযান আরম্ভ করে।

অপারেশনের প্রথম দু'দিনে ১ম বল্টিক ফ্রন্টের আক্রমণকারী গ্রুপিংয়ের এবং ৩য় বেলোরুশ ফ্রন্টের উত্তরের আক্রমণকারী গ্রুপের ফর্ম্যাশনগুলো শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ট্যাকটিকেল এলাকাটি ভেদ করে ২৫-৩০ কিলোমিটার গভীরে চলে যায়। এতে জার্মানদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। ১ম বল্টিক ফ্রন্টের সৈন্যরা পশ্চিম দ্‌ভিনা নদী অতিক্রম করল। ভিতেব্‌স্ক অঞ্চলে শত্রুকে পরিবেষ্টনের পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে তোলা হল।

১ম বল্টিক ফ্রন্টের ৪৩তম বাহিনীর সৈন্যরা এবং ৩য় বেলোরুশ ফ্রন্টের ৩৯তম বাহিনীর সৈন্যরা প্রবল আক্রমণাভিযান চালিয়ে অপারেশনের তৃতীয় দিনে, ২৫ জুন, শত্রুর ভিতেব্‌স্ক গ্রুপিংটি পরিবেষ্টনের কাজ সম্পন্ন করে ফেলে। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে ৫ম বাহিনীর এলাকায় ২০-২৫ কিলোমিটার গভীরে বিদ্ধ রক্ষাব্যূহে ঢোকানো হয় ৫ম রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীটিকে।

পরে উভয় ফ্রন্টের বাহিনীগুলো তাদের শক্তি একাংশের সাহায্যে জার্মানদের অবরুদ্ধ ভিতেব্স্ক গ্রুপিংটির বিলোপ ঘটায় আর প্রধান শক্তিসমূহের দ্বারা পলোৎস্ক, লেপেল ও বরিসভ অভিমুখে আক্রমণাভিযান চালিয়ে যায়।

ভিতেব্স্ক শহরের নিকটে অবরুদ্ধ ও ধ্বংস হয় ৫টি শত্রু ডিভিশন, পরাস্ত হয় দু'টি। এখানে জার্মানদের ২০ সহস্রাধিক লোক নিহত ও ১০ সহস্রাধিক বন্দী হয়েছিল।

১ম বেলোরুশ ফ্রন্টের সৈন্যরা ২৪ জুন আক্রমণাভিযান আরম্ভ করে। অপারেশনের প্রথম দিনে তারা শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রধান লাইনটি, আর দ্বিতীয় দিনে দ্বিতীয় লাইনটি ভেদ করে।

দু'টি ট্যাঙ্ক কোরের (৯ম ও ১ম রক্ষী ট্যাঙ্ক কোরের) ফর্ম্যাশনসমূহ আক্রমণাভিযান চালিয়ে পদাতিক বাহিনীর আগে চলে গিয়ে অপারেশনের চতুর্থ দিনে বব্রুইস্ক্ অঞ্চলে শত্রুর ৪০ হাজার সৈন্যের একটি গ্রুপিংকে ঘিরে ফেলে। অবরুদ্ধ নাৎসি সৈন্যরা উত্তর দিকে পরিবেষ্টন লাইন ভেদ করার আদেশ পায়। ২৭ জুন এই মতলব হাসিল করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নিতে গিয়ে তারা নিজেদের সমস্ত গুদাম ও সামরিক সাজসরঞ্জামের একাংশ ধ্বংস করতে শুরু করে। রণাঙ্গনের সংকীর্ণ এক এলাকায় ১৫০টির মতো ট্যাঙ্ক জড় করে জার্মানরা তিতোভ্কার উপর আঘাত হানার এবং ৯ম ট্যাঙ্ক কোরের সৈন্য বিন্যাসের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিল। কোরটির সৈন্য বিন্যাস স্বভাবতই ঘন হতে পারে নি। অবরুদ্ধ শত্রুর মুক্ত হয়ে পড়ার বাস্তব সম্ভাবনা দেখা দিল।

ফ্রন্টের অধিনায়ক অবরুদ্ধ শত্রু বাহিনীর উপর বিমান থেকে প্রবল বোমাবর্ষণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ২৭জুন অপরাহ্ণ ৭টা থেকে ৮টা পর্যন্ত ৫২৬টি বিমান বোমাবর্ষণের মাধ্যমে শত্রুর উপর ব্যাপক আঘাত হানে। দুশমনের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং সে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। পরে স্থল বাহিনীগুলো আক্রমণাভিযানে লিপ্ত হয়ে ২৯ জুন শত্রুকে একেবারে খতম করে দেয়।

বব্রুইস্কের উপকণ্ঠে নাৎসিদের ৭৩ সহস্রাধিক লোক নিহত ও বন্দী হয়। ৯ম জার্মান বাহিনীর প্রধান শক্তিসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ১ম বেলোরুশ ফ্রন্টের সৈন্যরা দক্ষিণ দিক থেকে ৪র্থ জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীটিকে ঘেরাও করে ফেলে।

২য় বেলোরুশ ফ্রন্টের ফৌজগুলো মগিলেভ অভিমুখে আক্রমণাভিযানে

লিপ্ত থেকে ২৯ জুন দিনের শেষে ৯০ কিলোমিটার গভীরে চলে যায়, নীপার নদী পার হয় এবং মগিলেভ শহরটি মুক্ত করে। অপারেশনের প্রথম পর্যায়টি এখানেই সমাপ্ত হয়। সোভিয়েত ফ্রন্টগুলোর সৈন্যরা ছ'দিনে ছ'টি নদী অতিক্রম করে, তার মধ্যে নীপারের মতো বৃহৎ নদীটিও ছিল।

ফিউরের বিক্ষুব্ধ। ২৮ জুন সে 'সেণ্টার' গ্রুপের জেনারেল-ফিল্ডমার্শাল এ. বুশকে অধিনায়কের পদ থেকে হটিয়ে দেয়। তার স্থলাভিষিক্ত হয় জেনারেল-ফিল্ডমার্শাল ভ. মডেল।

শত্রুর ভিতেবস্ক-ওর্শা, মগিলেভ ও বব্রুইস্ক্ গ্রুপিংগুলো বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার পর মিনস্কের পূর্বে ৪র্থ জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীর প্রধান শক্তিসমূহকে ঘিরে ফেলার পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হল। বেরেজিনা নদীতে (বরিসভের উত্তরে), মগিলেভের পশ্চিমে অবস্থিত এক জায়গায় এবং স্ভিস্লোচ ও ওসিপোভিচি অঞ্চলে পেঁছে সোভিয়েত সৈন্যরা তিন দিক থেকে পশ্চাদপসরণরত নাৎসি ইউনিটসমূহকে ঘিরে ফেলে। ফ্রন্টগুলোর মোবাইল ফর্ম্যাশনসমূহ মিনস্ক থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ছিল, আর তখন ৪র্থ জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীর প্রধান শক্তিগুলো মিনস্ক থেকে ১৩০-১৫০ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত ছিল। এমতাবস্থায় পশ্চাদপসরণরত শত্রুকে অনুসরণ করার গতি চূড়ান্ত তাৎপর্য লাভ করছিল। সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর সদর-দপ্তর পরিস্থিতি বিবেচনা করে ২৮ জুন চারটি ফ্রন্টের কাছে বিশেষ নির্দেশ প্রেরণ করে। তা অনুসারে, ৩য় ও ১ম বেলোরুশ ফ্রন্টের সৈন্যদের মিনস্ক অভিমুখে আঘাত হানার, মিনস্ক মুক্ত করার এবং একই সঙ্গে মিনস্কের দিকে ৪র্থ জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীর পশ্চাদপসরণরত প্রধান শক্তিসমূহের পরিবেষ্টন সম্পন্ন করার কথা ছিল। ১ম বল্টিক ফ্রন্টের কাজ ছিল — পশ্চিমাভিমুখে আক্রমণাভিযান চালানো, পলোৎস্ক অধিকার করা এবং তদ্দ্বারা উত্তর থেকে বেলোরুশ ফ্রন্টসমূহের সামরিক ক্রিয়াকলাপে সহায়তা করা। ২য় বেলোরুশ ফ্রন্টের কর্তব্য ছিল— মিনস্ক অভিমুখে শত্রুর পশ্চাদনুসরণে লিপ্ত থেকে তাকে নাগালের বাইরে যেতে ও পরিকল্পিতভাবে হটতে না দেওয়া, তার সৈন্যদের বিন্যাসের মধ্যে ঢুকে পড়া, এবং ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে তাকে অংশে অংশে ধ্বংস করা।

সর্বোচ্চ সদর-দপ্তরের নির্দেশ মেনে চার ফ্রন্ট অদম্য শক্তিতে আক্রমণাভিযানের গতি বৃদ্ধি করে চলে।

জুলাইয়ের শুরুতে ৩য় ও ১ম বেলোরুশ ফ্রন্টের সৈন্যরা মিনস্কের

পূর্বে জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের ১ লক্ষ ৫ হাজার সৈন্যের একটি গ্রুপিংকে অবরোধ করে ফেলে। তার সপ্তাহব্যাপী বিলোপ সাধনের কাজটি সম্পন্ন হয় কয়েকটি দিক থেকে আঘাতের দ্বারা শত্রুকে ছত্রভঙ্গ করার এবং একই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ পরিবেষ্টন লাইন সংকুচিত করার মাধ্যমে। এই সমস্ত লড়াইয়ে স্থায়ী ফৌজের বড় সহায় ছিল পার্টিজানরা, যারা পশ্চিমাভিমুখে ধাবমান বিচ্ছিন্ন নাৎসি গ্রুপগুলোর সঙ্গে সংগ্রামের প্রধান দায়িত্বটি নিজের উপর নিয়েছিল।

জুলাইয়ের শেষে ও আগস্টে ১ম বল্টিক ফ্রণ্ট রিগা উপসাগরের দিকে আক্রমণাভিযান চালিয়ে ইয়েলগাভা ও দবেলে লাইনে অবস্থান মজবুত করে নেয়।

৩য় বেলোরুশ ফ্রণ্ট পশ্চিমাভিমুখে আঘাতের প্রবলতা বৃদ্ধি করে ৫ম বাহিনী ও ৩য় রক্ষী মেকানাইজ্ড কোরের শক্তি দিয়ে লিথুয়ানিয়ার রাজধানী ভিলনিউস শহরটি মুক্ত করে। ১ আগস্ট তারিখে ৫ম বাহিনী— ৩৯তম ও ৩৩তম বাহিনীগুলোর সহায়তায় — কাউনাস শহরে প্রবেশ করে। পূর্ব প্রুশীয় অভিমুখে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কাউনাস ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি কেন্দ্র। ওই দিনগুলোতেই ফ্রণ্টের সৈন্যরা পূর্ব দিক থেকে জার্মানির সীমান্তে পেীছে যায় এবং আগস্টের শেষ অবধি নিজের অবস্থা উন্নতকরণের উদ্দেশ্যে লড়াইয়ে লিপ্ত থেকে একই সঙ্গে পূর্ব প্রাশিয়ায় নাৎসি নিধনের জন্য নতুন আক্রমণাত্মক অপারেশনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

২য় বেলোরুশ ফ্রণ্টের সৈন্যরা কঠোর লড়াইয়ের পর বেলস্তোক শহরটিকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করে এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে পূর্ব প্রাশিয়ার একেবারে দ্বারপথে গিয়ে হাজির হয়।

১ম বেলোরুশ ফ্রণ্টের ফর্ম্যাশনসমূহ জুলাই মাসের দ্বিতীয়ার্ধে ল্যুবলিন-ব্রেস্ত অপারেশনটি পরিচালনা করে। এর ফলে মুক্ত হল ব্রেস্ত নগরী — ওয়ার্শো অভিমুখে জার্মানদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ রেল জংশন এবং সুদৃঢ় এক অঞ্চল।

পোল্যাণ্ডের মুক্তির জন্য সংগ্রাম শুরু হল। পোল্যাণ্ডের অবৈধ জাতীয় পরিষদ — ক্রাইওভা রাদা নারোদভা — পোলিশ জাতীয় মুক্তি কমিটির আকারে অস্থায়ী এক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গঠনের বিষয়ে একটি ডিক্রি জারি করে। ২৩ জুলাই এই কমিটিটি হেল্‌ম শহরে পোলিশ জনগণের উদ্দেশে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে, যাতে তার অধীনস্থ

প্রশাসনিক সংস্থাসমূহের এবং জনগণের প্রতি 'লাল ফৌজের সঙ্গে নিবিড়তম সহযোগিতায় লিপ্ত হতে ও তাকে সবচেয়ে ফলপ্রসূ সহায়তা দিতে' আহ্বান জানানো হয়। ঘোষণাপত্রটি নতুন গণতান্ত্রিক পোল্যান্ডের পুনঃপ্রতিষ্ঠা আর বিকাশের পথগুলোর নির্দেশ দেয়, তার পররাষ্ট্র নীতির মূল ধারাসমূহ ব্যাখ্যা করে।

সোভিয়েত সৈন্যদের সঙ্গে একই সময়ে ১ম বেলোরুশ ফ্রন্টের অধীনে আক্রমণাভিযান চালায় ১ম পোলিশ বাহিনী। সোভিয়েত ও পোলিশ ফৌজের সম্মিলিত ক্রিয়াকলাপ জার্মান ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দুই জনগণের ঐক্য, পোল্যান্ডের জাতীয় স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসে তাদের ঐক্য সূচিত করে।

সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী ভিস্টুলা নদীর নিকটস্থ হতেই লন্ডনে অবস্থানরত পোলিশ প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিরা নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হয়ে এবং নির্দিষ্ট পরিস্থিতি বিবেচনা না করে, সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলীকে কোনকিছু অবগত না করে এবং পোলিশ বাহিনীর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কোনরূপ বোঝাপড়ায় না এসে ১ আগস্ট তারিখে ওয়ার্শোতে এক অভ্যুত্থান আরম্ভ করে।

সোভিয়েত সৈন্যরা ওই সময়ে ওয়ার্শোর ডান তীরস্থ অংশ প্রাগা নামক উপকণ্ঠে এবং ভিস্টুলার ব্রিজ-হেডগুলো ধরে রাখার জন্য কঠোর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। আগের লড়াইগুলোতে জনবলে ও সামরিক সাজসরঞ্জামে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হওয়াতে তারা বহু চেষ্টা সত্ত্বেও শত্রুর প্রতিরক্ষা লাইন ভেদ করে অভ্যুত্থানকারীদের সাহায্যে এগিয়ে যেতে পারল না। সোভিয়েত বিমান বাহিনী কর্তৃক আকাশ পথে গোলাবারুদ আর ঔষধপত্র প্রেরণের ফলে অভ্যুত্থানকারীরা ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে সংগ্রামে কিছুটা সহায়তা পেল। কিন্তু শক্তিতে শ্রেষ্ঠতার অধিকারী নাৎসিরা নির্মমভাবে অভ্যুত্থান দমন করে (দু' লক্ষ লোক নিহত হয়) এবং শহরটি প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়।

আগস্ট মাসে ১ম বেলোরুশ ফ্রন্টের সৈন্যরা ভিস্টুলায় পৌঁছে যায় এবং বিপরীত তীরে মাগ্নুশেভ ও পুলাভা অঞ্চলে দুটি বৃহৎ পাদভূমি দখল করে নেয়। শত্রু যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে পরে ভিস্টুলা-ওডের অপারেশন পরিচালনার পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে ওঠে।

জার্মান 'সেণ্টার' গ্রুপটির পরাজয়ের বিপুল সামরিক, রাজনৈতিক ও স্ট্র্যাটেজিক তাৎপর্য ছিল। এই অপারেশনটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফল

ছিল সমগ্র সোভিয়েত বেলোরুশিয়ার, সোভিয়েত লিথুয়ানিয়ার বড় একটি অংশের এবং মিত্র পোল্যান্ডের পূর্বাংশের মুক্তি। সোভিয়েত ফৌজগুলো নেমান নদী অতিক্রম করে ফ্যাসিস্ট জার্মানির সীমান্তে গিয়ে উপনীত হয়।

নাৎসিদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় বিরাট ভাঙন দেখা দিল। তারা পশ্চিম থেকে জরুরীভাবে ওখানে বিপুল শক্তি (৪৬টি ডিভিশন ও ৪টি ব্রিগেড) প্রেরণ করতে লাগল। আর তা ফ্রান্সে মিত্রদের আক্রমণাভিযানে সাফল্য অর্জনে সহায় হল।

শত্রু শোচনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। বিভিন্ন সময়ে লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারী ৯৭টি ডিভিশন ও ১৩টি ব্রিগেডের মধ্যে ১৭টি ডিভিশন ও ৩টি ব্রিগেড সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। ৫০টি ডিভিশন তাদের অর্ধেকেরও বেশি লোককে হারায়। প্রায় ২,০০০টি জার্মান বিমান ভূপাতিত হয়।

বেলোরুশীয় স্ট্র্যাটেজিক অপারেশনের আয়তন ছিল বিশাল। তাতে অংশ নেয় চারটি ফ্রন্ট। আক্রমণাভিযান চলে ১ হাজার ১ শতাধিক কিলোমিটার দীর্ঘ ও ৬০০ কিলোমিটার অবধি গভীর এক রণাঙ্গন জুড়ে।

বেলোরুশিয়ার মাটিতে জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের পরাজয়ের সুদূরপ্রসারী পরিণাম যুদ্ধের পরবর্তী গতিকে প্রভাবিত করে। ফ্যাসিস্ট জার্মানির অবস্থার উপর বেলোরুশিয়ায় লাল ফৌজের বিজয়ের প্রভাবের মূল্যায়ন করতে গিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল বলেছিলেন: 'অচিরেই যে সার্বিক পতন ঘটবে এ বিষয়ে সন্দেহ করার কারণ কমই ছিল।'*

পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত যোদ্ধারা নাৎসিদের নতুন নতুন রক্তাক্ত অপরাধের কাহিনী জানতে পারল। ওই সমস্ত অপরাধের ঘটনার মধ্যে ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল জার্মান ফ্যাসিজমের পাশবিক চেহারা ও চরিত্র। ২৩ জুলাই ১ম বেলোরুশ ফ্রন্টের সৈন্যরা ল্যুবলিন থেকে দুই কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মাইদানেক মৃত্যু শিবিরটি মুক্ত করে। ওখানে নাৎসি জল্লাদরা তাদের তৈরি মৃত্যু কারখানায় নারী বৃদ্ধ শিশু সহ প্রায় ১৫ লক্ষ লোককে হত্যা করে। এই ভয়ংকর, রোমহর্ষক অপরাধের কাছে এমনকি মধ্যযুগীয় নির্যাতনও হার মানে।

বেলোরুশীয় অপারেশনে পূর্বেকার অপারেশনগুলোর চেয়ে আরও

* Churchill W. The Second World War. Vol. VI. — London, 1954, p. 114.

ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়েছিল সামরিক ক্রিয়াকলাপের এরূপ একটি চূড়ান্ত পদ্ধতি: বড় বড় নাৎসি গ্রুপিংকে পরিবেষ্টন ও ধ্বংস করা। এই ভাবে, অপারেশনের গোড়ার দিকে বেলোরুশিয়ায় অবস্থিত ৬৩টি জার্মান-ফ্যাসিস্ট ডিভিশনের মধ্যে ৪০টিরও বেশি পরিবেষ্টিত হয়েছিল। ওগুলোর বড় একটি অংশ বিধ্বস্ত ও ধ্বংস হয়। এখানে নতুন ব্যাপারটি ছিল এই যে তিন বেলোরুশ ফ্রন্টের সৈন্যদের দ্বারা শত্রুর প্রবল পশ্চাদনুসরণের ফলে মিনস্কের পূর্বে, অগ্রবর্তী লাইন থেকে ২০০ কিলোমিটার গভীরে অবস্থিত জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের ১ লক্ষ ৫ হাজার সৈন্যের একটি গ্রুপিংকে ঘিরে ফেলা সম্ভব হয়েছিল। বেলোরুশ অপারেশনে পূর্বেকার অপারেশনগুলোর চেয়ে অধিকতর অল্প সময়ে শত্রুর পরিবেষ্টিত গ্রুপিংসমূহের বিলোপ ঘটানো হয়েছিল (ভিতেব্‌স্কের নিকটে — দুই দিনে, বব্রুইস্কের নিকটে — তিন দিনে, মিনস্কের উপকণ্ঠে — সাত দিনে)। এর পেছনে কারণটি ছিল এই যে পরিবেষ্টিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুকে অনেকগুলো অংশে বিভক্ত করা হচ্ছিল, আর তাতে সে স্থানান্তরণের উপায় থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল এবং তার প্রতিরোধ ক্ষমতা তীব্রভাবে হ্রাস পাচ্ছিল। এক কথায়, বেলোরুশ অপারেশন ছিল পরস্পরের থেকে দূরে অবস্থিত কয়েকটি এলাকায় একই সময়ে শত্রুর প্রতিরক্ষা লাইন ভাঙনের চমৎকার উদাহরণ। এতে জার্মানদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, প্রশস্ত রণাঙ্গনে প্রয়াস বিকেন্দ্রিত হয় এবং জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী সোভিয়েত ফৌজের আক্রমণাভিযান ব্যর্থকরণের উদ্দেশ্যে বড় রকমের কোন পাল্টা ব্যবস্থা অবলম্বন করার সুযোগ পেল না।

লভোভ-সান্দমির অপারেশন
(১৯৪৪ সালের ১৩ জুলাই-২৯ আগস্ট)

এই অপারেশনটি পরিচালিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল ইভান কনেভের সেনাপতিত্বাধীন ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সৈন্যদের দ্বারা। এর উদ্দেশ্য ছিল — শত্রুর বাহিনীসমূহের 'উত্তর ইউক্রেন' গ্রুপটিকে (অধিনায়ক কর্নেল-জেনারেল ই. গার্পে) বিধ্বস্ত করা, পশ্চিম ইউক্রেন ও পোল্যান্ডের দক্ষিণ-পূর্ব অংশকে মুক্ত করা।

সোভিয়েত সৈন্যদের আক্রমণাভিযানের গোড়ার দিকে শত্রুর হাতে ছিল ৩৪টি ইনফেণ্ট্রি, ৫টি ট্যাঙ্ক, ১টি মোটোরাইজ্‌ড ডিভিশন ও ২টি

ইনফেণ্ট্রি ব্রিগেড। তার মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল ৬ লক্ষাধিক লোক (পশ্চাদ্ভাগের ইউনিটগন্লো সমেত ৯ লক্ষ)। নাৎসি ফৌজগন্লোর কাছে ছিল ৬,৩০০টি তোপ ও মর্টার কামান, ৯০০টি ট্যাঙ্ক ও অ্যাসল্ট গান, ৭০০টি বিমান।

১ম ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের সৈন্যদের কাছে ছিল ৮০টি ইনফেণ্ট্রি ডিভিশন, ১০টি ট্যাঙ্ক ও মেকানাইজ্‌ড কোর, ৪টি স্বতন্ত্র ট্যাঙ্ক ও মেকানাইজ্‌ড ব্রিগেড, সর্বমোট ১০ লক্ষ লোক, ১৬,১০০টি তোপ ও মর্টার কামান, প্রায় ২,০৫০টি ট্যাঙ্ক ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গান, ৩,২৫০টির বেশি বিমান। সন্তরাং শক্তির অনন্পাত ছিল লাল ফৌজের অনন্কূলে: জনবলে — ১·২ গন্ণ, আর্টিলারিতে — ২·৬ গন্ণ, ট্যাঙ্কে — ২·৩ গন্ণ, বিমানে — ৪·৬ গন্ণ।

অপারেশনটি সম্পন্ন হয় দন্ই ধাপে। প্রথম ধাপে (১৩-২৭ জন্লাই) ফ্রণ্টের সৈন্যরা রাভা-রন্স্কায়া ও ল্‌ভোভ অভিমন্খে শত্রন্র প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে, ব্রোদীর দক্ষিণ-পশ্চিমের এক অঞ্চলে ৮টি ডিভিশন নিয়ে গঠিত একটি নাৎসি গ্রন্পিংকে ঘেরাও ও ধন্বংস করে, এবং সান নদী পেরিয়ে রাভা-রন্স্কায়া, পেরেমিশ্‌ল, ল্‌ভোভ ও স্তানিস্লাভ (ইভানো-ফ্রাঙ্কোভস্ক) শহরগন্লো মন্ক্ত করে।

দ্বিতীয় ধাপে (২৮ জন্লাই-২৯ আগস্ট) ফ্রণ্টের সৈন্যরা ল্‌ভোভ-পেরেমিশ্‌ল অভিমন্খ থেকে সান্দমির অভিমন্খে প্রধান প্রয়াস নিয়োগ করে ও শত্রন্র পশ্চাদনন্সরণে লিপ্ত থেকে ভিস্টুলা নদী অবধি পেশছে যায় এবং তা অতিক্রম করে সান্দমির অঞ্চলে সন্বিশাল একটি ব্রিজ-হেড দখল করে নেয়।

ল্‌ভোভ-সান্দমির অপারেশনের ফলে শত্রন্র বাহিনীসমন্হের 'উত্তর ইউক্রেন' গ্রন্পটি বিধন্বস্ত হয়, সমগ্র পশ্চিম ইউক্রেন এবং পোল্যাণ্ডের বড় একটি অংশ মন্ক্ত হয়। জার্মান-ফ্যাসিস্ট হানাদারদের কবল থেকে সমগ্র পোল্যাণ্ড মন্ক্তকরণের কাজটি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পরবর্তী ভিস্টুলা-ওডের অপারেশন পরিচালনার জন্য অনন্কূল পরিস্থিতি গড়ে উঠে।

পশ্চিম ইউক্রেনের মন্ক্তি ইউক্রেনীয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য জাতির এক মহোৎসবে পরিণত হয়। এই ঘটনা উপলক্ষে ওই দিনগন্লোতে ইউক্রেনে সমারোহপন্র্ণ অনেক সভা অনন্ষ্ঠিত হয় যাতে জার্মান-ফ্যাসিস্ট দখলদারদের বিরন্দ্ধে সংগ্রামে প্রভূত সহায়তা আর

সমর্থনের জন্য লোকে কায়মনোবাক্যে বীর সোভিয়েত যোদ্ধাদের প্রতি ও ভ্রাতৃপ্রতিম প্রজাতন্ত্রসমূহের জাতিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

ল্ভোভ-সান্দমির অপারেশনের বৈশিষ্ট্য ছিল বিশাল ব্যাপকতা, নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রধান আঘাতের দিক নির্বাচন ও ওখানে বিপুল শক্তির সমাবেশ, শত্রুর ব্যূহ ভেদের জন্য এবং আক্রমণাভিযানের পরবর্তী গতিবৃদ্ধির জন্য ৪-৬ কিলোমিটার প্রশস্ত সংকীর্ণ এক করিডরে ট্যাংক বাহিনীগুলোর প্রবেশ। অপারেশনটির আরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তাতে শত্রুকে দ্রুত ঘিরে ফেলা হয়, তা চলাকালে প্রয়াসের দিক পরিবর্তন করা হয়, গতিতে থেকে প্রশস্ত রণাঙ্গনে নদীগুলো অতিক্রম করা হয়, ভিস্টুলা তীরে বিশাল ব্রিজ-হেড দখল করে তা নিজের হাতে টিকিয়ে রাখা হয়। বিশেষ আগ্রহজনক ব্যাপার হচ্ছে অনুসন্ধান কার্য সংগঠন যা সময়মতো রাভা-রুস্কায়া অভিমুখে শত্রুর পশ্চাদপসরণের ঘটনাটি শনাক্ত করে এবং তাতে সোভিয়েত ইউনিটগুলো প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণ ছাড়াই তাড়াতাড়ি শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রধান অঞ্চলটি অতিক্রম করার সুযোগ পায়।

অপারেশনের সফল সম্পাদনে বৃহৎ এক ভূমিকা পালন করে বিমান বাহিনী, যা শত্রুর ব্যূহ ভেদে সৈন্যদের বিপুল সহায়তা জোগায়, বিদ্ধ স্থলে মোবাইল ফর্ম্যাশনসমূহের প্রবেশ সুনিশ্চিত করে, শত্রুর পশ্চাদনুসরণের সময় তাদের সঙ্গে থাকে এবং সান্দমির পাদভূমির জন্য সংগ্রামে স্থলসেনাকে ভালো সমর্থন দেয়।

৩। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে ফ্যাসিস্ট জোটের পরাজয়

১৯৪৪ সালের বসন্ত কালে সোভিয়েত সৈন্যরা দক্ষিণে জার্মাণ-ফ্যাসিস্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে বিপুল বিজয় লাভ করে, নীপার ডান তীরস্থ ইউক্রেনকে পুরোপুরিভাবে মুক্ত করে এবং উত্তর রুমানিয়ার মাটিতে পা দেয়। সামরিক ক্রিয়াকলাপ রুমানিয়ার ভূখণ্ডে চলে যাওয়াতে ১৯৪৪ সালের ২ এপ্রিল সোভিয়েত সরকার একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করলেন যাতে বিশেষ করে বলা হয় যে সোভিয়েত ইউনিয়ন 'রুমানীয় ভূখণ্ডের কোন অংশ নিয়ে নিতে অথবা রুমানিয়ায় বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থা বদলাতে চাইছে না; সোভিয়েত সৈন্যরা রুমানিয়ার মাটিতে প্রবেশ করেছে একমাত্র

সামরিক প্রয়োজনে এবং শত্রু ফৌজের অব্যাহত প্রতিরোধের দরুন'।*

রুমানিয়ায় সোভিয়েত সৈন্যদের প্রবেশ এবং সোভিয়েত সরকারের ঘোষণাপত্র রুমানীয় জনগণ ও সৈন্য বাহিনীর যুদ্ধবিরোধী ও ফ্যাসিস্টবিরোধী মনোভাব বৃদ্ধিকরণের উপর বিপুল প্রভাব ফেলে এবং দেশে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন জোরদার করে তোলার কাজে নতুন প্রেরণা জোগায়। অবৈধ সংবাদপত্র 'রমানিয়া লিবেরেয়ে' সোভিয়েত সরকারের ঘোষণাপত্রটির উপর মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছিল: 'সেই চরম মুহূর্তটি এসেছে যখন আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। রুমানীয় জনগণকে নিজের ভাগ্য নিজেকেই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে পড়ার জন্য লড়তে হবে।'

রুমানিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি জনগণকে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এবং সোভিয়েতবিরোধী যুদ্ধ রোধকরণের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হতে আহবান জানায়। তার উদ্যোগে গঠিত যুক্ত শ্রমিক ফ্রণ্টটি দেশের সমস্ত দেশপ্রেমিক শক্তির পরবর্তী সংহতি সাধনের কাজে অতি গুরুত্বপূর্ণ এক ভূমিকা পালন করেছিল।

কিন্তু এ দিকে ক্ষমতাসীন ফ্যাসিস্ট একনায়ক আন্তনেস্কু আগেই রুমানীয় জনগণকে রক্তক্ষয়ী ও অন্যায় যুদ্ধের মুখে ঠেলে দিয়েছিল এবং ১৯৪৪ সালের বসন্তে ব্যাপক হারে নতুন সৈন্যযোজনের কাজ সম্পন্ন করল। রুমানীয় জনগণের শত্রুরা হিটলারকে আগেরই মতো 'কামানের খোরাক' জোগানোর এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজিক সামগ্রী সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত নিল।

রুমানীয় জনগণ যুদ্ধের দরুন কঠোর লাঞ্ছনা ভোগ করছিল। আগেই বলা হয়েছে যে স্তালিনগ্রাদের উপকণ্ঠে এবং ক্রিমিয়ায় জার্মান-ফ্যাসিস্ট সৈন্যদের সঙ্গে রুমানীয় বাহিনীও মার খেয়েছিল। রুমানিয়ার জাতীয় অর্থনীতি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছিল। এ সমস্তকিছু দেশে ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলন বিকাশের জন্য প্রবল প্রেরণা জুগিয়েছিল।

এ দিকে রুমানীয় পুঁজিপতি সম্প্রদায় আর জমিদারেরা জনগণের ঘাড় ভেঙে বিপুল মুনাফা লুটে তাদের নতুন মনিব — ইঙ্গো-মার্কিন

সাম্রাজ্যবাদীদের সেবায় নিয়োজিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। রুমানীয় বুর্জোয়া সম্প্রদায় ও জমিদারদের স্বার্থ রক্ষা করছিল মানিউর জাতীয়-স্যারানিস্ট (কৃষক) পার্টি এবং ব্রাতিয়ানু জাতীয়-উদারনৈতিক পার্টি। এই পার্টিগুলো আন্তনেস্কুর ফ্যাসিস্ট সরকারের সম্মতিক্রমে স্বতন্ত্র শান্তি চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে ইঙ্গো-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য নিজের এক প্রতিনিধিকে কায়রোতে পাঠায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর ব্রিটেনের ধনকুবেররা রুমানিয়ার সঙ্গে এরূপ যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি সম্পাদন করতে সম্মত হল এবং তারা ফ্যাসিস্ট জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে রুমানিয়ার অংশগ্রহণ দাবি করল না ও আন্তনেস্কুকে ক্ষমতায় রেখে দিতে সম্মত হল।

সোভিয়েত ফৌজের দ্রুত অগ্রগতি এই সমস্ত পরিকল্পনাকে বানচাল করে দেয়। রুমানিয়ার ভূখণ্ডে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর আগমন ঘটলে সোভিয়েত সরকার রুমানিয়ার অবিলম্বিত আত্মসমর্পণ দাবি করলেন এবং তাকে ফ্যাসিস্ট জোট থেকে বেরিয়ে গিয়ে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বললেন।

প্রতিক্রিয়াশীল রুমানীয় সরকার ও জনগণবিরোধী পার্টিগুলো সর্বোপায়ে যুদ্ধ বন্ধকরণের কাজ স্থগিত রাখছিল, অচিরে দেশকে যুদ্ধ থেকে বের করে আনার জন্য সম্মিলিত সংগ্রাম পরিচালনার বিষয়ে রুমানিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি এবং যুক্ত শ্রমিক ফ্রন্টের একাধিক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দিচ্ছিল। কেবল ১৯৪৪ সালের জুন মাসে, যখন রুমানিয়ার ভূখণ্ডে অবস্থিত নাৎসি বাহিনীর পরাজয়ের অবশ্যম্ভাবিতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, প্রতিক্রিয়াশীল মহলের নেতারা চারটি পার্টিকে নিয়ে একটি জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট গঠন করতে রাজী হল। এই পার্টিগুলো হল: কমিউনিস্ট পার্টি, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি, জাতীয়-স্যারানিস্ট পার্টি ও জাতীয়-উদারনৈতিক পার্টি। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক ও ফ্যাসিস্টবিরোধী সংগঠনগুলো দেশে ফ্যাসিস্ট প্রশাসনের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম জোরদার করে তোলে।

জারতন্ত্রী বুলগেরিয়ায়ও রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিবেশ বিরাজ করছিল। নিস্টার নদীর তীরে ও উত্তর রুমানিয়ায় সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর আগমন বুলগেরীয় শাসক মহলে বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রাট ডেকে আনে।

ফিলোভের* নেতৃত্বাধীন বুলগেরীয় বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের একাংশ — যা ফ্যাসিস্ট জার্মানির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ ছিল — নাৎসি জার্মানির সঙ্গে জোটটি টিকিয়ে রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করছিল, — তারা এটা ভেবেছিল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন হিটলারবাদের পূর্ণ পতন ঘটতে দেবে না। বাগ্রিয়ানোভের** নেতৃত্বাধীন তার অপর অংশটি ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনী কর্তৃক নিজের দেশ দখলের দ্বারা নিজেকে ও বুলগেরিয়ায় ফ্যাসিস্ট প্রশাসনকে রক্ষা করার কথা ভাবছিল। বাগ্রিয়ানোভের সরকার আয়োজিত আলাপ-আলোচনায় ইঙ্গো-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা তার অভিপ্রায়কে পুরোপুরিভাবে সমর্থন করে। একই সঙ্গে এই প্রতিক্রিয়াশীল সরকার বুলগেরিয়ার ভূখণ্ডে ইঙ্গো-মার্কিন ফৌজের আগমন অবধি সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের দক্ষিণাংশে যাতে জার্মান-ফ্যাসিস্ট সৈন্যরা টিকে থাকতে পারে তার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল।

ঠিক এই কারণেই সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বুলগেরিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বুলগেরীয় ফ্যাসিস্টপন্থী সরকার ক্রিমিয়া ও ইউক্রেন থেকে পলায়িত নাৎসি সৈনিক আর অফিসারদের আশ্রয় দিচ্ছিল। এবং শুধু তা-ই নয়, জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী সোভিয়েত ভূখণ্ড থেকে নিজেদের বিধ্বস্ত ইউনিটসমূহকে অপসারণের জন্য বুলগেরীয় পরিবহন ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছিল, আর বুলগেরীয় বিমান ও সমুদ্র বন্দরগুলোকে ব্যবহার করছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সামরিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনার জন্য। ১৯৪৪ সালের জুন মাসে ভার্না বন্দরে অবস্থিত ছিল ২ সহস্রাধিক জার্মান সৈনিক, সাবমেরিন সহ ৫০-৬০টি জার্মান যুদ্ধ-জাহাজ ও ১০-১২টি জলবিমান।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি জারতন্ত্রী বুলগেরিয়ার অমিত্রভাবাপন্ন আচরণের জন্য সোভিয়েত সরকার একাধিক বার বুলগেরীয় সরকারের

* ফিলোভ — ১৯৪৩ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বুলগেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী, ১৯৪৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৪৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত — রিজেন্ট পরিষদের সদস্য।

** বাগ্রিয়ানোভ — ১৯৪৪ সালের ১ জুন থেকে ১৯৪৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বুলগেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী।

কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং জার্মানিকে সামরিক সহায়তা দানে তার বিরত থাকার দাবি জানান। কিন্তু বুলগেরীয় সরকার আগেরই মতো জনগণবিরোধী, হিটলারপন্থী নীতি অনুসরণ করে চলছিল।

১৯৪৪ সালের গ্রীষ্ম নাগাদ বুলগেরিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য তিন গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পায়। শ্রমিক ও কর্মচারিদের বেতনের মান তীব্রভাবে হ্রাস পায়। কৃষকদের উপর চলছিল নির্মম অবিচার, — বিনামূল্যে তাদের জিনিসপত্র, ফসল, হাঁসমুরগি ইত্যাদি নিয়ে যাওয়া হত।

বুলগেরিয়ার শাসক মহলগুলোর জনগণবিরোধী নীতি এবং দেশের সংকটজনক অর্থনৈতিক অবস্থা জনসাধারণের মধ্যে গভীর বিক্ষোভ ডেকে আনে। বুলগেরিয়ায় শুরু হয় ব্যাপক ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলন। হাজার হাজার শ্রমিক ও কৃষক ভর্তি হচ্ছিল পার্টিজান দলগুলোতে। ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে বুলগেরিয়ায় লড়ছিল ১৮,৩০০ লোকের ১১টি পার্টিজান ব্রিগেড ও ৩৭টি পার্টিজান দল।

সোফিয়া শহরের পুলিশ বিভাগের অসম্পূর্ণ তথ্য অনুসারে, ১৯৪৪ সালের কেবল এক জুন মাসেই প্রতিশোধকামীদের সামরিক কেন্দ্রগুলোর উপর ৪১৫ বার সশস্ত্র হামলা চালায় এবং ৯৮৯টি জার্মান ও বুলগেরীয় ফ্যাসিস্টকে ধ্বংস করে।

পার্টিজানদের সঙ্গে লড়ছিল লক্ষাধিক লোকের বুলগেরীয় সৈন্য বাহিনীটি। কিন্তু দেশে পার্টিজান আন্দোলন দমনের জন্য ফ্যাসিস্টপন্থী সরকার যে-সমস্ত প্রচেষ্টা চালায় তা ব্যর্থ হয়। বুলগেরীয় জনগণ দেশে ফ্যাসিস্ট প্রশাসনের বিরুদ্ধে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে শান্তি ও মৈত্রীর জন্য সফল সংগ্রাম চালিয়ে যায়।

এই ভাবে, ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মের শেষ নাগাদ রুমানিয়ায় ও বুলগেরিয়ায় সামরিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অতি উত্তেজনাপূর্ণ। এই দুটি দেশে ক্রমবর্ধমান ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্যে জার্মান সেনাপতিমণ্ডলী সমস্ত ব্যবস্থাই অবলম্বন করেছিল, কিন্তু তাতে কোন ফল মেলে নি। ব্যাপক মানুষ ফ্যাসিস্ট প্রশাসন ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে আরও ব্যাপকভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যায়। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে অদূর ভবিষ্যতে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী তাদের দেশকে ফ্যাসিস্ট প্রশাসন ও নাৎসি দখলদারদের কবল থেকে মুক্ত করবে।

বলকান দখলে রাখার ব্যাপারে জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলীর

পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছিল অধিকৃত সোভিয়েত মোলদাভিয়ার উপর। মোলদাভিয়া বলকান রক্ষাকারী ফ্যাসিস্ট ফৌজের কেবল অবস্থান স্থলই ছিল না, তাদের খাদ্যদ্রব্যের ঘাঁটিও ছিল।

জার্মান-রুমানীয় ফৌজ সোভিয়েত মোলদাভিয়া দখল করে নিয়ে ওখানে রক্তাক্ত সন্ত্রাস চালায়। তিন বছরের 'কর্তৃত্ব কালে' ফ্যাসিস্ট জল্লাদরা বিনা বিচারে ও বিনা তদন্তে ৬৫ সহস্রাধিক লোককে হত্যা করে ও যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলে, এবং ৪৯ সহস্রাধিক বাসিন্দাকে দাস বানিয়ে জার্মানিতে নিয়ে যায়।

দখলের বছরগুলোতে ফ্যাসিস্ট হানাদারেরা মোলদাভীয়-রুমানীয় জাতীয়তাবাদীদের সহায়তায় মোলদাভিয়া থেকে লক্ষ লক্ষ টন কৃষিজাত দ্রব্য, কয়েক লক্ষ পশু, সমস্ত ট্র্যাক্টর ও কম্বাইন, কলকারখানার সাজসরঞ্জাম নিয়ে চলে যায়। ফ্যাসিস্টরা মোলদাভিয়ার অনেকগুলো শহরকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেয়। জার্মান-ফ্যাসিস্ট দখলদারেরা সোভিয়েত মোলদাভিয়ার যে বৈষয়িক ক্ষতি সাধন করে তার পরিমাণ ছিল ১৬ শ' কোটিরও বেশি রুবল।

ফ্যাসিস্ট দখলদারদের স্বেচ্ছাচারিতা মোলদাভীয় জনগণকে ভীষণ বিক্ষুব্ধ করে তোলে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত জাতির সঙ্গে মোলদাভীয় জনগণও নিজের মুক্তি আর স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হয়। যুদ্ধের প্রথম দিনগুলোতেই হাজার হাজার স্বদেশপ্রেমিক স্বেচ্ছায় লাল ফৌজে ভর্তি হয়। সোভিয়েত মোলদাভিয়া দখলীকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় পার্টিজান আন্দোলন, আর মোলদাভিয়ার প্রায় সমস্ত শহরে সংগঠিত হয় গুপ্ত পার্টি দলগুলো।

গুপ্ত কর্মী আর পার্টিজানরা শত্রুর প্রভূত ক্ষতি সাধন করছিল। তারা রেল সড়কে বড় বড় অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করছিল, মিলিটারি ট্রেনগুলোকে লাইনচ্যুত করে দিচ্ছিল, পুল আর গুদাম উড়িয়ে দিচ্ছিল। এর সঙ্গে সঙ্গে পার্টিজান আর গুপ্ত কর্মীরা নাৎসিদের মিথ্যা প্রচারের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ে মোলদাভীয় জনগণের মনে দৃঢ় বিশ্বাস গড়ে তুলছিল এবং ব্যাপক মানুষকে হানাদারদের সঙ্গে সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করছিল। প্রথমে গঠিত হয় পাঁচটি পার্টিজান দল, আর দলগুলো বর্ধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওগুলো দিয়ে গড়া হয় দু'টি পার্টিজান ফর্ম্যাশন। ১৯৪৩-১৯৪৪ সালে এই ফর্ম্যাশনগুলো শত্রুর ২৬ সহস্রাধিক সৈনিক ও অফিসারকে ধ্বংস করে, নাৎসিদের ৩০০টি ট্রেনকে লাইনচ্যুত করে, বহু

সেতু ও গুদাম উড়িয়ে দেয়, শত্রুর প্রচুর সামরিক সাজসরঞ্জাম ধ্বংস করে।

পার্টিজান ও গুপ্ত কর্মীরা মোলদাভিয়ার মেহনতীদের কাছে বিপুল সহায়তা ও সমর্থন পাচ্ছিল। প্রতিশোধকামীরা লাল ফৌজের আক্রমণরত ইউনিটসমূহকে যথেষ্ট সাহায্য করছিল।

জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী পার্টিজানদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি পিটুনি অপারেশন চালায়, কিন্তু ওগুলোর একটিও সফল হয় নি। তখন তারা মোলদাভিয়ার সমগ্র ভূখণ্ডকে আর্মি কোরের সংখ্যানুযায়ী এক-একটি অঞ্চলে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নিল। পার্টিজানদের সঙ্গে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য প্রতিটি অঞ্চলে বিশেষ সদর-দপ্তর গঠিত হয়। এরূপ সদর-দপ্তরের অধীনে ছিল বিশেষ সামরিক গ্রুপ। 'দুমিত্রেস্কু' আর্মি গ্রুপের সেনাপতির নির্দেশে ১৫৩তম শিক্ষামূলক ফিল্ড ডিভিশনটি এবং বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত ৬২তম আর্মি কোরটি পার্টিজানদের সঙ্গে সংগ্রামের কাজে নিযুক্ত হয়। মোলদাভিয়ার অনেকগুলো অঞ্চলে, বিশেষত কিশিনেভের পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বনে, কঠোর লড়াই শুরু হয়, কিন্তু নাৎসিরা কিছুতেই পার্টিজান আন্দোলন দমন করতে পারে নি।

নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলী যেকোন উপায়ে রুমানিয়া, বুলগেরিয়া ও বলকান উপদ্বীপের অন্যান্য দেশকে নিজের দখলে রাখার চেষ্টা করছিল, — এই সমস্ত দেশ ফ্যাসিস্ট জার্মানিকে জোগাচ্ছিল জ্বালানি আর খাদ্যদ্রব্য। হিটলার কোন এক সভায় বলেছিল: 'রুমানিয়ার তেল না হারিয়ে আমি বরং বেলোরুশিয়ার বন হারাতে রাজী আছি।' রুমানিয়াকে জার্মানির প্রয়োজন ছিল 'কামানের খোরাক' সরবরাহকারী হিশেবেও। রুমানীয় সৈন্য বাহিনীর বিপুল শক্তি মোতায়েন ছিল সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে।

রুমানিয়া এবং বলকান দেশসমূহের ক্ষেত্রে মার্কিন এবং বিশেষত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদেরও নিজেদের বিশেষ বিশেষ পরিকল্পনা ছিল। তারা বলকানে লাল ফৌজের আগমনের আগে বলকান দখল করার এবং এতদঞ্চলে গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের বিজয়ে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছিল। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন: '১৯৪৩ সালের গ্রীষ্ম কালে আমাদের সিসিলিতে ও ইতালিতে প্রবেশ করার পর থেকে আমি বলকানের কথা এবং বিশেষ করে যুগোস্লাভিয়ার কথা মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারি নি।'* মার্কিন সাংবাদিক র. ইনগেরসলের

---

* Churchill W. The Second World War. Vol. V. — London, 1952, p. 410.

উক্তি অনুসারে, 'বলকান দেশসমূহ ছিল সেই চুম্বক, যার দিকে অপরিবর্তিতভাবে ঘুরত ব্রিটিশ স্ট্র্যাটেজির কাঁটা, তা কম্পাসটি যেভাবেই ঝাঁকানো হত না কেন।'* চার্চিল তাঁর 'বলকান পরিকল্পনা' বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কেবল ব্রিটিশ আর মার্কিনই নয়, তুর্কী সৈন্যদেরও কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। ইঙ্গো-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের এই সমস্ত পরিকল্পনা বলকান দেশগুলোর জাতিসমূহের জন্য খুবই বিপজ্জনক ছিল।

নিজেদের রণাঙ্গনের দক্ষিণ পার্শ্বে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গঠন করতে গিয়ে জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী বিপুল গুরুত্ব আরোপ করছিল বলকানের পথ রোধকারী ইয়াস্‌সি-কিশিনেভ অভিমুখের উপর এবং এখানে প্রচুর সৈন্যের সমাবেশ ঘটিয়েছিল।

স্রাজা, পাশকানি ও নিস্টার নদী বরাবর কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত যুদ্ধ-সীমায় প্রতিরক্ষারত ২য় ও ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সৈন্যদের সামনে জার্মানরা তিনটি অঞ্চল নিয়ে গঠিত সুদৃঢ় ও গভীর একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়েছিল। তিগর্ু-নিয়ামু, তিগর্ু-ফ্রুমোস, ইয়াস্‌সি ও পকশানি শহরগুলো পরিণত হয়েছিল মজবুত সামরিক ঘাঁটিতে, আর বেন্দেরি ও আকের্মান শহরগুলো — দুর্গে। নিস্টার, প্রুত ও সেরেত নদীগুলোর পশ্চিম তীরে শত্রু সুদৃঢ় প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান তৈরি করেছিল।

২য় ও ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষায় লিপ্ত ছিল ফ্যাসিস্ট বাহিনীসমূহের 'দক্ষিণ ইউক্রেন' গ্রুপটি। তা গঠিত হয়েছি 'ভেলের' আর্মি গ্রুপ (৮ম জার্মান, ৪র্থ রুমানীয় বাহিনী ও জার্মানদের ১৭শ স্বতন্ত্র কোর) এবং 'দুমিত্রেস্কু' আর্মি গ্রুপ (৬ষ্ঠ জার্মান ও ৩য় রুমানীয় বাহিনী) নিয়ে। 'দক্ষিণ ইউক্রেন' গ্রুপে ছিল সর্বমোট ৪৭টি ডিভিশন (২৫টি জার্মান ও ২২টি রুমানীয়) ও ৫টি ব্রিগেড, ৭,৬০০টি তোপ ও মর্টার কামান, ৪০৪টি ট্যাঙ্ক ও ৮১০টি বিমান। শত্রু সৈন্যের মোট সংখ্যা ছিল ৯ লক্ষাধিক লোক।

২য় ও ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টগুলোর (অধিনায়ক জেনারেল র. মালিনোভ্‌স্কি ও জেনারেল ফ. তল্‌বুখিন) সৈন্যদের সুসজ্জিত অবস্থান ছিল। উভয় ফ্রন্টে ছিল ৯০টি ডিভিশন, ৬টি ট্যাঙ্ক ও মেকানাইজ্‌ড কোর, বিপুল সংখ্যক আর্টিলারি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য বিশেষ ফর্ম্যাশন

* ইনগেরসল র.। সম্পূর্ণ গোপনীয়। ইংরেজী থেকে অনুবাদ। — মস্কো: বিদেশী সাহিত্য প্রকাশনালয়, ১৯৪৭, পৃঃ ৯৪।

আর ইউনিট। ফ্রন্টগুলোর কাছে ছিল ৭৬ ও ততোধিক মিলিমিটার ক্যালিবরের ১৬ হাজার তোপ ও মর্টার কামান (বিমানবিধ্বংসী কামান এর মধ্যে ধরা হয় নি), ১,৮৭০টিরও বেশি ট্যাঙ্ক ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্টগান, প্রায় ২,২০০টি বিমান (কৃষ্ণ সাগরীয় নৌ-বহরের বিমানগুলো সহ)। মোট সৈন্য সংখ্যা ১২ লক্ষ ৫০ সহস্রাধিক গিয়ে পৌঁছেছিল।

শত্রুর বিরুদ্ধে সোভিয়েত ফৌজের শ্রেষ্ঠতা ছিল জনবলে —১·৪ গুণ, আর্টিলারিতে —২·১ গুণ, ট্যাঙ্কে —৪·৭ গুণ, বিমানে —২·৭ গুণ।

সোভিয়েত সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর সদর-দপ্তরের ইয়াস্‌সি-কিশিনেভ অপারেশন পরিচালনার উদ্দেশ্যটি ছিল এরূপ: ২য় ও ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সৈন্যদের দ্বারা ইয়াস্‌সির উত্তর-পশ্চিমে ও বেন্দেরির দক্ষিণে অবস্থিত অঞ্চলগুলো থেকে একই অভিমুখে দু'টি প্রবল আঘাত হেনে শত্রুর ইয়াস্‌সি-কিশিনেভ গ্রুপিংটিকে পরিবেষ্টন ও ধ্বংস করা। পরে ফকশানি, গালাৎস ও ইজমাইল অভিমুখে উভয় ফ্রন্টের আক্রমণাভিযান চালানোর কথা ছিল।

সর্বোচ্চ সদর-দপ্তরের এই পরিকল্পনাটি লক্ষ্যনিষ্ঠতা ও অটলতার বিচারে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। প্রধান আঘাতের দিকগুলো নির্বাচনের বিশেষ তাৎপর্য ছিল, — এখানে আঘাত হেনে সোভিয়েত ফৌজ সাফল্য লাভ করলে 'দক্ষিণ ইউক্রেন' গ্রুপের প্রধান শক্তি ৬ষ্ঠ জার্মান বাহিনীটি পরিবেষ্টিত হবে, ৩য় ও ৪র্থ রুমানীয় বাহিনীগুলো তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং ওগুলো আলাদা-আলাদাভাবে ধ্বংস হবে। প্রধান আঘাতগুলো পড়েছিল শত্রুর গ্রুপিং ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে দুর্বল জায়গাগুলোর উপর: ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের এলাকায় — তির্গু-ফ্রুমোস ও ইয়াস্‌সি সুদৃঢ় অঞ্চলগুলোর মাঝখানে, আর ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের এলাকায় — জার্মান-ফ্যাসিস্ট ও রুমানীয় সৈন্যদের (৬ষ্ঠ জার্মান ও ৩য় রুমানীয় বাহিনীগুলোর) সংযোগ স্থলে। প্রুত নদীকে যুদ্ধ-সীমা হিশেবে বেছে নেওয়া হয় (ওখানেই পরিবেষ্টন সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল), এবং তাতে শত্রুর কিশিনেভ গ্রুপিংয়ের পশ্চাদপসরণের পথগুলো রোধকরণের সমস্যা সমাধানের কাজটি সহজ হয়ে যায়।

উভয় ফ্রন্টে আর্টিলারির আক্রমণাভিযান পরিকল্পিত হয়েছিল তিনটি কাল পর্যায়ের জন্য। ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টে প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণের জন্য

নির্ধারিত সময় ছিল ৯০ মিনিট, আর ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টে — ১০৫ মিনিট।

উভয় ফ্রণ্টের বিমান বাহিনীর কর্তব্য ছিল — অপারেশনের প্রথম দুই-তিন দিনে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদকরণে স্থলসেনাকে সহায়তা করা এবং বিদ্ধ স্থলে মোবাইল বাহিনীগুলোর প্রবেশ নিশ্চিত করা। পরবর্তী দিনগুলোতে তার কাজ ছিল — মোবাইল ফর্ম্যাশনগুলোকে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গভীরে ঢুকতে সাহায্য করা এবং তার প্রতিরোধ কেন্দ্রগুলোর উপর, পশ্চাদপসরণরত সৈন্যদের উপর, রেল ঘাঁটিসমূহ আর পাড়ি-ব্যবস্থার স্থানগুলোর উপর সামরিক ক্রিয়াকলাপ চালানো।

অপারেশনের প্রস্তুতির বৈশিষ্ট্যাবলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অপারেশনেল ক্যামুফ্লেজের ব্যাপারে সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী গৃহীত ব্যবস্থাদি। এর উদ্দেশ্য ছিল — আক্রমণাভিযানের প্রস্তুতি গোপন রাখা, সোভিয়েত সৈন্যদের প্রধান আঘাতের দিকগুলো সম্পর্কে ভ্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা। এই ভাবে, ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের সেনাপতিমণ্ডলী ফ্রণ্টের ডান অংশের নিকটে, রোমান শহর অভিমুখে আক্রমণকারী একটি গ্রুপিংয়ের মেকি সমাবেশ আয়োজন করলেন। ওখানে যাচ্ছিল প্রধান মোটর ও রেল সড়ক। ওখানে প্রস্তুত ও স্থাপন করা হয় ৬০টি নকল ট্যাঙ্ক ও ৪০০টি নকল কামান, তির্গু-ফ্রুমোস সুদৃঢ় অঞ্চলের পিল-বক্সগুলোর উপর নিয়মিত গোলাবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে চলে ব্যাপক অনুসন্ধান কার্য। ফ্রণ্টের বাঁ অংশেও একটি আক্রমণকারী গ্রুপিংয়ের কৃত্রিম সমাবেশ দেখানো হয়। এ সমস্তকিছু শত্রুর মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করে দেয়। সে ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের প্রধান আঘাতের দিকটি নির্ণয় করতে পেরেছিল অপারেশন আরম্ভ হওয়ার মাত্র একদিন আগে, এবং সেই হেতু জার্মানরা গুরুত্বপূর্ণ কোন পাল্টা ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে সক্ষম হয় নি।

৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টেও ফৌজের আক্রমণকারী গ্রুপিংয়ের নকল সমাবেশ কাজ চলছিল সহায়ক অভিমুখে, ৫ম আক্রমণকারী বাহিনীর এলাকায়। ওখানেও লড়াই মাধ্যমে সক্রিয় অনুসন্ধান কার্য চালাচ্ছিল, আর ১৭শ বিমান বাহিনী মাঝেমধ্যে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপর আঘাত হানছিল। এই ব্যবস্থাগুলো এতই ফলপ্রসূ ছিল যে শত্রু ৫ম আক্রমণকারী বাহিনীটির বিরুদ্ধে ৬ষ্ঠ জার্মান বাহিনীর বিপুল শক্তিকে মোতায়েন রাখতে বাধ্য হয়েছিল। আর এ ব্যাপারটি বেন্দেরির দক্ষিণে অবস্থিত পাদভূমি থেকে — ওখানেই ফ্রণ্ট তার প্রধান আঘাত হানছিল — শত্রুর

প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদকরণের কাজে সোভিয়েত সৈন্যদের সাফল্য অর্জনে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের সদর-দপ্তরের প্রাক্তন অধিকর্তা কর্নেল-জেনারেল স. বিরিউজোভ স্মরণ করেন, 'সমস্তকিছুই করা হয়েছিল অতি নিখুঁতভাবে।... আমরা নিশ্চিত হতে পেরেছিলাম যে অপারেশনেল ক্যামুফ্লেজের সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সার্থক প্রতিপন্ন হয়েছিল। শত্রু তার প্রতিরক্ষা ব্যূহ বিদ্ধ হওয়ার মুহূর্তেই কেবল নয়, এমনকি আমাদের আক্রমণাভিযানের দ্বিতীয় দিনেও কিশিনেভ অভিমুখেই প্রধান আঘাতের অপেক্ষা করছিল।... কঠোর লড়াইয়ের দ্বিতীয় দিনের কেবল শেষ দিকেই শত্রু নিজের সংকটময় অবস্থার কথা বুঝতে পেরেছিল।'*

আক্রমণাভিযান আরম্ভ হওয়ার আগে সোভিয়েত বাহিনীগুলোতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হচ্ছিল সৈন্যদের রুমানিয়ার প্রতি সোভিয়েত রাষ্ট্রের নীতি শেখানোর দিকে। যোদ্ধাদের কাছে ব্যাখ্যা করা হচ্ছিল যে সোভিয়েত সরকার রুমানিয়ার প্রতি যে-নীতি অনুসরণ করছেন তা সোভিয়েত মাটিতে রুমানীয় বাহিনী কৃত কুকর্মের জন্য প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে নয়, নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তার — অর্থাৎ জার্মান ফ্যাসিজমকে বিধ্বস্তকরণের প্রয়োজনীয়তার তাগিদে। সোভিয়েত সৈন্যদের বলা হচ্ছিল যে রুমানীয় মেহনতী মানুষ এবং সোভিয়েত জনগণের বিরুদ্ধে রুমানীয় সৈনিকদের প্রেরণকারী যুদ্ধাপরাধীদের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। এ কথাটিতে জোর দেওয়া হচ্ছিল যে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী রুমানিয়ায় প্রবেশ করছে বিজেতা হিশেবে নয়, ফ্যাসিস্ট শাসনের কবল থেকে রুমানীয় জনগণের মুক্তিদাতা হিশেবে, মেহনতী মানুষের রক্ষক হিশেবে।

অপারেশনের প্রস্তুতির পর্বে ২য় ও ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের সৈন্যদের বিপুল সহায়তা জুগিয়েছিল সোভিয়েত মোলদাভিয়ার মেহনতীরা। তারা পুনর্নির্মিত করে ৫৮টি রেল সেতু, মেরামত করে ৭ শতাধিক কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথ, ২ হাজার ৩ শতাধিক মোটর গাড়ি, বৃহৎ সংখ্যক কামান ও ট্যাংক। হাজার হাজার লোক অংশগ্রহণ করেছিল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও বিমানবন্দর নির্মাণের কাজে, রণক্ষেত্রের মোটর সড়ক ও সেতু পুনর্স্থাপনের

কাজে। মোলদাভীয়রা সৈন্যদের জন্য সরবরাহ করেছিল কয়েক হাজার টন গম ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য।

২০ আগস্ট সকালে প্রবল প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণ ও বোমাবর্ষণের পর ২য় ও ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের সৈন্যরা আক্রমণাভিযান আরম্ভ করে।*

২য় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের আক্রমণকারী গ্রুপিংয়ের ফর্ম্যাশনগুলো দিনের প্রথমার্ধে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহের দুটি লাইন ভেদ করে ফেলে। বিদ্ধস্থলে প্রবিষ্ট ৬ষ্ঠ ট্যাঙ্ক বাহিনী দিনান্তে মারে পর্বত শ্রেণী বরাবর অবস্থিত জার্মান তৃতীয় প্রতিরক্ষা লাইনটির কাছাকাছি পৌঁছে যায় এবং ওখানে সে নাৎসি পদাতিক ও ট্যাঙ্ক ফৌজের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়।

৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের সামরিক ক্রিয়াকলাপও সাফল্যের সঙ্গে চলছিল। সৈন্যরা এত যুগপৎ ও ক্ষিপ্র আক্রমণ চালায় যে শত্রু একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে এবং প্রথম ট্রেঞ্চগুলোতে প্রবল প্রতিরোধ দিতে পারে নি। দিনের শেষে ফ্রণ্টের সৈন্যরা জার্মানদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রধান লাইনটি ভেদকরণের কাজ সম্পন্ন করে এবং স্থানে স্থানে শত্রুর দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা লাইনে ঢুকে পড়ে।

অপারেশনের দ্বিতীয় দিনে, ২১ আগস্ট তারিখে, ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের সৈন্যরা রুমানিয়ার বৃহৎ প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র — ইয়াস্সি শহরটি অধিকার করে ফেলে, এবং তারপর শত্রুর তিনটি প্রতিরক্ষা লাইনের সবগুলো অতিক্রম করে অপারেশনেল উন্মুক্ত ক্ষেত্রে এগিয়ে যায়। ওই দিনই বিদ্ধস্থলে ঢোকানো হয়েছিল অশ্বারোহী-মেকানাইজ্ড গ্রুপ ও ১৮শ ট্যাঙ্ক কোর।

৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের সৈন্যরা সে দিন বিদ্ধস্থলে ঢোকায় ৭ম ও ৪র্থ রক্ষী মেকানাইজ্ড কোরকে, শত্রুর ১৩শ ট্যাঙ্ক ডিভিশনকে বিধ্বস্ত করে দেয় এবং ৩০ কিলোমিটার গভীরতা অবধি ঢুকে পড়ে ৬ষ্ঠ জার্মান বাহিনীটির ৩য় রুমানীয় বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার বাস্তব সম্ভাবনা সৃষ্টি করে।

পরবর্তী দিনগুলোতে উভয় ফ্রণ্টের সৈন্যরা তাদের প্রবল আক্রমণাভিযান অব্যাহত রাখে। ২৩ আগস্ট তারিখে ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের ১৮শ ট্যাঙ্ক কোরটি হুশি অঞ্চলে প্রুত নদীতে পৌঁছে যায়। ৩য় ইউক্রেনীয়

* ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টে বিমান থেকে প্রাগাক্রমণ বোমাবর্ষণ পরিচালনা করা হয় নি।

ফ্রণ্টের মেকানাইজ্‌ড কোরগুলো দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়ে লেওভো অঞ্চলের উত্তরে প্রুত নদীতে পেীছয় এবং উত্তর-পূর্ব দিক বরাবর একটি প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করে। শত্রুর কিশিনেভ গ্রুপিংটির প্রুতের অপর তীরে পশ্চাদপসরণের পথ রোধ করে দেওয়া হয়। পরের দিন মিলিত দুই ফ্রণ্টের মোবাইল ফৌজগুলো যৌথ প্রয়াসে হুশি ও ফেলচিউ অঞ্চলে প্রুতের পাড়ি-ব্যবস্থা দখল করে নেয়। এর ফলে শত্রুর কিশিনেভ গ্রুপিংটির পরিবেষ্টন সম্পন্ন হয়। ১৮টি জার্মান ডিভিশন 'অগ্নিকুণ্ডে' পতিত হয়।

৬৪তম মেকানাইজ্‌ড ব্রিগেডের ২য় মোটোরাইজ্‌ড ইনফেণ্ট্রি ব্যাটেলিয়নের কমসোমল নেতা সিনিয়র সার্জেণ্ট ইয়াকিমোভ লাল পতাকাটি উঁচিয়ে ধরেন এবং সোভিয়েত-রুমানীয় সীমান্তে তা স্থাপন করে সৈনিক আর অফিসারদের এই কথাগুলো বলেন:

'এই লেনিনীয় লাল পতাকাটি আমাদের সোভিয়েত সীমান্তে স্থাপন করছি। এই পতাকাটি হবে আমাদের বীর লাল ফৌজের বিজয়ের প্রতীক এবং নতুন নতুন বীরত্বপূর্ণ ক্রিয়াকলাপে আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। কমরেড সৈনিক আর অফিসারগণ, আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করেছি, কিন্তু আমরা সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক প্রদত্ত দায়িত্বটির কথা ভুলতে পারি না,— শত্রুকে আমাদের অক্লান্তভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং তার নিজস্ব ডেরায় তাকে খতম করতে হবে। ওই দেখুন, প্রুত নদীর ও-পারেই শত্রুর ডেরা শুরু হচ্ছে। সোভিয়েত যোদ্ধারা, শত্রুকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে প্রুতের ও-পারে চলুন!' এই কথাগুলো উচ্চারিত হওয়ার পর ২য় মোটোরাইজ্‌ড ইনফেণ্ট্রি ব্যাটেলিয়নের সৈনিক আর অফিসারেরা প্রুত নদী অতিক্রমণ আরম্ভ করে এবং ৩০ মিনিটে সে কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়।

২৪ আগস্ট জেনারেল ন. বের্জারিনের ৫ম আক্রমণকারী বাহিনীর সৈন্যরা সোভিয়েত মোলদাভিয়ার রাজধানী কিশিনেভ মুক্ত করে। জার্মান ও রুমানীয় দখলদার সৈন্যদের হাতে লাঞ্ছিত শহরবাসীরা মুক্তিদাতাদের সাদর অভ্যর্থনা জানায়।

৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের বাঁ পার্শ্বে ৪৬তম বাহিনীর সৈন্যরা কৃষ্ণ সাগরীয় নৌ-বহর ও ডানিয়ুব ফ্লোটিল্যার সঙ্গে সহযোগিতায় ২৩ আগস্ট আকের্মান অঞ্চলে ৩য় রুমানীয় বাহিনীটিকে পরিবেষ্টিত করে এবং পরের দিন বন্দী করে ফেলে।

পরে উভয় ফ্রণ্টের সৈন্যরা শত্রুর কিশিনেভ গ্রুপিংটির বিলোপ

সাধনের কাজে হাত দেয় এবং একই সঙ্গে বুখারেস্ট ও ইজমাইল অভিমুখে আক্রমণাভিযান চালাতে থাকে।

প্রুত নদীর বাঁ তীরে অবরুদ্ধ শত্রুকে ধ্বংস করার দায়িত্ব সদর-দপ্তর কর্তৃক ন্যস্ত হয়েছিল ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের উপর, আর ডান তীরে—২য় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের ৫২তম বাহিনীর উপর।

প্রচণ্ড লড়াইয়ের ফলে শত্রুর পরিবেষ্টিত ফৌজগুলো ধ্বংস কিংবা বন্দী হয়েছিল। শত্রুর সৈনিক ও অফিসারদের কেবল অনতিবৃহৎ একটি গ্রুপ বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে যেতে পেরেছিল, কিন্তু অচিরে তা-ও বিলুপ্ত হয়।

শত্রুকে পরিবেষ্টন ও বিলোপ করার কাজে স্থলসেনাদের বিপুল সহায়তা জুগিয়েছিল বৈমানিকরা। তারা শত্রুর সৈন্যদের উপর, সেতু ও পাড়ি-ব্যবস্থাগুলোর উপর প্রবল আঘাত হানছিল এবং তদ্দ্বারা প্রুত ও সেরেত নদীর ও-পারে শত্রুর পশ্চাদপসরণের সম্ভাবনা নষ্ট করে দিচ্ছিল।

একই সঙ্গে বুখারেস্ট ও ইজমাইল অভিমুখে আক্রমণাভিযান চালিয়ে সোভিয়েত সৈন্যরা ফকশানি সুদৃঢ় অঞ্চলটি ভেদ করে ২৭ আগস্ট ফকশানি শহরটি দখল করে নেয়। পর দিন তারা ডানিয়ুব ফ্লোটিল্যার সঙ্গে সহযোগিতায় ব্রাইলোভ শহর ও সুলিনা বন্দরটি নিয়ে নেয়, আর ২৯ আগস্ট কৃষ্ণ সাগরীয় নৌ-বহরের সঙ্গে মিলিত হয়ে কনস্টান্স বন্দর-শহরটি দখল করে ফেলে।

এই ভাবে, দশ দিনের লড়াইয়ে লাল ফৌজ শত্রু বাহিনীসমূহের 'দক্ষিণ ইউক্রেন' গ্রুপটিকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করে। ইয়াস্‌সি-কিশিনেভ অপারেশনে শত্রু আড়াই লক্ষাধিক সৈনিক ও অফিসারকে হারায়। সোভিয়েত বাহিনী কেবল বন্দী হিশেবেই ২,০৮,৬০০ সৈনিক আর অফিসারকে ধরেছিল।

ইয়াস্‌সি-কিশিনেভ অপারেশনের আয়তন ছিল বিপুল। তাতে অংশগ্রহণ করে ৮৯টি ইনফেণ্ট্রি ও ৩টি অশ্বারোহী ডিভিশন; আক্রমণাভিযান চলে ৫৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ রণাঙ্গন জুড়ে এবং দৈনিক ৩০ কিলোমিটার গতিতে তা শত্রু ব্যূহের ৩০০ কিলোমিটার গভীরে গিয়ে পৌঁছে। ১৯৪৪ সালের অপারেশনসমূহে পরিচালিত পরিবেষ্টন কার্যে কেবল ডান তীরস্থ ইউক্রেনে, বেলোরুশিয়ায় ও বল্টিক উপকূলেই বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিযুক্ত হয়েছিল। তবে এই অপারেশনগুলো বর্তমান

অপারেশনটির মতো ছিল না। ওগুলো সম্পন্ন হয়েছিল দুটো নয়, চারটি ফ্রন্টের দ্বারা।

স্থান ও কালের বিচারে ইয়াস্সি-কিশিনেভ অপারেশনের স্ট্র্যাটেজিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তা পরিচালিত হয়েছিল, বলা যেতে পারে, সর্বোচ্চ কর্মদক্ষতার সঙ্গে। যেমনটি পরিকল্পনা করা হয়েছিল, অপারেশনের বৃহৎ রাজনৈতিক ও রণনৈতিক লক্ষ্য অর্জিত হয়েছিল অল্প সময়ের মধ্যে এবং অন্যান্য অপারেশনের সঙ্গে তুলনায় কম শক্তি ও বৈষয়িক সঙ্গতির ক্ষতি ঘটিয়ে। এটা সম্ভবত গত যুদ্ধের অল্প কয়েকটি বৃহৎ স্ট্র্যাটেজিক অপারেশনের একটি যাতে শত্রুকে পরাস্ত করা হয়েছিল অপেক্ষাকৃত কম কোরবানি দিয়ে। ২য় ও ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট হারিয়েছিল সাড়ে ১২ হাজার লোক, কিন্তু শত্রু ১৮টি ডিভিশন থেকে বঞ্চিত হয়েছিল।

ইয়াস্সি-কিশিনেভ অপারেশনের বৈশিষ্ট্য ছিল আকস্মিকতা, প্রাথমিক আঘাতের বিপুল বেধন ক্ষমতা, আক্রমণাভিযানের উচ্চ গতি, চলন্ত উপকরণসমূহের ব্যাপক ব্যবহার এবং বিভিন্ন ধরনের সৈন্য বাহিনীর মধ্যে সুসংগঠিত সহযোগিতা। এই অপারেশনটি সোভিয়েত যুদ্ধ-কৌশলের ইতিহাসে শত্রুকে দ্রুত পরিবেষ্টনের ও দ্রুত বিধ্বস্তকরণের অপূর্ব এক দৃষ্টান্ত হিশেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর হাতে জার্মান-ফ্যাসিস্ট 'দক্ষিণ ইউক্রেন' গ্রুপের পরাজয় রুমানিয়ায় আন্তনেস্কুর ফ্যাসিস্ট শাসন ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটানোর পক্ষে এবং রুমানিয়াকে নাৎসি জার্মানির সপক্ষে যুদ্ধ থেকে বের করে দেওয়ার পক্ষে অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলে। ২৩ আগস্ট রাজা মিখাইয়ের নির্দেশে ই. আন্তনেস্কু ও তার ডেপুটি ম. আন্তনেস্কুকে গ্রেপ্তার করা হয়। অচিরে আরও কয়েকজন মন্ত্রী গ্রেপ্তার হয়।

আন্তনেস্কু সরকারের উচ্ছেদকরণে রাজা মিখাই ও তার চারিপাশের লোকেদের অংশগ্রহণ ছিল বাধ্যতামূলক। তারা একনায়ককে একমাত্র তখনই বন্দী করতে রাজী হল যখন নিশ্চিত হল যে ইয়াস্সি ও কিশিনেভের নিকটে জার্মান-রুমানীয় বাহিনীর পরাজয় ঘটছে এবং জনগণ লাল ফৌজের মুক্তি অভিযানে সমর্থন জোগাচ্ছে। ওই দিনই শুরু হয় গণ অভ্যুত্থান। স্বদেশপ্রেমিক শক্তিসমূহের আঘাতে রুমানিয়ায় ফ্যাসিস্ট প্রশাসনের পতন ঘটে।

রুমানীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক গেওর্গিউ-দেজ লিখেছিলেন, '১৯৪৪ সালের ২৩ আগস্ট তারিখটি হচ্ছে বিজয়ী

সোভিয়েত বাহিনী কর্তৃক রুমানিয়া মুক্তকরণের এবং রুমানীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন স্বদেশপ্রেমিক শক্তিসমূহের দ্বারা আন্তনেস্কুর একনায়কত্ব উচ্ছেদকরণের দিন, যা পরিণত হয় রুমানীয় জনগণের মহান জাতীয় উৎসব দিবসে। সোভিয়েত বাহিনী কর্তৃক আমাদের দেশের মুক্তি মেহনতীদের সামনে গণতান্ত্রিক, স্বাধীন ও স্বনির্ভর রুমানিয়া গড়ে তোলার পথ উন্মুক্ত করল।'*

২৩ আগস্ট তারিখে রাত ১১টা ৩০ মিনিটের সময় বুখারেস্টে বেতার মাধ্যমে আন্তনেস্কু সরকারের পতন, 'জাতীয় ঐক্য সরকার' গঠন, মিত্র জাতিসমূহের বিরুদ্ধে সামরিক ক্রিয়াকলাপ নিবারণ এবং রুমানিয়া কর্তৃক যুদ্ধ-বিরতির শর্তগুলো গ্রহণের কথা ঘোষণা করা হয়। পরের দিন রুমানিয়া জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

২৪ আগস্ট রাত্রে বেতার মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটা ঘোষণা প্রচারিত হয়: 'রুমানিয়ার ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েত সরকার চলতি বছরের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত বিবৃতি সত্ত্বেও আবারও ঘোষণা করছে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন রুমানীয় ভূখণ্ডের কোন একটি অংশ নিয়ে নিতে, অথবা রুমানিয়ায় বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে, অথবা কোনভাবে রুমানিয়ার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করতে চায় না। ব্যাপারটি বরং ঠিক উল্টো, সোভিয়েত সরকার মনে করে যে রুমানীয়দের সঙ্গে মিলে জার্মান-ফ্যাসিস্ট দাসত্বের কবল থেকে রুমানিয়ার স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

সোভিয়েত সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলী মনে করেন, রুমানীয় সৈন্যরা যদি লাল ফৌজের বিরুদ্ধে সামরিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করে ও রুমানিয়ার স্বাধীনতার জন্য লাল ফৌজের সঙ্গে মিলিত হয়ে জার্মানদের বিরুদ্ধে, অথবা ট্রান্সিলভানিয়ার মুক্তির জন্য হাঙ্গেরীয়দের বিরুদ্ধে মুক্তি যুদ্ধ চালাতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়, তাহলে লাল ফৌজ তাদের নিরস্ত্র করবে না, সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিজের হাতে রাখতে দেবে এবং এই সম্মানজনক কর্তব্যটি সম্পাদনে তাদের সর্বোপায়ে সাহায্য করবে।

তবে লাল ফৌজ রুমানিয়ার ভূখণ্ডে সামরিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করতে

* গেওর্গিউ-দেজ। সংগ্রাম ও বিজয়ের পথ (রুমানিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির ৩০তম বার্ষিকী উপলক্ষে), 'প্রাভদা' খবরের কাগজ, ১৯৪৪, ৮ মে।

পারবে একমাত্র তখনই, যখন সে দেশে রুমানীয়দের নির্যাতক জার্মান ফৌজ বিলুপ্ত হবে।

রুমানিয়ার ভূখণ্ডে অবিলম্বে সামরিক ক্রিয়াকলাপ নিবারণের ও মিত্র শক্তিবর্গের সঙ্গে রুমানিয়ার যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি সম্পাদনের একমাত্র উপায় হচ্ছে জার্মান সৈন্যদের বিলোপ সাধনের কাজে লাল ফৌজকে রুমানীয় সৈন্যদের সহায়তা দান।'*

সোভিয়েত সরকারের নতুন ঘোষণাটি রুমানীয় জনগণের খুবই মনঃপূত হল।

রুমানিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি গণ-সংগ্রামের নেতৃত্বে থেকে অভ্যুত্থানকে ব্যাপক সাংগঠনিক চরিত্র দিতে এবং তার বিজয় সুনিশ্চিত করতে সমর্থ হল।

বুখারেস্টের ঘটনাবলির খবর পেয়ে হিটলার অভ্যুত্থান দমন করার, রাজাকে গ্রেপ্তার করার এবং জার্মানির প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন কোন জেনারেলের নেতৃত্বে একটি সরকার গঠন করার আদেশ দিল। ফিল্ডমার্শাল কেইটেল ও জেনারেল গুদেরিয়ান হিটলারের কাছে প্রেরিত রিপোর্টে বলে যে 'রুমানিয়া যাতে ইউরোপের মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় আর রুমানীয় জনগণ যাতে জাতি হিশেবে বাঁচতে না পারে তার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত'।**

২৪ আগস্ট সকালে নাৎসিরা বুখারেস্টের উপর বর্বরোচিত বোমাবর্ষণ চালায় এবং অভ্যুত্থানকে রক্ত বন্যায় বইয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আক্রমণ আরম্ভ করে। ফ্যাসিস্টরা হুমকি দিয়েছিল যে তারা রুমানীয় রাজধানীকে ধূলিসাৎ করে দেবে। কিন্তু রুমানীয় জনগণের প্রবল প্রতিরোধ পেয়ে তারা তা করতে ব্যর্থ হল। ওই দিনই রুমানীয় বাহিনী সোভিয়েত সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের বিরুদ্ধে সামরিক ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ করে।

এই ভাবে, সোভিয়েত ফৌজ তার বিজয়ের দ্বারা রুমানীয় রাষ্ট্রের জাতীয় স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য পরিবেশ গড়ে দিল। সোভিয়েত

সৈন্য বাহিনীর সামনে বলকানে প্রবেশের 'রুমানীয় পথটি' উন্মুক্ত হয়ে গেল। কিন্তু রুমানিয়াকে জার্মান-ফ্যাসিস্ট দখলকারীদের কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্তকরণের উদ্দেশ্যে রুমানীয় ভূখণ্ডে তাদের কঠোর লড়াইয়ে লিপ্ত হতে হয়েছিল।

রুমানিয়ার মুক্তি সংগ্রামের সমাপ্তি

১৯৪৪ সালের ২৯ আগস্ট সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর সদর-দপ্তর ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের বাহিনীগুলোকে প্লয়েশ্তি, স্লাতিনা, তুর্নু-সেভেরিন অভিমুখে প্রধান শক্তিসমূহের দ্বারা আক্রমণাভিযান চালানোর এবং প্লয়েশ্তি তৈল অঞ্চলটিকে জার্মান-ফ্যাসিস্ট হানাদারদের কবল থেকে মুক্ত করার ও বুখারেস্ট থেকে অবশিষ্ট নাৎসি সৈন্যদের তাড়ানোর নির্দেশ দিল। পরে আক্রমণাভিযান অব্যাহত রেখে ফ্রণ্টের বাহিনীসমূহের তুর্নু-সেভেরিন অঞ্চলে ও তার দক্ষিণ-পূর্বে ডানিয়ুব নদীতে পৌঁছার কথা ছিল।

ফ্রণ্টের ডান পার্শ্বের সৈন্যরা পূর্ব কার্পেথিয়ার গিরিপথগুলো দখল করার ও ১৫ সেপ্টেম্বর নাগাদ বিস্ত্রিৎসা, ক্লুজ, আইউদ ও সিবিউ যুদ্ধ-সীমায় পৌঁছার নির্দেশ পেয়েছিল। তারপর তাদের পশ্চিম থেকে আত্মরক্ষা করে ৪র্থ ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের ফৌজসমূহকে কার্পেথিয়া অতিক্রমণে ও উজ্‌গরদ আর মুকাচেভো অঞ্চলে পৌঁছাতে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে সাতু-মারে অভিমুখে আঘাত হানার কথা ছিল।

৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের বাহিনীসমূহ রুমানীয়-বুলগেরীয় সীমান্ত অভিমুখে দ্রুত গতিতে মার্চ করে যাওয়ার আদেশ পেল।

২য় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের ডান পার্শ্বের সৈন্যদের দ্বারা পূর্ব কার্পেথিয়া অতিক্রমণের সময় অতি কঠোর লড়াই চলে। এখানে লড়ছিল জার্মানদের বাহিনীসমূহের 'দক্ষিণ ইউক্রেন' গ্রুপের কয়েকটি জীর্ণ ফর্ম্যাশন এবং নবাগত জার্মান-ফ্যাসিস্ট ও হাঙ্গেরীয় ইউনিটগুলো।

ফ্রণ্ট, বাহিনী, কোর আর ডিভিশনগুলোর সেনাপতিমণ্ডলী সৈন্যদের সফল পর্বত অতিক্রমণের জন্য সমস্ত ব্যবস্থাই অবলম্বন করলেন। ইউনিটগুলো পার্বত্য রণাঙ্গনে সামরিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনার পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্তকিছুই পেল।

সোভিয়েত সৈন্যরা শত্রুকে যতই পর্বতের মধ্যে হটিয়ে দিচ্ছিল, শত্রু ততই ক্ষিপ্ত ও কঠোর প্রতিরোধ দান করছিল। গিরিসংকট ও

গিরিপথগুলোতে মাইন পেতে, খাড়া চড়াইগুলোতে বাধা সৃষ্টি করে নাৎসিরা প্রায়ই প্রতিআক্রমণ চালাচ্ছিল। কিন্তু কিছুই সোভিয়েত সৈন্যদের প্রবল আক্রমণ রোধ করতে পারছিল না। শত্রুর কাছ থেকে অল্প অল্প করে জমি দখল করে নিয়ে সোভিয়েত যোদ্ধারা ক্রমশই অগ্রসর হতে থাকে।

৮ সেপ্টেম্বর তারিখে ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের ডান পার্শ্বের বাহিনীগুলো আইতোস পর্বত শ্রেণীতে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করার কাজ সম্পন্ন করে এবং নাৎসিদের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ব্রেৎস্কু দখল করে নেয়। এর পর ফ্রন্টের ডান পার্শ্বের সৈন্যরা উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে শত্রুর পশ্চাদনুসরণ আরম্ভ করে।

ওই সময় ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সৈন্যরা এবং ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের প্রধান শক্তিসমূহ রুমানিয়ার ভূখণ্ডে আক্রমণাভিযান চালিয়ে যাচ্ছিল। জার্মান-ফ্যাসিস্ট আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে লড়ছিল রুমানীয় ইউনিটসমূহ, যাদের মধ্যে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দেয় সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূখণ্ডে গঠিত তুদোর ভ্লাদিমিরেস্কুর নামাঙ্কিত রুমানীয় স্বেচ্ছাসৈনিক ডিভিশনটি।

৩০ আগস্ট ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের মধ্যভাগের সৈন্যরা লড়াই করে নাৎসিদের কবল থেকে মুক্ত করল প্লয়েশ্তি শহরটি — এটা রুমানিয়ার তৈল শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। এর আগের দিন সন্ধ্যায় সোভিয়েত ট্যাঙ্কগুলো প্লয়েশ্তির একেবারে কাছে পৌঁছে গেলে জার্মানরা তৈল শোধনাগারগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়। সারা রাত প্লয়েশ্তির রাস্তায় রাস্তায় কঠোর লড়াই চলে এবং তার ফলে শহর মুক্তি লাভ করে। সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী রুমানিয়াকে ফিরিয়ে দিল তার গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও তৈল অঞ্চল।

প্লয়েশ্তি তৈল অঞ্চল হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় ফ্যাসিস্ট জার্মানির অর্থনীতি মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন হল। এবার নাৎসিদের একমাত্র সম্বল ছিল — যদি সামান্য জার্মান ও হাঙ্গেরীয় তৈলের মজুদের কথা বাদ দেওয়া হয় — নিজের কৃত্রিম জ্বালানি। কিন্তু এই জ্বালানিতে ভের্মাখ্‌টের চাহিদা মেটানো সম্ভব ছিল না।

৩১ আগস্ট সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্টে প্রবেশ করল। রুমানীয় রাজধানীর বাসিন্দাদের আনন্দের অন্ত ছিল না। তারা সানন্দে মুক্তিদাতা সোভিয়েত সৈনিকদের অভ্যর্থনা জানাল। সর্বত্র শোনা যাচ্ছিল জয়ধ্বনি: 'ত্রেইয়াস্কা আর্মাতা রশিয়ে!' — 'লাল

ফৌজ জিন্দাবাদ!' সোভিয়েত যোদ্ধাদের দেওয়া হচ্ছিল ফুল, তুমুল হাততালি দিয়ে তাদের করা হচ্ছিল অভিনন্দিত।

সোভিয়েত সৈন্যদের প্রবল পদক্ষেপে বুখারেস্টের বাসিন্দারা দেখতে পেল রুমানীয় জনগণের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি এবং সেই বাস্তব শক্তিটি যা রুমানিয়া থেকে জার্মান-ফ্যাসিস্টদের বিতাড়িত করতে সক্ষম।

বুখারেস্ট মুক্তির পর ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের সৈন্যরা আক্রমণাভিযান চালিয়ে যেতে থাকে তুর্নু-সেভেরিন অভিমুখে, যুগোস্লাভিয়ার সীমান্তের দিকে, এবং উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে — ট্রান্সিলভানিয়া হয়ে রুমানীয়-হাঙ্গেরীয় সীমান্তের দিকে।

শত্রু দৃঢ় প্রতিরোধ দিচ্ছিল। কিন্তু সোভিয়েত ফৌজের অগ্রগতি রুখা সম্ভব ছিল না।

২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের সৈন্যরা জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের কবল থেকে রুমানিয়ার বেশির ভাগ ভূখণ্ড মুক্ত করে রুমানীয়-হাঙ্গেরীয় ও রুমানীয়-যুগোস্লাভীয় সীমান্তে পেঁছে যায়।

অক্টোবরের শেষ দিকে সোভিয়েত সৈন্যরা জার্মান হানাদারদের রুমানিয়ার মাটি থেকে পুরোপুরিভাবে বিতাড়িত করে দেয়। কিন্তু তার জন্য বিপুল প্রয়াস ও প্রচুর রক্তের প্রয়োজন হয়েছিল। ১৯৪৪ সালের মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত রুমানিয়ার মুক্তির জন্য লড়াইয়ে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী ২ লক্ষ ৮৬ সহস্রাধিক যোদ্ধাকে হারায়, যার মধ্যে ৬৯ হাজার লোক নিহত হয়েছিল। ২৩ আগস্ট থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত নাৎসিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রুমানীয় বাহিনীর ৫৮ হাজার ৩ শতাধিক লোক হতাহত ও নিখোঁজ হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকারের কাছে প্রেরিত রুমানিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ও রুমানিয়ার সরকারের অভিনন্দন বাণীতে বলা হয়, 'রুমানীয় জনগণ সোভিয়েত জনগণ ও তার গৌরবিত সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা পোষণ করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে তারা বিপুল বীরত্বের সঙ্গে ও প্রচুর প্রাণহানির মূল্যে নিজেরা যুদ্ধের প্রধান চাপ সয়েছে, ফ্যাসিস্ট জার্মানির পরাজয়ে চূড়ান্ত অবদান রেখেছে, নাৎসি আধিপত্য থেকে রুমানিয়ার এবং অন্যান্য দেশ ও জাতির মুক্তিলাভে অমূল্য সহায়তা জুগিয়েছে।'

৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সৈন্যরা কেলেরাশি শহর অঞ্চলে (ডানিয়ুবের তীরে) শত্রুর হটে-যাওয়া ইউনিটগুলোর পশ্চাদনুসরণ করে ৬ হাজারের মতো জার্মান-ফ্যাসিস্ট সৈনিক ও অফিসারকে বন্দী করে। এদের বড় একটি অংশ বুলগেরিয়া থেকে রুমানিয়ায় প্রেরিত হয়েছিল বুখারেস্ট আক্রমণের জন্য। পরবর্তী দিনগুলোতে ফ্রন্টের সৈন্যরা দব্রুজা অঞ্চলের উপর দিয়ে দ্রুত অগ্রসর হয়ে অবশিষ্ট নাৎসি ফৌজকে বিধ্বস্ত করতে থাকে। দব্রুজার বাসিন্দারা অপরিসীম আনন্দের সঙ্গে সোভিয়েত যোদ্ধাদের অভ্যর্থনা জানায়। স্থানীয় সংবাদপত্রগুলো লাল ফৌজের বিজয় সম্পর্কিত প্রবন্ধাদিতে পরিপূর্ণ ছিল।

১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মের শেষ দিকে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী যখন নাৎসি বাহিনীগুলোকে বিধ্বস্ত করে বুলগেরিয়ার সীমান্তের কাছে পেঁছিল তখন দেশে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন তার বিকাশের চরম পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছিল। ওই সময়ে বুলগেরিয়ায় স্বদেশী ফ্রন্টের কমিটিগুলোর সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল — আগস্টের শেষ দিকে সক্রিয় ছিল স্বদেশী ফ্রন্টের ৬৭০টি কমিটি। বুলগেরীয় কমিউনিস্ট পার্টির আহবানে জনগণ সর্বত্র অস্ত্র ধারণ করছিল। বহু জায়গায় পুলিশ আর সৈন্যদের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষ চলছিল। সরকারী বাহিনীগুলোতে বহু সৈনিক ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলীর আদেশ পালন করতে অস্বীকার করছিল। সময় সময় গোটা এক-একটি মিলিটারি ইউনিট পার্টিজানদের দিকে চলে আসছিল। বুলগেরীয় জনগণ অধীর হয়ে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর আগমনের অপেক্ষা করছিল, — সোভিয়েত সৈন্যরাই ছিল একমাত্র শক্তি যা বুলগেরিয়া থেকে জার্মান-ফ্যাসিস্ট হানাদারদের বিতাড়িত করতে সক্ষম ছিল।

১৯৪৪ সালের ৩ সেপ্টেম্বর তারিখে ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের বাহিনীগুলো রুমানীয়-বুলগেরীয় সীমান্তে পেঁছিল। ৫ সেপ্টেম্বর সোভিয়েত সরকার বুলগেরীয় সরকারের কাছে একটি নোট প্রেরণ করেন। তাতে বলা হয়েছিল যে সোভিয়েত সরকার তিন বৎসরাধিক কাল ধরে এমন অবস্থা সয়েছে 'যখন বুলগেরিয়া বস্তুত পক্ষে জার্মানিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করছিল। — এর পর নোটে বলা হয় — ...আশা করা হচ্ছিল যে বুলগেরিয়া অনুকূল মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে রুমানিয়া ও ফিনল্যান্ডের মতো জার্মানপন্থী নীতি পরিত্যাগ করে জার্মানির

সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে এবং গণতান্ত্রিক দেশসমূহের হিটলারবিরোধী জোটে যোগ দেবে।... কিন্তু বুলগেরীয় সরকার এখনও পর্যন্ত জার্মানির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে অস্বীকার করছে এবং তথাকথিত নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করে চলেছে যার ভিত্তিতে সে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জার্মানিকে প্রত্যক্ষ সহায়তা জোগাচ্ছে।...

এই কারণে, সোভিয়েত সরকার মনে করে যে বুলগেরিয়ার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রক্ষা করা সম্ভব নয় এবং বুলগেরিয়ার সঙ্গে সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করে ঘোষণা করছে যে কেবল বুলগেরিয়াই সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয় নয়, এখন থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নও বুলগেরিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে'।*

যুদ্ধ ঘোষণার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন — তদানীন্তন বুলগেরীয় সরকারকে নাৎসি জার্মানির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার সুযোগ দানের ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে — সঙ্গে সঙ্গেই বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ করে নি।

কিন্তু বুলগেরীয় সরকার তাকে প্রদত্ত সুযোগটির সদ্ব্যবহার করল না। ৬ সেপ্টেম্বর তারিখে সে পরস্পরবিরোধী দুটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল। প্রথম বিজ্ঞপ্তিটিতে সে ফ্যাসিস্ট জার্মানির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্তের বিষয়ে বলছিল এবং সোভিয়েত সরকারের কাছে যুদ্ধ-বিরতির ব্যাপারে অনুরোধ জানাচ্ছিল। দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তিতে সে কেবল এটাই বলল যে বুলগেরীয় সরকার সোভিয়েত সরকারের কাছে যুদ্ধ-বিরতির অনুরোধ জানায়, তবে জার্মানির সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্নকরণের প্রশ্নে সম্পূর্ণ নীরব থাকে। এতে প্রমাণিত হল যে বুলগেরীয় সরকার আগের মতোই ফ্যাসিস্ট জার্মানিকে সমর্থন জোগাবে এবং বুলগেরিয়ার ভূখণ্ডে হিটলারী সৈন্যদের আশ্রয় দেবে।

বুলগেরিয়ার ফ্যাসিস্ট শাসক চক্রের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষণার সংবাদটি বুলগেরীয় জনগণের খুবই মনঃপূত হল। এতে তারা দেশে বুলগেরীয় ফ্যাসিস্ট আর জার্মান দখলদারদের কর্তৃত্বের অবসান দেখতে পেল।

৫ সেপ্টেম্বর বুলগেরীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর বিশেষ এক অধিবেশনে অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত একটা

পরিকল্পনা গৃহীত হয়, আর তার পরের দিন বুলগেরীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং স্বদেশী ফ্রন্টের জাতীয় কমিটি জনগণকে মুরাভলেভের ফ্যাসিস্টপন্থী সরকারের উচ্ছেদের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হতে ও স্বদেশী ফ্রন্টের সরকার গঠন করতে আহ্বান জানায়। সারা দেশে শুরু হয় ব্যাপক ধর্মঘট আর মিছিল, এবং অনেকগুলো শহরে তা সমাপ্ত হয় জনগণ ও পুলিশের মধ্যে সাশস্ত্র সংঘর্ষে। বুলগেরীয় সৈনিকদের স্বদেশী ফ্রন্টের পক্ষ অবলম্বন — বিশেষত বুলগেরিয়ার মাটিতে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর আগমনের পরে — ব্যাপক আকার ধারণ করে।

জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের বিরুদ্ধে আক্রমণাভিযান আরম্ভ করে বুলগেরীয় জাতীয় মুক্তি বাহিনীর পার্টিজান ব্রিগেডগুলো। তারা গোটা এক-একটি অঞ্চল দখল করে নিয়ে ওখানে স্বদেশী ফ্রন্টের শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে।

৮ সেপ্টেম্বর তারিখে ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সৈন্যরা জুর্জু-মান্‌গালিয়া এলাকায় বুলগেরীয়-রুমানীয় সীমান্ত অতিক্রম করে এবং দিনান্তে রুসে (রুশুক), তুর্তুকাই, সিলিস্ত্রিয়া, দব্রিচ শহরগুলো ও কৃষ্ণ সাগর তীরস্থ বন্দর-নগরী ভার্না মুক্ত করে।

বুলগেরীয় সৈন্য বাহিনী — সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর মুক্তি অভিযানে যার সৈনিকরা সন্দিগ্ধ ছিল না — কোনরূপ প্রতিরোধ দিচ্ছিল না, আর বুলগেরিয়ার জনগণ লাল পতাকা হাতে নিয়ে ফুল উপহার দিয়ে তাদের মুক্তিদাতাদের বরণ করছিল। রুশ সৈনিক দ্বিতীয় বারের মতো বুলগেরিয়াকে বৈদেশিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করল: ১৭৭৮ সালে — তুর্কীদের শাসন থেকে, ১৯৪৪ সালে — নাৎসিদের কবল থেকে।

৯ সেপ্টেম্বর বুলগেরীয় জনগণ দেশে ফ্যাসিস্ট শাসন ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটাল এবং স্বদেশী ফ্রন্ট সরকার গঠন করল। এই সরকার ফ্যাসিস্ট জার্মানির সঙ্গে জোট ভেঙে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

ওই দিনই ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সৈন্যরা রাজগ্রাদ শহরটি নিয়ে নেয় এবং ওখানে ৪ হাজার জার্মান সৈনিক ও অফিসারকে বন্দী করে, আর কৃষ্ণ সাগরীয় নৌ-বহরের সঙ্গে সহযোগিতায় কৃষ্ণ সাগর তীরস্থ বৃহৎ বন্দর-নগরী বুর্গাস দখল করে নেয়। এবার তুরস্কের সীমানা পর্যন্ত কৃষ্ণ সাগরের সমগ্র উপকূলভাগ পুরোপুরি কৃষ্ণ সাগরীয় নৌ-বহরের হাতে এল।

১৬ সেপ্টেম্বর সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়ায় প্রবেশ করে। বুলগেরীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির

প্রথম সম্পাদক তদোর জিভকভ বলেন, ‘বুলগেরিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিজয় লাভ করেছে সোভিয়েত ইউনিয়নের চূড়ান্ত সহায়তায় এবং তার নিরবচ্ছিন্ন, উদার ও নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃপ্রতিম সাহায্যের কল্যাণে মুক্ত ও স্বাধীন বুলগেরিয়া তার শতাব্দীর অনগ্রসরতার অবসান ঘটিয়ে এক বিকাশমান শিল্প-কৃষিপ্রধান সমাজতান্ত্রিক দেশে রূপান্তরিত হয়েছে।’*

সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে সোভিয়েত বাহিনীগুলো রুমানীয়-হাঙ্গেরীয়, রুমানীয়-যুগোস্লাভীয়, বুলগেরীয়-যুগোস্লাভীয়, বুলগেরীয়-গ্রীস ও বুলগেরীয়-তুরস্ক সীমান্তে পৌঁছল। রুমানিয়ার বেশির ভাগ ভূখণ্ড এবং সমগ্র বুলগেরিয়া জার্মান-ফ্যাসিস্ট দখলদারদের কবল থেকে মুক্ত হল। হাঙ্গেরি ও যুগোস্লাভিয়ায় ফ্যাসিস্ট হানাদারদের বিধ্বস্তকরণের পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে উঠল।

কৃষ্ণ সাগরীয় নৌ-বহর ও ডানিয়ুব সামরিক ফ্লোটিল্যা ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সৈন্যদের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতায় রুমানিয়া ও বুলগেরিয়ায় শত্রুর সমস্ত সামরিক নৌ-ঘাঁটি দখল করে নেয়।

১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বরের লড়াইগুলোর বড় ফল ছিল — জার্মান-ফ্যাসিস্ট হানাদারদের কবল থেকে রুমানীয় ও বুলগেরীয় জনগণের মুক্তি। রুমানিয়া ও বুলগেরিয়ার জনগণ নিজ হাতে শাসন ভার গ্রহণ করে দৃঢ় পদক্ষেপে গণতান্ত্রিক বিকাশের পথ ধরে চলতে লাগল।

হাঙ্গেরির মুক্তি

রুমানিয়া মুক্ত হল বটে, তবে হাঙ্গেরি তখনও ফ্যাসিস্ট জার্মানির মিত্রই থেকে গিয়েছিল। কিন্তু এই দেশটির অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশই জটিল আকার ধারণ করছিল। ১৯৪৪ সালের ২৯ আগস্ট জেনারেল গ. লাকাতোশের নেতৃত্বে একটি সরকার গঠিত হয়। তার কোন সঠিক নীতি ছিল না। এক দিকে, সে তার ৮ সেপ্টেম্বর তারিখের অধিবেশনে আগের সরকারের জার্মানপন্থী নীতি অনুমোদন করে, আর অন্য দিকে — যেমন ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তেমনি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গেও কথাবার্তা চালানোর প্রয়োজন বোধ করছিল। তার নীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল ওই দিনগুলোতে জার্মান

পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেণ্ট্রপের কাছ থেকে প্রাপ্ত চিঠিখানি, যাতে ছিল হাঙ্গেরিকে রক্ষা করার জার্মান প্রতিশ্রুতি আর সম্ভাব্য গণবিক্ষোভের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাদি গ্রহণ করার দাবি। চিঠির জবাবে হাঙ্গেরীয় একনায়ক ম. হর্তি হিটলারকে এই প্রতিশ্রুতি দিল যে সে পুরোপুরিভাবে জার্মানির পক্ষে থাকবে। ভের্মাখ্‌টের স্থল বাহিনীর জেনারেল স্টাফের অধিকর্তা গ. গুদেরিয়ানের আদেশে হাঙ্গেরির ভূখণ্ডে আরও কয়েকটি জার্মান ডিভিশনকে ঢোকানো হল। ১১ সেপ্টেম্বর লাকাতোশের মন্ত্রিপরিষদ তার অধিবেশনে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে হাঙ্গেরির যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে দিল, যদিও এর আগে হর্তির সঙ্গে এক গোপন অধিবেশনে সরকারের সদস্যদের মধ্যে মতের প্রাধান্য ছিল মিত্র শক্তিবর্গের সঙ্গে যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি সম্পাদনের পক্ষেই। সামরিক সাহায্য প্রার্থনার জন্য হিটলারের সদর-দপ্তরে প্রেরিত হয় হাঙ্গেরীয় জেনারেল স্টাফের অধিকর্তা কর্নেল-জেনারেল ইয়া. ভেরেশ।

কিন্তু লাল ফৌজের হাঙ্গেরীয় সীমান্তের দিকে কাছিয়ে-আসার সঙ্গে সঙ্গে হাঙ্গেরির শাসক মহল অবশেষে বুঝতে পারল যে জার্মানি লাল ফৌজের প্রবল আক্রমণ প্রতিহত করতে পারবে না। সোভিয়েত সৈন্যরা যাতে হাঙ্গেরিতে প্রবেশ না করে সেই উদ্দেশ্যে হর্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডের সরকারের কাছে স্বতন্ত্র যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব পেশ করল। কিন্তু এ প্রস্তাব গৃহীত হয় নি। তখন হর্তিপন্থীরা আলাপ-আলোচনার জন্য সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল গ. ফারাগোর নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিল। ১৯৪৪ সালের ১ অক্টোবর প্রতিনিধিদলটি মস্কোয় পৌঁছল। হর্তি তার প্রতিনিধিদের সঙ্গে স্তালিনের নামে একখানি চিঠি পাঠিয়েছিল। তাতে সে সামরিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করতে, হাঙ্গেরি থেকে জার্মান ফৌজের পশ্চাদ-পসরণে বাধা না দিতে এবং হাঙ্গেরি দখলে ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনীগুলোর অংশগ্রহণে রাজী হতে অনুরোধ জানায়। যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করার ক্ষমতা প্রতিনিধিদলের ছিল না। তারা কেবল চুক্তির শর্তসমূহ সম্পর্কে একটা বোঝাপড়ায় পৌঁছার নির্দেশ পেয়েছিল।

বলাই বাহুল্য, হাঙ্গেরীয় পক্ষের এরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না, তখন কেবল হাঙ্গেরির আত্মসমর্পণের বিষয়েই কথা চলতে পারত। হর্তি এবং তার চারিপাশে লোকেরা তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিল। কিন্তু তারা সময় লাভ করতে চেষ্টিত ছিল যাতে এই খেলায় ব্রিটিশ ও আমেরিকানদের

টেনে আনা যায় এবং নিজের জন্য যুদ্ধ-বিরতির অধিকতর অনুকূল শর্ত রাখা যায়। তারা বিশেষ করে এমন এক সিদ্ধান্ত খুঁজছিল যাতে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করে থাকা সম্ভব হত।

হর্তিপন্থীরা তখনও আশা করেছিল যে তাদের কৃত কুকর্মের জন্য তারা শাস্তি এড়িয়ে যেতে এবং আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় তারা ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবে। সেই সঙ্গে হাঙ্গেরীয় একনায়কের — যে আলাপ-আলোচনার গতি মন্থর করার উদ্দেশ্যে ছলচাতুরীর আশ্রয় নিচ্ছিল — মনে এরূপ আশাও ছিল যে নাৎসিরা সোভিয়েত সৈন্যদের আক্রমণাভিযান রুখতে পারবে এবং ওদের কার্পেথীয় পর্বত শ্রেণীর অপর পাশে হটিয়ে দেবে। যখন হাঙ্গেরির মাটিতে লড়াই শুরু হয় এমনকি তখনও সে এই আশাটি ত্যাগ করে নি। কিন্তু লাল ফৌজের সফল আক্রমণাভিযান হর্তির সমস্ত আশাভরসা পণ্ড করে দেয় এবং সে মস্কোয় অবস্থানরত তার প্রতিনিধিদলকে এই নির্দেশ দিতে বাধ্য হয় যে 'যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি সম্পাদন বাঞ্ছনীয়'। ফারাগো ঘোষণা করেছিল যে হাঙ্গেরি মিত্র শক্তিবর্গের যুদ্ধ-বিরতির শর্তসমূহ গ্রহণ করছে এবং সোভিয়েত সরকার তা মনে রাখেন। কিন্তু অচিরেই বোঝা গেল যে ফ্যাসিস্ট জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে অনিচ্ছুক হর্তি পূর্বে সব পক্ষের সম্মতিক্রমে গৃহীত যুদ্ধ-বিরতি চুক্তির শর্তসমূহ পালন করতে অস্বীকার করেছে। তখন লাল ফৌজের জেনারেল স্টাফের উপাধিকর্তা জেনারেল আ. আন্তোনভ জেনারেল ফারাগোর কাছে এই দাবি হাজির করলেন যে হাঙ্গেরীয় সরকার যেন এই পত্র প্রাপ্তির মুহূর্ত থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তার নিজের গৃহীত যুদ্ধ-বিরতির প্রাথমিক শর্তসমূহ পালন করে। সর্বাগ্রে তাকে জার্মানির সঙ্গে সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে, জার্মানির বিরুদ্ধে সক্রিয় সামরিক ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ করতে হবে, রুমানিয়া, যুগোস্লাভিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়ার ভূখণ্ড থেকে নিজের সৈন্য অপসারণের কাজ শুরু করতে হবে এবং ১৬ অক্টোবর সকাল ৮টা নাগাদ সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলীর কাছে জার্মান ও হাঙ্গেরীয় ইউনিটসমূহের অবস্থিতি সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ দাখিল করতে হবে।

হর্তি যুদ্ধ-বিরতি চুক্তির শর্তসমূহ মানল বটে, কিন্তু নাৎসি ফৌজের বিরুদ্ধে কোনরূপ সামরিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করল না। এই সুযোগ নিয়ে জার্মান সেনাপতিমণ্ডলী প্রতিক্রিয়াশীল হাঙ্গেরীয় অফিসারদের এবং সালাশিপন্থীদের 'ক্রস্‌ড অ্যারোজ' পার্টির সমর্থনে ১৫-১৬ অক্টোবর হাঙ্গেরিতে এক কু-দে-তা আয়োজন করে। হাঙ্গেরীয় ফ্যাসিস্টদের সর্দার ফ.

সালাশি ক্ষমতায় এসে তার ফৌজকে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেয়। তাতে হাঙ্গেরির প্রগতিশীল শক্তিসমূহ তীব্র প্রতিবাদ জানায়। অতি গোপনীয়ভাবে কর্মরত কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে মেহনতীরা ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ক্রমশই অধিকতর সক্রিয় হয়ে উঠছিল। কলকারখানা ও রেলপথগুলোতে ঘন ঘন অন্তর্ঘাতমূলক ক্রিয়াকলাপ ঘটতে লাগল, ধর্মঘট ও হরতালের সংখ্যা, ফ্যাসিস্ট কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করার ঘটনা বৃদ্ধি পেল। কৃষকরা জার্মানি ও তার সৈন্য বাহিনীর জন্য কৃষিজাত দ্রব্যাদি সরবরাহ করতে অস্বীকার করল।

দেশে সালাশিস্ট-ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন সক্রিয় হয়ে উঠে। তা বিশেষ প্রবলতা লাভ করে হাঙ্গেরির ভূখণ্ডে লাল ফৌজের সামরিক ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ হওয়ার পর। প্রতিরোধ আন্দোলনে সহায়তা জোগায় সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আগত ১০টি পার্টিজান দল যেগুলোতে লড়ছিল ২৫০ জন হাঙ্গেরীয় ও ৩০ জন সোভিয়েত পার্টিজান। এই সুদক্ষ দলগুলো নিজের সংগ্রামী সক্রিয়তার দ্বারা ও নিজের দৃষ্টান্তের দ্বারা আরও প্রায় দেড় হাজার লোককে শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামে আকৃষ্ট করে।

১৯৪৪ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে হাঙ্গেরিতে পার্টিজান যুদ্ধে লিপ্ত হয় হাজার হাজার স্বদেশপ্রেমিক। সামরিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে পার্টিজানরা স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাখ্যামূলক কাজ চালায়, মেহনতীদের মিটিং ও সভাসমিতি আয়োজন করে, ফ্যাসিস্টবিরোধী সাহিত্য প্রচার করে এবং জনগণকে শত্রুর সন্ত্রাসের কবল থেকে রক্ষা করে। স্থানীয় বাসিন্দারাও গণযোদ্ধাদের যেভাবে পারত সাহায্য করত।

দেশে মুক্তি আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল হাঙ্গেরীয় কমিউনিস্ট পার্টি। সেপ্টেম্বরের শেষ দিকেই সে এক আবেদনপত্র প্রকাশ করেছিল যাতে স্বাধীন হাঙ্গেরির জন্য ও গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠনের জন্য, নাৎসিদের বিতাড়নের জন্য এবং ফ্যাসিস্ট শাসন উচ্ছেদকরণের জন্য মেহনতীদের তাদের সংগ্রাম প্রবলতর করে তোলার আহ্বান জানানো হয়। কমিউনিস্ট পার্টি সবার কাছে ব্যাখ্যা করছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়ন হাঙ্গেরীয় জনগণের সার্বভৌমত্বের অলঙ্ঘনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে, জনগণ নিজেই দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক গঠনের সমস্যাবলি সমাধানের অধিকার উপভোগ করবে। কমিউনিস্টরা শ্রমিক আর কৃষকদের জোটের উপর বিপুল গুরুত্ব আরোপ করত, হাঙ্গেরীয় ফ্রন্ট সরকার গঠনের জন্য সংগ্রাম করছিল, — ওই সময়ে এই ফ্রন্ট চারটি পার্টিকে — কমিউনিস্ট পার্টি,

সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি, ক্ষুদে কৃষি-মালিকদের পার্টি ও জাতীয় কৃষক পার্টিকে যুক্ত করে ফেলেছিল। তখনই, সেপ্টেম্বর মাসে, নির্বাচিত হয় ফ্রন্টের কার্যনির্বাহী কমিটি, যা স্থানীয় কমিটিগুলো গঠনের কাজে হাত দেয়।

দেশে পার্টিজান আন্দোলনের প্রবলতা বৃদ্ধির জন্য হাঙ্গেরীয় কমিউনিস্ট পার্টির বিদেশস্থ ব্যুরো অনেককিছু করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও হাঙ্গেরীয় স্বদেশপ্রেমিকদের সশস্ত্র সংগ্রাম ব্যাপক আকার ধারণ করে নি। এর কারণ ছিল ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব পরিচালিত নির্মম সন্ত্রাস, সাধারণ মানুষকে প্রতারণাকারী অবাধ উগ্রজাতিবাদী প্রচার, যুদ্ধের বছরগুলোতে গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের দুর্বলতা সাধন, কমিউনিস্ট পার্টির ক্রিয়াকলাপের কঠোর অবৈধ পরিবেশ।

হাঙ্গেরির ভূখণ্ডে শত্রুকে বিধ্বস্তকরণের ও হাঙ্গেরীর জনগণকে মুক্তকরণের উদ্দেশ্যে অপারেশনের পরিকল্পনা তৈরি করার সময় সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী হাঙ্গেরির সামরিক-রাজনৈতিক অবস্থার তীব্রতা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করেছিলেন।

১৯৪৪ সালের অক্টোবরের গোড়ার দিকে হাঙ্গেরি ও যুগোস্লাভিয়ার সঙ্গে সীমান্তে ৮০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এলাকা জুড়ে — প্রিসলোপ গিরিপথ থেকে ডানিয়ুবের বৃহৎ বাঁক পর্যন্ত — ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সৈন্যরা গিয়ে পৌঁছয়। ডান দিকে — দুকলা গিরিপথের পূর্ব দিক থেকে রুমানিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত সামরিক ক্রিয়াকলাপ চালায় ৪র্থ ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট। বাঁয়ে — যুগোস্লাভীয় ভূখণ্ডে লড়ছিল ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের ফৌজগুলো। হাঙ্গেরির সীমান্তে ২য় ফ্রন্টের আগমন ৪র্থ ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের ক্রিয়াকলাপের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলে এবং কার্পেথিয়ায় সমগ্র জার্মান-হাঙ্গেরীয় গ্রুপিংয়ের উপর প্রবল পার্শ্ব-আঘাতের হুমকি সৃষ্টি করে।

হাঙ্গেরীয় ভূখণ্ডে শত্রুকে বিধ্বস্তকরণের কাজে প্রধান ভূমিকা ছিল ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের। তাকে এই নির্দেশ দেওয়া হয় যে ক্লুজ, ওর্দিয়া ও দেব্রেৎসেন অঞ্চলে শত্রুর গ্রুপিংকে বিধ্বস্ত করতে হবে এবং উত্তর দিকে নিরেদহাজা-চপ অভিমুখে আক্রমণাভিযানে লিপ্ত থেকে ৪র্থ ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের বাহিনীসমূহকে নাৎসিদের কবল থেকে উজ্‌গরদ ও মুকাচেভো অঞ্চলটি মুক্তকরণে সহায়তা জোগাতে হবে।

১৯৪৪ সালের অক্টোবরের গোড়ার দিকে ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের

অধীনে ছিল ৪০টি ডিভিশন, ২টি সুদৃঢ় অঞ্চলের সৈন্যদল, ৩টি ট্যাংক কোর, ২টি মেকানাইজ্ড ও ৩টি অশ্বারোহী কোর এবং অন্যান্য ইউনিট আর ফর্ম্যাশন, ১০,২০০টি তোপ ও মর্টার কামান, ৭৫০টি ট্যাংক ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গান, ১,১০০টি বিমান। তাছাড়া ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের অধিনায়কের অধীনে ছিল ১ম ও ৪র্থ রুমানীয় বাহিনীগুলো (অপারেশনের শুরুতে ওগুলোর কাছে ছিল ২২টি ডিভিশন, পরে ১৭টি), কিন্তু এদের ফর্ম্যাশনগুলোর লোকসংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্র ছিল কম। যেমন, ১৯৪৪ সালের ১০ অক্টোবর তারিখে ১ম রুমানীয় বাহিনীতে ছিল ৩০,১৫১ জন লোক, ২৫,৫৭১টি বন্দুক, ১৯৮টি মেশিনগান, ২৭৬টি মর্টার কামান, ৮২টি ফিল্ড গান, ৮৭টি ট্যাংকবিরোধী ও ৩০টি বিমানবিধ্বংসী কামান।

২য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের বিরুদ্ধে খাড়া ছিল জেনারেল গ. ফ্রিসনেরের পরিচালনাধীন 'দক্ষিণ' গ্রুপের বাহিনীগুলো। গ্রুপটিতে ছিল ৮ম ও ৬ষ্ঠ জার্মান বাহিনী এবং ২য় ও ৩য় হাঙ্গেরীয় বাহিনী — সর্বমোট ২৯টি ডিভিশন, ৫টি ব্রিগেড ও বাহিনীসমূহের 'F' গ্রুপের ৩টি ডিভিশন। 'দক্ষিণ' গ্রুপের কাছে ছিল ৩,৫০০টি তোপ ও মর্টার কামান, ৩০০টি ট্যাংক ও ৪র্থ বিমান বহরের প্রায় ৫৫০টি বিমান।

৬ অক্টোবর সকালে অদীর্ঘ প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণ ও বোমাবর্ষণের পর ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের আক্রমণকারী গ্রুপিংটি প্রধান অভিমুখে আক্রমণাভিযান আরম্ভ করে। কঠোর লড়াই শুরু হয়ে যায়, তা চলাকালে সোভিয়েত-রুমানীয় বাহিনীগুলো শত্রুর প্রবল প্রতিঘাত ও প্রতিআক্রমণ প্রতিহত করে দেয় এবং রণক্ষেত্রে ব্যাপক সৈন্য স্থানান্তরণে লিপ্ত থাকে। ২০ অক্টোবর তারিখে প্রধান অভিমুখে লড়াইয়ে শত্রুর বৃহৎ শক্তি প্রবিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ৬ষ্ঠ রক্ষী ট্যাংক বাহিনীটি জেনারেল প্লিয়েভ ও জেনারেল গর্শকোভের অশ্বারোহী-মেকানাইজ্ড গ্রুপগুলোর সঙ্গে মিলিতভাবে সমানাভিমুখে প্রবল আঘাত হেনে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ একটি কেন্দ্র — দেব্রেৎসেন শহরটি দখল করে নেয়।

দেব্রেৎসেন অপারেশন সমাপ্ত হয় তিসা নদী অতিক্রমণ দিয়ে। হাঙ্গেরীয় ভূখণ্ডে এই প্রথম বৃহৎ অপারেশন চলাকালে লাল ফৌজ রুমানীয় সৈন্যদের সঙ্গে সহযোগিতায় ট্রানসিলভানিয়ার উত্তরাংশ এবং হাঙ্গেরির বড় একটি অংশ — তার ভূখণ্ডের এক-তৃতীয়াংশ যেখানে বাস করছিল দেশের সমগ্র জনগণের এক-চতুর্থাংশ — মুক্ত করে। ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সৈন্যরা ২৩ দিনে ১৩০-২৭৫ কিলোমিটার অগ্রসর হয় এবং হাঙ্গেরির রাজধানী

বুদাপেস্ট অভিমুখে ভবিষ্যৎ আক্রমণাভিযানের জন্য পূর্বশর্ত গড়ে তোলে। তাদের অগ্রগতির গড়পড়তা দৈনিক বেগ ছিল ৫ থেকে ১২ কিলোমিটারের মতো।

কঠোর লড়াইয়ে শত্রু জনবলে ও সামরিক প্রযুক্তিতে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি বহন করে। সোভিয়েত সৈন্যরা তার দশটি ডিভিশনকে বিধ্বস্ত করে দেয়, ৪২ সহস্রাধিক সৈনিক ও অফিসারকে বন্দী করে, ৯১৫টি ট্যাঙ্ক ও অ্যাসল্ট গান, ৭৯৩টি মর্টার কামান, ৪২৮টি আর্মার্ড ভেহিকেল ও আর্মার্ড পার্সোনেল কেরিয়ার, ৪১৬টি বিমান, ৮টি সাঁজোয়া রেলগাড়ি ও ৩ সহস্রাধিক মোটর গাড়ি ধ্বংস করে দেয়, ১৩৮টি ট্যাঙ্ক ও অ্যাসল্ট গান, ৮৫৬টি তোপ, ৬৮১টি মর্টার কামান, ৩৮৬টি বিমান, ১৬ হাজার বন্দুক ও সাবমেশিনগান কবজা করে নেয়।

দেব্রেৎসেন অঞ্চলে ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের ফর্ম্যাশনসমূহের আগমন ঘটাতে শত্রুর কার্পেথীয় গ্রুপিংটির পশ্চাদ্ভাগগুলো খুবই সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। তা নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলীকে ৪র্থ ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় এলাকা ও বাম পার্শ্বের সম্মুখে আপন সৈন্য অপসারণ শুরু করতে বাধ্য করে। ১ম হাঙ্গেরীয় বাহিনীর (যা তখন জার্মানদের পক্ষে লড়ছিল) অধিনায়ক জেনারেল ব. মিক্‌লোশ পরবর্তী প্রতিরোধের নিষ্ফলতা লক্ষ্য করে এবং ফ্যাসিস্ট সরকারের নীতিতে ও হাঙ্গেরিতে নাৎসিদের ক্রিয়াকলাপে অসন্তুষ্ট হয়ে নিজের সদর-দপ্তরের একাংশকে নিয়ে সোভিয়েত বাহিনীর পক্ষে চলে আসে। এতে আরও ভালো করে প্রতিফলিত হয় হর্তি বাহিনীর ভেতরকার তীব্র সঙ্কট।

হাঙ্গেরীয় ভূখণ্ডে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর প্রবেশের বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটির নির্দেশে ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সামরিক পরিষদ হাঙ্গেরীয় জনগণের কাছে এই আবেদন জানায় যে তারা যেন সোভিয়েত সৈন্যদের তাদের মুক্তি অভিযানে সর্বাঙ্গীণ সহায়তা জোগায়। আবেদনপত্রে বলা হয় যে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী হাঙ্গেরিতে প্রবেশ করেছে তার ভূখণ্ড দখলের জন্য নয়, কেবল সামরিক প্রয়োজনে, 'দেশ জয়ের উদ্দেশ্যে নয়, জার্মান-ফ্যাসিস্ট দাসত্বের কবল থেকে হাঙ্গেরীয় জনগণকে মুক্তি দানের উদ্দেশ্যে'। এই দলিলটিতে ব্যাখ্যা করা হয় যে দেশের মুক্ত ভূখণ্ডে হাঙ্গেরীয় প্রশাসনিক সংস্থাগুলো, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং বিদ্যমান রীতিরেওয়াজ টিকিয়ে রাখা হবে, নাগরিকদের সমস্ত অধিকার ও সম্পত্তি সোভিয়েত সামরিক প্রশাসনের

রক্ষণাধীনে থাকবে। এর সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ঘোষণা করা হয় যে মুক্ত অঞ্চলগুলোতে সোভিয়েত সামরিক প্রশাসনিক সংস্থা গঠিত হবে।

সোভিয়েত ফৌজ এবং স্থানীয় হাঙ্গেরীয় বাসিন্দাদের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে আবেদনপত্রটির বিপুল তাৎপর্য ছিল। এটা ছিল সেই মূল দলিল, যা হাঙ্গেরিতে সামরিক ক্রিয়াকলাপের পুরো কালপর্যায়টির জন্য সোভিয়েত সামরিক সংস্থা এবং সামরিক প্রশাসনিক সংস্থাসমূহের সমগ্র কাজের ভিত্তি রচনা করে। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটির কল্যাণে সোভিয়েত সৈন্য ও হাঙ্গেরীয় বাসিন্দাদের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য প্রগতিশীল পার্টি আর সংগঠনের স্থানীয় গ্রুপসমূহের ক্রিয়াকলাপ সক্রিয় হয়ে ওঠে, ট্রেড ইউনিয়নগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। অক্টোবর মাসেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে আরম্ভ করেন রাজনৈতিক প্রবাসীরা, হাঙ্গেরীয় কমিউনিস্ট পার্টির বিদেশস্থ ব্যুরোর সদস্যারা। নভেম্বর মাসে তাঁরা সেগেদ শহরে একটি সেণ্টার গঠন করেন যা মুক্ত ভূখণ্ডে পার্টি সংগঠনগুলোকে নেতৃত্ব দানের জন্য গঠিত অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কমিটির ভূমিকা পালন করছিল। সেগেদের সেণ্টারটি কমিউনিস্ট পার্টির বুদাপেস্টস্থ গুপ্ত কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। কেন্দ্রীয় কমিটিতে ছিলেন আ. আপ্র, ইয়া. কাদার ও অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ। হাঙ্গেরির মাটিতে সোভিয়েত সৈন্যদের পদার্পণের প্রথম দিনগুলোতেই হাঙ্গেরীয় প্রগতিশীল শক্তিসমূহ জাতীয় জীবনের গণতন্ত্রীকরণ আরম্ভ করে। এতে নিহিত ছিল দেব্রেৎসেন অভিমুখে শত্রুকে বিধ্বস্তকরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ফল।

দেব্রেৎসেন অপারেশন সমাপ্তির পর সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী বিরতি ব্যতিরেকেই বুদাপেস্ট অপারেশন আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তা করতে গিয়ে ইউরোপে ফ্যাসিস্ট জার্মানির শেষ মিত্র দেশের রাজধানীর বিশেষ গুরুত্বের কথাটি বিবেচনা করা হয়েছিল: হাঙ্গেরির সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ৫০ শতাংশেরও বেশি কেন্দ্রীভূত ছিল এই শহরটিতে এবং প্রায় সবগুলোই ভের্মাখ্‌টের চাহিদা পূরণ করছিল।

সুবিধাজনক রণনৈতিক-স্ট্র্যাটেজিক পরিস্থিতিও বুদাপেস্ট অভিমুখে অবিলম্বিত আক্রমণাভিযান আরম্ভ করার দাবি উপস্থিত করে। জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীসমূহের 'দক্ষিণ' গ্রুপের প্রধান শক্তিগুলো লড়ছিল নিরেদ-হাজা-মিশকোল্‌স অভিমুখে। নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলী ঠিক করল যে ওগুলোকে তারা ব্যবহার করবে বুদাপেস্টের উত্তর-পূর্ব প্রবেশ পথগুলো

রক্ষা করার উদ্দেশ্যে, আর দক্ষিণ-পূর্ব প্রবেশ পথগুলো রক্ষা করবে লড়াইয়ে বিধ্বস্ত এবং একটি জার্মান ট্যাঙ্ক ও একটি মোটোরাইজ্‌ড ডিভিশন দিয়ে দৃঢ়ীকৃত হাঙ্গেরীয় ৩য় বাহিনীর সৈন্যদের দ্বারা। বুদাপেস্ট অভিমুখে প্রতিরক্ষারত ফ্যাসিস্ট ফৌজের ঘনতা ছিল দেব্রেৎসেন অভিমুখের চেয়ে ২·১ গুণ কম। ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের প্রধান শক্তিসমূহ কেন্দ্রীভূত ছিল তার কেন্দ্রীয় এলাকায় ও ডান পার্শ্বে। এই ফ্রণ্টের বিরুদ্ধে খাড়া ছিল ৩৫টি ডিভিশন (তার মধ্যে ৯টি ট্যাঙ্ক ও মোটোরাইজ্‌ড ডিভিশন) ও ৩টি ব্রিগেড নিয়ে গঠিত নাৎসি 'দক্ষিণ' গ্রুপটির শক্তিসমূহ।

ওই সময় নাগাদ ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের কাছে ছিল ৭টি বাহিনী (তার মধ্যে ২টি রুমানীয়), ১টি ট্যাঙ্ক ও ১টি বিমান বাহিনী, ৩টি ট্যাঙ্ক কোর (ট্যাঙ্ক বাহিনীর কোরগুলো সহ), ৩টি মেকানাইজ্‌ড কোর, ৫৮টি ইনফেণ্ট্রি ও অশ্বারোহী ডিভিশন (যেগুলোর মধ্যে ১৩টি ছিল রুমানীয়)। জার্মান বাহিনীসমূহের 'দক্ষিণ' গ্রুপের সঙ্গে ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের শ্রেষ্ঠতা ছিল এরূপ: ইনফেণ্ট্রিতে — ২ গুণ, তোপে (ট্যাঙ্কবিরোধী ও বিমান-বিধ্বংসী কামান ছাড়া) ও মর্টার কামানে — ৪-৪·৫ গুণ, ট্যাঙ্কে ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গানে — ১·৯ গুণ ও বিমানে — ২·৬ গুণ।

হাঙ্গেরির অভ্যন্তরে সোভিয়েত ফৌজের পরবর্তী অগ্রগতি রোধ করার চেষ্টায় ফ্যাসিস্টরা বুদাপেস্টের উপকণ্ঠগুলোতে বেশ দৃঢ় ও গভীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়েছিল।

বুদাপেস্টের দক্ষিণ দিকে সংগ্রামরত জার্মান 'F' গ্রুপটির শক্তিসমূহের কাজ ছিল — পশ্চিমাভিমুখে সোভিয়েত সৈন্যদের পথ রোধ করা এবং একই সঙ্গে যুগোস্লাভ জাতীয়-মুক্তি বাহিনীর আঘাত থেকে সেই সমস্ত যোগাযোগ পথ রক্ষা করা যেগুলো দিয়ে গ্রীস, যুগোস্লাভিয়া ও আলবানিয়া থেকে জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীগুলো পশ্চাদপসরণ করছিল।

বুদাপেস্টের দক্ষিণ-পূর্ব উপকণ্ঠগুলোতে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃতভাবে দুর্বল ছিল। এটা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর সদর-দপ্তর ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টকে হুকুম দিল তিসা নদীর পশ্চিম তীরে শত্রুকে বিধ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে ও ৭ম রক্ষী বাহিনীকে এই নদীটি পেরিয়ে যেতে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিসা ও ডানিয়ুব নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে কেবল ৪৬তম বাহিনী এবং ২য় রক্ষী মেকানাইজ্‌ড কোরের শক্তি দিয়ে আঘাত হানতে, এবং পরে ৪র্থ রক্ষী মেকানাইজ্‌ড

কোরের আগমনের পর বুদাপেস্ট অভিমুখে চূড়ান্ত আক্রমণাভিযান আরম্ভ করতে।

২৯ অক্টোবর তারিখে ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের বাম পার্শ্বের সৈন্যরা শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে ফেলে এবং ২য় ও ৪র্থ রক্ষী মেকানাইজ্‌ড কোরগুলোকে লড়াইয়ে ঢোকানোর পর দ্রুত গতিতে অগ্রসর হতে আরম্ভ করে। ৫ দিন পর উভয় কোর দক্ষিণ দিক থেকে বুদাপেস্টের উপকণ্ঠে পৌঁছে যায়, তবে গতিতে থেকে শহরে প্রবেশ করতে পারে নি। জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী তাড়াহুড়ো করে মিশকোল্‌স অঞ্চল থেকে তিনটি ট্যাঙ্ক ও একটি মেকানাইজ্‌ড ডিভিশনকে এখানে পাঠিয়ে দেয়। এই ডিভিশনগুলো প্রবল প্রতিরোধ দিচ্ছিল। সেই জন্য সর্বোচ্চ সদর-দপ্তর সোভিয়েত ফৌজের পরবর্তী ক্রিয়াকলাপের পরিকল্পনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটায়। ৪ নভেম্বর সর্বোচ্চ সদর-দপ্তর ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের অধিনায়ককে জানিয়ে দিল যে একটি সংকীর্ণ অঞ্চলে অল্প সংখ্যক পদাতিক সৈনিক সমেত কেবল দু'টি মেকানাইজ্‌ড কোরের শক্তি দিয়ে বুদাপেস্ট আক্রমণ করলে অহেতুক ক্ষয়ক্ষতি ঘটতে পারে এবং এই অভিমুখে সংগ্রামরত সোভিয়েত সৈন্যরা উত্তর-পূর্ব দিক থেকে ফ্যাসিস্ট শক্তির পার্শ্বদেশীয় আঘাতের মধ্যে পড়তে পারে। সেই জন্য ফ্রন্টকে যথাসম্ভব দ্রুত তিসার পশ্চিমে ২৭তম, ৪০তম, ৫৩তম ও ৭ম রক্ষী বাহিনীগুলোর সৈন্যদের সরিয়ে নেওয়ার হুকুম দেওয়া হয় যাতে ব্যাপক রণাঙ্গনে আক্রমণ চালানো যায় এবং উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিক থেকে ফ্রন্টের ডান অংশের আঘাতে ও দক্ষিণ দিক থেকে বাঁ অংশের (৪৬তম বাহিনী, ২য় ও ৪র্থ রক্ষী মেকানাইজ্‌ড কোরের) আঘাতে শত্রুর বুদাপেস্ট গ্রুপিংটিকে বিধ্বস্ত করা যায়। তিসা নদীর পশ্চিম তীরে দ্রুত শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করার উদ্দেশ্যে ফ্রন্টকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে ৭ নভেম্বরের মধ্যে সলনোক অঞ্চল থেকে উত্তরাভিমুখে জেনারেল প্লিয়েভের অশ্বারোহী-মেকানাইজ্‌ড গ্রুপের শক্তিসমূহ দিয়ে আঘাত হানতে হবে এবং নিজের ডান অংশটিকে তিসার পশ্চিম তীরে নিয়ে যেতে হবে।

ডিসেম্বরের গোড়াতে ফ্রন্টের সৈন্যরা আক্রমণাভিযান আরম্ভ করে বুদাপেস্টের উত্তরে ও উত্তর-পশ্চিমে ডানিয়ুব তীরে পৌঁছে যায় এবং উত্তরাভিমুখে শত্রুর পশ্চাদপসরণের পথ কেটে দেয়। কঠোর লড়াইয়ের পর ৪৬তম বাহিনী ডানিয়ুব সামরিক ফ্লোটিল্যার সহায়তায় ৫ ডিসেম্বর তারিখে

ডানিয়ুব অতিক্রম করে বিপরীত তীরে অনতিবৃহৎ একটি ব্রিজ-হেড দখল করে নেয়।

৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সৈন্যরাও সাফল্যের সঙ্গে তাদের কাজ করে যাচ্ছিল। ৫৭তম বাহিনী ডানিয়ুব সামরিক ফ্লোটিল্যার সমর্থনে বাতিনা ও আপাতিনা নামক যুগোস্লাভীয় জনপদগুলোর অঞ্চলে ডানিয়ুব নদী পার হয় এবং বিপরীত তীরে একটি ব্রিজ-হেড দখল করে নেয়।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে ফ্রন্টের সৈন্যরা ভেলেনসে ও বালাতন হ্রদগুলোর তীরে পেঁাছে যায় এবং বুদাপেস্টের পশ্চিমে শত্রুর যোগাযোগ পথ কেটে দেয়। এর ফলে বুদাপেস্ট অঞ্চলে প্রতিরক্ষারত নাৎসি ফৌজগুলোকে পরিবেষ্টনের পূর্বশর্ত সৃষ্টি হল। এটা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর সদর-দপ্তর তার ১২ ডিসেম্বর তারিখের নির্দেশ দ্বারা ২য় ও ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টগুলোকে ব্যাপক আঘাত হেনে শত্রুর বুদাপেস্ট গ্রুপিংটিকে বিধ্বস্ত করতে এবং হাঙ্গেরির রাজধানী অধিকার করতে বাধিত করে।

ওই সময়ে ২য় ও ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টগুলোর কাছে ছিল ৮৪টি ডিভিশন (তার মধ্যে ১৪টি রুমানীয়), ৩টি অশ্বারোহী, ৩টি ট্যাঙ্ক ও ৪টি মেকানাইজ্‌ড কোর। ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সঙ্গে সহযোগিতা করছিল যুগোস্লাভিয়ার জাতীয়-মুক্তি বাহিনীর সৈন্যরা। ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের পরিচালনাধীন ১ম বুলগেরীয় বাহিনীটি ফ্রন্ট লাইনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। স্থল বাহিনীগুলোকে সমর্থন জোগাচ্ছিল ৫ম ও ১৭শ বিমান বাহিনী।

জার্মান-ফ্যাসিস্ট ও হাঙ্গেরীয় ফৌজগুলোর গ্রুপিংয়ে ছিল ৫১টি ডিভিশন (তার মধ্যে ৯টি ট্যাঙ্ক ডিভিশন) ও ২টি ব্রিগেড। ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সম্মুখে — ডানিয়ুব নদী ও বালাতন হ্রদের মধ্যবর্তী অঞ্চলে, যেখান দিয়ে যাচ্ছিল 'মার্গারেট' লাইন, শত্রু ইঞ্জিনিয়ারিং বিচারে অতি মজবুত ও বিকশিত একটি প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়েছিল যা গঠিত হয়েছিল তিনটি প্রতিরক্ষা লাইন নিয়ে।

মুখ্য দিকগুলোতে ফ্রন্টগুলোর প্রধান শক্তি ও যুদ্ধোপকরণের সমাবেশ ঘটাতে সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী ব্যূহভেদের অঞ্চলগুলোতে শত্রুর উপর যথেষ্ট প্রাধান্য সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। যেমন, ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টে আক্রমণকারী গ্রুপিংটি শত্রুকে জনবলে ৩·৩ গুণ, তোপে

৪·৮ গুণ, ট্যাঙ্কে ও সেলফ-প্রলেল্ড অ্যাসল্ট গানে ৩·৫ গুণ ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

আক্রমণাভিযান আরম্ভ হয় ২০ ডিসেম্বর।

২য় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের বাঁ অংশের সৈন্যরা (বুদাপেস্ট গ্রুপ — ৭ম রক্ষী বাহিনীর ৩০তম ইনফেণ্ট্রি কোর; ৭ম রুমানীয় কোর, ১৮শ স্বতন্ত্র রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোর) শত্রুর দৃঢ় প্রতিরোধ অতিক্রম করে ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে পূর্ব দিক থেকে বুদাপেস্টের কাছে গিয়ে উপনীত হয়। ফ্রণ্টের ডান অংশে সংগ্রামরত ৪০তম, ২৭তম, ৫৩তম বাহিনীগুলো, জেনারেল প্লিয়েভের অশ্বারোহী-মেকানাইজ্ড গ্রুপ ও রুমানীয় বাহিনীর ফর্ম্যাশনগুলো চেকোস্লোভাকিয়ার ভূখণ্ডে পদার্পণ করল।

৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের সৈন্যরা শত্রুর প্রধান প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রটি ভেদ করে আক্রমণাভিযানের প্রথম দিনেই ৫-৭ কিলোমিটার অগ্রসর হয়ে যায়। শত্রু ইনফেণ্ট্রি ও ট্যাঙ্কের সাহায্যে প্রবল প্রতিআক্রমণ চালায়।

কেবল চতুর্থ দিনে ফ্রণ্টের সৈন্যরা তিনটি প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের সবগুলো ভেদ করতে পেরেছিল। আক্রমণাভিযান আরম্ভ হওয়ার পর ২৭ কিলোমিটার অবধি অগ্রসর হয়ে তারা কঠোর লড়াইয়ের মাধ্যমে সেকেশফেখেরভার শহরটি দখল করে নেয় এবং তারপর উত্তরাভিমুখে ধাবিত হয়। ২৪ ডিসেম্বর সোভিয়েত সৈন্যরা বিচ্কে শহর থেকে ফ্যাসিস্ট ইউনিটগুলোকে তাড়িয়ে দেয়, আর তার দু'দিন বাদে ডানিয়ুব নদীতে পৌঁছে এস্তেরগম শহরটি অধিকার করে নেয় এবং ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হয়। এর ফলে পরিবেষ্টনের মধ্যে পড়ে শত্রুর ১ লক্ষ ৮৮ হাজার লোকের বুদাপেস্ট গ্রুপিংটি, যার সেনাপতিত্বে ছিল এস-এস বাহিনীর ওবেরগ্রুপ্পেনফিউরেরে ক.প্ফেফের-ভিলডেনব্রুখ। একই সঙ্গে ৪৬তম বাহিনী ২য় রক্ষী মেকানাইজ্ড কোরের সঙ্গে সহযোগিতায় বুদায় (বুদাপেস্ট শহরের ডান তীরস্থ অংশ) ঢুকে পড়ে এবং রাস্তায় রাস্তায় লড়াই আরম্ভ করে। ৪র্থ রক্ষী বাহিনীর ও ৫ম রক্ষী অশ্বারোহী কোরের ফর্ম্যাশনগুলো পরিবেষ্টনের বহির্দিকস্থ লাইন সৃষ্টি করে সেকেশফেখেরভার শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমের যুদ্ধ-সীমায় অগ্রসর হয়।

ফ্রণ্টগুলোর অধিনায়কদ্বয় মার্শাল র. মালিনোভ্স্কি ও মার্শাল ফ. তল্বুখিন আর যাতে রক্তপাত না ঘটে সেই উদ্দেশ্যে এবং বুদাপেস্ট যাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয় ও তার ঐতিহাসিক স্মৃতি নিদর্শনসমূহ যাতে রক্ষা পায় সেই জন্যে অবরুদ্ধ নাৎসি গ্রুপিংটির সেনাপতিমণ্ডলীর কাছে

চরম প্রস্তাব হাজির করলেন যাতে আত্মসমর্পণের মানবিক শর্ত ছিল। ২৮ ডিসেম্বর রাত্রে এবং পরের দিন সকালে রণাঙ্গনের অগ্রবর্তী অবস্থান থেকে প্রবল লাউডস্পিকার মাধ্যমে বুদাপেস্ট অঞ্চলে অবরুদ্ধ ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী ও সৈন্যদের নিরবচ্ছিন্নভাবে জানানো হয় যে চরম প্রস্তাবপত্র প্রদানের জন্য শিগগিরই সোভিয়েত সন্ধিদূতদের পাঠানো হবে। সন্ধিদূতদের প্রেরণের সময় এবং তাদের যাত্রাপথ সম্পর্কেও জার্মানদের অবগত করা হয়। মস্কোর সময় বেলা ১১টায় ডানিয়ুবের বাঁ তীরস্থ রণক্ষেত্র থেকে সোভিয়েত অফিসার-সন্ধিদূত ক্যাপ্টেন ম. শ্তেইন্‌মেৎস বড় একটা শাদা পতাকা নিয়ে মোটর গাড়িতে করে শত্রুর অবস্থানের দিকে রওয়ানা দিলেন। তিনি যখন কিশ্‌পেস্টের (বুদাপেস্টের শহরতলি) দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে শত্রুর অগ্রবর্তী অবস্থানের কাছে পৌঁছলেন, ফ্যাসিস্টরা উত্তোগিত শাদা পতাকা দেখেও গুলি ছুঁড়তে লাগল, এবং ক্যাপ্টেন শ্তেইন্‌মেৎস নিহত হন।

দ্বিতীয় সন্ধিদূত ক্যাপ্টেন ই. ওস্তাপেঙ্কো ডানিয়ুবের ডান তীরস্থ রণক্ষেত্র থেকে রওয়ানা দিলেন। বড় শাদা পতাকা হাতে তিনি বুদায়েশ্‌র্ জনপদের ৪ কিলোমিটার পূর্বে কয়েকটি সড়কের সংযোগ স্থলে ফ্রন্ট লাইন অতিক্রম করেন। অবরুদ্ধ জার্মান বাহিনীর সদর-দপ্তরে সন্ধিদূতকে জানানো হয় যে চরম প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে না এবং কোনরূপ আলাপ-আলোচনা চলবে না। প্রত্যাবর্তনের সময় ওস্তাপেঙ্কোও ফ্রন্ট লাইনের কাছে নিহত হন।

জার্মানরা আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করল। এ ব্যাপারটি সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলীকে অবরুদ্ধ গ্রুপিংটি ধ্বংসকরণের উদ্দেশ্যে সামরিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হতে বাধ্য করল। নতুন শক্তিতে কঠোর লড়াই শুরু হল। অতি খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে দিনরাত নিরবচ্ছিন্নভাবে লড়াই চলতে থাকল। ফ্যাসিস্ট সৈন্যরা শোচনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল।

হাঙ্গেরির ভূখণ্ডে সোভিয়েত বাহিনীর সফল সামরিক ক্রিয়াকলাপ স্বদেশপ্রেমিক শক্তিসমূহকে বেশ সক্রিয় করে তুলে। ১৯৪৪ সালের ২ ডিসেম্বর কমিউনিস্টদের উদ্যোগে সেগেদ শহরে গঠিত হয় হাঙ্গেরীয় জাতীয়-মুক্তি ফ্রন্ট, যাতে পূর্বে হাঙ্গেরীয় ফ্রন্টে অন্তর্ভুক্ত চারটি পার্টি ছাড়াও যোগদান করে বুর্জোয়া-ডেমোক্রাটিক পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলো। হাঙ্গেরীয় কমিউনিস্ট পার্টি রচিত ফ্রন্টের কর্মসূচিতে ছিল: জাতীয় নবজাগরণ, জার্মান-ফ্যাসিস্ট হানাদারদের বিতাড়নের কাজে সোভিয়েত সৈন্যদের সহায়তা দান, জনগণবিরোধী সংগঠনসমূহ অবৈধকরণ, গণতান্ত্রিক

স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা, জমি মালিকানার সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলোপ সাধন, রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে ফ্যাসিস্টপন্থী ব্যক্তিদের তাড়ান, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী ও ফ্যাসিস্টবিরোধী জোটের অন্যান্য দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন।

হাঙ্গেরির রাজনৈতিক জীবনে বৃহৎ ভূমিকা পালন করেছিল ২১ ডিসেম্বর তারিখে দেব্রেৎসেনে উদ্বোধিত অস্থায়ী জাতীয় সভার সিদ্ধান্তসমূহ। এই জাতীয় সভা নির্বাচন করে রাজনৈতিক পরিষদ যা রাষ্ট্রপ্রধানের কাজ করছিল। অচিরেই তা ১ম হাঙ্গেরীয় বাহিনীর প্রাক্তন অধিনায়ক জেনারেল ব. মিক্‌লোশের নেতৃত্বে একটি অস্থায়ী কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। ২৮ ডিসেম্বর হাঙ্গেরির অস্থায়ী সরকার জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

অস্থায়ী জাতীয় সভার প্রথম অধিবেশনটি হাঙ্গেরীয় জনগণের উদ্দেশে একটি আবেদনপত্র প্রকাশ করে। তাতে নতুন, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয় এবং জন-গণতান্ত্রিক হাঙ্গেরি নির্মাণের আশু কর্তব্যগুলোর কথা বলা হয়। অস্থায়ী জাতীয় সভা এবং সরকারের সিদ্ধান্তসমূহ হাঙ্গেরীয় জনগণ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হয়।

তখনও নাৎসিদের সমর্থনকারী হাঙ্গেরীয় সৈনিকদের প্রতি অস্থায়ী জাতীয় সভার এক আবেদনে বলা হয়: ‘জাতির আদেশ ছাড়া আপনাদের জন্য আর কোন আদেশ নেই!’ এবং অস্থায়ী জাতীয় সভা জাতির তরফ থেকে তাদের এই আহ্বান জানায় যে তারা যেন জার্মান নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, মুক্তিদাতা সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীকে সমর্থন করে, স্বাধীনতার জন্য হাঙ্গেরীয় যোদ্ধাদের সঙ্গে মিলিত হয় এবং নবগঠিত হাঙ্গেরীয় সৈন্য বাহিনীতে যোগ দেয়।*

হাঙ্গেরীয় গণ-প্রজাতন্ত্র গঠনের ২৫তম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আনুষ্ঠানিক অধিবেশনে হাঙ্গেরীয় সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টির প্রথম সম্পাদক ইয়া. কাদার বলেন: ‘বহু সোভিয়েত যোদ্ধা নিজের রক্ত দিয়ে হাঙ্গেরীয় মাটি সিক্ত করেছে, প্রাণ দিয়েছে আমাদের জনগণের মুক্তির জন্য। অগণ্য প্রাণহানির জন্য সোভিয়েত জনগণের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা

গভীর ও শাশ্বত। আমরা কখনও এ কথা ভুলব না যে সোভিয়েত ইউনিয়ন হচ্ছে আমাদের মুক্তিদাতা।*

পরিবেষ্টনের বহির্দিকস্থ রণাঙ্গনের ঘটনাবলির দরুন বুদাপেস্ট গ্রুপিংটির বিলোপ সাধনের কাজ চলে খুবই ধীরে ধীরে। ১৯৪৫ সালের জানুয়ারি মাসে জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী পরিবেষ্টিত শক্তিসমূহকে মুক্ত করার এবং ডানিয়ুব বরাবর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টায় তিনটি প্রবল প্রতিঘাত হানে। এই উদ্দেশ্যে তারা পরিবেষ্টনের বহির্দিকস্থ রণাঙ্গনে সংগ্রামরত ৪র্থ রক্ষী বাহিনীর বিরুদ্ধে যথেষ্ট শক্তির সমাবেশ ঘটায়। পরে শত্রু তা নিরবচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধি করে, প্রধানত ট্যাঙ্ক ইউনিটগুলো দিয়ে।

সোভিয়েত ফৌজের পক্ষে প্রথম (২-৬ জানুয়ারি) ও তৃতীয় (১৮-২৬ জানুয়ারি) প্রতিঘাতগুলো বিশেষ অনুভবযোগ্য ছিল। কমার্নো অঞ্চল থেকে আঘাত হেনে ফ্যাসিস্টরা বিপুল ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে ডানিয়ুবের ডান তীর বরাবর ২৫-৩৭ কিলোমিটার অগ্রসর হয়ে এস্তেরগমের পূর্বে — বিচ্‌কে-বান্‌খিদের উত্তরে অবস্থিত এক যুদ্ধ-সীমায় পৌঁছতে সমর্থ হল। তবে সোভিয়েত যোদ্ধাদের বীরত্বের জন্য, প্রতিরক্ষায় তাদের অটলতার কল্যাণে, এবং ব্যূহভেদের এলাকা অভিমুখে মজুদ শক্তিসমূহ ও বিশেষত ট্যাঙ্ক আর আর্টিলারি নিপুণভাবে স্থানান্তরণের কল্যাণে শত্রুকে রুখা সম্ভব হয়েছিল। শত্রুর প্রথম প্রতিঘাত প্রতিহতকরণে বৃহৎ ভূমিকা পালন করে সেই আক্রমণাভিযানটি যা সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর সদর-দপ্তরের নির্দেশে ডানিয়ুবের উত্তর তীর বরাবর আরম্ভ করেছিল ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের ৬ষ্ঠ রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনী ও ৭ম রক্ষী বাহিনী। কমার্নো অঞ্চলে, অর্থাৎ শত্রুর পার্শ্বদেশে ও পশ্চাদ্ভাগে তাদের আগমন শত্রুকে আক্রমণ বন্ধ করতে বাধ্য করে।

কিছুটা দক্ষিণে দ্বিতীয় প্রতিঘাত (৭-১১ জানুয়ারি) হেনে নাৎসিরা আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। আক্রমণাভিযানের ৫ দিনে তারা মাত্র ৬-৭ কিলোমিটার অগ্রসর হতে পেরেছিল। তিনটি জার্মান ট্যাঙ্ক ডিভিশনের আঘাত প্রতিহত হয় ২০তম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি কোর ও ৭ম মেকানাইজ্‌ড কোরের দ্বারা, এবং এর ফলে শত্রু প্রতিরক্ষায় লিপ্ত হতে বাধ্য হয়।

সপ্তাহ বাদে বালাতন হ্রদের উত্তরে অবস্থিত একটি অঞ্চল থেকে হানা তৃতীয় আঘাতটি ছিল সবচেয়ে প্রবল ও বিপজ্জনক। শত্রুর আক্রমণকারী গ্রুপিংয়ে ছিল ৫৬০টি ট্যাংক ও অ্যাসল্ট গান। অতি অল্প সময়ের মধ্যে (৩ দিন) জার্মান-ফ্যাসিস্ট সৈন্যরা দুনাপেন্তেলে অঞ্চলে ডানিয়ুব নদীতে পেঁছে যায় এবং তার পশ্চিম তীরে অবস্থিত ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের ফৌজকে দুই অংশে বিভক্ত করে দেয়। সৈন্য পরিচালনার কাজ অত্যন্ত জটিল হয়ে ওঠে।

সর্বোচ্চ সদর-দপ্তরের ২২ জানুয়ারি তারিখের নির্দেশানুসারে এহেন জটিল পরিস্থিতির অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে জরুরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট থেকে বিপুল শক্তি নিয়ে সর্বোচ্চ সদর-দপ্তর তা ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের হাতে তুলে দেয়। গঠিত হল দু'টি আক্রমণকারী গ্রুপ: একটি — ব্যূহভেদের এলাকার উত্তরে, অন্যটি — দক্ষিণে। ২৭ জানুয়ারি গ্রুপগুলো আক্রমণাভিযান আরম্ভ করে, আর ৭ ফেব্রুয়ারি শত্রুর কঠোর প্রতিরোধ অতিক্রম করে বহির্দিকস্থ রণাঙ্গনে প্রতিঘাতের পূর্বে বিদ্যমান যুদ্ধ-সীমাতেই নিজের অবস্থান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে।

এইভাবে, পরিবেষ্টিত গ্রুপিংকে মুক্ত করার এবং ডানিয়ুবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জার্মান পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সোভিয়েত সৈন্যদের প্রতিরক্ষামূলক ক্রিয়াকলাপের সাফল্যের পেছনে ছিল উচ্চ চলাচল ক্ষমতা, সঙ্কটজনক এলাকায় মজুত শক্তির (বিশেষত ট্যাংক এবং আর্টিলারি-অ্যান্টিট্যাংক ফর্ম্যাশন আর ইউনিটগুলোর) কালোচিত স্থানান্তরণ, শত্রুর সম্ভাব্য আক্রমণাভিযানের দিকগুলোতে দ্রুত প্রতিরক্ষা লাইন গঠন, উভয় ফ্রন্টের বিমান বাহিনীগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সোভিয়েত যোদ্ধাদের সাহসিকতা ও বীরত্ব।

বহির্দিকস্থ রণাঙ্গনে ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের প্রবল সামরিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সঙ্গে বুদাপেস্টে শত্রুর অবরুদ্ধ গ্রুপিংটির বিলোপ ঘটানোর জন্যও লড়াই চলছিল। সে লড়াই চলছিল অতি জটিল পরিস্থিতিতে। বুদাপেস্ট অস্ট্রিয়ার এবং জার্মানির দক্ষিণাঞ্চলসমূহের প্রবেশ পথগুলো ও ওখানে পেঁছার সবচেয়ে অদীর্ঘ রাস্তাগুলো রোধ করে রেখেছিল, সেই জন্যই শত্রুর পক্ষে এই শহরটির গুরুত্বপূর্ণ রণনৈতিক তাৎপর্য ছিল এবং সেটা সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ঘাঁটিতে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। শহরে গঠিত হয়েছিল ১১০টি প্রতিরোধ কেন্দ্র ও ২ শতাধিক দৃঢ় ঘাঁটি। প্রতিরোধ কেন্দ্রগুলোতে অন্তর্ভুক্ত ছিল কলকারখানা, রেলওয়ে স্টেশন, রেলওয়ে টার্মিনাল ও বড়

বড় বাড়িগুলো সমেত একটি অথবা কয়েকটি আবাসিক এলাকা। দৃঢ় ঘাঁটিগুলোতে অন্তর্ভুক্ত ছিল এক-দু'টি বাড়ি এবং ওগুলো অবস্থিত ছিল প্রতিরোধ কেন্দ্রগুলোর মাঝে মাঝে। সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ স্থানান্তরণের জন্য শত্রু ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছিল ভূগর্ভস্থ যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলো: পাতাল রেলপথ, মল নিষ্কাশন পথ আর ক্যাটাকম্‌বগুলো। প্রতিটি রাস্তাকে, প্রতিটি আবাসিক এলাকাকে ও বহু বাড়িকে ফ্যাসিস্টরা দীর্ঘকালীন প্রতিরক্ষার উপযোগী করে তোলে।

অবরুদ্ধ শত্রুর বিলোপ সাধনের কাজে লিপ্ত হয়েছিল ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সৈন্যদের ৪-৫ ইনফেন্ট্রি কোরগুলো নিয়ে গঠিত বুদাপেস্ট গ্রুপটি। সোভিয়েত সৈন্যরা ক্রমাগতভাবে ধ্বংস করছিল শত্রুর দৃঢ় ঘাঁটিগুলো; একটার পর একটা রাস্তা, একটির পর একটি আবাসিক এলাকা দখল করছিল। ১৮ জানুয়ারি শহরের পূর্ব অংশটি — পেস্ট — সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যায়, আর ১৩ ফেব্রুয়ারি মুক্ত হয় পশ্চিম অংশটি — বুদা। ১ লক্ষ ৩৮ সহস্রাধিক ফ্যাসিস্ট সৈন্য বন্দী হয়। বুদাপেস্টের মুক্তির জন্য লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছিল রুমানীয় ফর্ম্যাশন এবং হাঙ্গেরীয় স্বেচ্ছাসেবকদের বুদাপেস্ট রেজিমেণ্টটি। এর ছিল বৃহৎ রাজনৈতিক তাৎপর্য।

বুদাপেস্ট অপারেশনের গুরুত্বপূর্ণ ফল ছিল এই যে এই স্ট্র্যাটেজিক অভিমুখে সোভিয়েত সৈন্যদের সক্রিয় ক্রিয়াকলাপ জার্মান সেনাপতিমণ্ডলীকে দক্ষিণ-পশ্চিম যুদ্ধক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক সৈন্য, বিশেষত ট্যাঙ্ক ও মোটোরাইজ্‌ড ফৌজ প্রেরণ করতে বাধ্য করেছিল। এতে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে যুধ্যমান সমস্ত জার্মান ট্যাঙ্ক ও মোটোরাইজ্‌ড ডিভিশনের অর্ধেকই চলে গিয়েছিল কার্পেথিয়ার দক্ষিণে। এবং এটা ঘটে ঠিক সেই সময় যখন লাল ফৌজ কার্পেথিয়ার উত্তরে, প্রধান ওয়ার্শো-বার্লিন অভিমুখে আক্রমণাভিযান আরম্ভ করে!

জার্মান সেনাপতিমণ্ডলী বুদাপেস্ট অঞ্চলে ট্যাঙ্ক ও মোটোরাইজ্‌ড ডিভিশনগুলো সমাবেশকরণের উপর বিপুল গুরুত্ব আরোপ করছিল। কারণ তারা মনে করেছিল যে তারা আক্রমণরত সোভিয়েত সৈন্যদের রুখতে এবং এমনকি তাদের ডানিয়ুবের অপর তীরে হটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু তা ঘটে নি দেখে তারা অতিশয় বিস্মিত হল। জার্মান বাহিনীসমূহের 'দক্ষিণ' গ্রুপের অধিনায়ক ফ্রিসনের ১৯৪৪ সালে ও ১৯৪৫ সালের গোড়াতে রুমানিয়া ও হাঙ্গেরির ঘটনাবলি নিয়ে তার লেখা বইয়ে জানাচ্ছে

যে স্থলসেনার সদর-দপ্তরের অধিকর্তা গ্রুদেরিয়ান বুদাপেস্টের কাছে লড়াইয়ের সময় তাকে বলেছিল যে সে 'বুঝতে পারছে না কেন এখানে (হাঙ্গেরিতে। — লেখক) গঠিত 'ট্যাঙ্ক ফৌজের' সাহায্যে শত্রুকে রুখা সম্ভব নয়। এরূপ বিপুলাকারের ফৌজ পূর্ব রণাঙ্গনে ছিল অভূতপূর্ব।'*

বুদাপেস্ট অপারেশনের সময় উভয় ফ্রন্টের সৈনিক, অফিসার আর জেনারেলদের সমস্ত শারীরিক ও নৈতিক শক্তি একত্রিত করতে হয়েছিল। এটা উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে যে বুদাপেস্ট অপারেশনের মতো ১৯৪৪ সালের আর কোন আক্রমণাভিযানে সোভিয়েত সৈন্যদের এত কঠোর প্রতিরক্ষামূলক লড়াইয়ে লিপ্ত হতে হয় নি, শত্রুর আর কোন বৃহৎ গ্রুপিংয়ের পরিবেষ্টনে ও বিলোপ সাধনে এত বেশি সময় লাগে নি।

হাঙ্গেরির ভূখণ্ডে সম্পন্ন অপারেশনগুলোর বৈশিষ্ট্য ছিল সামরিক ক্রিয়াকলাপের বিপুল বৈচিত্র্য। সোভিয়েত সৈন্যরা জার্মানদের সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যূহ ('মার্গারেট' লাইন) ভেদ করে, গতিতে থেকে বড় নদীগুলো (তিসা, ডানিয়ুব) অতিক্রম করে, বেশি গভীরতায় শত্রুকে পশ্চাদনুসরণ করে এবং পাহাড়পর্বতে আর বড় বড় জনপদে লড়াই চালায়। সাধারণত সৈন্যদের আক্রমণাভিযানের এলাকা ছিল সুবিস্তৃত, শক্তি ও যুদ্ধোপকরণের ঘনতা ছিল অপেক্ষাকৃত কম, তবে এরূপ পরিস্থিতিতেও তারা উচ্চ রণকৌশল, সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করে বড় বড় সাফল্য অর্জন করে।

ডানিয়ুব ফ্লোটিল্যার সঙ্গে ইনফেণ্ট্রি ইউনিটগুলোর সুসংগঠিত পারস্পরিক সহযোগিতা, নিরবচ্ছিন্ন সৈন্য পরিচালন এবং অব্যাহত যুদ্ধোপকরণ সরবরাহের ব্যাপারগুলোও ছিল বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

হাঙ্গেরির ভূখণ্ডে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছিল বিপুল সংখ্যক ট্যাঙ্ক ও মেকানাইজড ফৌজ। দেব্রেৎসেন ও বুদাপেস্ট অপারেশনগুলোতে ৬ষ্ঠ রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীটি আক্রমণাভিযান চালাচ্ছিল প্রথম এশিলনে স্বতন্ত্র এক অঞ্চলে, এবং তার কারণটি ছিল প্রধানত শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা ও তদঞ্চলের ভূখণ্ডগত বৈশিষ্ট্য। সোভিয়েত সৈন্যরা বৃহৎ শিল্প নগরীতে সামরিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ঝঞ্ঝাক্রমণকারী গ্রুপগুলোকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

* Friessner H. Verratene Schlachten. — Hamburg, 1956, S. 205.

বুদাপেস্ট অপারেশন সম্পন্ন করে ২য় ও ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সৈন্যরা ভিয়েনা অভিমুখে আক্রমণাভিযানের প্রস্তুতির কাজে হাত দেয়। কিন্তু ওই অঞ্চলের পরিস্থিতিতে আবার তীব্র পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী পাল্টা-আক্রমণ আরম্ভ করার জন্য বৃহৎ শক্তির সমাবেশ ঘটায়। ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সৈন্যদের চেয়ে শত্রুর ট্যাঙ্ক ও অ্যাসল্ট গানের সংখ্যা ছিল ২·১ গুণ বেশি। জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলীর পরিকল্পনাটি ছিল এরূপ: বালাতন হ্রদ অঞ্চলে সোভিয়েত ফৌজকে বিধ্বস্ত করা, ডানিয়ুব নদী বরাবর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, হাঙ্গেরির তৈলের উৎসগুলো নিজের অধিকারে রাখা এবং অস্ট্রিয়া ও দক্ষিণ জার্মানির শিল্পাঞ্চলসমূহের প্রতি হুমকি দূর করা। এই পাল্টা-আক্রমণে নাৎসিদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল: তারা বলকান অঞ্চলকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ব্রিটেনের মধ্যে কলহের উপলক্ষ হিশেবে ব্যবহার করতে চাইছিল। সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর সদর-দপ্তর ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সৈন্যদের হুকুম দিল তারা যেন ভিয়েনা অভিমুখে আক্রমণাভিযানের প্রস্তুতি অব্যাহত রেখে সাময়িকভাবে আত্মরক্ষায় লিপ্ত হয় এবং শত্রুর আক্রমণকারী গ্রুপিংকে নাজেহাল ও দুর্বল করে দেয়।

১৯৪৫ সালের ৬ মার্চ ফ্যাসিস্টরা পাল্টা-আক্রমণ আরম্ভ করে। কঠোর লড়াই আরম্ভ হয় এবং তা চলে দশ দিন। ২৫-৩০ কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত সুদৃঢ় ও সুসংগঠিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার (তাতে ট্যাঙ্কবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও ছিল) সম্মুখীন হয়ে শত্রু শোচনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় (৪০ হাজার লোক, প্রায় ৫০০ ট্যাঙ্ক ও অ্যাসল্ট গান হারায়) এবং ১৫ মার্চ তারিখে আক্রমণাভিযান বন্ধ করে আত্মরক্ষায় লিপ্ত হতে বাধ্য হয়। তার সৈন্যদের নৈতিক অবস্থার তীব্র অবনতি ঘটে।

বালাতন হ্রদের অঞ্চলে ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে শত্রুর পাল্টা-আক্রমণ প্রতিহত করার ঘটনাটি ছিল এই যুদ্ধের সময় সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর সর্বশেষ বৃহৎ প্রতিরক্ষামূলক অপারেশন।

শত্রু সৈন্যকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়ার ও দৃঢ় অবস্থান নেওয়ার সুযোগ না দিয়ে ৩য় ও ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টগুলো পরের দিনই ভিয়েনা অভিমুখে আক্রমণাভিযান আরম্ভ করে এবং ৪ এপ্রিল তারিখে হাঙ্গেরিকে সম্পূর্ণরূপে জার্মান-ফ্যাসিস্ট হানাদারদের কবল থেকে মুক্ত করে।

বেলগ্রেড অপারেশন
(১৯৪৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর-২০ নভেম্বর)

রুমানিয়ায় জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের পরাজয় এবং বুলগেরিয়ার মুক্তির পর লাল ফৌজের জন্য বেলগ্রেড অপারেশন পরিচালনার পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে ওঠে। এই অপারেশনটির উদ্দেশ্য ছিল যুগোস্লাভিয়ায় নাৎসি ফৌজকে বিধ্বস্ত করা এবং তার রাজধানী বেলগ্রেড মুক্ত করা।

এই কর্তব্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর সদর-দপ্তর ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের ৫৭তম বাহিনী, ১৭শ বিমান বাহিনী, ৪র্থ রক্ষী মেকানাইজ্‌ড কোর, ২৩৬তম ইনফেণ্ট্রি ডিভিশন, ৫ম স্বতন্ত্র মোটোরাইজ্‌ড ইনফেণ্ট্রি ব্রিগেড ও ডানিয়ুব সামরিক ফ্লোটিল্যাকে কাজে লাগায়। এই সমস্ত ফৌজের কাছে ছিল ২,৩৫০টি তোপ, মর্টার কামান ও রকেট প্রজেক্টর, ৩৫৮টি ট্যাঙ্ক ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গান, ১,২৫০টি বিমান ও প্রায় ৮০খানি যুদ্ধ-জাহাজ, প্রধানত আর্মার্ড্‌ বোট।

এছাড়া অপারেশনে অংশগ্রহণ করেছিল যুগোস্লাভিয়ার গণ-মুক্তি বাহিনীর ১ম আর্মি গ্রুপ (১ম প্রলেতারীয় কোর, ১২শ কোর ও ডিভিশনগুলোর একটি অপারেটিভ গ্রুপ), ১৩শ, ১৪শ, ১৫শ ও ১৬শ কোর এবং ১ম, ২য় ও ৪র্থ বুলগেরীয় বাহিনীগুলো।

সোভিয়েত, যুগোস্লাভ ও বুলগেরীয় বাহিনীসমূহে ছিল ৬ লক্ষ ৬০ হাজার লোক, ৪,৪৭৭টি তোপ ও মর্টার কামান, ৪২১টি ট্যাঙ্ক ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গান, ১,২৫০খানি বিমান। এদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজে ছিল দেড় লক্ষ লোক, ২,১৩০টি তোপ ও মর্টার কামান, ১২৫টি ট্যাঙ্ক ও অ্যাসল্ট গান এবং ৩৫২টি বিমান। শক্তির অনুপাত ছিল গণ বাহিনীগুলোর অনুকূলে: জনসংখ্যায় — ৪·৪ গুণ, আর্টিলারিতে — ২·১ গুণ, ট্যাঙ্ক ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গানে — ৩·৪ গুণ, বিমানের ক্ষেত্রে — ৩·৬ গুণ।

অপারেশনের পরিকল্পনাটি ছিল: সোভিয়েত, যুগোস্লাভীয় ও বুলগেরীয় সৈন্যদের সম্মিলিত প্রয়াসে শত্রুর ‘সের্বিয়া’ আর্মি গ্রুপটি বিধ্বস্ত করা, গ্রীসে অবস্থিত জার্মান বাহিনীসমূহের ‘E’ গ্রুপটির যোগাযোগ পথ কেটে দেওয়া এবং বলকান উপদ্বীপের দক্ষিণাঞ্চল থেকে ওটাকে হটতে না দেওয়া। বুলগেরীয় সৈন্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায়

৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের ফৌজগুলো পূর্ব দিক থেকে বেলগ্রেডের উপর প্রধান আঘাত হানছিল। যুগোস্লাভিয়ার গণ-মুক্তি বাহিনীর ইউনিট ও ফর্ম্যাশনগুলো শত্রুর উপর আঘাত হানছিল পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব দিক থেকে।

ইয়সিফ ব্রজ্ টিটোর অনুরোধক্রমে যুগোস্লাভিয়ার ভূখণ্ডে সোভিয়েত ও বুলগেরীয় বাহিনীগুলোর ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত হচ্ছিল যুগোস্লাভ জা[illegible] সেনাপতিমণ্ডলীর সঙ্গে বোঝাপড়া করে। ১৯৪৪ সালের ১৫ জুলাই টিটো ই. স্তালিনকে লিখেছিলেন যে 'সের্বিয়ায় সম্ভাব্য সমস্ত উপায়ে রাজার অনুগামীদের, অর্থাৎ চেৎনিকদের অবস্থান সুদৃঢ় করার এবং আমাদের অবস্থান দুর্বল করার জন্য ইংরেজরা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে; সের্বিয়ার প্রতি ইংরেজদের এহেন পলিসির দরুন আমরা মিত্রদের তরফ থেকে কোন প্রকার ফলপ্রসূ সহায়তা আশা করতে পারি না।... আমরা আপনার বিপুল সহায়তা প্রার্থনা করি।' এবং এই সহায়তা দেওয়া হয়েছিল। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে মস্কোতে যুগোস্লাভিয়ার ভূখণ্ডে সোভিয়েত বাহিনীর পদার্পণ সম্পর্কে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তারপর ক্রাইয়োভায় নিরূপিত হয়েছিল যৌথ ক্রিয়াকলাপের চূড়ান্ত পরিকল্পনা। যুদ্ধ সমাপ্তির অনতিকাল পরে যুগোস্লাভিয়ার জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের ফ্যাসিস্টবিরোধী পরিষদের তৃতীয় অধিবেশনের ভাষণ দান কালে ইয়সিফ ব্রজ্ টিটো এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন: '১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি মস্কোতে গেলাম আমাদের দেশ থেকে আগ্রাসকদের দ্রুত বিতাড়নের উদ্দেশ্যে সাহায্য প্রার্থনার জন্য। যেহেতু লাল ফৌজ তখন প্রায় আমাদের দেশের সীমান্তে পৌঁছে গিয়েছিল, সেইহেতু সামরিক ক্রিয়াকলাপের সমন্বয় সাধন সম্পর্কে কথাবার্তা বলার প্রয়োজন ছিল।'*

২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে মাসিডোনিয়ায় যুগোস্লাভিয়ার গণ-মুক্তি বাহিনীর প্রধান সদর-দপ্তরে যুগোস্লাভীয় ও বুলগেরীয় বাহিনীগুলোর সেনাপতিমণ্ডলীর প্রতিনিধিদের একটি সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। তার অংশগ্রহণকারীরা মাসিডোনিয়ার ভূখণ্ডে নাৎসিদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ক্রিয়াকলাপের সম্ভাবনা সম্পর্কে একটা সমঝোতায় পৌঁছেন।

২৮ সেপ্টেম্বর জেনারেল ন. গাগেনের সেনাপতিত্বে ৫৭তম বাহিনীর

সৈন্যরা আক্রমণাভিযান আরম্ভ করে এবং বিমান বাহিনীর সমর্থন পেয়ে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে পূর্ব সের্বীয় পর্বতমালা পেরিয়ে যায়, এবং ১০ অক্টোবরের মধ্যে ভেলিকা-প্লানা অঞ্চলে মরাভা নদীর পাড়ি-ব্যবস্থা দখল করে নেয়। সৈন্যরা ১৩০ কিলোমিটার এগিয়ে গিয়েছিল।

১২ অক্টোবর তারিখে মরাভা নদীর যুদ্ধ-সীমা থেকে বিদ্ধ স্থলে ঢোকানো হয় ৪র্থ রক্ষী মেকানাইজ্‌ড কোরটি, যা সফল আক্রমণাভিযান চালিয়ে ১৪ অক্টোবর বেলগ্রেডের উপকণ্ঠে পেঁছে যায় এবং শহরটির জন্য লড়াই শুরু করে দেয়।

২০ অক্টোবর জার্মান-ফ্যাসিস্ট হানাদারদের কবল থেকে বেলগ্রেড মুক্ত করা হয়। সোভিয়েত সৈন্যদের ছাড়া তার জন্য লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছিল ১ম প্রলেতারীয় কোরের ও ১২শ কোরের ৮টি যুগোস্লাভ ডিভিশন।

যুগোস্লাভিয়ার জনগণ বেলগ্রেড অপারেশনে সোভিয়েত সৈন্যদের ক্রিয়াকলাপের উচ্চ মূল্যায়ন করে। ১৯৪৪ সালের ২১ অক্টোবর মার্শাল ই. ব্রজ্‌ টিটো ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের অধিনায়ককে লেখেন: 'বেলগ্রেড অভিমুখে সংগ্রামরত আপনার সৈন্যদের এই কথাগুলো জানাতে অনুরোধ করছি: যুগোস্লাভিয়ার গণ-মুক্তি বাহিনীর ইউনিটগুলোর সঙ্গে মিলে লাল ফৌজের যে সৈনিক, অফিসার আর জেনারেলরা আমাদের রাজধানী বেলগ্রেড মুক্ত করেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বেলগ্রেড মুক্তকরণের জন্য কঠোর লড়াইয়ে আপনারা যে বীরত্ব ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন যুগোস্লাভিয়ার জাতিসমূহ তাকে লাল ফৌজের অবিস্মরণীয় বীরত্ব হিশেবে সর্বদা স্মরণ করবে। অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মিলিত সংগ্রামে আপনারা এবং যুগোস্লাভিয়ার গণ-মুক্তি বাহিনীর যোদ্ধারা যে রক্ত ঢেলেছেন তা সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিসমূহের সঙ্গে যুগোস্লাভিয়ার জাতিসমূহের ভ্রাতৃত্বকে চিরকালের জন্য সুদৃঢ় করে দিয়েছে।'*

বেলগ্রেড মুক্তির পর সোভিয়েত সৈন্যরা আক্রমণাভিযান চালিয়ে যায় এবং অক্টোবরের শেষ দিকে ক্রালেভো, ক্রুশেভেৎস যুদ্ধ-সীমায় পেঁছে

যায়। বুলগেরীয় সৈন্যরা ১৪ অক্টোবর নিশ শহরটি দখল করে নেয় এবং দক্ষিণ মরাভা নদীর উপত্যকায় গিয়ে পেণছয়।

বেলগ্রেড অপারেশনের ফলে বিধ্বস্ত হয় জার্মানদের 'সেবিয়া' আর্মি গ্রুপটি, বাহিনীসমূহের 'E' গ্রুপটি যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড শহর মুক্তি লাভ করে, জার্মান-ফ্যাসিস্ট হানাদারদের কবল থেকে সমগ্র দেশের মুক্তির জন্য এবং গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের স্বার্থে পরিস্থিতির পরবর্তী পরিবর্তনের জন্য অনুকূল পরিবেশ গড়ে ওঠে।

যুগোস্লাভিয়ার মাটিতে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী প্রায় ৮ হাজার সৈনিক ও অফিসারকে হারায়।

যুগোস্লাভিয়ার মুক্তি সংগ্রামে সোভিয়েত ও বুলগেরীয় সৈন্যদের অংশগ্রহণ যুগোস্লাভ জনগণের কাছে উচ্চ মূল্য লাভ করে। ই. ব্রজ্ টিটো লিখেছিলেন, 'লাল ফৌজের সহায়তায় দ্রুত মুক্ত করা হয় বেলগ্রেড ও সেবিয়া, আর বুলগেরীয় বাহিনীর সহায়তায় মুক্ত হয় মাসিডোনিয়া।'*

বেলগ্রেড অপারেশন — এ হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বছরগুলোতে তিনটি গণ-ফৌজের সংগ্রামী ভ্রাতৃত্ব ও ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক সহযোগিতার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই অপারেশনের বৈশিষ্ট্যটি ছিল এই যে ফর্ম্যাশন-গুলোর দ্বারা পার্বত্য পরিবেশে সামরিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত হচ্ছিল স্বনির্ভর অভিমুখে। স্থল বাহিনীগুলোকে বিপুল সমর্থন জোগাচ্ছিল সোভিয়েত বিমান বাহিনী। তা ৪,৬৭৮ বিমান-উড্ডয়ন চালিয়ে শত্রুর যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে। ডানিয়ুব সামরিক ফ্লোটিল্যা স্থলসেনাকে সৈন্য অবতরণে সাহায্য করে, তোপ থেকে গোলাবর্ষণ করে তাদের সমর্থন জোগায় এবং ডানিয়ুব নদীতে যানবাহন (২ শতাধিক জাহাজ) চলাচলের নির্বিঘ্নতা বজায় রেখে ৭০ সহস্রাধিক সোভিয়েত সৈন্য, বিপুল সংখ্যক ট্যাঙ্ক, কামান, মোটর গাড়ি ও বিভিন্ন ধরনের প্রায় ৮ হাজার টন মালপত্র পরিবহণের কাজটি সম্ভব করে তোলে।

বলকানে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর চমৎকার বিজয়ের ফলে আলবানিয়ার জাতীয়-মুক্তি ফৌজের আক্রমণাভিযানের জন্য অনুকূল

পরিস্থিতি গড়ে ওঠে। অক্টোবরের শেষে তা তিরানা শহরে প্রায় ৩ হাজার জার্মান সৈন্যকে ঘিরে ফেলে, আর ১৭ নভেম্বর আলবানিয়ার রাজধানী মুক্ত করে। নভেম্বর মাসের শেষ দিকে দেশের সমগ্র ভূখণ্ড থেকে জার্মান-ফ্যাসিস্ট হানাদারদের বিতাড়নের কাজ সম্পন্ন হয়।

নাৎসি দখলকারীদের কবল থেকে আলবানিয়া মুক্তকরণে সোভিয়েত ইউনিয়নের চূড়ান্ত ভূমিকার উচ্চ মূল্যায়ন করেছিল আলবানীয় জনগণ। যেমন, ১৯৫০ সালে আলবানীয় শ্রম পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদক এনভের হজা লিখেছিলেন: 'আলবানিয়া গণ-প্রজাতন্ত্র তার অস্তিত্বের জন্য বীর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার সৈন্য বাহিনীর কাছে ঋণী, যারা হিটলারী ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে আপন উপকথাসুলভ বিজয়ের দ্বারা আলবানীয় জনগণকে চিরতরে মুক্ত করেছে বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদীদের এবং রক্তলোলুপ সামন্তদের দ্বারা তার উপর চাপিয়ে-দেওয়া কঠোর দাসত্ব থেকে, জার্মান নাৎসিজম ও ইতালীয় ফ্যাসিজমের গোলামি থেকে।'*

চেকোস্লোভাকিয়া মুক্তকরণের সূত্রপাত

চেকোস্লোভাকিয়া মুক্তকরণের উদ্দেশ্যে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর সামরিক ক্রিয়াকলাপকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্যায় (১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর — ডিসেম্বর) — স্লোভাকিয়ার জাতীয় অভ্যুত্থানকে সমর্থন করার এবং স্লোভাকিয়ার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলসমূহ মুক্তকরণের অপারেশন। দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৪৫ সালের জানুয়ারি — এপ্রিল) — চেকোস্লোভাকিয়ার মধ্যাঞ্চলসমূহ থেকে নাৎসি বিতাড়নের অপারেশন। তৃতীয় পর্যায় (১৯৪৫ সালের মে) — আক্রমণাত্মক প্রাগ অপারেশন, যা দিয়ে সমাপ্ত হয় চেকোস্লোভাকিয়া মুক্তকরণের কাজ।

সোভিয়েত সৈন্যদের অপারেশনগুলোর প্রতিটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। সবচেয়ে কঠিন অপারেশনগুলোর মধ্যে ছিল পূর্ব-কার্পেথীয় অপারেশন, যা পরিচালিত হয় মার্শাল ই. কনেভের ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের বাম পার্শ্বের শক্তিসমূহের দ্বারা এবং জেনারেল ই. পেত্রোভের ৪র্থ

* 'For a Lasting Peace, for People's Democracy' খবরের কাগজ, ১৯৫৯ সালের ১১ আগস্ট।

ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সৈন্যদের দ্বারা। এই অপারেশনটি আরও দ্'টি ভাগে বিভক্ত হয় — কার্পেথীয়-দ্কলা অপারেশন এবং কার্পেথীয়-উজ্গরদ অপারেশন। তবে এগ্লোর পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন।

কার্পেথীয়-দ্কলা অপারেশনটি চলে ১৯৪৪ সালের ৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত। এর উদ্দেশ্য ছিল — স্লোভাকিয়ার জাতীয় অভ্যুত্থানকে সহায়তা দান।

অপারেশন পরিচালনার কাজে নিয্ক্ত হয়েছিল ১ম ও ৪র্থ ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের ৩৮তম ও ১ম রক্ষী বাহিনীগ্লোর সৈন্যরা এবং ১ম চেকোস্লোভাক আর্মি কোর। আকাশ থেকে সৈন্যদের সমর্থন জোগাচ্ছিল ২য় ও ৮ম বিমান বাহিনী।

সোভিয়েত সৈন্যরা প্রধান আঘাতটি হানছিল দ্কলা গিরিপথ অভিম্খে। এর উদ্দেশ্য ছিল — কার্পেথিয়ান পর্বতের পাদদেশে শত্রুকে বিধ্বস্ত করা এবং জার্মান-ফ্যাসিস্ট দখলকারীদের সঙ্গে সংগ্রামে ভ্রাতৃপ্রতিম স্লোভাক জনগণকে সামরিক সহায়তা দানের জন্য কার্পেথীয় পর্বতশ্রেণীর উপর দিয়ে আক্রমণাভিযান চালিয়ে যাওয়া।

সৈন্যদের সম্ম্খে ছিল বনজঙ্গলপ্র্ণ কঠোর পার্বত্য অঞ্চল, তাদের পাহাড়পর্বতের ভেতরে শত্র্র ৫০ কিলোমিটার গভীর স্দৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করার কথা ছিল, যাতে অন্তর্ভুক্ত ছিল ইঞ্জিনিয়ারিং দিক থেকে দৃঢ়ীকৃত গিরিপথগ্লো, বিশেষত দ্কলা গিরিপথ, এবং পার্বত্য নদীনালার পাড়ি-ব্যবস্থাগ্লো।

অপারেশনের প্রস্তুতির জন্য দেওয়া হয়েছিল মাত্র ৪ দিন এবং এ কাজে বড় রকমের কিছ্ বাধাবিপত্তি ছিল। আগস্ট মাসের দ্বিতীয়ার্ধে পরিচালিত স্দীর্ঘ আক্রমণাত্মক অপারেশনের পর ১ম ও ৪র্থ ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সৈন্য সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিল এবং সৈন্যদের বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল, আর ফর্ম্যাশন ও ইউনিটগ্লোর কাছে ছিল সীমিত পরিমাণ রসদ ও য্দ্ধোপকরণ। বনাকীর্ণ পার্বত্য অঞ্চলে সৈন্যদের আক্রমণাভিযান চালানোর কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। তবে প্রকৃত বন্ধ্ত্ব বোধ এবং জার্মান-ফ্যাসিস্ট আগ্রাসনের শিকারে পরিণত চেকোস্লোভাক জনগণকে সহায়তা করার ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী সিদ্ধান্ত নিলেন — রণ কৌশলগত অযৌক্তিকতা সত্ত্বেও কার্পেথিয়ায় আঘাত হানা হবে। ওই সময় সোভিয়েত সৈনিক ও অফিসারদের জন্য প্রধান স্লোগান ছিল: 'স্লোভাক ভাইদের সাহায্যে এগিয়ে চলো!'

৮ সেপ্টেম্বর তারিখে ৩৮তম বাহিনীর সৈন্যরা বিমান বাহিনীর সমর্থনে আক্রমণাভিযান আরম্ভ করে এবং প্রথম দিনই শত্রুর প্রধান প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে ৬ থেকে ১০ কিলোমিটার ভেতরে ঢুকে পড়ে। অধিক সাফল্য অর্জনের জন্য লড়াইয়ে ঢোকানো হয় মোবাইল ফর্ম্যাশনগুলো ও ১ম চেকোস্লোভাক আর্মি কোর।

শত্রুর প্রবল প্রতিরোধ দমন করে এবং তার অনেকগুলো প্রতিআক্রমণ প্রতিহত করে সোভিয়েত সৈন্যরা চেকোস্লোভাক ইউনিটসমূহের সঙ্গে মিলিতভাবে কঠোর লড়াই করতে করতে অগ্রসর হতে থাকে।

সেপ্টেম্বরের শেষে দুকলা গিরিপথের জন্য কঠোর, রক্তক্ষয়ী লড়াই শুরু হয়। সোভিয়েত ও চেকোস্লোভাক যোদ্ধারা বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সয়ে অটলভাবে অভ্যুত্থানকারীদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। ৬ অক্টোবর গিরিপথ তাদের অধিকারে চলে আসে। ১ম চেকোস্লোভাক আর্মি কোরের সৈন্যরা মাতৃভূমির মাটিতে পদার্পণ করল, আর সোভিয়েত যোদ্ধারা আবারও প্রদর্শন করল প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি তাদের আনুগত্য।

এই ভাবে, বনাকীর্ণ পার্বত্য অঞ্চলের কঠিন পরিস্থিতি, হেমন্তের ঘন ফুয়াশা এবং শত্রুর প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও সোভিয়েত সৈন্যরা কার্পেথিয়া অতিক্রম করে উচ্চ কৌশল, নৈপুণ্য ও বীরত্বের নজির রাখল। সোভিয়েত ও চেকোস্লোভাক বাহিনীগুলো যদিও স্লোভাকিয়ার অভ্যুত্থানকারীদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হতে পারে নি, কার্পেথিয়ায় ১ম ও ৪র্থ ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের ফর্ম্যাশনসমূহের আক্রমণাভিযান কিন্তু অভ্যুত্থানকারীদের অবস্থা অনেকটা সহজ করে তোলে এবং তাদের অটল সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে সাহায্য করে।

কার্পেথীয়-দুকলা অপারেশনের বৃহৎ সামরিক-রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল। তা চেকোস্লোভাকিয়া মুক্তকরণের সূত্রপাত ঘটায়, এই দেশটির মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য সম্মিলিত সংগ্রামে সোভিয়েত ও চেকোস্লোভাক জনগণের মৈত্রী সুদৃঢ়করণে সহায়তা করে। লড়াইয়ের মধ্যে দৃঢ় ও বিকশিত হয়ে ওঠে সোভিয়েত ও চেকোস্লোভাক যোদ্ধাদের সংগ্রামী সহমিতালি।

অপারেশনটির ফলে জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীগুলো শোচনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়: যুদ্ধক্ষেত্রে হতাহত হয় শত্রুর ৫২ হাজার লোক, ওখানে থেকে যায় ৮৩৭টি তোপ ও মর্টার কামান, ১৮৫টি ট্যাঙ্ক ও অ্যাসল্ট গান, বিপুল পরিমাণ অন্যান্য হাতিয়ারপত্র। সোভিয়েত ফৌজের ১ লক্ষাধিক

লোক হতাহত হয়, আর ১ম চেকোস্লোভাক ফৌজী কোরের — ৬,৫০০ যোদ্ধা।

আন্তর্জাতিক কর্তব্য পালনে লাল ফৌজের আত্মোৎসর্গিতা প্রসঙ্গে গুস্তাভ হুসাক লিখেছেন: 'স্লোভাক জাতীয় অভ্যুত্থানের অন্যতম অংশগ্রহণকারী হিশেবে উত্তেজনার সঙ্গে স্মরণ করি সেই অতি ঝুঁকিপূর্ণ ও অত্যন্ত কঠিন অপারেশনগুলোর কথা যখন লাল ফৌজ স্লোভাকিয়ার একেবারে কেন্দ্রস্থলে প্রতিরোধের শক্তিসমূহকে সাহায্য করার জন্য কার্পেথিয়া অতিক্রমণে লিপ্ত ছিল।'*

দুকলা চেকোস্লোভাকিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিসমূহের ঐতিহাসিক অদৃষ্টকে ঘনিষ্ঠ করে, তাদের নতুন বৈপ্লবিক ও সংগ্রামী ঐতিহ্যসমূহে প্রাণসঞ্চার করে। চেকোস্লোভাক কমিউনিস্টদের নেতা ক্লেমেন্ত গত্‌ওয়াল্‌দ ১৯৪৯ সালে লেখেন, 'দুকলায় সেই স্লোগানটির জন্ম হয়েছিল যা আমাদের জনগণের অন্তরে ও চেতনায় স্থান করে নিয়েছে। চিরকাল সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে! সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে এবং কদাচ অন্যথা হবে না!'**

৪। বল্টিক উপকূল এবং সুমেরুর মুক্তি

বল্টিক অপারেশন

(১৯৪৪ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর — ২২ অক্টোবর)

১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালীন আক্রমণাত্মক অপারেশনগুলোর ফলে সোভিয়েত সৈন্যরা বল্টিক উপকূলস্থ অঞ্চলে প্রবেশ করল। সামনে ছিল লিথুয়ানিয়া মুক্তকরণের কাজ সম্পাদনের এবং লাতভিয়া ও এস্তোনিয়া থেকে দখলকারীদের বিতাড়নের নতুন এক স্ট্র্যাটেজিক অপারেশন। বল্টিক অঞ্চলটি আপন দখলে রাখার প্রচেষ্টায় জার্মান- ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী এখানে বিপুল শক্তির সমাবেশ ঘটায় এবং গভীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলে। অপারেশন আরম্ভের দিকে প্রায় ১,০০০ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত রণাঙ্গনে (ফিন উপসাগর থেকে নেমান নদী পর্যন্ত) প্রতিরক্ষায় লিপ্ত ছিল

* হুসাক, গুস্তাভ। নির্বাচিত প্রবন্ধ ও বক্তৃতা। — মস্কো: পলিতইজদাত, ১৯৬৯, পৃঃ ৫৬-৫৭।

** Gottwald K., 1949-1950. — Praha, 1951, S. 137.

'নার্ভা' অপারেটিভ গ্রুপ, ১৬শ ও ১৮শ ফিল্ড আর্মি এবং 'সেণ্টার'* গ্রুপ থেকে নেওয়া ৩য় ট্যাঙ্ক বাহিনী নিয়ে গঠিত জার্মান বাহিনীসমূহের 'উত্তর' গ্রুপটি। শত্রুর কাছে সব মিলিয়ে ছিল ৫৬টি ডিভিশন (যার মধ্যে ৫টি ট্যাঙ্ক ও ২টি মোটোরাইজ্‌ড ডিভিশন) ও ৩টি মোটোরাইজ্‌ড ব্রিগেড। তার বল্টিক গ্রুপিংয়ে ছিল ৭ লক্ষাধিক লোক, ১,২১৬টি ট্যাঙ্ক ও অ্যাসল্ট গান, প্রায় ৭ হাজার তোপ ও মর্টার কামান এবং ৪০০টি বিমান।

তালিন অভিমুখে, লেনিনগ্রাদ ফ্রন্টের আক্রমণাভিযানের এলাকায়, শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গঠিত হয়েছিল ২৫-৩০ কিলোমিটার গভীর তিনটি প্রতিরক্ষাঞ্চল নিয়ে। রিগা অভিমুখে, বল্টিক ফ্রন্টসমূহের ক্রিয়াকলাপের এলাকায়, ছিল তিনটি প্রতিরক্ষা লাইন: প্রথমটি — 'ভালগা', যা বিস্তৃত ছিল সোভিয়েত সৈন্যদের অবস্থান স্থল থেকে ১৫০-২০০ মিটার দূরে এবং ওখানে ছিল ১০-১২ কিলোমিটার গভীর দু'টি প্রতিরক্ষাঞ্চল; দ্বিতীয়টি— 'সেসিস', যা বিস্তৃত ছিল রণাঙ্গন থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরে এবং ওখানে অনেকগুলো ফায়রিং পজিশন বিশিষ্ট একটি নিরবচ্ছিন্ন ট্রেঞ্চ ছিল; তৃতীয়টি — 'সিগুল্দা', যা চলেছিল দ্বিতীয় লাইনটি থেকে ২৫-৪০ কিলোমিটার দূরে এবং গঠিত হয়েছিল দুটি প্রতিরক্ষাঞ্চল ও তিনটি মধ্যবর্তী অবস্থান নিয়ে। রিগা অঞ্চলে নির্মিত হয়েছিল একাধিক প্রতিরক্ষামূলক বেষ্টনী। বাইরের বেষ্টনীতে ছিল দু'টি প্রতিরক্ষা লাইন ও তা চলেছিল শহর থেকে ১০-১৫ কিলোমিটার দূরে, অভ্যন্তরীণ বেষ্টনীটি গড়া হয়েছিল শহরতলিতে।

জার্মান সৈন্যদের বল্টিক গ্রুপিংটি বিধ্বস্তকরণের কাজে নিযুক্ত সোভিয়েত ফ্রন্টসমূহের (লেনিনগ্রাদ ফ্রন্টের, ১ম, ২য় ও ৩য় বল্টিক ফ্রন্টগুলোর) কাছে ছিল ১২৫টি ইনফেন্ট্রি ডিভিশন, ৭টি সুদৃঢ় অঞ্চল, ৭টি ট্যাঙ্ক ও মেকানাইজ্‌ড কোর। ওগুলোতে ছিল: ৯ লক্ষ লোক, প্রায় ১৭,৫০০টি তোপ ও মর্টার কামান (৭৬ মিলিমিটার ও ততোধিক ক্যালিবরের), ৩,০৮০টি ট্যাঙ্ক ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গান, ২,৬৪০টি জঙ্গী বিমান। এ ছাড়া অপারেশনে নিযুক্ত হয়েছিল বল্টিক নৌ-বহর ও দূর-পাল্লা বিমান বাহিনী। শক্তির সাধারণ অনুপাত ছিল সোভিয়েত

* ১৯৪৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ৩য় ট্যাঙ্ক বাহিনীটি অন্তর্ভুক্ত হয় বাহিনীসমূহের 'উত্তর' গ্রুপে।

সৈন্যদের অনুকূলে: জনবলে — ১·৩ গুণ, আর্টিলারি ও ট্যাঙ্কে -- ২·৫ গুণ এবং বিমানে — ৬ গুণের বেশি।

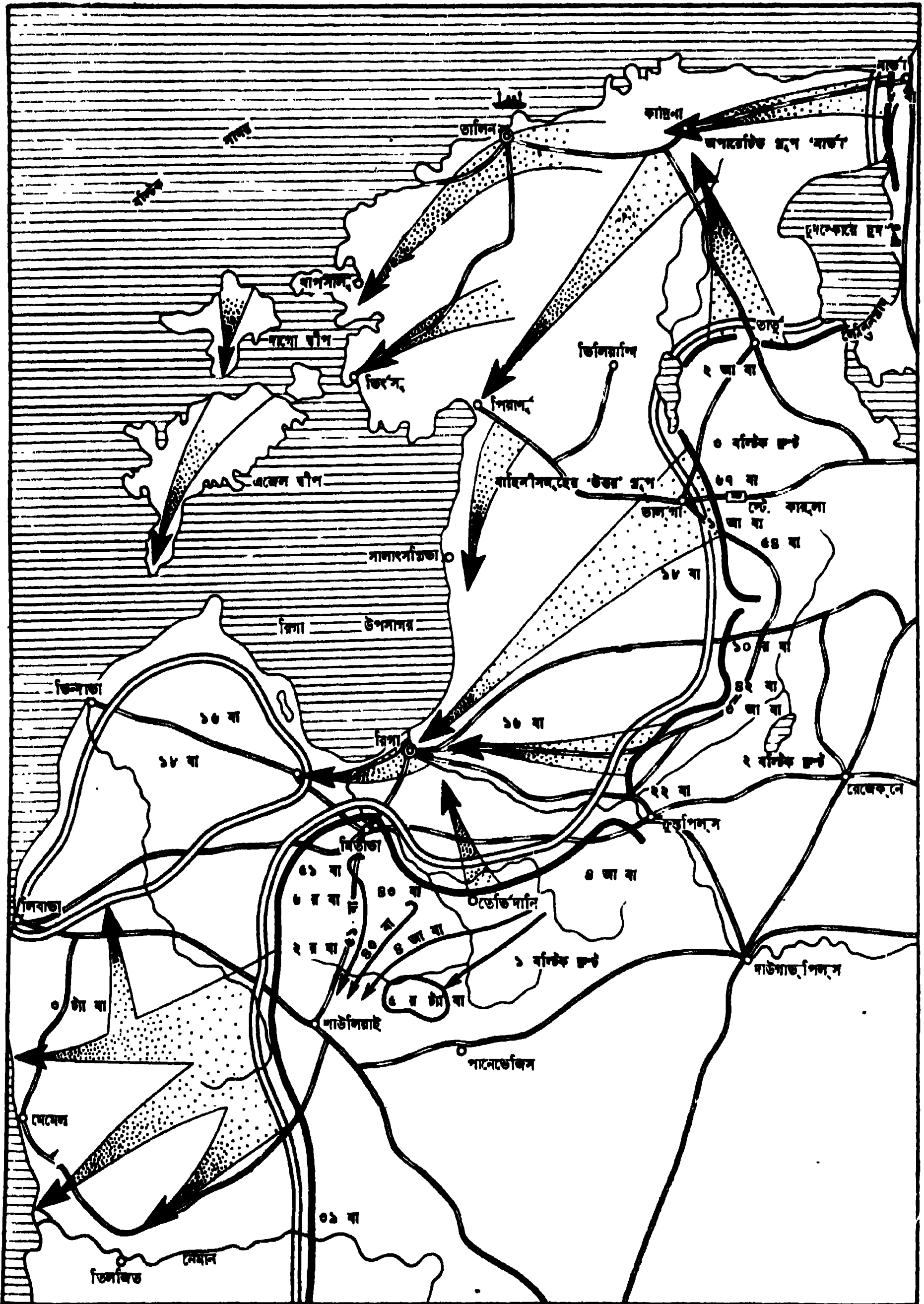
সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর সদর-দপ্তর ফ্রন্টগুলোর সামনে যে-কর্তব্যটি হাজির করল তা ছিল: বল্টিক উপকূলস্থ ভূখণ্ডে জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীগুলোকে বিধ্বস্ত করা এবং এস্তোনিয়া, লাতভিয়া ও লিথুয়ানিয়া সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রসমূহের জনগণকে হানাদারদের কবল থেকে মুক্ত করা। সোভিয়েত সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর পরিকল্পনা ছিল — রিগা শহর অঞ্চলে রিগা উপসাগরের উপকূলে লাল ফৌজের সৈন্যদের আগমন ঘটিয়ে শত্রুর বল্টিক গ্রুপিংটিকে ভের্মাখ্‌টের বাদবাকি শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া।

সোভিয়েত ফ্রন্টগুলোর সমস্ত শক্তি প্রধানত নিয়োজিত হচ্ছিল শত্রুর রিগা গ্রুপিংটি — ১৬শ ও ১৮শ জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীগুলোর প্রধান শক্তিসমূহ বিধ্বস্তকরণের কাজে। তিনটি বল্টিক ফ্রন্টের সমাভিমুখে আঘাত হানার কথা ছিল রিগার উপর। 'নার্ভা' অপারেটিভ গ্রুপটির বিলোপ সাধন ও এস্তোনিয়া মুক্তকরণের দায়িত্ব পড়েছিল লেনিনগ্রাদ ফ্রন্টের (অধিনায়ক জেনারেল ল. গভোরভ) উপর। ফ্রন্টটি এই কাজটি করছিল বল্টিক নৌ-বহরের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতায়। বল্টিক ফ্রন্টসমূহের ক্রিয়াকলাপের সমন্বয় সাধনের কাজটি পরিচালনা করছিলেন সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর প্রতিনিধি মার্শাল আ. ভাসিলেভস্কি।

সোভিয়েত বল্টিক প্রজাতন্ত্রগুলো মুক্তকরণের অপারেশনটি সম্পন্ন হয় দুই ধাপে। প্রথম ধাপে (১৪-২৭ সেপ্টেম্বর) সোভিয়েত সৈন্যরা জার্মান-ফ্যাসিস্ট দখলদারদের কবল থেকে মুক্ত করে এস্তোনিয়ার সমগ্র মূল ভূখণ্ডটি (দ্বীপপুঞ্জ ছাড়া)। জেনারেল ফ. স্তারিকোভের সেনাপতিত্বে ৮ম বাহিনীর সৈন্যরা ২২ সেপ্টেম্বর তারিখে এস্তোনিয়ার রাজধানীতে প্রবেশ করে এবং বল্টিক উপকূলের অতি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক নৌ-ঘাঁটি — তালিন অধিকার করে নেয়।

'নার্ভা' নামক জার্মান অপারেশনেল গ্রুপটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়; কেবল তার পর্যুদস্ত অংশগুলো মোনসুন্দ দ্বীপপুঞ্জে ও রিগা ব্রিজ-হেড অঞ্চলে হটে যেতে সক্ষম হয়।

সোভিয়েত সৈন্যরা লাতভিয়ার বৃহৎ একটি অংশও মুক্ত করে। স্ট্র্যাটেজিক অপারেশনের প্রথম ধাপেই শত্রুর বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়: তার ৩৫টি ডিভিশন গড়ে ৪০ শতাংশ লোক হারায়। ২য় ও ৩য় বল্টিক



নকশা ১৫। বল্টিক উপকূলে জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের পরাজয় (১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর)

ফ্রণ্টের সৈন্যরা 'সিগুল্দা' যুদ্ধ-সীমায় পেঁাছে রিগা থেকে ৫০-৬০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছিল, আর ১ম বল্টিক ফ্রণ্টের ফর্ম্যাশনগুলো অবস্থান করছিল ২৫ কিলোমিটার দূরে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সোভিয়েত

বাহিনীগুলো পরিকল্পনা মতো শত্রুর রিগা গ্রুপিংটিকে পরিবেষ্টন করতে পারে নি। নাৎসিরা প্রতিরক্ষার পক্ষে সুবিধাজনক বনাকীর্ণ আর জলাময় অঞ্চল এবং আগে থেকে প্রস্তুত অবস্থান ব্যবহার করে নিজেদের শক্তির বৃহৎ একটি অংশকে রিগার দিকে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। তাদের জন্য রক্ষামূলক আচ্ছাদন হিশেবে কাজ করছিল 'সিগুল্দা' আত্মরক্ষা লাইনটি। এরূপ পরিস্থিতিতে সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী রিগা অভিমুখ বদলে মেমেল (ক্লাইপেদা) অভিমুখে আক্রমণাভিযানের প্রধান উদ্যোগ চালান।

বল্টিক অঞ্চলে স্ট্র্যাটেজিক অপারেশনের দ্বিতীয় ধাপে (২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত) চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করে ১ম বল্টিক ফ্রণ্ট, যার কাজ ছিল — মেমেল অভিমুখে আঘাত হেনে পূর্ব প্রাশিয়া থেকে শত্রুর সমগ্র বল্টিক গ্রুপিংটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া।

জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীগুলোর প্রধান শক্তিসমূহের রিগা অভিমুখে অবস্থান কালে আকস্মিক আক্রমণাভিযান আরম্ভ করার চেষ্টায় সর্বোচ্চ সদর-দপ্তর অল্প সময়ের মধ্যে মেমেল অপারেশনের জন্য প্রস্তুতি চালানোর নির্দেশ দিলেন।

ছয় দিনের মধ্যে শত্রুর অলক্ষ্যে শাউলিয়াই অঞ্চলে ৮০ থেকে ২৪০ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে তিনটি বাহিনীকে (৪র্থ আক্রমণকারী বাহিনী, ৪৩তম ও ৫১তম বাহিনী), একটি ট্যাঙ্ক বাহিনীকে (৫ম রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনী), কয়েকটি স্বতন্ত্র ফর্ম্যাশনকে এবং বিপুল পরিমাণ আর্টিলারি ও অন্যান্য সমরাস্ত্র পুনর্বিন্যাস করা সম্ভব হল। এ সমস্তকিছুই করা হয় জার্মানদের অবস্থান স্থল থেকে অল্প দূরে। সব মিলিয়ে পুনর্বিন্যস্ত হয়েছিল প্রায় ৫ লক্ষ লোক, ৯,৩০০টি তোপ ও মর্টার কামান, ১,৩৪০টি ট্যাঙ্ক ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গান।

একই সঙ্গে ১ম বল্টিক ফ্রন্টের সেনাপতিমণ্ডলী অপারেশনেল ক্যামুফ্লেজ ব্যবস্থাদির সহায়তায় নাৎসিদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করে দিলেন যে তাঁদের ফ্রন্ট রিগা ও তুকুম্‌স্ অভিমুখে বড় রকমের আক্রমণাভিযানের প্রস্তুতি চালাচ্ছে। কিন্তু এ দিকে মেমেল অভিমুখে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণের জন্য কাজকর্ম চলছিল: দ্বিতীয় ও তৃতীয় ট্র্যাঞ্চগুলো খোঁড়া হচ্ছিল, সম্মুখবর্তী অঞ্চলে মাইন পাতার ভান করা হচ্ছিল। আর্টিলারির সমস্ত গোলাবর্ষণ কেন্দ্র পুরোপুরিভাবে ঢেকে রাখা হয়।

সৈন্যদের পুনর্বিন্যাসের এবং মেমেল অপারেশনের জন্য তাদের

গোপনীয়তা কীভাবে রক্ষা করা হয়েছিল সে সম্পর্কে জার্মান দলিলাদিতেও যথেষ্ট প্রমাণ মেলে। বাহিনীসমূহের 'উত্তর' গ্রুপের ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের সামরিক ক্রিয়াকলাপের রেজিস্ট্রি বই থেকে জানা যায় যে ফ্যাসিস্টরা দবেলে ও ইয়েলগাভা (মিতাভা) অঞ্চলে সোভিয়েত ফৌজের আক্রমণাভিযানের প্রত্যাশা করছিল। 'উত্তর' গ্রুপের অধিনায়ক কর্নেল-জেনারেল শের্নের ২৬ সেপ্টেম্বর হিটলারকে অবগত করে যে 'অদূর ভবিষ্যতে ব্যাপক আক্রমণাভিযান আরম্ভ করার উদ্দেশ্যে ইয়েলগাভার (মিতাভার) পশ্চিমে নিজের ট্যাঙ্ক ইউনিটগুলোর আঘাতের ক্ষেত্রসমূহ ইনফেন্ট্রির দ্বারা সুদৃঢ়করণের জন্য বিভিন্ন দিক থেকে শত্রু সৈন্য নিয়ে আসছে।'*

৫ অক্টোবর তারিখে ১ম বল্টিক ফ্রন্টের সৈন্যরা আক্রমণাভিযান শুরু করে, এবং কেবল লড়াইয়ের প্রকৃতি দেখেই ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী সোভিয়েত ফৌজের আক্রমণাত্মক অপারেশনের আয়তন ও প্রধান আঘাতের দিক নির্ধারণ করতে সমর্থ হল। পরের দিন নাৎসিরা তাড়াহুড়ো করে রিগা অঞ্চল থেকে মেমেল অভিমুখে ৩৯তম ট্যাঙ্ক কোরের ইউনিটগুলোকে স্থানান্তরিত করে। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছিল। সোভিয়েত সৈন্যদের আকস্মিক ও প্রবল আঘাতে ৩য় জার্মান ট্যাঙ্ক বাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হয়। ১০ অক্টোবর ১ম বল্টিক ফ্রন্টের সৈন্যরা মেমেলের (ক্লাইপেদার) উত্তরে ও দক্ষিণে বল্টিক সাগরের উপকূলে গিয়ে উপনীত হয়।

২য় বল্টিক ফ্রন্টের সৈন্যরাও কম সাফল্য অর্জন করে নি। তারা অপরিসীম সাহসিকতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও বিপুল বীরত্বের পরিচয় দেয়।

এই ভাবে, রিগা অভিমুখে শত্রু ফৌজের বল্টিক গ্রুপিংটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর সদর-দপ্তরের পরিকল্পনাটি মেমেল অভিমুখে সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়িত হয়।

মেমেল অপারেশনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে সোভিয়েত বিমান বাহিনী। অন্তরীক্ষে আধিপত্য লাভ করে ৩য় বিমান বাহিনী লড়াইয়ের পুরো সময়টি ধরে ৫,৯১৬ বিমান উড্ডয়ন সম্পন্ন করে, শত্রুর উপর ১২৮,৫৪৮টি বোমা বর্ষণ করে এবং ২১৬,২৮৯টি রকেট শেল ও বৈমানিক গোলা নিক্ষেপ করে।

* প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় মহাফেজখানা, সূচক ২৩৫, তালিকা ২৭০৪৩১, নং ৩, পৃঃ ৩৩।

রিগা অভিমুখে ৩য় ও ২য় বাল্টিক ফ্রণ্টের সৈন্যরা — 'সিগুল্দা' যুদ্ধ-সীমায় গতিতে থেকে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করার অনেকগুলো ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর — আক্রমণাভিযানের জন্য পরিকল্পিত প্রস্তুতির কাজে মনোনিবেশ করে।

জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী পশ্চিম দ্ভিনা নদীর উত্তরে তাদের গ্রুপিংটির নিরুপায় অবস্থা লক্ষ্য করে এই যুদ্ধ-সীমা থেকে সৈন্য অপসারণের সিদ্ধান্ত নেয়। ৫ অক্টোবর রাত্রে ৩য় ও ২য় বাল্টিক ফ্রণ্টের এলাকায় শত্রুর পশ্চাদপসরণ পরিলক্ষিত হয়। তখন ফ্রণ্টগুলো শত্রুর পশ্চাদনুসরণ করে তাকে বিধ্বস্ত করার ও রিগা অধিকার করার নির্দেশ পেল।

৩য় ও ২য় বাল্টিক ফ্রণ্টের সৈন্যরা সকাল থেকে পশ্চাদপসরণরত শত্রুর পশ্চাদনুসরণ করতে শুরু করে এবং দিনের শেষে আরা 'সিগুল্দা' প্রতিরক্ষা লাইনের দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পৌঁছে যায়, আর কোন কোন স্থানে তার ভেতরে ঢুকে পড়ে। পরবর্তী দিনগুলোতে তারা পুরোপুরিভাবে 'সিগুল্দা' প্রতিরক্ষা লাইনটি ভেদ করে ফেলে এবং ১০ অক্টোবর তারিখে রিগা শহরের সীমান্তে পৌঁছে যায়। তাতে শত্রু মেমেল অভিমুখে যথা সময়ে আপন সৈন্য পুনর্বিন্যাস করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল, এবং সেই অভিমুখে ১ম বাল্টিক ফ্রণ্টের ফর্ম্যাশনগুলো বাল্টিক সাগরে পৌঁছে পূর্ব প্রাশিয়ার দিকে সমগ্র জার্মান বাল্টিক গ্রুপিংটির পশ্চাদপসরণের পথটি কেটে দিল। সেই জন্যাই নাৎসিরা রিগা অঞ্চলে দৃঢ় প্রতিরক্ষায় লিপ্ত হয়। কিন্তু তা তাদের রক্ষা করতে পারল না। তারা সোভিয়েত সৈন্যদের প্রবল আক্রমণ প্রতিহত করতে অক্ষম প্রতিপন্ন হল। ১৩ অক্টোবর শহরটি মুক্ত হয়। শত্রু প্রথমে লিয়েলুপে নদীর যুদ্ধ-সীমার দিকে এবং পরে তুকুম্স্ প্রতিরক্ষা লাইনের দিকে পশ্চাদপসরণ আরম্ভ করে। সোভিয়েত সৈন্যরা জার্মানদের পশ্চাদনুসরণে লিপ্ত হয়।

২৯ অক্টোবর থেকে ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত কালপর্যায়ে লেনিনগ্রাদ ফ্রণ্ট বাল্টিক নৌ-বহরের সঙ্গে সহযোগিতায় জার্মান-ফ্যাসিস্ট দখলদারদের কবল থেকে মোনসুন্দ দ্বীপপুঞ্জ মুক্ত করে।

বাল্টিক অঞ্চলে সোভিয়েত ফৌজের বিজয়ের ছিল বিপুল সামরিক-রাজনৈতিক তাৎপর্য। এই বিজয় লাভের ফলে মুক্ত হয় বাল্টিক প্রজাতন্ত্রসমূহের প্রায় সমগ্র ভূখণ্ড। জার্মানদের দখলে থেকে গিয়েছিল কেবল লাতভিয়া আর লিথুয়ানিয়ার অনতিবৃহৎ একটি অংশ। ৩০টিরও বেশি

জার্মান-ফ্যাসিস্ট ডিভিশন আটকা পড়ে যায় তুকুম্‌স্‌ ও লিবাভার (লিয়েপায়ার) মাঝখানে, যেখানে তারা যুদ্ধ শেষে আত্মসমর্পণ করে। ফ্যাসিস্ট জার্মানি আক্রমণের সুবিধাজনক একটি পাদভূমি হারাল, ওখান থেকে সে পূর্ব প্রাশিয়া অভিমুখে যুদ্ধরত সোভিয়েত বাহিনীগুলোর প্রতি হুমকি সৃষ্টি করছিল। বল্টিক অঞ্চল মুক্ত হওয়ার ফলে বল্টিক নৌ-বহরের ঘাঁটিগুলোর অবস্থার সুবিধা গড়ে ওঠে। তার জলোপরিস্থ ও জলাভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহ ফিন উপসাগর থেকে উন্মুক্ত সমুদ্রবক্ষে গিয়ে টহল দেওয়ার সুযোগ পেল।

সর্বত্র সোভিয়েত যোদ্ধাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল বল্টিক প্রজাতন্ত্রসমূহের বাসিন্দারা। জার্মান-ফ্যাসিস্ট দখলদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সোভিয়েত সৈন্যদের বিপুল সহায়তা প্রদান করে পার্টিজানরা, লাতভিয়ার ভূখণ্ডে যাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২০ হাজার। তারা রেল লাইনচ্যুত করে ৩৫০টি মিলিটারি ট্রেন, নষ্ট করে ৮৭টি ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ি, হতাহত করে ৪৫ হাজার নাৎসি সৈন্যকে। ১৯৪৫ সালের মে মাসে লাতভিয়ার সমগ্র ভূখণ্ড শত্রুমুক্ত হয়।

লিথুয়ানিয়ায় লড়ছিল প্রায় ১০ হাজার পার্টিজান। হানাদারদের সঙ্গে সংগ্রামের বছরগুলোতে তারা লাইনচ্যুত করে ৫৭৭টি মিলিটারি ট্রেন, অকেজো করে ৩৭৭টি রেল ইঞ্জিন ও ৩ সহস্রাধিক ওয়াগন, বিধ্বস্ত করে ১৮টি জার্মান গ্যারিসন, হতাহত করে ১৪ সহস্রাধিক নাৎসি ও তাদের সহযোগীকে। ১৯৪৫ সালের ২৮ জানুয়ারি সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী মেমেল (ক্লাইপেদা) করায়ত্ত করে নেয় এবং সোভিয়েত লিথুয়ানিয়া প্রজাতন্ত্র মুক্তকরণের কাজ সম্পন্ন করে।

এস্তোনীয় পার্টিজানরাও সাফল্যের সঙ্গে লড়ছিল। তারা গুপ্ত তথ্য সংগ্রহ করছিল, জার্মান যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত করছিল। প্রতিশোধকামীরা সেতু উড়িয়ে দিচ্ছিল, শত্রুর মিলিটারি ট্রেন লাইনচ্যুত করছিল, তার গ্যারিসনগুলোকে বিধ্বস্ত করে দিচ্ছিল।

সোভিয়েত বল্টিক অঞ্চল মুক্তকরণের স্ট্র্যাটেজিক অপারেশনটি ছিল এক বিরাট ব্যাপার। তাতে অংশগ্রহণ করে পাঁচটি ফ্রন্টের সৈন্যরা (দ্বিতীয় পর্যায়ে লড়াইয়ে নিযুক্ত হয়েছিল ৩য় বেলোরুশ ফ্রন্টের ৩৯তম ও ৫ম বাহিনীগুলো) এবং বল্টিক নৌ-বহর। তাদের সামরিক ক্রিয়াকলাপ চলে ১,০০০ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত রণাঙ্গনে।

সোভিয়েত যুদ্ধকলার বিপুল সাফল্যের পরিচয় পাওয়া যায় স্ট্র্যাটেজিক

অপারেশনের সময় রিগা থেকে মেমেল অভিমুখে বিপুল সংখ্যক সৈন্য পুনর্বিন্যাসের কাজে। এই অভিমুখে অল্পকালের মধ্যে চারটি বাহিনী, দু'টি স্বতন্ত্র ট্যাঙ্ক কোর, একটি মেকানাইজ্‌ড কোর ও বৃহৎ পরিমাণ সমরাস্ত্রের সমাবেশ সোভিয়েত সৈন্যদের আঘাতের আকস্মিকতা এবং আক্রমণাভিযানের সাফল্য নিশ্চিত করে।

সোভিয়েত যুদ্ধকলার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য ছিল সমুদ্রোপকূল অভিমুখে শত্রুর বৃহৎ এক স্ট্র্যাটেজিক গ্রুপিংয়ের পরিবেষ্টন। এ কাজটি একই সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছিল ১ম বল্টিক ফ্রণ্টের সমস্ত শক্তির দ্বারা মেমেল অভিমুখে সফল ব্যূহভেদের কাজ চালিয়ে আর তার পাশ কেটে যাওয়ার মাধ্যমে এবং শত্রুর গ্রুপিংয়ের ভিন্ন পার্শ্বে ৩য় ও ২য় বল্টিক ফ্রণ্টের সৈন্যদের ক্রিয়াকলাপের সাহায্যে। এই অপারেশনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেল যে সমুদ্রোপকূল অভিমুখে পরিবেষ্টিত বাহিনীগুলোর সফল বিলোপ সাধনের জন্য স্থলে ও অন্তরীক্ষে শত্রুকে অকেজো করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের দিক থেকেও তাকে পুরোপুরিভাবে অবরোধ করা প্রয়োজন।

অপারেশনে ভুলভ্রান্তিও ছিল। এই ভুলভ্রান্তির জন্য জার্মান বাহিনীসমূহের 'উত্তর' গ্রুপটিকে পুরোপুরিভাবে বিধ্বস্ত করা সম্ভব হয় নি। যেমন, আক্রমণাভিযানের পরিকল্পনা তৈরির সময় শত্রু সৈন্যের গ্রুপিংকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য ও তাকে অংশে অংশে ধ্বংস করার জন্য গভীর ফ্রণ্ট্যাল আঘাত হানার ব্যাপারটি বিবেচিত হয় নি। অপারেশনের গোড়াতে আক্রমণরত বাহিনীগুলো ট্যাক্‌টিকেল এলাকায় ও নিকটতম অপারেশনেল গভীরতায় শত্রুকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করতে পারে নি। শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গভীরে প্রস্তুত যুদ্ধ-সীমা ভেদকরণের সময় ২য় ও ৩য় বল্টিক ফ্রণ্টগুলোর বাহিনীসমূহের সামরিক ক্রিয়াকলাপ চলছিল সমগ্র গভীরতা জুড়ে সমকালীন চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে নয়।

বল্টিক অঞ্চল মুক্তকরণের অপারেশনে সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনী অর্জিত সংগ্রামী অভিজ্ঞতা সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছিল যুদ্ধের শেষ দিককার অপারেশনগুলোতে।

পেত্‌সামো-কির্কেনেস অপারেশন (১৯৪৪ সালের ৭-২৯ অক্টোবর)

এই অপারেশনটির উদ্দেশ্য ছিল শত্রু সৈন্যের 'নরওয়ে' নামক গ্রুপিংটিকে বিধ্বস্ত করা এবং উত্তরে সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমারেখা

পুনর্স্থাপন করা।

নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলী যেকোন উপায়ে স্ট্র্যাটেজিক কাঁচামালের উৎস সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলো নিজের দখলে রাখার চেষ্টা করছিল। এখানেও অবস্থিত ছিল শীতে জমে-না-যাওয়া উত্তুরে বন্দরগুলো, যেখান থেকে জার্মান-ফ্যাসিস্ট নৌ-বহর উত্তরের যোগাযোগ পথসমূহে সক্রিয় সামরিক ক্রিয়াকলাপ চালাতে পারত।

পাহাড় পর্বত, বনজঙ্গল, হ্রদ আর জলায় ভরা অঞ্চলের কঠোর পরিবেশে শত্রু তিন বছরের মধ্যে গভীর ও মজবুত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (১৬০ কিলোমিটার গভীর) গড়ে তুলে। ওখানে ছিল কংক্রিট এবং কাঠ ও মাটি দিয়ে তৈরি অনেকগুলো দৃঢ় ঘাঁটি। প্রতিরক্ষা কার্যে লিপ্ত ছিল ২০শ জার্মান পার্বত্য বাহিনীর ১৯শ মাউন্টেন-ইনফেণ্ট্রি কোরটি। উত্তর নরওয়ের বন্দরগুলোতে অবস্থিত ছিল জার্মানদের বৃহৎ সামরিক নৌ-শক্তি: ১টি রণপোত, ১৪টি ডেস্ট্রয়ার, ৩০টিরও বেশি সাবমেরিন।

সোভিয়েত সুমেরু অঞ্চল মুক্তকরণের অপারেশন পরিচালনার জন্য সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর সদর-দপ্তর কারেলীয় ফ্রণ্টকে (অধিনায়ক জেনারেল ক. মেরেৎস্কোভ) এই নির্দেশ দিল যে উত্তর নৌ-বহরের (অধিনায়ক অ্যাডমিরাল আ. গলোভ্‌কো) সহায়তায় ১৪শ বাহিনী ও ৭ম বিমান বাহিনীর শক্তিসমূহ দিয়ে জার্মান ফৌজকে বিধ্বস্ত করে পেতসামো (পেচেন্‌গা) অঞ্চলটি মুক্ত করতে হবে এবং সোভিয়েত-নরওয়েজীয় সীমান্তের দিকে আক্রমণাভিযান চালিয়ে যেতে হবে। অপারেশনের গোড়ার দিকে শক্তির অনুপাত ছিল সোভিয়েত ফৌজের অনুকূলে: জনবলে — ১·৮ গুণ আর্টিলারিতে — ২·৮ গুণ, ট্যাঙ্কে — ২·৫ গুণ, বিমানে — ৬·৩ গুণ। উত্তর নৌ-বহরের কাজ ছিল শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে সৈন্য নামানো, তার সামুদ্রিক পরিবহণ ব্যবস্থা বিঘ্নিত করা এবং নিজের যোগাযোগ ব্যবস্থা অটুট রাখা।

সুমেরুর পাহাড়পর্বত, বনজঙ্গল, হ্রদ আর জলাপূর্ণ অঞ্চলের কঠোর পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে অপারেশনের প্রস্তুতির সময় সৈন্যদের পুঙ্খানুপুঙ্খ তালিম দেওয়া হয়।

৭ অক্টোবর তারিখে প্রবল প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণের পর সোভিয়েত সৈন্যরা আক্রমণাভিযান আরম্ভ করে। তিন দিন লড়াই করে তারা শত্রুর ১৬ কিলোমিটার গভীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করে ফেলে। দুশমন পিছু হটতে শুরু করে।

৯ অক্টোবর রাত্রে মালায়া ভলোকোভায়া খাড়ি অঞ্চলে ৩০টি লঞ্চ থেকে নামানো হয় নৌ-সৈন্যদের ৬৩তম ব্রিগেড, আর ১০ তারিখ সকাল বেলা স্রেদ্‌নি উপদ্বীপ থেকে আক্রমণ আরম্ভ করে ১২শ নৌ-পদাতিক ব্রিগেড। ১২ অক্টোবর বিকালে নৌ-সৈন্য নামানো হয় লিনোহামোরি বন্দরে। এ সমস্তকিছু পেতসামো অভিমুখে সোভিয়েত ফৌজের সফল আক্রমণাভিযানে সহায়তা করে। ১৫ অক্টোবর পেতসামো শত্রুর কবল থেকে মুক্ত হয়।

প্রবল আক্রমণাভিযানে লিপ্ত সোভিয়েত ইউনিটগুলো মুক্ত করে নিকেল বসতি, একই সঙ্গে শত্রুকে তাড়ায় নরওয়েজীয় ভূখণ্ডে অবস্থিত গার্নেট জনপদটি থেকে এবং ২৫ অক্টোবর তারিখে কঠোর লড়াইয়ের পর প্রবেশ করে কির্কেনেস শহরে। কির্কেনেসের এক স্কোয়ারে নরওয়ের জাতীয় পতাকা উত্তোলন উপলক্ষে বিরাট এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে গল্প করেন সভার অন্যতম অংশগ্রহণকারী, ১০ম রক্ষী ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনের প্রাক্তন সেনাপতি জেনারেল খ. খুদালোভ: 'ওখানে সমবেত বাসিন্দারা সোভিয়েত সৈন্যদের সাদর অভ্যর্থনা জানায়। আমাদের ডিভিশনের তরফ থেকে ভাষণ দেন রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান কর্নেল ভ. দ্রাগুনোভ। তাঁর বক্তৃতাটি আমার ভালো মনে আছে।

— শ্রদ্ধেয় ভদ্র মহোদয়গণ, আমাদের নরওয়েজীয় সুপ্রতিবেশীরা! কির্কেনেস শহর এবং উত্তরের সমগ্র ফিনমার্ক প্রদেশের মুক্তিলাভ উপলক্ষে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী আপনাদের সবাইকে এবং আপনাদের মাধ্যমে সমগ্র নরওয়েজীয় জনগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছে! এখান থেকে জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনী লাল ফৌজের সৈন্যদের উপর, সোভিয়েত যুদ্ধ-জাহাজগুলোর উপর, মুর্মানস্ক শহরের উপর আঘাত হানছিল। এবার তার অবসান ঘটানো হয়েছে, এবং এখন থেকে সর্বদা কির্কেনেসের বাসিন্দারা স্বাধীনভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলতে ও বসবাস করতে পারবে, আর তাদের নাৎসিদের কাছ থেকে পালিয়ে পাহাড়পর্বতে চলে যেতে হবে না। দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়েছে, মৃত্যুর হুমকি থেকে পরিত্রাণ লাভ করেছে হাজার হাজার নরওয়েজিয়ান।...

দোভাষী যখন এই কথাগুলো অনুবাদ করে দিল তখন অনেক নারী সম্মুখ পানে এগিয়ে গেল এবং চেঁচিয়ে বলল: 'আমরাই হচ্ছি সেই সব লোক আপনারা যাদের জীবন রক্ষা করেছেন!'

এবং তৎক্ষণাৎ শুরু হল তুমুল করতালি, চারিদিক থেকে লোকে উচ্চ কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগল। এবার শহরের ফ্যাসিস্টবিরোধী

মেয়রের ভাষণ দেওয়ার কথা। বোঝাই যাচ্ছিল এ কাজটি করা সহজ ছিল না। এ সবকিছু তাঁকে আলোড়িত করেছিল। তিনি বাঁ হাতে ধরে রেখে ছিলেন রাষ্ট্রীয় পতাকার দড়ি, — বহু বছরের নাৎসি দখলের পর স্কোয়ারের উপরে তাঁর পতাকাটি উত্তোলন করার কথা। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংযত করতে পারেন নি। অবশেষে মেয়র সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীকে শহরের জন্য, নরওয়ে মুক্তকরণের জন্য সে যাকিছু করেছে তার জন্য, তাঁর দেশের জনগণকে নিঃস্বার্থ সহায়তা দানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানান। 'মুক্তিদাতা সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর যোদ্ধারা, আমরা নরওয়েবাসীরা আপনাদের কথা কখনও ভুলব না!,' — এই ভাবে তিনি তাঁর ভাষণ সমাপ্ত করেন। স্কোয়ারে সমবেত জনতার হর্ষধ্বনি আর জয়ধ্বনির মধ্যে ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বপানে উঠতে থাকে দেশের পতাকা। আমাদের অর্কেস্ট্রা বাজাতে লাগল নরওয়ের জাতীয় সঙ্গীতের সুর, গাইতে শুরু করল শহরবাসীরা। তিনবার শোনা গেল রাইফেলের আওয়াজ।...'

সোভিয়েত সৈন্যরা কেবল উত্তর নরওয়ের বাসিন্দাদের মুক্তি এনে দিয়েই ক্ষান্ত হল না, তারা নাৎসি দখলদারদের হাতে অপরিসীম লাঞ্ছনা সহনকারী অন্য নরওয়েজীয়দের কঠোর অবস্থাও সহজ করতে চেষ্টিত ছিল। তারা শহর ও জনপদগুলোকে মাইনমুক্ত করছিল, বাসিন্দাদের খাদ্যদ্রব্য, ঔষধপত্র আর জ্বালানি জোগাচ্ছিল। লাল ফৌজ কর্তৃক সদ্য মুক্ত অঞ্চলসমূহ ভ্রমণ সম্পন্ন করে নরওয়েজিয়ান আইন মন্ত্রী ট. ভল্ড লণ্ডনে তাঁর সরকারকে জানান যে 'রাত্রিবেলা শত শত অনতিবৃহৎ ক্যাম্পফায়ার দেখা গিয়েছিল যেগুলোর চারি ধারে ঘুমাচ্ছিল সৈন্যরা', এবং 'সোভিয়েত সৈন্যরা যে অল্প সংখ্যক ঘরবাড়ি ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নি তা নরওয়েজীয় বাসিন্দাদের ব্যবহার করতে দিচ্ছিল'।*

১৯৪৫ সালের ৩০ জুন তারিখে ওস্‌লোতে 'মিত্র দিবসের' উৎসব উদ্‌যাপনের সময় নরওয়ের রাজা সপ্তম হকোন বলেন: 'নরওয়েজীয় জনগণ সোৎসাহে নিরীক্ষণ করেছে সোভিয়েত সৈন্যদের বীরত্ব ও সাহসিকতা, জার্মানদের উপর লাল ফৌজের প্রবল আঘাত।... পূর্ব রণাঙ্গনেই লাল ফৌজ যুদ্ধ জয় করেছে। এই বিজয়ের কল্যাণেই লাল ফৌজ কর্তৃক মুক্ত

* পররাষ্ট্রনীতির মহাফেজখানা, সূচক ১১৬, তালিকা ২৭, নং ২, পৃঃ ৬৮-৬৯।

হয়েছে উত্তরের নরওয়েজীয় ভূখণ্ড।... নরওয়েজীয় জনগণ লাল ফৌজকে বরণ করেছে তাদের মুক্তিদাতা হিশেবে।'*

উত্তর নরওয়েতে আগত সোভিয়েত সৈন্যদের মহত্ত্ব সম্পর্কে তখন বিদেশী কাগজপত্রেও অনেককিছু লেখালেখি হয়েছিল। যেমন, ১৯৪৪ সালের ৬ ডিসেম্বর সুইডিশ সংবাদপত্র 'গ্যটেবর্গ'স পস্টেন' ঘটনাবলি সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করেছিল: '...প্রতিরোধ আন্দোলনে মুখ্য স্থান অধিকারকারী এক নরওয়েবাসী সম্প্রতি সুইডেনে এসেছেন। তিনি বলেন যে রুশরা উত্তর নরওয়ের বাসিন্দাদের প্রতি খুবই মিত্রভাবাপন্ন। প্রথম দিনগুলোতে, যখন সরবরাহ ব্যবস্থা চালু হয় নি, রুশ সৈন্যরা নিজেদের রসদ ভাণ্ডার থেকে লোকজনকে খাদ্যদ্রব্য জোগাচ্ছিল এবং যেভাবে পারে সাহায্য করছিল। জার্মানরা কির্কেনেসের বেশির ভাগ ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দিয়েছিল। যে-বাড়িগুলো টিকে ছিল তা রুশরা স্থানীয় বাসিন্দাদের হাতে তুলে দেয়। রুশ ও নরওয়েজীয়দের মধ্যে সহযোগিতায় ছিল বিশেষ আন্তরিকতা। রুশরা আসে প্রকৃত মুক্তিদাতা হিশেবে, এবং তাদের সর্বত্র সাদর অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছে।'

পেত্সামো-কির্কেনেস অপারেশনের ফলে শত্রু কেবল নিহত অবস্থায়ই হারায় প্রায় ৩০ হাজার লোককে। উত্তরের নৌ-বহর জলমগ্ন করে ১৫৬টি জার্মান জাহাজ। প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও সোভিয়েত বিমান বাহিনী ১০,৬০০ বেশি বিমান-উড্ডয়ন সম্পন্ন করে হামলা চালায় এবং ১২৫টি নাৎসি বিমান ধ্বংস করে দেয়। সোভিয়েত বাহিনীতে হতাহতের সংখ্যা ছিল ১৫,৭৭৩ জন, যার মধ্যে ২,১২২ জন হতাহত হয়েছিল নরওয়ের মাটিতে। অপারেশনের সময় আক্রমণকারী সোভিয়েত স্থল বাহিনীর সৈন্যরা নির্ভীক ও দৃঢ় সামরিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হয়, তারা বিমান বাহিনী ও নৌ-বহরের সঙ্গে নিবিড় সহযোগিতা করে। এই অপারেশনের সময় পথাভাবের মধ্যেও তারা উচ্চ রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করে শত্রুকে বিধ্বস্ত করতে সক্ষম হয়। রণাঙ্গনের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী ট্যাকটিকেল অবতরণ বাহিনী নামানো হয়, যার ফলে আক্রমণাভিযানের গতি বৃদ্ধিকরণে ও শত্রু বাহিনী বিধ্বস্তকরণে যথেষ্ট সহায়তা পাওয়া যায়।

* 'ইজভেস্তিয়া' খবরের কাগজ, ১৯৪৫, ৫ জুলাই।

৫। পশ্চিম ইউরোপে এবং ইতালিতে মিত্র শক্তিবর্গের সামরিক ক্রিয়াকলাপ

নরম্যাণ্ডিতে সৈন্য অবতরণের অপারেশন

যুদ্ধের প্রথম বছরগুলোতে ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুললে তা নিঃসন্দেহেই বিপুল সামরিক-রাজনৈতিক তাৎপর্য বহন করত। কিন্তু ১৯৪১ সালে, ১৯৪২ সালে এবং এমনকি ১৯৪৩ সালেও মিত্ররা দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলল না। অথচ তখন — ১৯৪৩ সালে — সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে শোচনীয় পরাজয়ের ফলে জার্মানি তার সামরিক শ্রেষ্ঠতা হারিয়ে ফেলেছিল। যুদ্ধ যখন সমাপ্তি পর্যায়ে উপনীত হল কেবল তখনই ব্রিটিশ ও মার্কিন সৈন্যরা ইংলিশ প্রণালী পেরিয়ে ফ্রান্সের উত্তর উপকূলে অবতরণ করল। তা ঘটল ১৯৪৪ সালের ৬ জুন তারিখে।

অপারেশনের প্রস্তুতি চলেছিল যথেষ্ট দীর্ঘ কাল ধরে এবং তা পরিচালিত হয়েছিল মিত্রদের পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতিতে, কেননা জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীর প্রধান শক্তিসমূহ অবস্থিত ছিল সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে এবং নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলী আক্রমণকারী ইঙ্গো-মার্কিন ফৌজের বিরুদ্ধে কেবল সীমিত পরিমাণ শক্তি প্রেরণ করতে সক্ষম ছিল।

১৯৪৪ সালের গোড়ার দিকে ফ্রান্সে, বেলজিয়ামে, নেদার্ল্যাণ্ডসে অবস্থিত ছিল ৫৮টি জার্মান-ফ্যাসিস্ট ডিভিশন, যার মধ্যে ৪২টি ছিল ইনফেণ্ট্রি ডিভিশন, ৯টি ট্যাঙ্ক ও ৪টি এয়ার-ফিল্ড ডিভিশন। ওগুলো মিলিত হয়েছিল বাহিনীসমূহের 'B' ও 'G' নামক দু'টি গ্রুপে, যা অন্তর্ভুক্ত ছিল 'পশ্চিম' নামক গ্রুপিংয়ে। এই সমস্ত বাহিনী ছাড়াও 'পশ্চিম' গ্রুপিংয়ের রিজার্ভে ছিল ৪টি ডিভিশন। এই সমস্ত ফৌজের যুদ্ধক্ষমতা ছিল কম। অনেকগুলো ফর্ম্যাশন ছিল পরিপূর্ণতা লাভের অথবা গঠনের পর্যায়ে, এবং তাদের অর্ধেকই (৩৩টি ডিভিশন) সীমিত সংখ্যক যানবাহনের জন্য 'অচল' বলে গণ্য হচ্ছিল। ডিভিশনসমূহে লোক সংখ্যা ছিল প্রয়োজনের চেয়ে ২০-৩০ শতাংশ কম। অধিকাংশ ট্যাঙ্ক ডিভিশনে ৯০ থেকে ১৩০টি করে ট্যাঙ্ক ছিল, যেখানে প্রতিটি ডিভিশনে থাকার কথা ছিল ২০০টি করে। খোদ নাৎসি জেনারেলরাও পশ্চিমে জার্মান-ফ্যাসিস্ট সৈন্যদের এরূপ অবস্থার কথা বলে। যেমন, 'পশ্চিম' গ্রুপিংয়ের সদর-দপ্তরের অধিকর্তা জেনারেল জ. ওয়েস্টফাল লিখেছে: 'সবারই জানা আছে যে অবতরণের মুহূর্তে পশ্চিমে জার্মান বাহিনীগুলোর

যুদ্ধক্ষমতা পূর্বে এবং ইতালিতে যুদ্ধরত ডিভিশনগুলোর যুদ্ধক্ষমতার চেয়ে অনেক কম ছিল।... ফ্রান্সে অবস্থিত স্থলসেনার অনেকগুলো ফর্ম্যাশনের — তথাকথিত 'অচল ডিভিশনগুলোর' — অস্ত্রশস্ত্রের ও মোটর যানবাহনের অভাব ছিল এবং ওগুলো গঠিত হয়েছিল বয়স্ক সৈনিকদের নিয়ে।'*

পশ্চিমে অবস্থিত ৩য় জার্মান বিমান বহরে ছিল প্রায় ৫০০টি বিমান, যার মধ্যে কেবল ১৬০টি ছিল যুদ্ধক্ষম।**

'পশ্চিম' গ্রুপের সামরিক নৌশক্তিসমূহের বেশির ভাগই ৬ জুন তারিখে অবস্থিত ছিল আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলের ঘাঁটিগুলোতে (৪৯টি ডুবো জাহাজ, ৫টি ডেস্ট্রয়ার, ১টি টর্পেডো জাহাজ, ৫৯টি পাহারা-জাহাজ ও ১৪৫টি মাইন-সুইপার)। ইংলিশ প্রণালী ও পা-দে-কালে প্রণালীতে ওই সময় নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলীর অধীনে ছিল ৫টি টর্পেডো জাহাজ, ৩৪টি টর্পেডো বোট, ১৬৩টি মাইন-সুইপার, ৫৭টি পাহারা-জাহাজ ও ৪২টি আর্টিলারি গাধাবোট।

ফ্রান্সের উত্তর উপকূলের অবতরণ বাহিনীবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটি ছিল দুর্বল। তা গঠিত হয়েছিল ঘাঁটিগুলোর ব্যবস্থা নিয়ে, যেগুলোর বেশির ভাগ পরস্পরকে গোলাবর্ষণে সাহায্য করতে পারছিল না। সৈন্য অবতরণের উপযোগী অঞ্চলগুলোতে মাইন পাতা হয়েছিল, কাঁটা তারের বেড়া, প্রতিবন্ধক ও ফাঁদ গড়া হয়েছিল, নিয়ন্ত্রণযোগ্য উগ্র বিস্ফোরক গোলা স্থাপন করা হয়েছিল। পিল-বক্স ছিল কেবল কয়েকটি জায়গায়। সুতরাং কোন দুর্ভেদ্য 'আটলান্টিক বাঁধের' অস্তিত্বই ছিল না। এরূপ বাঁধ সম্পর্কে গুজব রটিয়েছিল খোদ নাৎসিরাই তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতাগুলো ঢাকার জন্য, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডে এই গুজবটি রটানো হচ্ছিল পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার কাজে দীর্ঘসূত্রতার নীতিটি সমর্থনের উদ্দেশ্যে।

পশ্চিমে অবস্থিত জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীগুলোর সর্বাধিনায়ক

* Westphal S. Heer in Fesseln. Aus den Papieren der Stabschefs von Rommel, Kesselring und Rundstedt. — Bonn, 1952, S. 264.

** Der Große Atlas zum II Weltkrieg. S. 264. অন্যান্য তথ্য অনুসারে ৩য় বিমান বহরে ছিল ৩৫০টি যুদ্ধক্ষম বিমান।

জেনারেল-ফিল্ডমার্শাল গের্ড ফন রুণ্ডস্টেড্‌ট তার অবতরণ বাহিনীবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার এরূপ বর্ণনা দেয়: 'আটলাণ্টিক বাঁধ' ছিল মিথ্যা এক কাহিনী মাত্র, যা তৈরি করা হয়েছিল জার্মান জনগণকে ও বিপক্ষকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে।... আমি যখনই দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে কল্পনা প্রসূত রচনাদি পড়তাম আমি সর্বদাই ভীষণ ক্ষেপে উঠতাম। এটাকে বাঁধ বলে অভিহিত করা ছিল এক হাস্যকর ব্যাপার। হিটলার কখনও সেখানে যায় নি এবং তা আসলে কী জিনিস সেটা কখনও সে দেখে নি।*

নরম্যাণ্ডিতে ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনীসমূহের অভিযানের প্রস্তুতি বস্তুতপক্ষে শুরু হয়েছিল ১৯৪৩ সালের শেষ দিকে, তেহেরান সম্মেলনের পরে, এবং সেই প্রস্তুতি চলছিল এরূপ পরিস্থিতিতে যখন জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলীর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের দিকে, যেখানে অবস্থিত ছিল ভের্মাখ্‌টের প্রধান শক্তিসমূহ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বহুখণ্ডবিশিষ্ট ব্রিটিশ ইতিহাসে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'মিত্রদের কাছে ছিল এরূপ প্রাধান্য যা সাধারণত পেয়ে থাকে কেবল কোন আক্রমণকারী রাষ্ট্র। অপারেশনের জটিলতা যেমনটি দাবি করছিল সেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খতা ও সুবিবেচনার সঙ্গে অপারেশনের প্রস্তুতির জন্য তাদের কাছে যথেষ্ট সময় ছিল, তাদের পক্ষে ছিল উদ্যোগ এবং সৈন্য অবতরণ করানোর ব্যাপারে স্বাধীনভাবে কাল ও স্থান নির্বাচনের সুযোগসম্ভাবনা।'**

'ওভারলর্ড' নামক অপারেশনটির পরিকল্পনা ছিল এরূপ: নরম্যাণ্ডির উপকূলে সৈন্য নামানো, একটি ব্রিজ-হেড দখল করা, ওখানে প্রয়োজনীয় শক্তি ও বৈষয়িক সঙ্গতির সমাবেশ ঘটানো এবং তারপর উত্তর-পূর্ব ফ্রান্সের ভূখণ্ড অধিকার করার উদ্দেশ্যে আক্রমণাভিযান আরম্ভ করা। এরূপ পরিকল্পনা আকস্মিকতা অর্জনের সুযোগ দিচ্ছিল, কেননা নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলী নরম্যাণ্ডিতে বৃহৎ ফৌজ নামানোর ব্যাপারটিকে অসম্ভব বলে গণ্য করছিল। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মিত্রদের সৈন্যরা অবতরণ করবে পা-দে-কালে প্রণালীর উপকূলে, কারণ ওই প্রণালীর চওড়াই ছিল মাত্র ৩২ কিলোমিটার। সেই জন্য নাৎসিরা ওখানে অধিক শক্তি মোতায়েন

করেছিল এবং ইঞ্জিনিয়রিং দিক থেকে উন্নততর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়েছিল।

মিত্র সেনাপতিমণ্ডলী ইংলিশ প্রণালীর উপকূলে সৈন্যাবতরণের ব্যাপারটি পরিকল্পনা করতে গিয়ে ইতিবাচক মুহূর্তগুলোর সঙ্গে সঙ্গে (যেমন, সেন খাড়ির বালুময় সমতল উপকূল, প্যারিসের সঙ্গে উপকূলকে যুক্তকারী বৃহৎ সংখ্যক মোটর সড়ক ও রেলপথ) নেতিবাচক মুহূর্তগুলোর কথাও ভেবেছিলেন: প্রণালীটির প্রস্থ অনেক বেশি — ১৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত, তীর বাঁধানো নয়, জোয়ারের সময় জলের উচ্চতা ৭·৫ মিটার পর্যন্ত পেঁছে, জোয়ার-ভাঁটার সময় স্রোতের বেগ ৩ নট অবধি যায়।

নরম্যাণ্ডিতে অবতরণের জন্য নির্ধারিত এবং ইংলণ্ডে সমাবেশিত মিত্র বাহিনীগুলোতে ছিল ৩৯টি ডিভিশন, ১২টি স্বতন্ত্র ব্রিগেড ও ১০টি 'কমাণ্ডোস' আর 'রেঞ্জার্স' ডিটাচমেণ্ট। আকাশ থেকে অবতরণের কাজে সাহায্য করার কথা ছিল ১০,৮৫৯টি জঙ্গী বিমানের, ২,৩১৬টি ট্র্যান্সপোর্ট প্লেনের ও ২,৫৯১টি গ্লাইডারের।* সমুদ্র থেকে — ১,২১৩টি যুদ্ধ-জাহাজের, ৪,১২৬টি ল্যাণ্ডিং ভেসেল ও অবতরণ উপকরণের, ৭৩৬টি সহায়ক জাহাজের এবং ৮৬৪টি বাণিজ্য জাহাজের।** ইঙ্গো-মার্কিন ফৌজ ছাড়া অপারেশনে অংশগ্রহণ করেছিল কানাডিয়ান, ফরাসী, চেকোস্লোভাক ও পোলিশ ফর্ম্যাশনগুলোও। সব মিলিয়ে অভিযানকারী মিত্র বাহিনীগুলোতে ছিল ২৮,৭৬,৪৩৯ জন লোক, যার মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ছিল আমেরিকান — ১৫ লক্ষ ৩৩ হাজার। সমস্ত বাহিনীতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সৈন্য ছিল।*** অনেকগুলো ইউনিট আর ফর্ম্যাশনের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছিল। এ অভিজ্ঞতা তারা অর্জন করেছিল উত্তর আফ্রিকায় এবং ইতালিতে। অভিযানকারী বাহিনীসমূহের শক্তি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত ছিল আরও ৪১টি ডিভিশন।

অভিযানকারী মিত্র বাহিনীসমূহের সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক ছিলেন

---

* Eisenhower D. Crusade in Europe. - New York, 1951, p. 53.

*** মার্কিন ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনে ছিল — ১৪·২-১৬·৭ হাজার লোক, ব্রিটিশ ইনফেণ্ট্রি ডিভিশনে ছিল — ১৯-২১ হাজার, কানাডিয়ান ডিভিশনে — ১৪·৮-১৮·৯ হাজার লোক। (Public Record. Office (পরে PRO), Premier 3/54, p. 509).

জেনারেল ড. আইজেনহাওয়ার, তাঁর সহকারীরা ছিলেন: স্থলসেনার অধিনায়ক জেনারেল মন্টগমেরি, নৌ-সেনার অধিনায়ক অ্যাডমিরাল র‍্যামসি, বায়ুসেনার অধিনায়ক এয়ার চীফ মার্শাল টেডার।

অপারেশনের পরিকল্পনানুসারে নৌ-সেনা ও বায়ুসেনা নামানোর কথা ছিল সেন খাড়ির উপকূলে ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ রণাঙ্গন জুড়ে, এবং ২০ দিনের দিন ফ্রন্ট বরাবর ১০০ কিলোমিটার ও গভীরতা বরাবর ১০০-১১০ কিলোমিটার বিস্তৃত একটি ব্রিজ-হেডও অধিকার করার কথা ছিল।

সৈন্য অবতরণের অঞ্চলটি দুটি এলাকায় বিভক্ত ছিল: পশ্চিম এলাকা (এটা আমেরিকানদের) ও পূর্ব এলাকা (এটা ইংরেজদের)। পশ্চিম এলাকা গঠিত হয়েছিল দুটি ক্ষেত্র নিয়ে, আর পূর্ব এলাকা — তিনটি ক্ষেত্র নিয়ে। প্রতিটি ক্ষেত্রে একই সময়ে অবতরণ করছিল অধিক লোকবল ও অস্ত্রবল প্রাপ্ত এক-একটি ইনফেণ্ট্রি ডিভিশন।

অপারেশনেল সৈন্য বিন্যাসে ছিল দুটি এশিলন: প্রথমটিতে ১ম মার্কিন ও ২য় ব্রিটিশ বাহিনী; দ্বিতীয়টিতে — ১ম কানাডিয়ান বাহিনী।

নৌ-সৈন্য নামানোর আগে উপকূল থেকে ১০-১৫ কিলোমিটার গভীরে অবতরণ অঞ্চলের পার্শ্বদেশগুলোতে দুটি মার্কিন ও একটি ব্রিটিশ এয়ারবোর্ন ডিভিশন নামানোর কথা ছিল। উদ্দেশ্য — রোড জংশন, রাস্তাঘাট, সেতু, পাড়ি-ব্যবস্থা দখল করা এবং শত্রুর মজুদ শক্তিকে উপকূলে আসতে না দেওয়া।

নৌ-শক্তি বিভক্ত ছিল দুটি স্কোয়াড্রনে, এবং এগুলোর প্রতিটির কাজ ছিল নিজ নিজ এলাকায় সৈন্য অবতরণে সহায়তা করা। প্রতিটি ডিভিশনের অবতরণের জন্য গঠিত হয়েছিল স্বনির্ভর নৌ ফর্ম্যাশন।

অভিযানের ৯০ দিন আগে প্রাগাক্রমণ বিমান হামলা শুরু হয়। আকাশ থেকে আঘাত হানা হত উত্তর ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি আর হল্যাণ্ডের শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সামরিক কেন্দ্রগুলোর উপর। আক্রমণের দিন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মিত্র বিমান বাহিনীর বোমাবর্ষণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে, তা ক্রমশই প্রবলতর হয়ে ওঠে। মে মাসের শেষ দিকে উত্তর ফ্রান্সে রেল পরিবহণের কাজ ব্যাহত হয়ে পড়ে, মোহানা থেকে প্যারিস পর্যন্ত সেন নদীর সমস্ত সেতু বিনষ্ট করে দেওয়া হয়, জার্মানদের বিমান ঘাঁটিগুলোর ও রেডিওলকেশন ব্যবস্থার বিপুল ক্ষতি সাধন করা হয়। এ সমস্তকিছুর ফলে মিত্র বাহিনীর অবতরণ রোধ করার সময় জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আকস্মিকতা অর্জনের লক্ষ্যে মিত্র সেনাপতিমণ্ডলী অপারেশনেল ক্যামুফ্লেজের এবং শত্রুকে মিথ্যা তথ্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে ব্যাপক ও বিচিত্র ব্যবস্থাদি অবলম্বন করেন। যেমন, অপারেশনের পরিকল্পনা রচনার কাজে নিযুক্ত হয় অতি সীমিত সংখ্যক লোক, আর অবতরণের প্রকৃত অঞ্চল সম্পর্কে শত্রুকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে সৈন্য নামানোর প্রস্তুতি চলে পা-দে-কালে প্রণালী দিয়ে আক্রমণাভিযান আরম্ভ করার মিথ্যা তোড়জোড়ের আড়ালে। এই উদ্দেশ্যে মিত্র বিমান বাহিনী অবতরণের জায়গা — নরম্যাণ্ডির উপকূলের চেয়ে পা-দে-কালে প্রণালীর উপকূল বরাবর অধিকতর প্রবল আঘাত হানছিল, আর দক্ষিণ-পূর্ব ইংলণ্ডের বন্দরগুলোতে নির্মিত হয় অনেকগুলো ডামি ল্যাণ্ডিং শিপ ও গড়া হয় সৈন্য সমাবেশের কৃত্রিম অঞ্চলসমূহ, যা ফ্রান্সের উপকূল থেকে দেখা যেত।

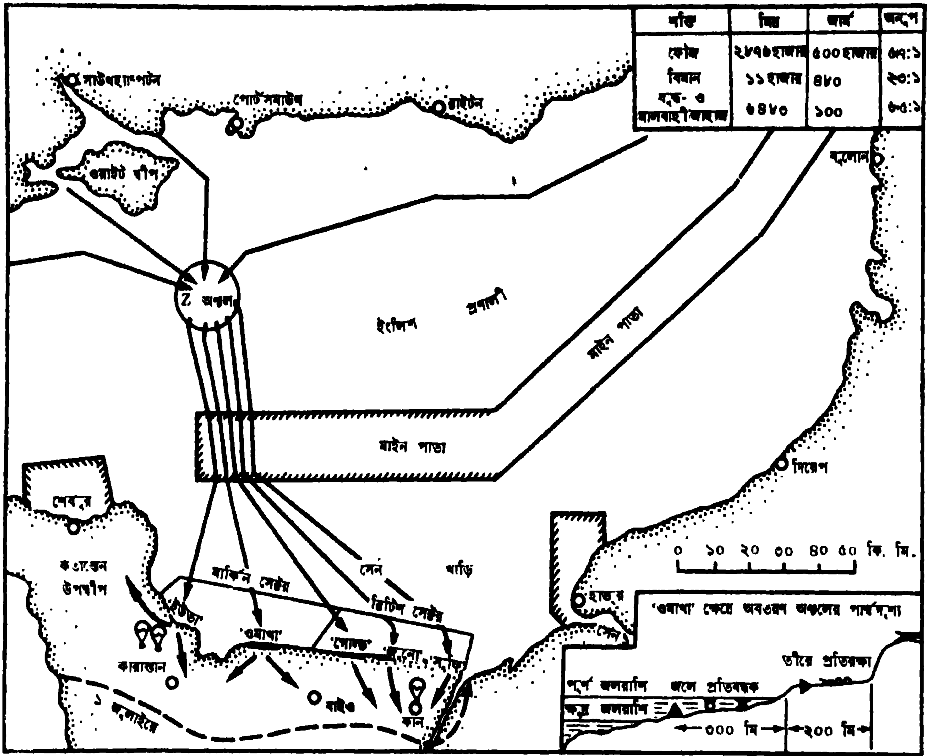
ইংলণ্ডে অবস্থানরত কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের — তবে সোভিয়েত ও মার্কিন কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের ছাড়া — নিজ নিজ দেশের সঙ্গে অনিয়ন্ত্রিত পত্রালাপ চালাতে এবং ব্রিটেনের বাইরে যেতে বারণ করে দেওয়া হয়েছিল।

সৈন্যাবতরণের আগের রাত্রে ব্রিটিশ নৌ-বহরের ১৮টি জাহাজ কয়েকটি দলের বোমারুর সমর্থনে হাভ্‌র, বুলোন ও শের্বুরের উত্তর-পূর্বে প্রদর্শনমূলক সামরিক ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ করে। জাহাজগুলো যখন উপকূল বরাবর সামরিক চাল চালছিল, তখন বিমানগুলো টুকরো টুকরো ধাতবীকৃত (মেটালাইজ্‌ড) কাগজ বর্ষণ করছিল, এবং জার্মান র‍্যাডারে তা পা-দে-কালে প্রণালীতে আক্রমণের উদ্দেশ্যে মিত্র বাহিনীসমূহের বিপুল শক্তির সমাবেশ ঘটছে বলে মনে হচ্ছিল।

'ওভারলর্ড' অপারেশনের প্রস্তুতির পক্ষে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল পুঙ্খানুপুঙ্খ বৈষয়িক-প্রযুক্তিগত ভিত্তি। যেমন, প্রণালীর উপর দিয়ে প্রেরিত ও পরে সেন খাড়ির উপকূলে স্থাপিত হয়েছিল দু'টি কৃত্রিম বন্দর। এ ছাড়াও ৭০টিরও বেশি পুরনো যুদ্ধ-জাহাজ ও সাধারণ জাহাজ জলমগ্ন করে পাঁচটি কৃত্রিম বন্দর তৈরি করার এবং প্রণালীর তলদেশ দিয়ে কয়েকটি তেল পাইপ লাইন বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল।

সমস্ত জিনিসপত্র জাহাজে বোঝাইকরণের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল এবং ওগুলো হার্মেটিক মোড়কের মধ্যে ছিল।

সৈন্যরা অবতরণের জন্য ট্রেনিং নিচ্ছিল বিশেষ শিবিরগুলোতে। অসংখ্য মহড়ায় তারা জাহাজে চড়ার ও সামরিক দিক থেকে অপ্রস্তুত



নকশা ১৩। নর্ম্যান্ডিতে অবতরণ অভিযান (১৯৪৪ সালের ৬-৩০ জুন)

উপকূলে অবতরণের, সুদৃঢ় ঘাঁটিসমূহের উপর ঝঞ্ঝাক্রমণের এবং অন্যান্য ধরনের ফৌজ আর সশস্ত্র শক্তির সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা চালানোর তালিম পাচ্ছিল।

নরম্যাণ্ডি অপারেশন আরম্ভ হওয়ার প্রাক্কালে শক্তির অনুপাতটি ছিল এরূপ:*

* মিত্রদের অভিযানকারী শক্তিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল ইংলণ্ডে অবস্থিত এবং নরম্যাণ্ডিতে অবতরণের জন্য নির্ধারিত বাহিনীগুলো, আর জার্মান-ফ্যাসিস্ট শক্তি সম্পর্কিত তথ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বাহিনীসমূহের 'B' গ্রুপের ফৌজ, 'পশ্চিম' গ্রুপিংয়ের মজুদ ফৌজ, ১ম বাহিনীর ফৌজ ও 'G' গ্রুপের ট্যাঙ্ক ডিভিশনগুলো।

সারণিটি প্রস্তুত করা হয়েছে এই বইগুলো থেকে গৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে:

শক্তি ও সঙ্গতি	মিত্রদের অভিযানকারী শক্তি	জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের শক্তি	অনুপাত
স্থল বাহিনীর লোকসংখ্যা (হাজার জনের হিসাবে)	১,৬০০	৫২৬	৩·০:১
ট্যাংক ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গান	৬,০০০	২,০০০	৩·০:১
তোপ ও মর্টার কামান (হাজারের হিসাবে)	১৫,০০০	৬,৭০০	২·২:১
জঙ্গী বিমান	১০,৮৫৯	১৬০	৬১·৪:১
প্রধান শ্রেণী যুদ্ধ-জাহাজ	১১৪	৫৪	২·১:১

১৯৪৪ সালের ৫ জুন তারিখে ইংলণ্ডের দক্ষিণ উপকূলের কাছে অবস্থিত জাহাজগুলোতে ছিল অভিযানকারী মিত্র বাহিনীগুলোর ২ লক্ষ ৮৭ হাজার লোক। তারা জাহাজে চড়ার জায়গাগুলো থেকে যাত্রা করে সকাল বেলা এবং দিনের শেষে ইংলণ্ডের দক্ষিণ উপকূল থেকে ৫০-৬০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কণ্ট্রোল পয়েণ্টে গিয়ে পেণছে যায়। এই কণ্ট্রোল পয়েণ্ট থেকে অবতরণ বাহিনীর সৈন্যরা আগে থেকে মাইনমুক্ত-করা দশটি জলপথে সেন খাড়ির দিকে যাত্রা করে। ল্যাণ্ডিং ফৌজ সমেত জাহাজগুলোর যাত্রাকালীন নিরাপত্তা বিধান করছিল মাইন-সুইপার আর পাহারা-জাহাজগুলো। ৬ জুন ভোর হতেই জাহাজগুলোকে আকাশ থেকে রক্ষা করছিল ফাইটার বিমান বাহিনী, আর পার্শ্বদেশ থেকে — অ্যাণ্টি-সাবমেরিন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বৃহৎ শক্তিসমূহ। নাৎসিদের নির্ভাবনা এবং অসন্তোষজনক অনুসন্ধান ব্যবস্থা অবতরণ বাহিনীকে অবাধে প্রণালী পার

হতে সাহায্য করে। ভের্মাখ্‌টের সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর অপারেশনেল সুপারভিশন বিভাগের প্রাক্তন উপাধিকর্তা জেনারেল ভ. ভার্লিমণ্ট তার স্মৃতিকথায় লিখেছিল যে মিত্রদের ৫ হাজার জাহাজের ইংলিশ প্রণালী পার হয়ে উত্তর ফ্রান্সের অবতরণ অঞ্চলে এসে পৌঁছার কথা কেউ-ই জানত না, — না জার্মান সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলী, না 'পশ্চিম' গ্রুপিংয়ের সদর-দপ্তর, না রমেল, না রুণ্ড্‌স্টেড্‌ট।*

৫ জুন তারিখের রাত প্রায় ২টার সময়, অবতরণের প্রাক্কালে, এয়ারবোর্ন ল্যান্ডিং ফোর্স নামানোর কাজ শুরু হয়। তাতে অংশগ্রহণ করে মার্কিন বিমান বাহিনীর ১,৬৬২টি বিমান ও ৫১২টি গ্লাইডার এবং ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর ৭৩৩টি বিমান ও ৩৩৫টি গ্লাইডার। শত্রুর তরফ থেকে কোনরূপ প্রতিরোধ না পাওয়া সত্ত্বেও বায়ুসেনা নামানোর কাজটি কিন্তু তেমন সুসংগঠিতভাবে সম্পন্ন হল না। ১০১তম মার্কিন এয়ারবোর্ন ডিভিশনটি নির্ধারিত অঞ্চল থেকে ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত দূরে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় গিয়ে নামে। অবতরণের সময় তা তার অস্ত্রশস্ত্র আর সাজসরঞ্জামের অর্ধেকেরও বেশি হারিয়ে ফেলে। ৬ষ্ঠ ব্রিটিশ এয়ারবোর্ন ডিভিশনটি অবতরণের তিন ঘণ্টা পরেই জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীর আঘাতের মধ্যে পড়ে। তবে মোটামুটিভাবে এয়ারবোর্ন ল্যান্ডিং ফৌজ নির্ধারিত কর্তব্যসমূহ পালন করতে সমর্থ হয় এবং তারা নৌসেনাদের অবতরণ করতে ও ব্রিজ-হেড দখল করতে যথেষ্ট সহায়তা প্রদান করে।

৬ জুন সকালে, প্রবল প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণ আর বোমাবর্ষণের পর (তা চলাকালে জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়ে যায়) নৌ-সৈন্যদের প্রথম এশিলনটির অবতরণ আরম্ভ হয়ে যায়। এবং এই পর্যায়েও সমস্তকিছু নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় নি: ল্যান্ডিং শিপগুলো নির্ধারিত সামরিক বিন্যাসে টিকে থাকে নি, বোট আর স্বয়ংচালিত গাধাবোটগুলো পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছিল। ওগুলোর মধ্যে কয়েকটি মাইনমুক্ত পথ থেকে সরে গিয়ে মাইন-পাতা এলাকায় প্রবেশ করে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। স্যাপার গ্রুপগুলো অবতরণ ক্ষেত্রসমূহে সমস্ত অ্যান্টি-ল্যান্ডিং প্রতিবন্ধক পুরোপুরিভাবে ধ্বংস করে দিতে পারে নি। কিন্তু উল্লিখিত ও অন্যান্য ভুলত্রুটি সত্ত্বেও ক্রিয়াকলাপের আকস্মিকতা, অন্তরিক্ষে আধিপত্য ও

* Warlimont W. Im Hauptquartier der deutschen Wermacht, 1939-1945. — Bonn, 1962, S. 452.

সংখ্যাগত শ্রেষ্ঠতা মিত্রদের প্রায় অবাধেই তীরে অবতরণ করতে সাহায্য করে।

সে দিনের শেষে নরম্যাণ্ডির উপকূলে নামানো হয়েছিল ১ লক্ষ ৫৬ সহস্রাধিক সৈন্য, ৯০০টি ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ি, ৬০০ তোপ, আর বিপুল পরিমাণ পরিবহণোপকরণ।

১২ জুনের দিকে মিত্র ফৌজ ৮০ কিলোমিটার চওড়া ও ১৩-১৮ কিলোমিটার গভীর একটি ব্রিজ-হেড দখল করে নেয়, আর ৩০ জুন নাগাদ রণাঙ্গন বরাবর ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত ও গভীরতার দিকে ২০ থেকে ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত ওই ব্রিজহেডটি প্রসারিত করে। নরম্যাণ্ডিতে অভিযানকারী সৈন্যের মোট সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ ৭৫ সহস্রাধিক। তাদের জন্য পেঁছানো হয়েছিল ১,৪৮,৮০৩টি ট্র্যান্সপোর্ট কার ও ৫,৭০,৫০৫ টন জিনিসপত্র। ব্রিজ-হেডে নির্মিত হয় ২৩টি বিমান বন্দর, যেখানে নিয়ে আসা হয়েছিল মিত্রদের ট্যাক্টিকেল বিমানগুলোর বৃহৎ একটি অংশ।

ওই সময় মিত্র বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে খাড়া ছিল ১৮টি জার্মান-ফ্যাসিস্ট ডিভিশন, — আগের লড়াইগুলোতে ওরা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। হিটলার যে-কারণে পশ্চিমে নিজের সৈন্যদের শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে নি তা হল মিত্রদের সঙ্গে বোঝাপড়া অনুযায়ী ১৯৪৪ সালের জুন মাসে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী কর্তৃক আরব্ধ বিপুলায়তনের বেলোরুশ অপারেশন। জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী ওই সময় সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গন থেকে কোন ইউনিট তো সরাতেই পারে নি, বরং তারা অন্যান্য রণাঙ্গন থেকে জরুরীভাবে ওখানে সৈন্য প্রেরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। বিখ্যাত মার্কিন কূটনীতিক, 'মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির পরিবর্তন' নামক গ্রন্থের লেখক চ বোলেন লিখেছিলেন যে সোভিয়েত সরকার অক্ষরে অক্ষরে তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। তিনি লেখেন, 'সোভিয়েতরা তাদের কথা মতো সততার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করে এবং ঠিক সেই সময় নিজেদের আক্রমণাভিযান আরম্ভ করে যখন তা মিত্রদের বাস্তব সহায়তা দান করে।'*

মার্কিন সৈন্যরা যখন কতান্তেন উপদ্বীপে লড়াইয়ে লিপ্ত ছিল তখন

n

ইংরেজরা কান শহর দখলের জন্য ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিল। কেবল ২১ জুলাই তারিখে তারা বিমান ও গোলন্দাজ বাহিনীর সমর্থনে শহরটি কবজা করতে পেরেছিল।

২৫ জুলাই নাগাদ অভিযানকারী মিত্র বাহিনীগুলো সেন-লো, কমোন ও কানের দক্ষিণে অবস্থিত যুদ্ধ-সীমায় গিয়ে পৌছয়। নরম্যাণ্ডির ল্যাণ্ডিং অপারেশন সমাপ্ত হয়। এবার ইউরোপীয় মহাদেশে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার কথা ছিল।

এটাই ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্ববৃহৎ ল্যাণ্ডিং অপারেশন। তাতে অবতরণের আকস্মিকতা অর্জন, সমস্ত ধরনের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে সুশৃংখল সহযোগিতা, সমুদ্র পথে বিপুল সংখ্যক সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র আর বিভিন্ন ধরনের মালপত্রের দ্রুত স্থানান্তরণের মতো জটিল সমস্যাবলি সাফল্যের সঙ্গে সমাধান করা হয়েছিল।

১৯৪৪ সালে ১১ জুন ই. স্তালিন উইনস্টন চার্চিলকে লেখেন, 'যেমনটি দেখা যাচ্ছে, বিপুলায়তনে পরিকল্পিত ল্যাণ্ডিং অপারেশনটি পুরোপুরিভাবে সফল হয়েছে। আমি এবং আমার সহকর্মীরা এ কথা স্বীকার না করে পারছি না যে যুদ্ধের ইতিহাসে আকার, পরিকল্পনার বিশালতা আর সম্পাদনের নিপুণতার বিচারে অনুরূপ অন্য কোন অভিযানের নজির নেই।'*

নৌ-সেনা ও বায়ুসেনার অবতরণ ঘটানো হয়েছিল শক্তি ও সঙ্গতিতে শত্রুর উপর মিত্রদের বিপুল শ্রেষ্ঠতার পরিস্থিতিতে। অবতরণের সময় নাৎসিরা উপকূলে ক্ষীণ প্রতিরোধ দান করে, আর অন্তরীক্ষে ও সমুদ্রে কোনরূপ প্রতিরোধ দেয় নি বললেই চলে।

সফল ল্যাণ্ডিং অপারেশনে আনুকূল্য করেছিল ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে সোভিয়েত সৈন্যদের প্রবল আক্রমণাভিযান, যা কেবল নাৎসি বাহিনীর প্রধান শক্তিসমূহকেই লড়াইয়ে লিপ্ত রাখে নি, জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলীকে তাদের মুখ্য রিজার্ভগুলোকেও সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে প্রেরণ করতে বাধ্য করে।

৬ জুন থেকে ২৪ জুলাইয়ের মধ্যে জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের ১ লক্ষ ১৩ হাজার লোক হতাহত ও বন্দী হয়, ২,১১৭টি ট্যাঙ্ক ও ৩৪৫টি বিমান

* সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সভাপতির পত্রালাপ, খণ্ড ১, পৃঃ ২৭১।

ধ্বংস হয়।* মিত্ররা ওই কাল পর্যায়ে হারায় ১ লক্ষ ২২ হাজার লোককে (৪৯ হাজার ইংরেজ ও কানাডিয়ান, প্রায় ৭৩ হাজার আমেরিকান)।**

উত্তর ফ্রান্সে ইঙ্গো-মার্কিন ফৌজের সফল অবতরণে সহায়তা করেছিল ফরাসি স্বদেশপ্রেমিকদের সক্রিয় ক্রিয়াকলাপ। এরা আইজেনহাওয়ারের কড়া নির্দেশ অমান্য করে (আইজেনহাওয়ার ফ্রান্সের জনগণকে অনতিবিলম্বে জার্মান দখলদারদের বিরূদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম বন্ধ করতে বলেছিলেন) নাৎসিদের বিরূদ্ধে সক্রিয় সংগ্রাম আরম্ভ করে। এমনকি মিত্রদের অবতরণের অঞ্চলেই সংগ্রামরত ফরাসি পার্টিজানরা ৪২টি শহর ও শত শত গ্রাম মুক্ত করে, যা অবতরণ বাহিনীকে তাদের অধিকৃত ব্রিজ-হেডটি সুদৃঢ় ও প্রসারিত করতে সাহায্য করে।

স্বয়ং আইজেনহাওয়ারই ফরাসি স্বদেশপ্রেমিকদের সুকৃতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি লেখেন, 'অভিযানের সময় সারা ফ্রান্সে এই শক্তিসমূহ আমাদের অমূল্য সহায়তা প্রদান করেছে। তারা বিশেষ সক্রিয় ছিল ব্রিতানিতে... তাদের বিপুল সহায়তা ব্যতিরেকে ফ্রান্সের মুক্তি সাধনের জন্য এবং পশ্চিম ইউরোপে শত্রুকে বিধ্বস্তকরণের জন্য আরও বেশি সময় ও আরও বেশি প্রাণহানির প্রয়োজন হত।'***

দক্ষিণ ফ্রান্সে মিত্র ফৌজের অবতরণ
(১৯৪৪ সালের ১৫ আগস্ট — ৩ সেপ্টেম্বর)

আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে মিত্র সৈন্যরা দক্ষিণ ফ্রান্সে অবতরণ করে। দক্ষিণ ফ্রান্স অপারেশনের উদ্দেশ্য ছিল: ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূলে রণাঙ্গন বরাবর ৯০ কিলোমিটার ও গভীরতা বরাবর ২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি ব্রিজ-হেড দখল করা, তুলোঁ ও মার্সেই বন্দরগুলো অধিকার করা এবং তারপর লিয়োঁ অভিমুখে আক্রমণাভিযান চালিয়ে যাওয়া।

অপারেশন পরিচালনার দায়িত্বভার পড়েছিল জেনারেল এ. প্যাচের

* KTB/OKW, Bd. IV, S. 326.

** পগিউ ফ.। সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলী। ইংরেজী থেকে অনুবাদ।— মস্কো, ১৯৫৯, পৃঃ ২০৮।

*** Eisenhower D. Crusade in Europe. — New York, 1951, p. 296.

অধীন ৭ম মার্কিন বাহিনীর উপর, যা গঠিত হয়েছিল ৬ষ্ঠ মার্কিন, ১ম ও ২য় ফরাসি কোরগুলো (৭টি ইনফেন্ট্রি, ২টি ট্যাঙ্ক ও ১টি মাউন্টেন ডিভিশন) নিয়ে এবং 'রেগবি' নামক ইঙ্গো-মার্কিন এয়ারবোর্ন ল্যান্ডিং গ্রুপটি নিয়ে। সৈন্যাবতরণের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল ৮১৭টি যুদ্ধ-জাহাজ, ৬৩টি ট্রুপ-কেরিয়ার এবং প্রায় ১,৩৭০টি ল্যান্ডিং শিপ ও অবতরণ সামগ্রী। সমুদ্র থেকে অবতরণ বাহিনীকে সমর্থন দিচ্ছিল ৫টি রণপোত, ৯টি বিমানবাহী এসকোর্ট জাহাজ, ২৪টি ক্রুজার ও বিমানবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ক্রুজার এবং অন্যান্য ধরনের যুদ্ধ-জাহাজ। এই শক্তিসমূহের অধিনায়ক ছিলেন ভাইস-অ্যাডমিরাল জ. হিউইট। আকাশ থেকে অবতরণ বাহিনীকে সাহায্য করছিল ৫,০০০টি বিমান।

মিত্রদের বিরুদ্ধে খাড়া ছিল ১৯শ জার্মান বাহিনীটি, যার লোকসংখ্যা ছিল প্রয়োজনের চেয়ে কম, অস্ত্রশস্ত্রের অভাব অনুভব করছিল, তার যুদ্ধক্ষমতাও ছিল কম। আর কান শহরের পশ্চিমে মিত্রদের অবতরণের ৮০ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত এলাকায় প্রতিরক্ষা কার্যে লিপ্ত ছিল জার্মান ২৪২তম ইনফেন্ট্রি ও ১৪৮তম রিজার্ভ ডিভিশনগুলোর মাত্র ৫টি ব্যাটেলিয়ন।

মার্কিন-ফরাসি বাহিনীগুলো উত্তর আফ্রিকায়, ইতালি ও কর্সিকায় সুদীর্ঘ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রস্তুতি পেয়েছিল।

অবতরণের আকস্মিকতা অর্জনের উদ্দেশ্যে মিত্র সেনাপতিমণ্ডলী ক্যামুফ্লেজ ব্যবস্থার আশ্রয় নেন এবং তদ্দ্বারা শত্রুকে বিভ্রান্ত করতে প্রয়াসী হন। ১৪ আগস্ট সন্ধ্যা থেকে যুদ্ধ-জাহাজের দু'টি গ্রুপ মার্সেই ও তুলোঁর মধ্যবর্তী এলাকাগুলোতে — যেখানে কোনরূপ সামরিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত হওয়ার কথা ছিল না — নৌ-সৈন্য অবতরণের প্রদর্শনে লিপ্ত থাকে।

১৫ আগস্ট সকাল বেলা মিত্ররা ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূলে ৯,৭৩২ জন লোকের একটি এয়ারবোর্ন ল্যান্ডিং গ্রুপ নামায়। অবতরণ কার্যে অংশগ্রহণ করে ৫৩৫টি বিমান ও ৪৬৫টি গ্লাইডার। নাৎসিদের তরফ থেকে তেমন কোন প্রতিরোধ না পেয়ে অবতরণকারী সৈন্যরা কয়েকটি জনপদ দখল করে নেয়। নৌ-সৈন্যদের অবতরণের আগে চলে প্রবল প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণ আর বোমাবর্ষণ। মিত্র বিমান বাহিনীর ১,৩০০টি প্লেন তুলোঁ ও কান শহরের মধ্যবর্তী অবতরণ এলাকায় ১২,৫০০ টন বোমা ফেলে। দিনের শেষ দিকে মিত্ররা তিনটি ব্রিজ-হেড অধিকার করে ফেলে, এবং ১৯ আগস্ট তারিখে

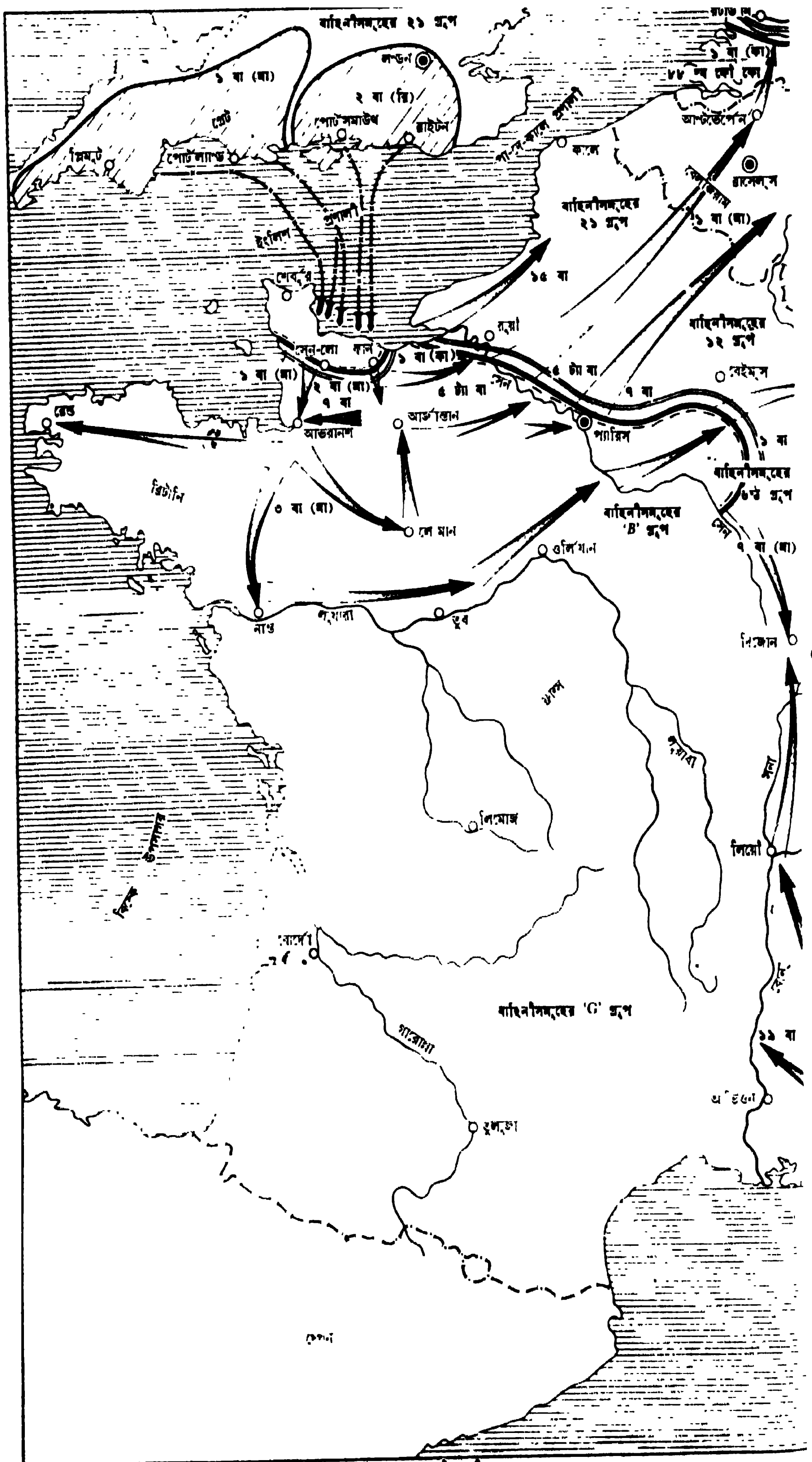
ওগ্‌লোকে একটি অভিন্ন ব্রিজ-হেডে ঐক্যবদ্ধ করা হয়। এই ব্রিজ-হেডটির আয়তন হয় — রণাঙ্গন বরাবর ৯০ কিলোমিটার ও গভীরতা বরাবর ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত। ওখানে মিত্রদের বিপ্‌ল শক্তির সমাবেশ ঘটানো হয়: ১ লক্ষ ৬০ হাজার লোক, ২,৫০০টি তোপ ও মর্টার কামান, ৬০০ ট্যাংক ও প্রায় ২১,৫০০টি মোটর গাড়ি।

নাৎসিদের জন্য পরিস্থিতির খ্‌বই অবনতি ঘটে। এক দিকে, দক্ষিণ ফ্রান্সে ব্‌হৎ ল্যান্ডিং ফোর্সের অবতরণ, আর অন্য দিকে, ওই সময় নাগাদ উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্সে য্‌দ্ধরত ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনীর সেন নদীর য্‌দ্ধ-সীমায় আগমন এবং প্রতিরোধ আন্দোলনের ব্যাপক বিস্তার। মিত্র বাহিনীর অগ্রগতি রোধকরণের উদ্দেশ্যে মার্সেই, তুলোঁ ও অন্যান্য কয়েকটি শহরে অনতিব্‌হৎ কিছ্‌ গ্যারিসন রেখে দিয়ে জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী জার্মানির পশ্চিম সীমান্তের দিকে ১৯শ বাহিনীটিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে শ্‌র্‌ করতে বাধ্য হয়েছিল। ২২ আগস্ট তারিখে মিত্ররা গ্রেনোবল ম্‌ক্ত করে, আর তার এক সপ্তাহ বাদে — অভ্যুত্থিত বাসিন্দাদের সহায়তায় — তুলোঁ ও মার্সেই, এবং ২ সেপ্টেম্বর তারা ফরাসি স্বদেশপ্রেমিকদের দ্বারা ম্‌ক্ত লিয়োঁ শহরে পদার্পণ করে। পরে শত্র্‌র প্রতিরোধ না পেয়ে মার্কিন-ফরাসি ফৌজ উত্তরাভিম্‌খে অগ্রসর হতে থাকে এবং ১০ সেপ্টেম্বর দিজোনের পশ্চিমে ৩য় মার্কিন বাহিনী অগ্রবর্তী ইউনিটগ্‌লোর সঙ্গে মিলিত হয়। এর ফলে পা-দে-কালে প্রণালীর উপকূল থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত মিত্র ফৌজগ্‌লোর একটি সর্বব্যাপী রণাঙ্গন গড়ে ওঠে এবং মিত্রদের দ্বিধাগ্রস্ত ক্রিয়াকলাপ আর মন্থর অগ্রগতিই কেবল জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজকে বিধ্বস্ত হতে দেয় নি। ভেরমাখ্‌টের সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীর ডায়েরিতে লেখা আছে যে ১৯শ বাহিনীর প্রধান শক্তিসম্‌হের পশ্চাদপসরণের ক্ষেত্রে আসল রণাঙ্গনে উপস্থিত বিপক্ষের চেয়ে বেশি হ্‌মকি স্‌ষ্টি করছিল পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত ফরাসি পার্টিজানদের ক্রিয়াকলাপ।*

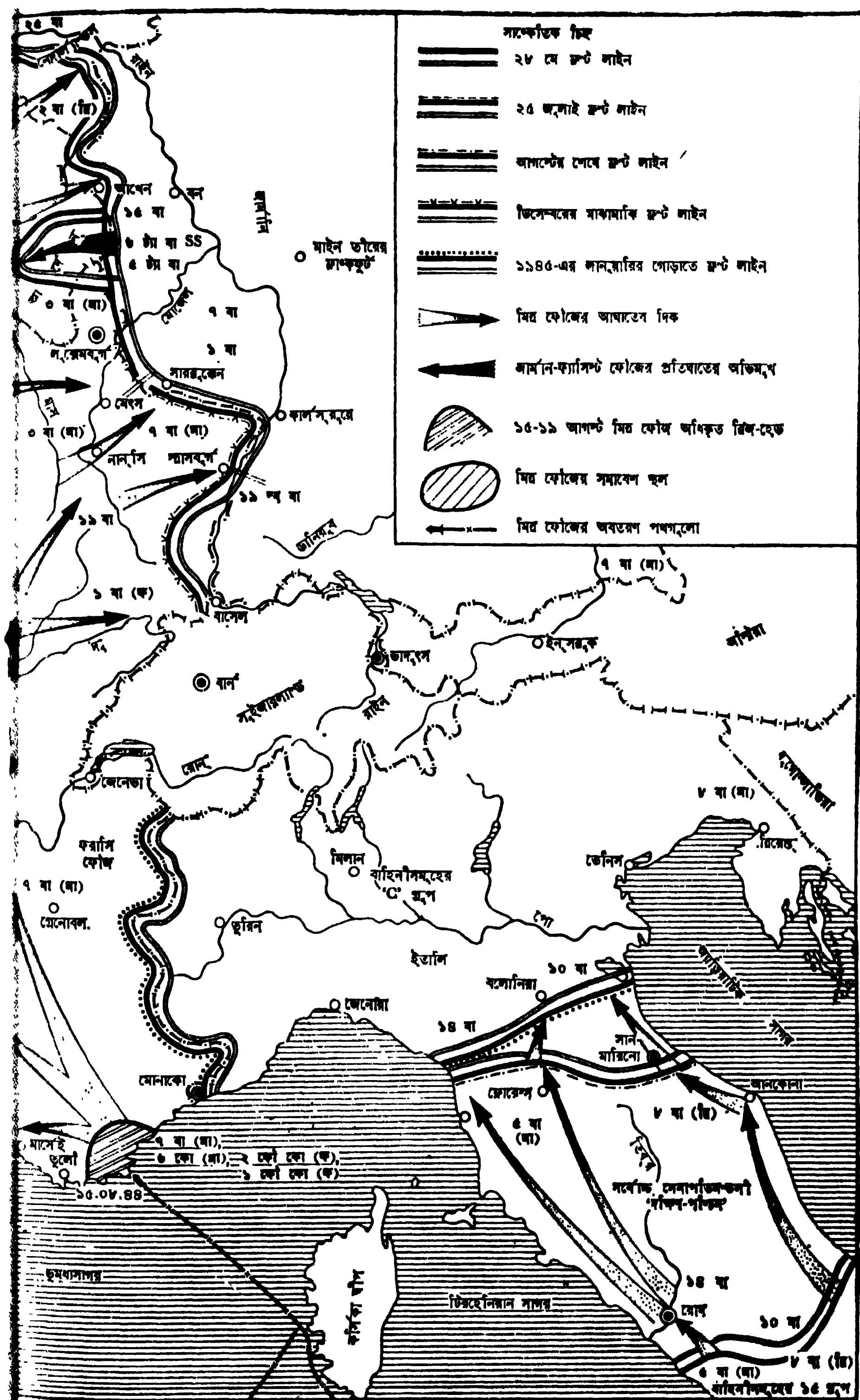
ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও হল্যান্ডে
মিত্রদের আক্রমণাভিযানের গতিব্‌দ্ধি

নরম্যান্ডি অপারেশন সম্পন্ন করে মিত্র বাহিনীগ্‌লো ২৫ জ্‌লাই তারিখে উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্সে আক্রমণাভিযান আরম্ভ করে। সেনাপতিমণ্ডলীর

* KTB/OKW, Bd. IV, S. 354.



নকশা ১৪। ১৯৪৪ সালের জুন-ডিসেম্বরে পশ্চিম ইউরোপে সামরিক ক্রিয়াকলাপ



সাঙ্কেতিক চিহ্ন
২৮ মে ফ্রন্ট লাইন
২৫ জ্বলাই ফ্রন্ট লাইন
আগস্টের শেষে ফ্রন্ট লাইন
ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ফ্রন্ট লাইন
১৯৪৫-এর জান্‌য়ারির গোড়াতে ফ্রন্ট লাইন
মিত্র ফৌজের আঘাতের দিক
জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের প্রতিঘাতের অভিমুখ
১৫-১৯ আগস্ট মিত্র ফৌজ অধিকৃত ব্রিজ-হেড
মিত্র ফৌজের সমাবেশ স্থল
মিত্র ফৌজের অবতরণ পথগ্‌লো
আখেন
বন
১৫ বা
৬ ষ্ঠ বা SS
৫ ম বা
মাইন তীরের ফ্রাঙ্কফুর্ট
৩ বা (আ)
৭ বা
১ বা
ল্‌ক্সেমবুর্গ
সারব্রুকেন
মেৎস
কার্লস্‌রুয়ে
৭ বা (আ)
নান্‌সি
স্ট্রাসবুর্গ
১৯ বা
১৯ ন্ম বা
১ বা (ফ)
বাসেল
বার্ন
সুইজারল্যান্ড
রাইন
রোন
জেনেভা
ইন্‌সব্রুক
অস্ট্রিয়া
৭ বা (আ)
৮ বা (ব্রি)
ফরাসি ফৌজ
৭ বা (আ)
গ্রেনোবল.
মিলান
বাহিনীসমূহের 'C' গ্রুপ
ভেনিস
ত্রিয়েস্ত
তুরিন
পো
ইতালি
১০ বা
বলোনিয়া
জেনোয়া
১৪ বা
সান মারিনো
ফ্লোরেন্স
আনকোনা
৫ বা (আ)
৮ বা (ব্রি)
মোনাকো
মার্সেই
তুলো
৭ বা (আ),
৬ কো (আ), ২ ফ্রা কো (ফ),
১ ফ্রা কো (ফ)
১৫.০৮.৪৪
সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলী 'দক্ষিণ-পশ্চিম'
ভূমধ্যসাগর
কর্সিকা দ্বীপ
টিরহেনিয়ান সাগর
রোম
১৪ বা
১০ বা
৮ বা (ব্রি)
৫ বা (আ)
বাহিনীসমূহের ১৫ গ্রুপ

পরিকল্পনা অনুসারে, কান শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে জার্মানদের প্রধান শক্তিসমূহকে ব্রিটিশ ও কানাডিয়ান বাহিনীর অচল করে রাখার কথা ছিল, আর মার্কিন ফৌজের কাজ ছিল — সেন-লোর পশ্চিমাঞ্চল থেকে দক্ষিণাভিমুখে আসল আঘাত হানা ও ব্রিতানি উপদ্বীপ অধিকার করা। পরে লে-মান ও আলানসনের মধ্য দিয়ে পূর্বাভিমুখে প্রধান শক্তিসমূহকে ঘোরানো, দুশমনকে সেনের দিকে হটিয়ে দেওয়া এবং সেন আর লুয়ারা নদীগুলোর যুদ্ধরেখা পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্সের ভূখণ্ডটিকে জার্মানদের কবল থেকে মুক্ত করা।

২৫ জুলাই ৩ হাজার বিমান থেকে প্রবল প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণের পর আমেরিকান সৈন্যরা আক্রমণাভিযান আরম্ভ করে। তৃতীয় দিনের শেষ দিকে তারা জার্মানদের ট্যাকটিকেল এলাকা ভেদ করে ১৫-২০ কিলোমিটার ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং পশ্চাদপসরণরত শত্রুকে তাড়া করতে শুরু করে। ৩১ জুলাই আমেরিকানরা সেমন নদীতে পেীছে যায় ও আভরানশ শহরটি অধিকার করে নেয়।

আগস্টের গোড়াতে মিত্র বাহিনীগুলো দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখে ব্রিতানির দিকে আক্রমণাভিযান চালিয়ে যায়। কিন্তু তখন নির্ভীক ফরাসী স্বদেশপ্রেমিকরা উপদ্বীপের বড় একটি অংশ মুক্ত করে ফেলেছিল। সেই জন্যই মিত্র সেনাপতিমণ্ডলী ঠিক করলেন যে এই অভিমুখে তাঁরা একটি মাত্র কোরকে রেখে ৩য় মার্কিন বাহিনীর প্রধান শক্তিসমূহকে পূর্ব দিকে ঘুরিয়ে দেবেন।

আইজেনহাওয়ার লেখেন যে বস্তুত পক্ষে ব্রিতানির দিকে পেছন ফেরার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ৬ আগস্ট আমেরিকান সৈন্যরা লাভাল ও মাইয়েন শহরগুলো অধিকার করে নেয় এবং তদ্দ্বারা ৭ম জার্মান বাহিনীর বাম পার্শ্বের জন্য হুমকি সৃষ্টি করে।

রণাঙ্গনের উত্তরাঞ্চলে ২য় ব্রিটিশ বাহিনী ১,২০০টি বিমানের প্রবল প্রাগাক্রমণ বোমাবর্ষণের পর শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে ফেলে এবং ১০ আগস্ট তারিখে দক্ষিণাভিমুখে ২০ কিলোমিটার অবধি ভেতরে ঢুকে পড়ে। জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের পরিবেষ্টিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। ৭ আগস্ট রাত্রিবেলা মর্তেন অঞ্চলে নাৎসিরা প্রতিঘাত হানে, কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি। অন্তরীক্ষে পূর্ণাধিপত্যের সুযোগ নিয়ে মার্কিন বিমান বাহিনী শত্রুর ট্যাঙ্কগুলোর উপর ব্যাপক আঘাত হানে। এ ছাড়া

আমেরিকানরা বিপদের সম্ভাবনাযুক্ত এলাকায় অতিরিক্ত ইনফেণ্ট্রি ও ট্যাঙ্ক নিয়ে আসে।

ওই দিনই ৩য় মার্কিন বাহিনী লে-মান শহরটি অধিকার করে ফেলে এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ৭ম জার্মান বাহিনীকে ঘিরে ফেলতে আরম্ভ করে। লে-মান অঞ্চল থেকে ৩য় মার্কিন বাহিনীর ১৫শ কোরটি দ্রুত গতিতে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। ১ম কানাডিয়ান বাহিনীর ২য় কোরটি উত্তর থেকে দক্ষিণাভিমুখে আক্রমণাভিযান চালিয়ে যায়। জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের পরিবেষ্টিত হওয়ার বাস্তব সম্ভাবনা সৃষ্টি হল। কিন্তু মিত্র সেনাপতিমণ্ডলী এই সুযোগটির সদ্ব্যবহার করলেন না। জেনারেল ব্র্যাডলির নির্দেশে ১৫শ কোরটিকে আর্জান্তান শহরের অঞ্চলে হঠাৎ থামিয়ে দেওয়া হয় বাহিনীসমূহের ১২শ ও ২১তম গ্রুপগুলোর মধ্যেকার সীমানির্ধারক লাইনটি অতিক্রান্ত হতে পারে এই আশঙ্কায়; আর তা ঘটলে, এইজেনহাওয়ারের মতে, কেবল 'রণাঙ্গনেই বিশৃঙ্খলা' সৃষ্টি হত না, কানাডিয়ান আর ইংরেজদের সঙ্গেও সম্ভবত সংঘর্ষ বাধত, — কেননা এরা আমেরিকানদের জার্মান বলে মনে করতে পারত। এইজেনহাওয়ার ধরে নিয়েছিলেন যে সৈন্যদের থামিয়ে দেওয়ার ফলে জার্মানদের একটি অংশ বেঁচে যাবে। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন যে তথাকথিত ফালেজ বেষ্টনীতে পতিত জার্মান সৈন্যদের বিধ্বস্তকরণের কাজ সম্পন্ন করবে বিমান বাহিনী।*

কিন্তু ঘটনা প্রবাহ অন্য দিকে মোড় নেয়। ফালেজ বেষ্টনীর মুখের কাছে থেমে গিয়ে মিত্র বাহিনীগুলো কয়েক দিন ধরে বস্তুত পক্ষে নিষ্ক্রিয়ই থাকে। জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী এই নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে ফালেজ বেষ্টনীর মুখ দিয়ে তাদের ডিভিশনগুলোর বৃহৎ একটি অংশকে বের করে নিয়ে যায়। কেবল ১৮ আগস্ট তারিখে মিত্র ফৌজগুলো বেষ্টনীর মুখটি বন্ধ করে। ৭ম জার্মান বাহিনীর প্রায় ৬ ডিভিশন সৈন্য ও ৫ম ট্যাঙ্ক বাহিনীর ২টি ডিভিশন বেষ্টনীর মধ্যে থেকে গিয়েছিল। ২০ আগস্ট পরিবেষ্টিত এবং পরিবেষ্টনের বাইরে অবস্থিত জার্মান সৈন্যরা পাল্টা-আক্রমণ চালিয়ে মিত্রদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে ফেলে ও নিজেদের প্রধান শক্তিসমূহের সঙ্গে মিলিত হতে সক্ষম হয়।

* Eisenhower D. Crusade in Europe. — New York, 1951, p. 278.

ভেরমাখ্‌টের সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীর ডায়েরিতে লেখা আছে, 'অবরুদ্ধ ফৌজের হাতিয়ারপত্রের বড় একটি অংশ ব্যূহভেদের আগেই খুয়া যায়, আর বাকী অংশটি তারা হারায় পরিবেষ্টন থেকে বেরিয়ে আসার সময়। ফৌজগুলো জনবলেও বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে তাদের অর্ধেকই বেঁচে যায়।'*

ফালেজ বেষ্টনীর অঞ্চলে সামরিক ক্রিয়াকলাপ সমাপ্তির পর মিত্র বাহিনীগুলো শত্রুর তরফ থেকে প্রতিরোধ না পেয়ে পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ২৫ আগস্ট তারিখে তারা ফরাসী স্বদেশপ্রেমিকদের দ্বারা মুক্ত প্যারিস নগরীতে প্রবেশ করে। ৩০ আগস্ট জেনারেল দ্য গল প্যারিসে ফরাসি প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী সরকারের ক্রিয়াকলাপ আরম্ভের কথা ঘোষণা করেন।

১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বরের গোড়াতে মিত্র ফৌজগুলো বিস্তৃত এক রণাঙ্গন জুড়ে আক্রমণাভিযানে লিপ্ত হয় এবং আণ্টভের্পেন ও আখেন অভিমুখে পা-দে-কালে উপকূল বরাবর ১ম মার্কিন বাহিনীর সহায়তায় বাহিনীসমূহের ২২তম গ্রুপটি প্রধান আঘাত হানতে থাকে। বাহিনীসমূহের ১২শ গ্রুপটি রুর ও সার অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল।

সেপ্টেম্বরের গোড়াতে বেলজিয়ামে স্বদেশপ্রেমিকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু হয়। তারা মিত্র ফৌজের আগমনের আগেই অনেকগুলো শহর ও প্রদেশ মুক্ত করে ফেলেছিল। ৩ সেপ্টেম্বর তারিখে ২য় ব্রিটিশ বাহিনী ব্রাসেল্‌সে প্রবেশ করে, আর তার পরের দিন — স্বদেশপ্রেমিকদের দ্বারা মুক্ত আণ্টভের্পেনে।

১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে ইঙ্গো-মার্কিন ফৌজগুলো বেলজিয়ামের প্রায় সমগ্র ভূখণ্ড অধিকার করে নিয়ে হল্যাণ্ডের সীমান্তে এবং জার্মানদের সুদৃঢ় আত্মরক্ষা লাইন — 'জিগফ্রিড অবস্থানের' নিকটে গিয়ে উপনীত হয়। উক্ত আত্মরক্ষা লাইনে শত্রুর প্রতিরোধ পেয়ে মিত্র সেনাপতিমণ্ডলী ঠিক করলেন যে তাঁরা উত্তর দিক থেকে হল্যাণ্ডের ভেতর দিয়ে লাইনটির পাশ কেটে চলে যাবেন, এবং এরূপ সিদ্ধান্তের পেছনে যে-উদ্দেশ্যটি ছিল তা হল: রাইন নদী তীরস্থ ব্রিজ-হেডটি দখল করা, শেল্দা নদীর মোহানা নাৎসিমুক্ত করা এবং জার্মানির অভ্যন্তর অভিমুখে পরবর্তী আক্রমণাভিযানের জন্য পরিবেশ গড়ে তোলা।

* KTB/OKW, Bd. IV, S. 357.

ইতিহাসে ওলন্দাজ অপারেশন (১৭-২৬ সেপ্টেম্বর) নামে পরিচিত এই অভিযানটি পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছিল মণ্টগমেরির সেনাপতিত্বাধীন ২১তম আর্মি গ্রুপটি, যা গঠিত হয়েছিল ২য় বৃটিশ ও ১ম কানাডিয়ান বাহিনীগুলো নিয়ে (১৬টি ডিভিশন, যার মধ্যে ৫টি ছিল ট্যাঙ্ক ডিভিশন)।

৩·২ কিলোমিটার চওড়া এক এলাকায় জার্মানদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করার এবং তিনটি এয়ারবোর্ন ডিভিশন নিয়ে গঠিত ল্যান্ডিং ফৌজের সঙ্গে সহযোগিতায় আর্নেম অভিমুখে আক্রমণাভিযান চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ৩০তম ব্রিটিশ কোরের শক্তিসমূহ (দু'টি ইনফেণ্ট্রি ডিভিশন, একটি ট্যাংক ডিভিশন ও একটি স্বতন্ত্র ব্রিগেড) দিয়ে প্রধান আঘাতটি হানার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। অবতরণ বাহিনী নামানোর পরিকল্পনাটি ছিল এরূপ: ১০১তম মার্কিন এয়ারবোর্ন ডিভিশনটিকে নামানো হবে এইন্ডহোভেন অঞ্চলে, ৮২তম ডিভিশনটিকে নেইমেগেনের কাছে, ১ম ব্রিটিশ এয়ারবোর্ন ডিভিশনটিকে ও পোলিশ প্যারাশুট ব্রিগেটটিকে আর্নেমের উত্তরে। এদের কাজ ছিল — তথাকথিত 'মণ্টগমেরি কার্পেট' গঠন করে মাস, ভাল্ ও রাইন নদীগুলোর পাড়ি-ব্যবস্থা দখল করা এবং এই সমস্ত অঞ্চলে স্থলসেনার আগমন না ঘটা পর্যন্ত তা টিকিয়ে রাখা।

অন্য দু'টি ব্রিটিশ কোরের (৮ম ও ১২শ কোরের) কাজ ছিল — ব্যূহভেদের এলাকা প্রসারণের উদ্দেশ্যে আক্রমণকারী গ্রুপিংটির পার্শ্বদেশে সামরিক ক্রিয়াকলাপ চালানো।

১ম কানাডিয়ান বাহিনীর উপর এরূপ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল: বুলোন, কালে ও ডানকার্কে শত্রুর অবরুদ্ধ গ্রুপিংগুলোর বিলোপ ঘটানো, নাৎসি ফৌজের কবল থেকে শেল্দা নদীর মোহানাটি মুক্ত করা এবং পরে রটার্ডাম ও আমস্টার্ডাম অভিমুখে আক্রমণাভিযান চালিয়ে যাওয়া।

২য় ব্রিটিশ বাহিনীর সামরিক ক্রিয়াকলাপের সময় অন্তরীক্ষ থেকে সমর্থন জোগাচ্ছিল ৬৫০টি বিমান।

মিত্র বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে খাড়া ছিল ১৫শ জার্মান ফিল্ড আর্মি ও ১ম প্যারাশুট বাহিনী। ওগুলোতে ছিল ৯টি ডিভিশন ও ২টি সামরিক গ্রুপ। এই ফর্ম্যাশনগুলো জনবলে ও অস্ত্রবলে সজ্জিত ছিল কেবল ৫৫-৬০ শতাংশ মাত্র। আর্নেম অভিমুখে, ৮৫ কিলোমিটার দীর্ঘ রণাঙ্গনে, প্রতিরক্ষা কার্যে লিপ্ত ছিল শত্রুর ৪টি ডিভিশনের ইউনিটগুলো।

২য় ব্রিটিশ বাহিনীর এলাকায় শক্তির অনুপাত ছিল মিত্রদের

অনুকূলে: ইনফেণ্ট্রি ও আর্টিলারিতে ২ গুণ (প্রধান আঘাতের অভিমুখে ৪ গুণ) প্রাধান্য, বিমানে ও ট্যাঙ্কে — নিরঙ্কুশ আধিপত্য।

১৭ সেপ্টেম্বর তারিখে স্বল্পকালীন প্রাগাক্রমণ বোমাবর্ষণের ও দশ মিনিট ব্যাপী তোপ দাগার পর মিত্র সৈন্যরা আক্রমণাভিযান আরম্ভ করে এবং দিনের শেষে ১০ কিলোমিটার অবধি গভীরে ঢুকে পড়ে।

ওই দিন এবং তার পরের দিন প্রবল বোমাবর্ষণের পর ভেগেল, গ্রাভে ও আর্নেম অঞ্চলগুলোতে বায়ুসেনার অবতরণ ঘটানো হয়।

সামনের দিক থেকে আক্রমণরত ৩০তম ফৌজী কোরটি এইণ্ডহোভেন শহরটি ঘুরে গিয়ে ১০১তম এয়ারবোর্ন ডিভিশনের ইউনিটগুলোর সঙ্গে মিলিত হয়। ২০ সেপ্টেম্বর কোরটি এক সংকীর্ণ এলাকা দিয়ে নেইমেগেনে গিয়ে পেঁছে এবং ৮২তম এয়ারবোর্ন ডিভিশনের সঙ্গে মিলিত হয়। আক্রমণকারী গ্রুপিংয়ের পার্শ্বদেশে আক্রমণাভিযানে লিপ্ত ৮ম ও ১২শ ফৌজী কোরগুলো অগ্রসর হচ্ছিল ধীরে ধীরে।

১ম ব্রিটিশ এয়ারবোর্ন ডিভিশন ও পোলিশ প্যারাশুট ব্রিগেডটি আর্নেম অঞ্চলে জার্মান ট্যাঙ্ক ডিভিশনের অবস্থানের নিকটে অবতরণ করার পর ফ্রণ্ট থেকে আক্রমণরত ফৌজের সমর্থন না পাওয়ার ফলে নাৎসিদের হাতে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এয়ারবোর্ন ইউনিটগুলোর কেবল শেষাংশসমূহ দক্ষিণ দিকে চলে যেতে ও নিজেদের ফৌজের সঙ্গে মিলিত হতে সমর্থ হয়েছিল। সেপ্টেম্বরের শেষে ২য় ব্রিটিশ বাহিনী নিম্ন রাইন নদীর দক্ষিণ তীরে, আর্নেমের পশ্চিমে প্রতিরক্ষায় লিপ্ত হয়।

দশ দিনে মিত্র বাহিনীগুলো ৮০ কিলোমিটার গভীরে চলে যায় এবং ফ্রণ্ট বরাবর ২৫ থেকে ৪০ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ব্যূহভেদের জায়গাটি প্রসারিত করে। কিন্তু অপারেশনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না — হল্যাণ্ডে জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজকে বিধ্বস্ত করা গেল না। সেই সঙ্গে উত্তর দিক থেকে 'জিগফ্রিড লাইন' ঘুরে মিউনস্টের অভিমুখে আক্রমণাভিযান আরম্ভ করার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় নি।

২য় কানাডিয়ান বাহিনী পা-দে-কালে প্রণালীর দক্ষিণ উপকূল বরাবর আক্রমণাভিযানে লিপ্ত থেকে বুলোন ও কালে বন্দরগুলো দখল করে নেয়, ডানকার্ক অবরোধ করে ফেলে শেল্দা নদীর মোহানায় পেঁছে যায়। ওলন্দাজ অপারেশনের প্রধান বৈশিষ্ট্যটি ছিল এই যে তাতে ব্যবহৃত হয়েছিল ওই সময়ের পক্ষে সর্ববৃহৎ এয়ারবোর্ন ল্যাণ্ডিং ফোর্স। কিন্তু তার প্রস্তুতি কালে একটি বড় ভুল হয়ে যায়: মিত্রদের অনুসন্ধান বিভাগ

আর্নেম অঞ্চলে জার্মান ট্যাঙ্ক ইউনিটগুলোর উপস্থিতি নিরূপণ করতে পারে নি। সেই সঙ্গে বায়ুসেনা নামানো হয় প্রয়োজনের চেয়ে অনেক আগে, তার শক্তিসমূহ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল, আর স্থলসেনা প্রধান অভিমুখে আক্রমণাভিযানের গতির মন্থরতার জন্য ও আক্রমণকারী গ্রুপিংয়ের পার্শ্বদেশে ক্রিয়াকলাপের শিথিলতার দরুণ অবতরণ বাহিনীকে সময়মতো সহায়তা প্রদান করতে পারে নি।

আর্দেনে জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের পাল্টা-আক্রমণ

ব্যাপক ও চূড়ান্ত আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপের পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও মিত্ররা পরবর্তী আক্রমণাভিযান আরম্ভ করতে বিলম্ব করে এবং ছোটখাটো অপারেশনে আর অসংখ্য সৈন্য পুনর্বিন্যাসের কাজে লিপ্ত থাকে। ইঙ্গো-মার্কিন সেনাপতিমণ্ডলীর এরূপ আচরণের কারণটি ছিল ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি, যার উদ্দেশ্য ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বাধিক দুর্বলতাসাধন। পরিস্থিতি বিবেচনা করে জার্মান সেনাপতিমণ্ডলী আর্দেনে লিয়েজ ও আণ্টভের্পেন অভিমুখে আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নিল।

এই পাল্টা-আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল — বৃহৎ ট্যাঙ্ক শক্তির সাহায্যে আচমকা এক প্রবল আঘাত হেনে ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনীগুলোকে বিধ্বস্ত করে দেওয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনকে ফ্যাসিস্ট জার্মানির পক্ষে সম্মানজনক পৃথক শান্তি চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করা। জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের পাল্টা-আক্রমণের বিষয়ে ভেরমাখ্‌টের সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীর ১৯৪৪ সালের ১০ নভেম্বর তারিখের নির্দেশে বলা হয়: 'অপারেশনটির উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে আণ্টভের্পেন-ব্রাসেল্‌স-লুক্সেমবুর্গ লাইনের উত্তরে শত্রুর শক্তিসমূহ ধ্বংসকরণের মাধ্যমে পশ্চিমে যুদ্ধের গতিতে — এবং তদ্দ্বারা সম্ভবত গোটা যুদ্ধের গতিতেও — আমূল পরিবর্তন ঘটানো'।

অপারেশনের পরিকল্পনা অনুসারে, আর্দেনের মধ্য দিয়ে লিয়েজ ও আণ্টভের্পেন অভিমুখে প্রধান আঘাত হানার কথা ছিল, এবং এর উদ্দেশ্যটি ছিল আণ্টভের্পেন অঞ্চলে বাহিনীসমূহের সমগ্র ব্রিটিশ গ্রুপটিকে এবং আখেন অঞ্চলে মার্কিন ফৌজগুলোকে ফ্রান্সে যুদ্ধরত মিত্র সৈন্য বাহিনীগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। ব্রিটিশ ফৌজকে সমুদ্রের দিকে হটিয়ে দিয়ে তাদের জন্য দ্বিতীয় ডানকার্ক সৃষ্টি করার কথা ভাবা হচ্ছিল। প্রধান

সাঙ্কেতিক চিহ্ন

- জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজ
- মার্কিন ফৌজ
- ব্রিটিশ ফৌজ
- অপারেশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রধান আঘাতের দিক
- জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের বাস্তব অগ্রগতি
- মিত্র ফৌজের পুনর্বিন্যাস
- ১২-১৬. ১.৪৫ তারিখে আঘাতের দিক

নকশা ১৬। (ক) আর্দেন্‌ অপারেশন (১৯৪৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর-১৯৪৫ সালের ২৫ জানুয়ারি).

সাঙ্কেতিক চিহ্ন

- ১৯৪৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরে ফ্রন্ট লাইন
- জার্মানদের আঘাত

(খ) অ্যাল্‌সেস অপারেশন (১৯৪৫ সালের ১-২৭ জানুয়ারি)

আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে আর্দেনের উত্তরে এবং এ্যালসেস দ্বটি সহায়ক আঘাত হানার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছিল।

পাল্টা-আক্রমণের গোড়ার দিকে নাৎসি বাহিনীতে ছিল ৭৩টি ডিভিশন (তার মধ্যে ১১টি ট্যাংক ডিভিশন) ও ৩টি ব্রিগেড। সৈন্য সংখ্যায় ও অস্ত্রশস্ত্রে হিটলারী ডিভিশনগুলো মিত্র ফৌজের চেয়ে ছিল দুর্বলতর। বহু জার্মান ডিভিশনের লোকসংখ্যা ও সাজসজ্জা প্রয়োজনের চেয়ে ৩০-৪০ শতাংশ কম ছিল। মিত্রদের হিসাব মতে, সমস্ত ফ্যাসিস্ট ফর্ম্যাশন যুদ্ধ-ক্ষমতায় কেবল ৩৯টি ইঙ্গো-মার্কিন ডিভিশনের সমকক্ষ ছিল।

পাল্টা-আক্রমণের জন্য জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী ফৌজের একটি গ্রুপিং গড়ে, যাতে অন্তর্ভুক্ত হয়: ৬ষ্ঠ ট্যাংক বাহিনী এস-এস (৯টি ডিভিশন), ৫ম ট্যাংক বাহিনী (৭টি ডিভিশন) ও ৭ম বাহিনী (৪টি ডিভিশন)। একটি ডিভিশন ছিল রিজার্ভে। আক্রমণকারী গ্রুপিংটিতে ছিল সর্বমোট ২১টি ডিভিশন, প্রায় ৯০০টি ট্যাংক ও অ্যাসল্ট গান। অন্তরীক্ষ থেকে সমর্থন জোগাচ্ছিল ৮০০টি বিমান। ভের্মাখ্‌টের স্থলসেনার জেনারেল স্টাফের প্রাক্তন অধিকর্তা জেনারেল গাল্‌ডের পরবর্তী কালে লিখেছে, 'আর্দেনে ব্যবহৃত শক্তিগুলো ছিল নিঃস্ব-হয়ে-যাওয়া একটি মানুষের শেষ সম্বল।... যেকোন অবস্থায়ই কয়েকটি ডিভিশনের উপর আর্দেন থেকে আণ্টভের্পেন পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার দায়িত্বটি ন্যস্ত করা উচিত হয় নি, কেননা ওগুলোর কাছে যথেষ্ট পরিমাণ জ্বালানি ছিল না, গোলাবারুদ ছিল সীমিত পরিমাণ এবং ওরা বায়ুসেনার সমর্থন পাচ্ছিল না।'*

১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনীগুলোর ৬৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ ফ্রণ্টে ছিল ৬৩টি ডিভিশন (তার মধ্যে ১৫টি ট্যাঙ্ক ডিভিশন)। তার মধ্যে ৪০টিই ছিল মার্কিন। ওদের কাছে ছিল প্রায় ১০ হাজার ট্যাংক ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গান, প্রায় ৮ হাজার বিমান (পরিবহণ বিমান ব্যতিরেকে)। এইজেনহাওয়ারের কাছে রিজার্ভে ছিল ৪টি এয়ারবোর্ন ডিভিশন।

আর্দেনে মিত্রদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল দুর্বল। তারা ভেবেছিল যে জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীগুলো এতই দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে ওগুলো আর পাল্টা-আক্রমণ পরিচালনায় সক্ষম ছিল না, এবং সেই জন্য তারা তাদের ফৌজকে প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুত করে নি। বাহিনীসমূহের ১২শ গ্রুপের

* Halder F. Hitler als Feldherr. — München, 1949, S. 59-60.

প্রাক্তন অধিনায়ক জেনারেল ও. ব্র্যাডলি লেখেন, 'আমি ভাবি নি যে জার্মানরা এত বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে শক্তি সমাবেশিত করতে পারে, এবং শত্রুর আক্রমণ চালানোর ক্ষমতা খাটো করে দেখেছিলাম।'*

আমেরিকানদের মধ্যে এই ধারণার প্রাধান্য ছিল যে জার্মানরা একই ধরনের কাজ করবে না এবং ১৯৪০ সালে যেরূপ আক্রমণাভিযান চালিয়েছিল সেরূপ কোন আক্রমণাভিযানে লিপ্ত হবে না। আর্ডেনে ১১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ রণাঙ্গন জুড়ে প্রতিরক্ষারত ৮ম মার্কিন কোরটি কেবল প্রধান আত্মরক্ষাঞ্চলটিই গড়েছিল, এবং তা গঠিত হয়েছিল বিস্তৃত ফ্রন্টে ছড়ানো একাধিক দৃঢ় ঘাঁটি নিয়ে। ওগুলোর মধ্যে পারস্পরিক ফায়ারিং সমর্থন ছিল না, এবং ইঞ্জিনিয়ারিং দিক থেকেও ওগুলো যথেষ্ট সজ্জিত ছিল না। শত্রু সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হচ্ছিল খুবই কম। আর্দেন অভিমুখে মিত্রদের অপারেশনেল বা স্ট্র্যাটেজিক রিজার্ভের কোনটাই ছিল না।

আর্দেন থেকে উত্তরে ও দক্ষিণে সামরিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত ছিল আমেরিকানদের বৃহৎ শক্তি। তাদের সঙ্গে ছিল বিপুল সংখ্যক ট্যাঙ্ক ফর্ম্যাশন।

মিত্রদের সদর-দপ্তরগুলোতে ও ফৌজগুলোতে কেউ জার্মানদের পাল্টা-আক্রমণ সম্পর্কে সন্দেহই করে নি। আর্দেন অপারেশন সম্পর্কিত রচনার লেখক জ. টল্যান্ড লিখেছেন, 'এখটের্নাখ থেকে মনশাউ পর্যন্ত বিস্তৃত রণাঙ্গনে ৭৫ হাজার মার্কিন সৈনিক ১৫ ডিসেম্বর রাত্রে বরাবরকার মতোই ঘুমিয়ে পড়ে।... সে দিন সন্ধ্যায় কোন মার্কিন সেনাপতিই ভাবতে পারেন নি যে জার্মানরা বড় রকমের এক আক্রমণাভিযান আরম্ভ করবে।'**

১৯৪৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভোর বেলা জার্মানদের একটি ট্যাঙ্ক গ্রুপ পাল্টা-আক্রমণ শুরু করে। আচমকা আঘাত হেনে তা সঙ্গে সঙ্গেই বড় রকমের সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় মার্কিন সৈন্যরা প্রথম দিনগুলোতে জার্মানদের বিশেষ প্রতিরোধ দিতে পারে নি। শুরু হয় বিশৃঙ্খল পশ্চাদপসরণ, যা কোন কোন

* ব্র্যাডলি ও.। সৈনিকের স্মৃতিকথা। ইংরেজী থেকে অনুবাদ। — মস্কো: বিদেশী সাহিত্য প্রকাশন, ১৯৫৭, পৃঃ ৪৯২।

** Toland J. Battle. The Story of the Bungle. — London, 1959, pp. 21, 24.

জায়গায় পরিণত হয় আতঙ্কিত পলায়নে। মার্কিন সাংবাদিক র. ইনগেরসল লিখেছেন যে জার্মান ফৌজগুলো পঞ্চাশ মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গনে আমাদের প্রতিরক্ষা লাইন ভেদ করে ফেলে এবং ওই বিদ্ধস্থল দিয়ে বাঁধা-ভাঙা জলের মতো প্রবল বেগে হুড়মুড় করে ঢুকতে থাকে। আর ওদের হাত থেকে পশ্চিমাভিমুখী সমস্ত পথ দিয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পালাচ্ছিল আমেরিকানরা।*

জার্মানদের সাফল্যে সহায়তা করে খারাপ আবহাওয়া, যা বিমান চলাচলের পক্ষে মোটেই অনুকূল ছিল না। মার্কিন বিমান বাহিনীর বিপুল শ্রেষ্ঠতার কথা বিবেচনা করে জার্মানরা মেঘলা ও কুয়াশাচ্ছন্ন দিনে পাল্টা-আক্রমণ আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত নেয়। আমেরিকান সৈনিকদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে শত্রুর ইংরেজী ভাষায় বলা ও মার্কিন সামরিক পোশাক পরিহিত সেই সমস্ত প্যারাট্রুপার আর অন্তর্ঘাতী গ্রুপ, নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলী যাদের মিত্র ফৌজের পশ্চাদ্ভাগে নামিয়ে দিয়েছিল। অন্তর্ঘাতকরা ছিল সমস্ত ধরনের ফৌজ এবং এস-এস ইউনিটগুলো থেকে আগত স্বেচ্ছাসেবক। এদের ওত্তো স্কোরসেনির সেনাপতিত্বে ১৫০তম বিশেষ ট্যাঙ্ক ব্রিগেডে মিলিত করা হয়। ব্রিগেডে ছিল ২,০০০ লোক, এবং এদের মধ্যে ১৫০ জন ইংরেজী জানত। এরা বিশেষ তালিম পায়, মার্কিন ও ব্রিটিশ ইউনিফর্ম পরিহিত এবং মার্কিন ও ব্রিটিশ অস্ত্রে সজ্জিত ছিল। এদের কাজ ছিল: মিত্রদের পশ্চাদ্ভাগে আতঙ্ক সৃষ্টি করা, তাদের জেনারেল আর অফিসারদের হত্যা করা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত করা, রাস্তার চিহ্নগুলো ধ্বংস করা ও ওগুলোর স্থান পরিবর্তন করা, রাস্তার উপর প্রতিবন্ধক গড়া, রেল পথে ও মোটর সড়কে মাইন পাতা, গোলাবারুদ ও জ্বালানির গুদাম বিনষ্ট করা। কিন্তু অন্তর্ঘাতী গ্রুপগুলো নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলীর আশা পূরণ করতে পারল না। মার্কিন সেনাপতিমণ্ডলী অচিরেই কঠোর হস্তে এদের ক্রিয়াকলাপের অবসান ঘটাতে আরম্ভ করেন। বন্দী অন্তর্ঘাতকদের কাছ থেকে তাদের কাজের চরিত্র ও স্থান সম্পর্কে তথ্যাদি লাভ করে মিত্ররা এদের ধরার আয়োজন করে। এর ফলে কয়েক

---

* ইনগেরসল র.। সম্পূর্ণ গোপনীয়। ইংরেজী থেকে অনুবাদ। — মস্কো, ১৯৪৭, পৃঃ ১২৯।

দিনের মধ্যেই ১৩০ টিরও বেশি অন্তর্ঘাতক ধৃত হয় এবং সামরিক আদালতে বিচারের পর ওদের গুলি করে হত্যা করা হয়।*

পাল্টা-আক্রমণাভিযানের প্রথম দিনগুলোতে জার্মান সৈন্যরা দ্রুত আমেরিকানদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ট্যাকটিকেল এলাকাটি ভেদ করতে এবং তার গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। ১৯ ডিসেম্বর তারিখে তাদের অগ্রবর্তী ট্যাংক ইউনিটসমূহ অবস্থান করছিল লিয়েজের ২৫ কিলোমিটার দক্ষিণে, আর ৫ম ট্যাংক বাহিনীর প্রধান শক্তিসমূহ দ্রুত গতিতে মাসের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল এবং ২৪ ডিসেম্বর তার উপকণ্ঠে পেণছে গিয়েছিল। তবে তারা এর বেশি আর অগ্রসর হতে পারে নি: ট্যাংকগুলোতে জ্বালানি ছিল না, তাছাড়া ৫ম ট্যাংক বাহিনীর এগিয়ে-যাওয়া ইউনিটসমূহের শক্তি নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল বাস্তনের জন্য কঠোর লড়াইয়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১ম মার্কিন বাহিনীর ৮ম কোরটি যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

আর্দেনে ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনী হারায় ৭৬,৮৯০ জন লোক, এদের মধ্যে ৮,৬০৭ জন নিহত হয়, ৪৭,১২৯ জন হয় আহত ও ২১,১৪৪ জন নিখোঁজ হয়ে যায়। জার্মানরা হারায় ৮১,৮৩৪ জনকে — ১৯,৬৫২ জন হয় নিহত, ৩৮,৬০০ জন হয় আহত ও ৩০,৫৮২ জন নিখোঁজ হয়।

২৮ ডিসেম্বর হিটলার তার সদর-দপ্তরে অনুষ্ঠিত এক অধিবেশনে আর্দেন অপারেশন সম্পর্কে আলোচনা কালে ওই অপারেশনের অকৃতকার্যতা স্বীকার করে এবং আর্দেনের দক্ষিণে নতুন আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নেয়। এর উদ্দেশ্য ছিল — ওখানে অবস্থিত আমেরিকান ফৌজগুলোকে ধ্বংস করা।

উত্তর অ্যালসেসে ৭ম মার্কিন বাহিনীকে ঘিরে ফেলার ও ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে আর্দেনের দক্ষিণে জার্মান-ফ্যাসিস্ট সৈন্যদের পাল্টা-আক্রমণাভিযান সম্পন্ন করার কথা ছিল ১ম ও ১৯শ বাহিনীগুলোর শক্তিসমূহ দিয়ে — বিটচে অঞ্চল ও স্ত্রাসবুর্গ এবং কলমার ব্রিজ-হেড থেকে আঘাত হেনে।

১৯৪৫ সালের জানুয়ারির গোড়াতে পশ্চিম ইউরোপে মিত্রদের অবস্থা জটিলই থেকে যায়। উত্তর অ্যালসেসে অবস্থিত ৭ম মার্কিন বাহিনী

নাৎসিদের কাছে মার খেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পিছু হটে যায়। আইজেনহাওয়ারের সমস্ত মজুত শক্তি ফুরিয়ে যায়। ব্যাপারটি রুজভেল্ট ও চার্চিলকে সোভিয়েত সরকারের কাছে বৃহৎ এক আক্রমণাভিযান আরম্ভ করার এবং তদ্দ্বারা কঠোর পরিস্থিতির সম্মুখীন মিত্র বাহিনীগুলোকে সহায়তা দানের অনুরোধ জানাতে বাধ্য করে। চার্চিল স্তালিনকে লেখেন, 'পশ্চিমে কঠোর লড়াই চলছে, এবং যেকোন মুহূর্তে সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আপনি নিজেই স্বীয় অভিজ্ঞতা থেকে জানেন যে যখন সাময়িকভাবে উদ্যোগ হারানোর পর অতি বিস্তৃত এক রণাঙ্গন রক্ষা করতে হয় তখন অবস্থাটি কত আশংকাজনক হয়ে দাঁড়ায়।... জানুয়ারি মাসে এবং আপনার ইচ্ছানুযায়ী অন্য যেকোন সময়ে ভিস্টুলা রণাঙ্গনে অথবা অন্য কোন স্থানে আমরা বৃহৎ রুশ আক্রমণাভিযানের প্রত্যাশা করতে পারি কি না এ সম্পর্কে আপনি যদি আমায় কোনকিছু জানাতে পারেন তাহলে আমি বাধিত হব।'*

নিজের মিত্রসুলভ কর্তব্যের প্রতি অনুগত সোভিয়েত ইউনিয়ন এই অনুরোধটি রক্ষা করে। সোভিয়েত সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলী সোভিয়েত ফৌজের আক্রমণাভিযান আরম্ভের সময়টি জানুয়ারির দ্বিতীয়ার্ধ থেকে প্রথমার্ধের দিকে এগিয়ে নিয়ে আসেন। ১২ জানুয়ারি তারিখে বল্টিক সাগর থেকে কার্পেথিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এক অঞ্চল জুড়ে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর আরব্ধ আক্রমণাভিযান জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলীকে পশ্চিমে তাদের আক্রমণাত্মক পরিকল্পনাগুলো ত্যাগ করতে বাধ্য করে। তদুপরি তারা ৬ষ্ঠ এস-এস ট্যাঙ্ক বাহিনীটিকে — আর্দেনের উদ্গতাংশে সৈন্যসমূহের গ্রুপিংয়ের প্রধান আক্রমণকারী শক্তিটিকে — এবং অন্যান্য কয়েকটি ফর্ম্যাশনকে জরুরীভাবে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিল। এর ফলে আমেরিকান ফৌজগুলো ১৯৪৫ সালের ২৫ জানুয়ারি নাগাদ আর্দেনে তাদের অবস্থান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হল। ২৭ জানুয়ারির দিকে নাৎসি বাহিনীগুলো উত্তর অ্যালসেসেও তাদের আগের অবস্থানে চলে যায়।

এই ভাবে, ১৯৪৪ সালে মিত্র বাহিনীসমূহের বড় বড় সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ক্রিয়াকলাপে অনেক ভুলভ্রান্তিও ছিল। যেমন, শত্রুর

* সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সভাপতির পত্রালাপ, খণ্ড ১, পৃঃ ২৯৮।

উপর বিপুল শ্রেষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও মিত্র বাহিনীসমূহ নরম্যাণ্ডিতে ব্রিজ-হেড প্রসারণের জন্য যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম চালায় নি। ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডে তারা জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের একটি বৃহৎ গ্রুপিংকেও অবরুদ্ধ ও বিধ্বস্ত করতে পারে নি। শত্রুর উপর শক্তি ও সঙ্গতিতে বৃহৎ শ্রেষ্ঠতা সত্ত্বেও তারা আর্নেম অপারেশনের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভুলভ্রান্তি করে এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে সক্ষম হয় নি। মিত্র সেনাপতিমণ্ডলী যথা সময়ে আর্দেনে জার্মানদের পাল্টা-আক্রমণাভিযানের পরিকল্পনা ফাঁস করেন নি, শত্রুর আক্রমণ ক্ষমতা খাট করে দেখেন, এবং তার জন্য ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনীকে কঠোর পরিণাম ভোগ করতে হয়।

১৯৪৪ সালে ইতালিতে সামরিক ক্রিয়াকলাপ

১৯৪৪ সালের গোড়ার দিকে জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজ — ১৯৪৩ সালের হেমন্তে দক্ষিণ ইতালি থেকে পশ্চাদপসরণের পর — আগে থেকে-প্রস্তুত আত্মরক্ষা লাইনে অবস্থান দৃঢ় করে নেয়। আত্মরক্ষা লাইনটি যাচ্ছিল রোমের ১২০ কিলোমিটার দক্ষিণে সান্‌গ্র ও কারিলিয়ানো নদীগুলো বরাবর। নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলীর উদ্দেশ্য ছিল — মধ্য ইতালিকে নিজেদের দখলে রাখা।

ইতালিতে ইঙ্গো-মার্কিন ফৌজগুলো বাহিনীসমূহের ১৫শ গ্রুপে ঐক্যবদ্ধ হয়। তার অধিনায়ক নিযুক্ত হন ব্রিটিশ জেনারেল হ. আলেকজাণ্ডার। গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ৫ম মার্কিন ও ৮ম ব্রিটিশ বাহিনী, সর্বমোট ১৬টি ইনফেণ্ট্রি ডিভিশন, ২টি ট্যাঙ্ক ডিভিশন, ১টি এয়ারবোর্ন ডিভিশন ও ৪টি স্বতন্ত্র ট্যাঙ্ক ব্রিগেড।

বাহিনীসমূহের ১৫শ গ্রুপটিকে সমর্থন জোগাচ্ছিল ৪ হাজার বিমান সম্বলিত বায়ুসেনা ও প্রধান প্রাধন শ্রেণীর ১৩০টি যুদ্ধ-জাহাজ এবং বিপুল সংখ্যক অন্যান্য জাহাজ ও ল্যাণ্ডিং শিপ সম্বলিত নৌ-বহর।

মিত্র ফৌজগুলোর বিরুদ্ধে খাড়া ছিল জার্মান বাহিনীসমূহের ‘C’ গ্রুপটি যার অধিনায়ক ছিল জেনারেল-ফিল্ডমার্শাল আ. কেসেলরিঙ। তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ১০ম ও ১৪শ বাহিনী,* সর্বমোট ২১টি ডিভিশন, যার

* ১০ম বাহিনীটি রক্ষা করছিল আগে-থেকে-প্রস্তুত আত্মরক্ষা লাইন, আর ১৪শ বাহিনী রক্ষা করছিল উপকূল ভাগ এবং উত্তর ইতালিতে লড়ছিল পার্টিজানদের সঙ্গে।

মধ্যে ২টি ছিল ট্যাঙ্ক ডিভিশন। ইতালিতে জার্মান বিমান বাহিনীর কাছে ছিল প্রায় ৩৭০টি বিমান, আর ভূমধ্যসাগরে জার্মানদের নৌ-বহরটি ছিল খুবই দুর্বল — প্রধান প্রধান শ্রেণীর যুদ্ধ-জাহাজের মধ্যে তার কাছে ছিল মাত্র ১৩টি ডুবো-জাহাজ।

ইতালীয় রণাঙ্গনে শক্তির অনুপাত মূল্যায়ন করে নাৎসি জেনারেল ইওডল ১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে স্বীকার করেছিল: 'ইতালিতে সামরিক ক্রিয়াকলাপের উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলছে জলে স্থলে ও অন্তরিক্ষে শত্রুর শ্রেষ্ঠতা। শত্রুর পশ্চাদ্ভাগের সামুদ্রিক যোগাযোগ পথগুলোর প্রতি কোন হুমকি নেই বললেই চলে, কেননা আমাদের কাছে আছে যৎসামান্য নৌ-শক্তি ও বিমান শক্তি।'*

মিত্র সেনাপতিমণ্ডলীর পরিকল্পনাটি ছিল এরূপ: জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে বিধ্বস্ত করা এবং ৫-৬ মাস বাদে পিজা ও রিমিনি লাইনে পৌছা। নিকটতম উদ্দেশ্য — ১৯৪৪ সালের জানুয়ারিতে রোম অধিকার করা। ইঙ্গো-মার্কিন সেনাপতিমণ্ডলী এই উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন দু'টি সমকালীন আঘাত হেনে: ফ্রন্ট দিক থেকে -- সৈন্যদের প্রধান গ্রুপিংটি দিয়ে এবং পশ্চাদ্ভাগ থেকে — আনসিও অঞ্চলে (রোমের ৩০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে ও ফ্রন্ট লাইন থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে) নৌ-সৈন্যদের অবতরণ ঘটিয়ে।

আনসিওর কাছে সৈন্যাবতরণ ও ব্রিজ-হেড দখলের কাজটি সম্পন্ন করার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল ৫ম মার্কিন বাহিনীর ৬ষ্ঠ কোরের উপর, যা গঠিত হয়েছিল একটি ব্রিটিশ ও একটি মার্কিন ইনফেন্ট্রি ডিভিশন, একটি প্যারাশুট ও একটি ট্যাঙ্ক রেজিমেণ্ট নিয়ে, দু'টি 'কমাণ্ডোস' দল ও একটি 'রেঞ্জার্স' ব্যাটেলিয়ন নিয়ে। কোরটিতে ছিল সর্বমোট প্রায় ৫০ হাজার লোক। অবতরণ বাহিনীর কাজ ছিল — আক্রমণের পাদভূমি দখলের পর ১০ম জার্মান বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগ বরাবর আঘাত হানা এবং উত্তর দিকে তার পশ্চাদপসরণের পথ কেটে দেওয়া। সপ্তম দিনে অবতরণ ফৌজের মিলিত হওয়ার কথা ছিল ফ্রন্ট দিক থেকে সংগ্রামরত ৫ম মার্কিন বাহিনীর প্রধান শক্তিসমূহের সঙ্গে এবং পরে সম্মিলিত প্রয়াসে উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে আক্রমণাভিযান চালানোর ও রোম অধিকার করার পরিকল্পনা ছিল।

ল্যান্ডিং ফৌজের অবতরণ ঘটানোর কথা ছিল একই সঙ্গে তিনটি এলাকায়: আমেরিকান ইউনিটগুলোর — আনসিও শহরের পূর্ব দিকে, ব্রিটিশ ইউনিটগুলোর — পশ্চিম দিকে, আর মিশ্র ইঙ্গো-মার্কিন নৌ-ইনফেন্ট্রি গ্রুপটির — খোদ শহরের মধ্যে। সমুদ্র পথে সৈন্য প্রেরণের কাজ চলছিল ২৫০টি পরিবহণ পোতে। সমুদ্র থেকে সমর্থন জোগাচ্ছিল ১২৬টি যুদ্ধ-জাহাজ।

২১ জানুয়ারি রাত্রে আনসিও অঞ্চলে ইঙ্গো-মার্কিন ফৌজের অবতরণ আরম্ভ হয়। তাদের বিরুদ্ধে খাড়া ছিল দু'টি জার্মান ব্যাটেলিয়ন ও উপকূলীয় আর্টিলারির কয়েকটি ব্যাটারি। অবতরণের প্রথম দিনে মিত্র বিমান বাহিনী ল্যান্ডিং ফৌজকে সরাসরি সহায়তা দানের জন্য ১২ শতাধিক বিমান-উড্ডয়ন সম্পন্ন করে। দু'দিন ধরে সৈন্যরা প্রায় নির্বিঘ্নে তীরে নামে, তবে তারা সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণে লিপ্ত হয় নি, অধিকৃত ব্রিজ-হেডটি সুদৃঢ়করণে ব্যস্ত থাকে। জানুয়ারির শেষ দিকে ব্রিজ-হেডে সমাবেশিত হয় ১ লক্ষের মতো লোক। নামানো মিত্র ফৌজের ক্রিয়াকলাপের অনিশ্চয়তার সুযোগ নিয়ে জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী রোম অঞ্চল ও উত্তর ইতালি থেকে ব্রিজ-হেডটির দিকে নিজের মজুদ ফৌজগুলোকে আনতে থাকে এবং ওটার বিরুদ্ধে অখণ্ড এক ফ্রন্ট গড়ে তোলে। কিন্তু ব্রিজ-হেডটির বিলোপ সাধনের জন্য নাৎসিদের পৌনঃপুনিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, যদিও ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে তিনটি ডিভিশনের শক্তির দ্বারা প্রতিঘাত হেনে তারা লক্ষ্য স্থলের নিকটেই পৌঁছে গিয়েছিল। ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনীগুলো ব্রিজ-হেডে টিকে থাকতে পেরেছিল কেবল অন্তরিক্ষে তাদের নিরঙ্কুশ আধিপত্যের কল্যাণে। এর পর আনসিও অঞ্চলে ১৯৪৪ সালের মে মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত অবস্থা সুস্থির থাকে।

কাসিনো অঞ্চলে জার্মানদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করার ও আনসিওতে অবতরণ ফৌজের সঙ্গে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৪৪ সালের জানুয়ারি মাসে মিত্রদের ৫ম ও ৮ম বাহিনীগুলোর প্রধান শক্তিসমূহ আক্রমণাভিযানের যে প্রচেষ্টা চালায় তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ফেব্রুয়ারি আর মার্চেও তাদের প্রয়াস নিষ্ফল হয়।

কিন্তু মিত্রদের ক্রিয়াকলাপে দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও আনসিওতে নামানো নৌ-সৈন্যরা নিজেদের ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। এ ছিল শত্রুর গভীর পশ্চাদ্ভাগে বৃহৎ একটি ল্যান্ডিং অপারেশন। অবতরণ বাহিনীটি রোম অভিমুখে প্রথম ও দ্বিতীয় আক্রমণাভিযানের সময় ৫টি এবং তৃতীয়

আক্রমণাভিযানের সময় ৯টি জার্মান ডিভিশনকে নিজের সঙ্গে লড়াইয়ে ব্যস্ত রাখে। কিন্তু ৫ম মার্কিন বাহিনীর সৈন্যরা তিন বারের কোন বারই জার্মানদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করতে ও অবতরণ বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হতে পারে নি।

এই ভাবে, মিত্রদের যথেষ্ট শ্রেষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে তাদের রোম অধিকার করার প্রচেষ্টা সফল হল না। কেবল ৪ জুন তারিখে ইঙ্গো-মার্কিন ফৌজগুলো ইতালীয় পার্টিজানদের দ্বারা মুক্ত রোম নগরীতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল।

আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে মিত্র বাহিনীগুলো গটা প্রতিরক্ষা লাইনে পেঁাছে যায়। ওখানে তারা জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। কেবল ১৯৪৪ সালের শেষ দিকে ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনীগুলো শত্রুর এই প্রতিরক্ষা লাইনটি অতিক্রম করতে এবং ৪০-১০০ কিলোমিটার গভীরে ঢুকে রাভেন্না ও পিয়েত্রাসান্তা লাইনে পেঁাছতে সক্ষম হয়। এই যুদ্ধ-সীমায় মিত্রদের আক্রমণাভিযান সমগ্র পরবর্তী শীত কালের জন্য বন্ধ থাকে।

১৯৪৪ সালের বসন্তে ইতালিতে প্রতিরোধ আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। পার্টিজানরা জার্মান-ফ্যাসিস্ট হানাদারদের প্রচুর ক্ষতি সাধন করে মিত্র বাহিনীগুলোর আক্রমণাভিযানে সক্রিয় সহায়তা জোগাচ্ছিল। তারা পুল ধ্বংস করত, রাস্তায় ওৎ পেতে বসে থেকে হঠাৎ জার্মানদের আক্রমণ করত, মোটর গাড়ির সারিগুলোর উপর হামলা করত, মাল ও সৈন্যবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত করে দিত, শত্রুর শিবিরে আতঙ্ক সৃষ্টি করত।

১৯৪৪ সালের জুন থেকে ১৯৪৫ সালের মার্চ পর্যন্ত কাল পর্যায়ের মধ্যে পার্টিজানরা ৬,৪৪৯টি সশস্ত্র হামলা পরিচালনা ও ৫,৫৭০টি অন্তর্ঘাতমূলক কাজ সম্পন্ন করে, কমপক্ষে ১৬ হাজার ফ্যাসিস্টকে ধ্বংস করে এবং শত্রুর বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র কবজা করে।*

নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলী বৃহৎ সৈন্যদল নিয়োগ করে পার্টিজানদের বিরুদ্ধে শাস্তিদায়ক অভিযান চালায়। যেমন, ১৯৪৪-১৯৪৫ সালের শীত কালে শাস্তিদানমূলক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনার কাজে তারা ১৫টির মতো

* বাত্তালিয়া র.। ইতালীয় প্রতিরোধ আন্দোলনের ইতিহাস (১৯৪৩-এর ৮ সেপ্টেম্বর — ১৯৪৫-এর ২৫ এপ্রিল)। ইতালিয়ান থেকে অনুবাদ।— মস্কো, ১৯৫৪, পৃঃ ৫৭১।

ডিভিশনকে (এর মধ্যে ১০টিই ছিল জার্মান) নিযুক্ত করে। ১৯৪৪ সালের শেষ দিকে দখলদারদের সঙ্গে সংগ্রামে পার্টিজানরা শোচনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা সক্রিয় সংগ্রাম অব্যাহত রাখে।

মিত্র বাহিনীগুলো — আর ওগুলোতে ছিল ইংরেজ, আমেরিকান, আলজিরিয়ান, ব্রাজিলিয়ান, গ্রীক, ভারতীয়, ইতালিয়ান, কানাডিয়ান, পোলিশ, ফরাসি ও অন্যান্য দেশের সৈন্যরা — সামরিক ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে ১৫টি জার্মান-ফ্যাসিস্ট ডিভিশনকে (তার মধ্যে ১টি ট্যাঙ্ক ডিভিশন আর ১টি মোটোরাইজড ডিভিশনও ছিল) বিধ্বস্ত করে দেয়। ১৯৪৪ সালের জুন থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ভের্মাখ্‌টের সর্বমোট ১৯ হাজার সৈন্য নিহত হয়, ৬৫ হাজার আহত হয় এবং আরও ৬৫ হাজার নিখোঁজ হয়ে যায়।* জার্মানরা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিমান বাহিনীর বোমাবর্ষণের মধ্যে পড়ে। মিত্রদের ক্ষয়ক্ষতির চিত্রটি ছিল এরূপ: প্রায় ৩২ হাজার লোক নিহত হয়, ১ লক্ষ ৩৪ সহস্রাধিক হয় আহত এবং প্রায় ২৩ হাজার নিখোঁজ হয়ে যায়।**

১৯৪৪ সালের শেষ দিকে মিত্র বাহিনীগুলো মধ্য ইতালি দখল করে ফেলে। রোম ও ফ্লোরেন্স অঞ্চলে সামরিক বিমান ঘাঁটিগুলো অধিকার করে এবং ওখানে বিমান বাহিনীর বৃহৎ শক্তি মোতায়েন করে ইঙ্গো-মার্কিন সেনাপতিমণ্ডলী দক্ষিণ দিক থেকে জার্মানির উপর বায়ুসেনার দ্বারা প্রবল আঘাত হানার ভালো সুযোগ লাভ করলেন।

কিন্তু মিত্ররা ১৯৪৪ সালে ইতালি অভিযানের উদ্দেশ্যটি পুরোপুরিভাবে সিদ্ধ করতে পারে নি। তারা গটা লাইন অতিক্রম করেছিল বটে, কিন্তু পো নদীর উপত্যকায় পেঁছিতে পারে নি। পশ্চাদপসরণরত শত্রুকে অনুসরণ করা হয় ধীরে ধীরে, তাছাড়া মিত্ররা জার্মান ফৌজের পিছু-হটার পথগুলো কেটে দেওয়ার সুযোগ কাজে লাগায় নি। এর ফলে নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলী প্রায় নির্বিঘ্নে আগে-থেকে-প্রস্তুত প্রতিরক্ষা লাইনে সৈন্যদের সরিয়ে নিয়ে যায়।

ইতালিতে মিত্রদের অপারেশনসমূহের অসম্পন্নতার পেছনে প্রধান কারণটি ছিল তাদের সেনাপতিমণ্ডলীর ক্রিয়াকলাপের অনিশ্চয়তা। প্রাক্তন নাৎসি জেনারেল জ. ওয়েস্টফাল এ প্রসঙ্গে লিখেছিল: '...অপারেশনেল সমস্যাবলি সমাধানে পশ্চিমী মিত্ররা যদি অধিক সাহসিকতার পরিচয় দিত,

* Naus. T. 78, R. 414, f. 383 234-383 236, 383 246-383 247.
** From Salerno to the Alps. p. 452.

তাহলে তারা আপেনিনজ উপদ্বীপে বিজয় গৌরবে এবং নিজের ও অন্যের জন্য অনেক কম ক্ষয়ক্ষতি ঘটিয়ে অনেক আগেই যুদ্ধাভিযান সম্পন্ন করতে পারত।'*

৬। প্রশান্ত মহাসাগরে এবং এশিয়ায় মিত্রদের আক্রমণাভিযান

১৯৪৩ সালের গ্রীষ্ম ও হেমন্ত কালে জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের বড় বড় গ্রুপিং বিধ্বস্ত হওয়ার ফলে প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রদের সামরিক ক্রিয়াকলাপের জন্য অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে উঠল। ১৯৪৪ সালের গোড়ার দিকে অ্যালিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জকে, হাওয়াই, গিলবার্ট ও এলিস দ্বীপপুঞ্জকে ভিত্তি করে তারা সলোমন দ্বীপপুঞ্জে ও নিউ গিনির পূর্বাংশে সামরিক ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যায়। প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গনের অঞ্চলে তাদের সশস্ত্র বাহিনীগুলোতে ছিল ১৩টি ইনফেণ্ট্রি ডিভিশন ও ৩টি নৌ-সৈনিক ডিভিশন, স্থলসেনার ৩২টি বিমান গ্রুপ ও নৌ-বহরের বিপুল শক্তি — ১৩টি রণপোত, ২৮টি বিমানবাহী জাহাজ, ৩২টি ক্রুজার, ১২৩টি ডুবো-জাহাজ, ১৮৮টি ডেস্ট্রয়ার, ৫৭টি এসকোর্ট টর্পেডো জাহাজ এবং বিভিন্ন ধরনের আরও অনেকগুলো জাহাজ। স্থলসেনা ও নৌ-সেনার ফর্ম্যাশনগুলোর কাছে ছিল ৬,৬৭৬টি বিমান। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সর্বমোট ১৬ লক্ষাধিক সৈনিক আর অফিসার ছিল। মিত্র সেনাপতিমণ্ডলীর অধীনে ছিল কয়েক লক্ষ লোকের ভারতীয়, অস্ট্রেলীয় ও নিউজিল্যান্ডীয় ফৌজগুলো।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গনের অঞ্চলে মিত্র সশস্ত্র বাহিনীগুলো দু'টি অপারেশনেল-স্ট্র্যাটেজিক গ্রুপিংয়ে বিভক্ত ছিল। প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্য ভাগে অবস্থিত গ্রুপিংটির অধিনায়ক ছিলেন অ্যাডমিরাল চ. নিমিট্স, আর প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে অবস্থিত গ্রুপিংটির অধিনায়র ছিলেন জেনারেল ড. ম্যাকার্থার।

মিত্রদের বিরুদ্ধে লড়ছিল ৮ম, ২য় ও ৭ম জাপানী ফ্রন্টগুলো (প্রায় ৬ লক্ষ লোক) ও জাপানের নৌ-সেনা, যাদের কাছে ছিল ৯টি রণপোত, ১৩টি বিমানবাহী জাহাজ, ৩১টি ক্রুজার, ৭৮টি ডেস্ট্রয়ার, ৭২টি সাবমেরিন ও ৩ সহস্রাধিক বিমান। এই ভাবে, শত্রুর উপর মিত্রদের যথেষ্ট শ্রেষ্ঠতা ছিল।

* বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৩৯-১৯৪৫ সাল। প্রবন্ধ-সংকলন। — মস্কো: বিদেশী সাহিত্য প্রকাশালয়, ১৯৫৭, পৃঃ ১২১।

১৯৪৪ সালের জন্য মিত্রদের ক্রিয়াকলাপের পরিকল্পনাটি ছিল এরূপ। আগেরই মতো জাপানের প্রধান কেন্দ্রগুলোর দিকে 'ধীরে অগ্রসরের' রণনীতি অনুসরণ করে এবং জাপানীদের দ্বীপসমূহ থেকে হটিয়ে দেওয়ার কাজে লিপ্ত থেকে তারা দু'টি দিকে আক্রমণাভিযান আরম্ভ করার কথা ভাবছিল। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্য ভাগে সামরিক ক্রিয়াকলাপ চালানো হবে ফিলিপাইন অথবা ফরমোসা (তাইওয়ান) অভিমুখে, এবং এর আশু কর্তব্য ছিল — মার্শাল, ক্যারোলিন ও ম্যারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করা, সবচেয়ে অদীর্ঘ পথে জাপানে গিয়ে পৌঁছা এবং ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে তার যুক্তকারী গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ পথগুলোতে গিয়ে পৌঁছা। পরিকল্পনা মতে, প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে আক্রমণাভিযান চালানোর কথা ছিল নিউ গিনির উত্তর উপকূল দিয়ে ফিলিপাইন অভিমুখে, এবং এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল বিসমার্ক দ্বীপপুঞ্জ ও নিউ গিনি দ্বীপ থেকে জাপানীদের তাড়ানো।

জাপানী সেনাপতিমণ্ডলীর পরিকল্পনাটি ছিল এই যে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যাংশের দ্বীপপুঞ্জসমূহ ও ফিলিপাইনের প্রতিরক্ষা কার্য অব্যাহত রেখে অসংখ্য দ্বীপের জন্য আমেরিকানদের সুদীর্ঘ এক সংগ্রাম লিপ্ত করা, ওদের বিপুল ক্ষতি সাধন করা এবং জাপান অভিমুখে ওদের পরবর্তী অগ্রগতি রোধ করা।

৩০ জানুয়ারি তারিখে মিত্ররা মার্শাল দ্বীপপুঞ্জে ল্যাণ্ডিং অপারেশন আরম্ভ করে। মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ ছিল প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যাংশে জাপানী নৌ-বহরের একটি বৃহত্তম অগ্রণী ঘাঁটি এবং ওগুলোর বৃহৎ রণনৈতিক তাৎপর্য ছিল। ওখান থেকে জাপানী নৌ-বহর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউ জিল্যাণ্ডের মধ্যে মিত্রদের যোগাযোগ পথগুলোর উপর হামলা চালাত।

মার্শাল দ্বীপপুঞ্জে জাপানী গ্যারিসনে মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল ২৮ হাজার লোক। আর মার্কিন ফৌজের ল্যাণ্ডিং গ্রুপিংটিতে ছিল ৬৩ হাজার লোক! অস্ত্রশস্ত্রে ও অন্যান্য সামরিক সাজসরঞ্জামে মিত্রদের শ্রেষ্ঠতা ছিল আরও বেশি।

আমেরিকানরা প্রধান আঘাত হানছিল কোয়াজিলেইন ও রয় দ্বীপগুলোতে অবস্থিত জাপানী নৌ ও বিমান ঘাঁটির উপর। ল্যাণ্ডিং ফৌজ নামানোর আগে ২৮ ঘটা ধরে চলে প্রাগাক্রমণ গোলা ও বোমাবর্ষণ, যাতে অংশগ্রহণ করেছিল ২৮টি রণপোত আর ক্রুজার এবং ১২টি বিমানবাহী জাহাজে অবস্থিত ৭০০টি বিমান।

১৯৪৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারি তারিখে মার্শাল দ্বীপপুঞ্জে নৌ-সেনা নামানোর কাজ শুরু হয়ে যায়। ৬৩ সহস্র সৈন্যের গ্রুপিংটির কোয়াজিলেইন দ্বীপ অধিকার করতে লেগেছিল ৪ দিন। ২৩ ফেব্রুয়ারি নাগাদ মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের প্রধান দ্বীপগুলো অধিকৃত হয়ে যায়।

মার্শাল দ্বীপপুঞ্জে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করে মিত্র সেনাপতিমণ্ডলী ম্যারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত সাইপান দ্বীপে সৈন্যাবতরণের কাজে হাত দেন। এই দ্বীপটির ছিল বৃহৎ স্ট্র্যাটেজিক তাৎপর্য, কেননা এটা অধিকার করে 'উড়ন্ত দুর্গ' নামক বোমারুগুলো জাপানের মূল ভূখণ্ডের জাপানী সামরিক ঘাঁটিগুলো এবং শিল্প কেন্দ্রসমূহের উপর বোমাবর্ষণ করার সুযোগ পাচ্ছিল।* তাছাড়া সাইপান দ্বীপ দখলের ফলে মার্কিন সেনাপতিমণ্ডলী ইন্দোনেশিয়ায় ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে জাপানী অবস্থানগুলোর উপর পার্শ্ব থেকে আঘাত হানার সুযোগ পাচ্ছিলেন। সেই জন্যই ১০ হাজার সৈন্যের গ্যারিসন রক্ষিত দ্বীপটির জন্য লড়াই কঠোর চরিত্র ধারণ করে এবং তা চলে প্রায় মাস ধরে — ১৯৪৪ সালের ৯ জুলাই পর্যন্ত।

সাইপান দ্বীপে সৈন্যাবতরণের সময় মার্কিন বিমান বাহিনী সেই প্রথম বার নাপাল্‌ম-যুক্ত বিমান-বোমা ব্যবহার করেছিল। সামরিক ক্রিয়াকলাপের চতুর্থ দিনে, ১৮ জুলাই তারিখে জাপানী বিমান বাহিনী মার্কিন নৌ-শক্তির উপর আঘাত হানে এবং ১টি রণপোত, ৫টি বিমানবাহী জাহাজ ও ১০০টি বিমান বিনষ্ট করে দেয়। জাপানী বিমান বাহিনী হারায় ৩০০টি প্লেন।

২১ জুলাই তারিখে আমেরিকানরা ম্যারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত গুয়াম দ্বীপে সৈন্য নামায় এবং ১০ আগস্টের দিকে দ্বীপটি করায়ত্ত করে ফেলে। অধিকৃত ম্যারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জে মিত্ররা নিজেদের বিমান ও নৌ ঘাঁটি গড়ে এবং জাপানের নিকটবর্তী ভলক্যানো ও বনিন দ্বীপগুলোতে এবং ফিলিপাইনে অবস্থিত জাপানী ঘাঁটিসমূহের উপর বোমাবর্ষণ করতে শুরু করে।

প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে মিত্ররা অ্যাডমিরেলটি দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে নেয়, আর এপ্রিলে নিউ গিনি দ্বীপে আক্রমণাভিযান আরম্ভ করে। নিউ গিনি দ্বীপের পশ্চিম

* সাইপান দ্বীপ থেকে টোকিও পর্যন্ত দূরত্ব প্রায় ২,৫০০ কিলোমিটার অথবা ভারী বোমারুর জন্য সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার পথ।

উপকূলে তাদের সৈন্যদের অবতরণ ঘটার এবং ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে মরোতাই দ্বীপটি দখল করার ফলে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ হস্তগতকরণের অপারেশনটি পরিচালনার পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে ওঠে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ছিল সেই অন্তিম বাধা, যা এশিয়া মহাদেশের মূল ভূখণ্ডের প্রবেশ পথগুলো এবং দক্ষিণ সমুদ্রসমূহের সঙ্গে জাপানের যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলো রক্ষা করছিল। ফিলিপাইন দখলের জন্য প্রেরিত হয়েছিল ১৪টি ডিভিশন (২ লক্ষ লোক) নিয়ে গঠিত ৬ষ্ঠ মার্কিন বাহিনীটি, ৩য় ও ৭ম নৌ-বহর — ৮৮৫টি জাহাজ। ২০ অক্টোবর মিত্ররা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অন্যতম প্রধান দ্বীপ — লেইটে দ্বীপে সৈন্যাবতরণ শুরু করে।

২৩-২৪ অক্টোবর লেইটে দ্বীপের নিকটে সংঘটিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার তৃতীয় বৃহত্তম নৌ-যুদ্ধ (প্রথম দু'টি সংঘটিত হয়েছিল ১৯৪২ সালের মে ও নভেম্বর মাসে প্রবাল সাগরে)। শক্তির অনুপাত ছিল আমেরিকানদের অনুকূলে। ফিলিপাইনের মধ্যাঞ্চলে তাদের কাছে ছিল ৩০টি বিমানবাহী জাহাজ, ১২টি রণপোত, ২০টি ক্রুজার ও ১০৪টি ডেস্ট্রয়ার আর টর্পেডো জাহাজ, আর জাপানীদের কাছে ছিল ৬টি বিমানবাহী জাহাজ, ৭টি রণপোত, ১৯টি ক্রুজার ও ৩৩টি ডেস্ট্রয়ার।

এই লড়াইয়ে জাপানী সেনাপতিমণ্ডলী দেখতে পেল যে বিমানবাহী জাহাজের ক্ষেত্রে তাদের নৌ-বহর আমেরিকানদের থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। সেই জন্য তারা রণপোত ও ক্রুজারগুলার গোলাবর্ষণ ক্ষমতার সর্বাধিক ব্যবহার ঘটানোর সিদ্ধান্ত নিল। আর আমেরিকান সেনাপতিমণ্ডলী বিমানবাহী জাহাজে আপন শ্রেষ্ঠতার কথা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেন যে তাঁরা বিমানবাহী জাহাজের প্লেনগুলো দিয়ে জাপানী যুদ্ধ-জাহাজগুলোর উপর ব্যাপক আঘাত হানবেন ওগুলোর নিকটস্থ হওয়ার অনেক আগেই। এ ছাড়া, র‍্যাডার সিস্টেমে শ্রেষ্ঠতা থাকায় মিত্ররা তাদের অনুসন্ধান ক্রিয়াকলাপ সুসংগঠিত করতে এবং নৈশ পরিস্থিতিতে অধিকতর ফলপ্রসূতার সঙ্গে লড়াই চালাতে সক্ষম ছিল। অন্য দিকে, জাপানীরা রাত্রিবেলা আমেরিকান যুদ্ধ-জাহাজ আবিষ্কার করার জন্য সার্চ-লাইট ব্যবহার করত এবং তদ্দ্বারা নিজেদের জাহাজগুলোর অবস্থান ফাঁশ করে দিত।

বিদ্যমান শ্রেষ্ঠতা কাজে লাগিয়ে মার্কিন নৌ-বহর জাপানীদের বিধ্বস্ত করে দেয়। তিন দিনে তারা হারায় ৪টি বিমানবাহী জাহাজ, ৩টি রণপোত. ১০টি ক্রুজার, ১১টি ডেস্ট্রয়ার। ২২ ডিসেম্বর লেইটে দ্বীপের জাপানী গ্যারিসন আত্মসমর্পণ করে।

১৯৪৪ সালের শেষ দিকে আমেরিকনরা ফিলিপাইনের বড় একটি অংশ অধিকার করে ফেলে, তবে জাপানীদের কবল থেকে তারা ওই দেশটিকে পুরোপুরিভাবে মুক্ত করতে পেরেছিল কেবল ১৯৪৫ সালের বসন্তের দিকে। ফিলিপাইনের জন্য সামরিক ক্রিয়াকলাপ চলে দীর্ঘকাল ধরে, এবং তার কারণটি হচ্ছে এই যে আমেরিকানরা ছোট ছোট জাপানী গ্যারিসনগুলোর সঙ্গে সংগ্রামে যতটা ব্যস্ত ছিল তার চেয়ে বেশি ব্যস্ত ছিল ফিলিপাইনের পার্টিজান দলগুলো ধ্বংসকরণের কাজে। ক্রমবর্ধমান জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন দমন করাই ছিল এর উদ্দেশ্য।

১৯৪৪ সালের শেষ দিকে মিত্র বাহিনীগুলো প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম ও মধ্য অংশের দ্বীপগুলো থেকে দুর্বল জাপানী গ্যারিসনসমূহকে বিতাড়িত করে দিয়ে জাপানের কাছে — ২,০০০-২,৫০০ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে — পৌঁছে যায়।

এশীয় মহাদেশের মাটিতে ১৯৪৪ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত জাপানীদের সঙ্গে লড়াইয়ে কুওমিনটাঙ ১০ লক্ষ সৈন্য এবং ও কোটি লোক অধ্যুষিত একটি ভূখন্ড হারায়। কিন্তু জাপানীরা সে সমস্তকিছু সত্ত্বেও মধ্য ও দক্ষিণ চীন দখলের পরিকল্পনাগুলো পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়িত করতে পারে নি। এর কারণ — ব্যাপক পার্টিজান আন্দোলন ও গণমুক্তি বাহিনীসমূহের সক্রিয় ক্রিয়াকলাপ। বর্মায় মিত্র ফৌজগুলো ওই দেশীয় পার্টিজানদের সঙ্গে সহযোগিতায় উত্তর বর্মাকে জাপানীদের কবল থেকে মুক্ত করে।

ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনীর অপারেশনগুলোর বড় বৈশিষ্ট্যটি ছিল জন বলে, জলে ও অন্তরিক্ষে শত্রুর উপর তাদের শ্রেষ্ঠতা। এর আসল কারণটি হল এই যে জাপানের প্রধান শক্তিসমূহ কেন্দ্রীভূত ছিল মাঞ্চুরিয়ায় এবং চীনের উত্তরাঞ্চলগুলোতে।

মিত্ররা আক্রমণাভিযান চালায় স্থলসেনা, বায়ুসেনা ও নৌ-সেনার বৃহৎ শক্তি দিয়ে এবং তা করতে গিয়ে তারা সর্বদা ল্যান্ডিং অপারেশনের 'লম্ফ' পদ্ধতি — অর্থাৎ এক দ্বীপপুঞ্জ থেকে অন্য দ্বীপপুঞ্জে অবতরণের পদ্ধতিটি অনুসরণ করে।

মার্কিন সেনাপতিমন্ডলী কর্তৃক ল্যান্ডিং অপারেশনগুলো পরিচালিত হয় নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে। প্রথমে — অন্তরীক্ষে আধিপত্য লাভের উদ্দেশ্যে দখলের জন্য নির্ধারিত দ্বীপের উপর ও সর্বাগ্রে তাতে অবস্থিত বিমান

ঘাঁটিগ্নলোর উপর এবং প্রতিবেশী দ্বীপসমূহের বিমান ঘাঁটিগ্নলোর উপরও সন্দীর্ঘ বোমাবর্ষণ।

অন্তরিক্ষে আধিপত্য লাভের পর সমস্ত শ্রেণীর যুদ্ধ-জাহাজ নিয়ে গঠিত মিত্র নৌ-বাহিনী উপকূলের নিকটে গিয়ে সৈন্য নামাত। অবতরণ ফৌজের প্রথম এশিলনটি সাধারণত গঠিত হত নৌ-সৈন্যদের ইউনিটগ্নলো নিয়ে এবং তা উপকূলে অবতরণ করত জাহাজস্থ আর্টিলারি আর বিমান বাহিনীর সমর্থন পেয়ে। প্রথম ল্যান্ডিং গ্রুপটি ব্যবহার করত অ্যাম্ফিবিয়ান ট্যাংক ও অ্যাম্ফিবিয়ান আর্মার্ড পার্সোনেল কেরিয়ার। প্রথম এশিলনের কাজ ছিল—ট্যাকটিকেল ব্রিজ-হেড দখল করা ও তাতে অবস্থান সন্দৃঢ় করা। কেবল এর পরই নৌ-সেনার পরবর্তী এশিলনগ্নলোর অবতরণ শন্রন হত।

নৌ-সেনা অবতরণের সময় নৌ-বহরের রণবিন্যাস হত সাধারণত এরূপ:

— ল্যান্ডিং গ্রুপ, যাতে অন্তর্ভুক্ত ছিল ফৌজ সমেত ট্রুপ-কেরিয়ার, বিশেষ ধরনের ল্যান্ডিং শিপ ও ভেহিকেল ল্যান্ডিং ক্রাফ্ট — অ্যাম্ফিবিয়ান আর্মার্ড পার্সোনেল কেরিয়ার ও অ্যাম্ফিবিয়ান ট্যাংক সমেত ট্যাংকবাহী জাহাজগ্নলো,

— ফায়ার সাপোর্ট গ্রুপ — রণপোত, ক্রুজার, ডেস্ট্রয়ার;

— এয়ার সাপোর্ট গ্রুপ — বিমানবাহী জাহাজ ও ওগ্নলো রক্ষাকারী ডেস্ট্রয়ার;

— মাইন সনুইপিং গ্রুপ — উপকূলবর্তী জলভাগ মাইনমনুক্ত করার জন্য মাইন-সনুইপার।

রণকৌশলের ক্ষেত্রে প্রথম ল্যান্ডিং গ্রুপের অবতরণ সংগঠনের কাজটি বিশেষ লক্ষণীয়। সাধারণত অবতরণের প্রাক্কালে রাত্রিবেলা ট্রুপ কেরিয়ারগ্নলো সৈন্য ও অবতরণ সামগ্রী সমেত নৌ-বহরের সমর্থন পেয়ে উপকূল থেকে ১৫-২০ কিলোমিটার দূরে এসে পেঁছিত ও জলের মধ্যে ল্যান্ডিং ক্রাফ্ট ছাড়ত, এবং ওগ্নলো প্রথম ল্যান্ডিং গ্রুপের সৈন্যদের নিয়ে তীর থেকে ৪-৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সমাবেশ স্থলের দিকে যাত্রা করত। ওখানে প্রথম ল্যান্ডিং গ্রুপের ব্যাটেলিয়নগ্নলোকে তোলা হত ট্যাংকবাহী জাহাজে আনীত অ্যাম্ফিবিয়ান আর্মার্ড পার্সোনেল কেরিয়ারগ্নলোতে। ভোরের অন্ধকারের মধ্যে কণ্ট্রোল বোটগ্নলো থেকে প্রদত্ত সংকেত অনন্সারে অ্যাম্ফিবিয়ান আর্মার্ড পার্সোনেল কেরিয়ার ও অ্যাম্ফিবিয়ান ট্যাংকগ্নলো বিমান বাহিনী আর জাহাজস্থ আর্টিলারির

সমর্থন পেয়ে অবতরণ স্থলের দিকে যাত্রা শুরু করত। প্রথম ল্যান্ডিং গ্রুপের পর-পরই নামত নৌ-সেনার প্রথম এশিলনের সাব-ইউনিটগুলো। এরূপ অবতরণ পদ্ধতির সার্থকতা প্রমাণিত হয়েছিল।

এখানে এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রশান্ত মহাসাগরে সামরিক ক্রিয়াকলাপ চলাকালে বিমানবাহী জাহাজগুলো ব্যবহারের পদ্ধতিতে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে। যুদ্ধের প্রথম বছরগুলোতে বিমানবাহী জাহাজগুলো শত্রু থেকে সাধারণত বেশ দূরে থাকত এবং ওগুলোর বিমান কেবল সময় সময় শত্রুর যুদ্ধ-জাহাজগুলোর উপর হামলা চালাত। ১৯৪৪ সাল থেকে বিমানবাহী জাহাজ ব্যবহৃত হতে থাকে সৈন্যাবতরণের সময় সরাসরি সমর্থন জোগানোর উদ্দেশ্যে এবং অন্তরিক্ষ থেকে নৌ-বাহিনীকে রক্ষা করার জন্য।

৭। প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রবলতা বৃদ্ধি

সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর বিজয়ের প্রভাবে এবং মিত্র বাহিনীসমূহের সামরিক ক্রিয়াকলাপের সক্রিয়তা বৃদ্ধির ফলে ১৯৪৪ সালে ইউরোপে ও এশিয়ায় প্রতিরোধ আন্দোলন সবচেয়ে ব্যাপক আকার ধারণ করে। যেমন, ১৯৪৪ সালের বসন্ত কালে যুগোস্লাভিয়া, গ্রীস ও আলবানিয়ার গণমুক্তি বাহিনীগুলোতে ছিল সাড়ে চার লক্ষের মতো লোক এবং ওই বাহিনীগুলো তাদের সক্রিয় ক্রিয়াকলাপের দ্বারা শত্রুর ১৯টি ডিভিশনকে অচল করে রাখে। ফ্রান্সে প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রায় ৫ লক্ষ অংশগ্রহণকারী ৭-৮টি নাৎসি ডিভিশনকে নিজেদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত রাখে। পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া ও জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনী অধিকৃত অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে পার্টিজান আন্দোলনের ব্যাপকতা বেড়ে যায়। ইউরোপের দেশসমূহে অস্ত্র হাতে সংগ্রাম করছিল সর্বমোট প্রায় ২০ লক্ষ স্বদেশপ্রেমিক।

মুক্তি আন্দোলনের পক্ষে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যাপারটি ছিল এই যে সামরিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত হচ্ছিল অধিকতর বৃহৎ দল ও ফর্ম্যাশনের দ্বারা। অনেকগুলো দেশে স্থায়ী সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে প্রতিরোধ আন্দোলনের অংশগ্রহণকারীদের সংগ্রামী সহমিতালি অধিকতর নিবিড় ও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। সংগ্রাম চলাকালে সর্বত্র গড়ে উঠছিল ও বিকাশ লাভ করছিল গণ-ক্ষমতার গুপ্ত সংস্থাদি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমানার বাইরে সোভিয়েত সৈন্যদের সফল

আক্রমণাভিযানের পরিস্থিতিতে অনেকগুলো দেশে ফ্যাসিস্টবিরোধী সংগ্রাম উত্তুঙ্গ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে, — তা পরিণত হয় সর্বজনীন সশস্ত্র অভ্যুত্থানে। যেমন, রুমানিয়ায় ১৯৪৪ সালের ২৩ আগস্ট তারিখের জাতীয় সশস্ত্র অভ্যুত্থান, বুলগেরিয়ায় ১৯৪৪ সালের সশস্ত্র সেপ্টেম্বর অভ্যুত্থান, ১৯৪৪ সালের হেমন্ত কালে স্লোভাক জাতীয় অভ্যুত্থান।

প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রোৎসাহক, সংগঠক ও সবচেয়ে সক্রিয় শরিক ছিল কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলো, যারা অন্যান্য গণতান্ত্রিক পার্টি ও সংগঠনসমূহের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করছিল। মেহনতী মানুষের মৌলিক স্বার্থ রক্ষায়, সাম্রাজ্যবাদের ও তার সন্তান ফ্যাসিজমের ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র উদ্‌ঘাটনে এবং মুক্তি আন্দোলনের বিকাশ সাধনে তারা ছিল সবচেয়ে অটল ও অদম্য। কমিউনিস্টরা দৃঢ়তার সঙ্গে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে লড়ে যাচ্ছিল ফ্যাসিজম নির্মূল করার জন্য, তাদের দেশগুলোর সামাজিক জীবনের গণতন্ত্রীকরণের জন্য এবং নাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে সংগ্রামে ওগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য।

১৯৪৪ সালে ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম ও অন্যান্য দেশে প্রতিরোধ আন্দোলনের শক্তিসমূহ আরও বেশি সংহত হয়।

১৯৪৩ সালের মে মাসে ফ্রান্সে গঠিত জাতীয় প্রতিরোধ পরিষদ ১৯৪৪ সালের ১৫ মার্চ প্রতিরোধ আন্দোলনের একটি কর্মসূচি গ্রহণ করে যাতে নির্ধারিত হয়েছিল ফ্রান্সের মুক্তির জন্য সংগ্রামের জরুরী কর্তব্যসমূহ এবং নিরূপিত হয়েছিল তার মুক্তির পর দেশের অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক বিকাশের সম্ভাবনাসমূহ। ১৯৪৪ সালের বসন্ত কালে প্রতিরোধ আন্দোলনের সংগ্রামী সংগঠনসমূহ ঐক্যবদ্ধ হয়ে 'ফরাসি অভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহের' একটি অখণ্ড বাহিনী গড়ে তুলে, এবং তাতে মুখ্য ভূমিকা ছিল কমিউনিস্টদের। ফরাসি স্বদেশপ্রেমিকরা আপন শক্তি দিয়ে প্যারিস, লিয়োঁ, গ্রেনোবল ও অন্যান্য কয়েকটি বড় শহর সহ ফ্রান্সের ভূখণ্ডের বড় একটি অংশ মুক্ত করে ফেলে।

১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে ইতালিতে গঠিত হয় স্বদেশপ্রেমিকদের একটি সৈন্য বাহিনী — 'স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামী স্বেচ্ছাসেবক কোর', যাতে ছিল লক্ষাধিক লোক। ইতালীয় স্বদেশপ্রেমিকরা দখলদারদের কবল থেকে মুক্ত করে উত্তর ইতালির বিস্তীর্ণ অঞ্চল। শহরে ও গ্রামে দেখা দেয় স্বদেশপ্রেমিক ক্রিয়াকলাপের গ্রুপগুলো। ১৯৪৪-১৯৪৫ সালের শীত কালে উত্তর ইতালির অনেকগুলো শিল্প কেন্দ্রে ব্যাপক ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়,

আর ১৯৪৫ সালের এপ্রিলে শুরু হয় দেশজোড়া হরতাল যা পরিণত হয় সর্বজনীন অভ্যুত্থানে। এই অভ্যুত্থানের ফলে ইঙ্গো-মার্কিন ফৌজের আগমনের আগেই জার্মান-ফ্যাসিস্ট হানাদারদের কবল থেকে মুক্ত হয় উত্তর ও মধ্য ইতালি।

১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মের দিকে বেলজিয়ামে সামরিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত ছিল ৫০ হাজারের মতো পার্টিজান। তাদের সশস্ত্র সংগ্রাম সমাপ্ত হয় জাতীয় অভ্যুত্থানে, যা সেপ্টেম্বর মাসে ছড়িয়ে পড়েছিল সারা দেশে।

গ্রীসে মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনা করে ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর গঠিত জাতীয়-মুক্তি ফ্রন্ট, যার কোষ কেন্দ্র ছিল শ্রমিক আর কৃষকরা। ১৯৪১ সালের গোড়াতে গড়ে-ওঠা পার্টিজান দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হয় জাতীয়-মুক্তি বাহিনীতে, যা আপন মাতৃভূমির মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করে যাচ্ছিল। জাতীয়-মুক্তি ফ্রন্টে এবং জাতীয়-মুক্তি বাহিনীতে নেতৃভূমিকা ছিল গ্রীক কমিউনিস্ট পার্টির।

বলকানে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর দ্রুত অগ্রগতি উদ্ভূত অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে গ্রীক স্বদেশপ্রেমিকরা ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসের শেষ দিকে জার্মান-ফ্যাসিস্ট দখলদারদের কবল থেকে মহাদেশীয় গ্রীসের সমগ্র ভূখন্ড মুক্ত করতে সক্ষম হয় এবং তদ্দ্বারা ফ্যাসিজম বিধ্বস্তকরণের অভিন্ন সংগ্রামে যোগ্য অবদান রাখে।

অন্যান্য দেশেও 'অভ্যন্তরীণ ফ্রন্ট' ছিল। প্রতিরোধ আন্দোলন বিপুল আকার ধারণ করে এশিয়ায়ও। যেমন, ১৯৪৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে ৮ম ও নতুন ৪র্থ চীনা বাহিনীগুলো চীনে জাপানী ও কুওমিনটাঙ ফৌজগুলোর বৃহৎ শক্তিকে অচল করে রাখে। ১৯৪৪ সালে ভিয়েতনামে গঠিত হয় জাপানবিরোধী গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, যা একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি প্রকাশ করে। কর্মসূচিতে বলা হয় যে সমরবাদী জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয় লাভের পর একটি অস্থায়ী সরকার গঠিত হবে যা ভিয়েতনামের স্বাধীনতা ঘোষণা করবে।

১৯৪৪ সালের গোড়াতে ইন্দোনেশিয়ায় 'স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার আন্দোলন' নামক একটি গুপ্ত সংগঠন গঠিত হয়। বর্মায় গড়ে উঠে জাতীয় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রন্ট। ফিলিপাইনে বিশেষ সক্রিয় হয়ে উঠেছিল প্রতিরোধ আন্দোলনের শক্তিসমূহ। যেমন, ১৯৪৪ সালে হুকবালাখাপ জাতীয় বাহিনীটি জনগণের সক্রিয় সমর্থন পেয়ে জাপানী দখলদারদের কবল থেকে লুসোন দ্বীপের কয়েকটি অঞ্চল মুক্ত করে এবং ওখানে

গণতান্ত্রিক রূপান্তর সাধিত হয়। কিন্তু সে সুফল টিকিয়ে রাখা সম্ভব হল না। দ্বীপে মার্কিন সৈন্যাবতরণের পর ম্যাকার্টুরের সদর-দপ্তর সর্বপ্রথম যে-কাজটি করে তা ছিল প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতাদের গ্রেপ্তার।

প্রতিরোধ আন্দোলন অনেক বেশি সুফল দিতে পারত যদি তা সোভিয়েত ইউনিয়নেরই মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের সরকারগুলোর এবং তাদের সেনাপতিমণ্ডলীর তরফ থেকে যথাযোগ্য সমর্থন পেত।

এই সমস্ত দেশে গণ-সংগ্রামের প্রসার এবং গভীর সামাজিক ও গণতান্ত্রিক পরিবর্তন ঘটতে পারে এই আশঙ্কায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর ইংলণ্ড প্রতিরোধ আন্দোলনকে সর্বোপায়ে ঠেকিয়ে রাখে, তারা প্রধানত আন্দোলনের সেই অংশকেই সহায়তা জোগাচ্ছিল যে-অংশটি ছিল দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক গ্রুপিংসমূহের নেতৃবর্গের অধীন।

সেই সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন আপন জাতীয় ও সামাজিক মুক্তির জন্য সংগ্রামরত জাতিসমূহের আশাআকাঙ্ক্ষার কথা বুঝত এবং তাদের যাকিছু দিয়ে পারত তা দিয়েই সাহায্য করত। এর বাস্তব প্রকাশ ঘটে ১৯৪৪ সালের বসন্ত কালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূখণ্ডে ১ম চেকোস্লোভাক ফৌজী কোর, ১ম পোলিশ বাহিনী ও যুগোস্লাভ ইনফেণ্ট্রি ব্রিগেড গঠনে, এবং পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি ও যুগোস্লাভিয়ায় পার্টিজান আন্দোলন বিকাশের জন্য বিশেষজ্ঞ, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও অন্যান্য যুদ্ধ সামগ্রী দিয়ে বিপুল ব্যবহারিক সহায়তা দানের মধ্যে। ১৯৪৪ সালের বসন্ত কালে কেবল এক পোল্যাণ্ডেই প্রেরিত হয়েছিল পূর্বে সোভিয়েত ভূখণ্ডে সংগ্রামরত ৭টি পার্টিজান ফর্ম্যাশন ও ২৬টি পার্টিজান দল।

ইউরোপের অনেকগুলো দেশে প্রতিরোধ আন্দোলনে থেকে সংগ্রাম করছিল সেই সোভিয়েত মানুষ, যারা ফ্যাসিস্ট বন্দী শিবির থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। বহু সোভিয়েত স্বদেশপ্রেমিক ছিল ফ্যাসিস্টবিরোধী গ্রুপগুলোর নেতা, পার্টিজান দলগুলোর কমাণ্ডার।

ইউরোপের দেশগুলোতে পার্টিজান আন্দোলনকে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে-সহায়তা দিচ্ছিল তার ছিল বিপুল সামরিক ও নৈতিক তাৎপর্য। সোভিয়েত ফৌজের বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সহায়তা লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষকে ফ্যাসিজমের সঙ্গে সংগ্রামে উদ্দীপ্ত করে, তাদের মধ্যে শক্তি ও দৃঢ় বিশ্বাস জাগিয়ে তুলে।

প্রতিরোধ আন্দোলনকে প্রচুর কোরবানি দিতে হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ

স্বদেশপ্রেমিক প্রাণ দিয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে এবং ফ্যাসিস্ট কারাগারের যন্ত্রণার মধ্যে। বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কমিউনিস্টরা, যারা ছিল ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামকারীদের পুরোভাগে।

প্রতিরোধ আন্দোলনের ছিল বিপুল রাজনৈতিক ও সামরিক তাৎপর্য। তা কেবল ফ্যাসিজম বিধ্বস্তকরণের ক্ষেত্রেই বৃহৎ অবদান রাখে নি, বিশ্বের যুদ্ধোত্তর বিকাশকেও উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে।

যুগোস্লাভিয়ার জাতীয়-মুক্তি বাহিনীর কমিউনিস্টদের দ্বারা পরিচালিত বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম, পোল্যান্ড ও চেকোস্লোভাকিয়ার স্বদেশপ্রেমিকদের দ্বারা গঠিত বাহিনী আর ফর্ম্যাশনসমূহের বীরোচিত কীর্তি, স্লোভাকিয়া, রুমানিয়া ও বুলগেরিয়ায় গণ-অভ্যুত্থানগুলো, আলবেনীয় জনগণের মুক্তি সংগ্রাম, প্রতিরোধ আন্দোলন, ফ্রান্স, ইতালি ও অন্যান্য দেশে পার্টিজান দলসমূহের ক্রিয়াকলাপ, শত্রুর শিবিরে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী গুপ্ত আন্দোলন — এ সমস্তকিছু শেষ বিচারে সোভিয়েত জনগণের সংগ্রামের সঙ্গে মিলিত হয়ে এমন একটি প্রবল প্রবাহ সৃষ্টি করে যা ইউরোপের বুক থেকে ফ্যাসিজমরূপ আবর্জনাকে ধুয়ে নিয়ে যায়।

৮। হিটলারবিরোধী জোট সুদৃঢ়করণ

১৯৪৪ সালে হিটলারবিরোধী জোট বিকশিত ও দৃঢ় হতে থাকে। এতে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপুল অবদান ছিল। সমগ্র প্রগতিশীল মানবজাতির আশাআকাঙ্ক্ষার কথা মনে রেখে সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসমূহের ফ্যাসিস্টবিরোধী ফ্রন্টটি প্রসারিত ও সংহত করার কাজে নিজের সমস্ত প্রয়াস নিয়োগ করছিল। ১৯৪৩ সালের ১২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত হয় মৈত্রী, পারস্পরিক সহায়তা ও যুদ্ধোত্তর সহযোগিতা বিষয়ক সোভিয়েত-চেকোস্লোভাক চুক্তিটি। ১৯৪৩ সালের ১৪ ডিসেম্বর তারিখে সোভিয়েত সরকার বিশেষ এক ঘোষণাপত্রে যুগোস্লাভিয়ার জাতিসমূহের ফ্যাসিস্টবিরোধী পরিষদকে ওই দেশের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়ন সংস্থা ও কার্যনির্বাহী কমিটিতে রূপান্তরিত করার এবং যুগোস্লাভিয়ার অস্থায়ী সরকার হিশেবে জাতীয়-মুক্তি কমিটি গঠনের ঘটনাটিকে অভিনন্দিত করেন। ১৯৪৪ সালের ২১ জুলাই তারিখে গঠিত পোলিশ জাতীয়-মুক্তি কমিটির সঙ্গে ওই বছরের ২৬ জুলাই সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকারের একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তিটি ছিল সোভিয়েত সর্বোচ্চ সেনা-

প্রতিমণ্ডলী এবং পোল্যাণ্ডের ভূখণ্ডে সোভিয়েত ফৌজের পদার্পণের পর পোলিশ প্রশাসনের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে। এই চুক্তির দ্বারা স্বীকৃত হয় মুক্ত পোলিশ ভূখণ্ডে পোলিশ জাতীয়-মুক্তি কমিটির ক্ষমতা। ১৯৪৪ সালের ১০ ডিসেম্বর তারিখে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ফ্রান্সের মধ্যে ঐক্য ও পারস্পরিক সহায়তার বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পূর্ণ সমানাধিকারের ভিত্তিতে অন্যতম মহাশক্তির সঙ্গে এটাই ছিল ফ্রান্সের অস্থায়ী সরকারের প্রথম চুক্তি।

ফ্যাসিস্টবিরোধী জোট গঠিত ও সংহত হওয়ার প্রক্রিয়াটি কিন্তু সর্বদা নির্বিবাদে চলছিল না। তা প্রতিষ্ঠার একেবারে গোড়াতেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার বিষয়ে প্রস্তাব দিয়েছিল। সোভিয়েত সরকার কর্তৃক এ প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিল ১৯৪১ সালের ১৮ জুলাই তারিখে। ওই দিনই ইওসিফ স্তালিন উইনস্টন চার্চিলের কাছে একটা বার্তা প্রেরণ করেন যাতে সরকারীভাবে পশ্চিমে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়। ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসমাজ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রস্তাবটির কথা জেনে উৎসাহিত হয় ও তা সমর্থন করে। এতে তারা দেখতে পায় যুদ্ধের মেয়াদ হ্রাসের এবং প্রাণহানির সংখ্যা ও জাতিসমূহের লাঞ্ছনা হ্রাসের বাস্তব সম্ভাবনা। কিন্তু ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসক মহলগুলো বিভিন্ন অজুহাতে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে। ১৯৪২ সালে তো নয়ই এবং এমনকি ১৯৪৩ সালেও দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হল না, যদিও স্তালিনগ্রাদের উপকণ্ঠে এবং কুর্স্কের বাঁকে জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীর পরাজয় এর পক্ষে অনুকূল পরিস্থিত গড়ে দিয়েছিল। কেবল তিন মিত্র শক্তির সরকার প্রধানদের তেহেরান সম্মেলনেই (১৯৪৩ সালের ২৮ নভেম্বর — ১ ডিসেম্বর) চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়েছিল দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার সময় ও স্থান — ১৯৪৪ সালের মে, উত্তর ফ্রান্স।

পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ড সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু তারা প্রায়ই তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করত না। ঠিক তা-ই ঘটেছিল মস্কোর উপকণ্ঠে লড়াইয়ের সময় এবং স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধের সময়। ১৯৪৩ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে মাল-বোঝাই জাহাজ পাঠাতে অনেক বিলম্ব হয়েছিল (প্রায় ৮ মাস)।

পোল্যাণ্ড ও যুগোস্লাভিয়ার প্রশ্নে, এবং সেই সঙ্গে ফ্রান্স, ইতালি ও

জার্মান-ফ্যাসিস্ট দখলদারদের কবল মুক্ত অন্যান্য দেশের ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর তার পশ্চিমী মিত্রদের মধ্যে অনেক মতানৈক্য দেখা দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন পোল্যান্ড আর যুগোস্লাভিয়ায় যুদ্ধপূর্ব শাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াস পাচ্ছিল, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন এই দেশ দু'টিতে জন-গণতান্ত্রিক ক্ষমতাকে স্বীকৃতি ও সমর্থন দিয়ে তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইঙ্গো-মার্কিন হস্তক্ষেপের অবসান ঘটায়। প্রথমে ফরাসি জাতীয়-মুক্তি কমিটিকে সমর্থন করে, আর তারপর তাকে ফ্রান্সের অস্থায়ী সরকার হিশেবে স্বীকৃতি দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্রান্সের ব্যাপারে নীতিগত মতাবস্থান অধিকার করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল ইতালির বিষয়ে ঘোষণাপত্র গ্রহণের উদ্যোক্তা। এই ঘোষণাপত্রে ইতালির জাতীয় স্বতন্ত্রতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার এবং তার জনগণকে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা দানের কথা বলা হয়েছিল।

সোভিয়েত সরকারের উদ্যোগে যুদ্ধ চলাকালেই বিশ্বের যুদ্ধোত্তর গঠনের পূর্বশর্ত গড়ে উঠতে থাকে। এর উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করছে মস্কো, তেহেরান, ইয়ালতা ও পট্‌স্‌ডামে হিটলারবিরোধী জোটভুক্ত মিত্র শক্তিবর্গের সম্মেলনসমূহে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি।

১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে মস্কোয় সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলন্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে যুদ্ধের মেয়াদ হ্রাসের প্রশ্নটি আলোচিত হয়েছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলন্ড ১৯৪৪ সালে পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার ব্যাপারে কোন নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিল না। তারা জার্মানি বিভক্তকরণের ব্যাপারে এবং মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের ক্ষুদ্র আর মাঝারি আকারের রাষ্ট্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রীয় (ফেডারেটিভ) ইউনিয়নগুলি গঠনের ব্যাপারে গোঁ ধরল। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই সমস্ত পরিকল্পনার ঘোর বিরোধিতা করে এবং প্রস্তাব দেয় জাতিসমূহ নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করুক। এরূপ প্রস্তাব পুরোপুরিভাবে তাদের স্বার্থ রক্ষা করছিল এবং সোভিয়েত দেশ ও অন্যান্য রাষ্ট্রের যুদ্ধোত্তর নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করছিল।

তিন মিত্র রাষ্ট্রের সরকার প্রধানদের তেহেরান সম্মেলনে — এতে অংশগ্রহণ করেন স্তালিন, রুজভেল্ট ও চার্চিল — প্রধান প্রশ্নটি ছিল কীভাবে ফ্যাসিস্ট জার্মানির পরাজয় ত্বরান্বিত করা যায়। মোট দশ লক্ষ লোকের ইঙ্গো-মার্কিন অবতরণ বাহিনীর শক্তিতে পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয়

রণাঙ্গন খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের দাবিতে বলকানে মিত্র ফৌজের আক্রমণের ব্রিটিশ পরিকল্পনাটি প্রত্যাখ্যান করা হয়।

তেহেরান সম্মেলনের পর প্রকাশিত ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল যে তিন রাষ্ট্রের নেতারা 'পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক থেকে যে-সমস্ত অপারেশন পরিচালিত হবে ওগুলোর আয়তন ও মেয়াদ সম্পর্কে পূর্ণ ঐক্যমতে উপনীত হয়েছেন।... পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যা স্থলে জার্মান ফৌজগুলোকে ও সমুদ্রে তাদের ডুবো জাহাজগুলোকে ধ্বংস করতে এবং আকাশ থেকে তাদের সামরিক কারখানাগুলো বিনষ্ট করতে আমাদের বাধা দিতে পারে।'* সম্মেলনে এ ছাড়াও আলোচিত হয়েছিল যুদ্ধোত্তর সহযোগিতার প্রশ্নাদি, দৃঢ় শান্তি সুনিশ্চিতকরণের প্রশ্নাদি, জার্মানির ভবিষ্যৎ বিষয়ক প্রশ্নাদি, তথাকথিত কার্জন লাইন থেকে ওডের নদীর লাইন পর্যন্ত পোল্যাণ্ডের সীমান্ত বিষয়ক প্রশ্নাদি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে কনিগস্‌বার্গ দিয়ে দেওয়ার প্রশ্নটি। হিটলারবিরোধী জোটটি সুদৃঢ়করণের পক্ষে তেহেরান সম্মেলনের তাৎপর্য ছিল অপরিসীম। সম্মেলনের সাফল্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের শান্তিকামী পররাষ্ট্র নীতির নতুন এক বিজয়।

১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হয় তিন রাষ্ট্রের নেতৃবর্গের ইয়ালতা (ক্রিমিয়া) সম্মেলন। তাতেও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তাদি নেওয়া হয়: জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের উপর মিত্র বাহিনীসমূহের আঘাত হানার দিনতারিখ ঠিক হয়, জার্মানির বিনা শর্তে আত্মসমর্পণের পরই কেবল সামরিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধকরণের বিষয়ে, ফ্যাসিজম ও নাৎসিজমের বিলোপ সাধনের বিষয়ে, যুদ্ধাপরাধীদের দণ্ড প্রদানের বিষয়ে, জার্মানির সামরিক শিল্প ক্ষমতা ধ্বংসকরণের বিষয়ে, ইউরোপের ক্ষতিগ্রস্ত জাতিসমূহকে জার্মানি কর্তৃক ক্ষতিপূরণ দানের বিষয়ে এবং স্বাধীন গণতান্ত্রিক জার্মানি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে একটা বোঝাপড়া হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্যোগে ক্রিমিয়া সম্মেলনের ইশতেহারে লেখা হয়: 'আমাদের স্থির উদ্দেশ্য হচ্ছে জার্মান সমরবাদ ও নাৎসিজমের বিনাশ সাধন এবং জার্মানি ভবিষ্যতে আর কখনও সমগ্র বিশ্বের শান্তি ভঙ্গ করার সুযোগ পাবে না সে সম্পর্কে

* দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র নীতি। দলিল ও কাগজপত্র। খণ্ড ১। — মস্কো, ১৯৪৬।

গ্যারাণ্টি সৃষ্টি।... জার্মান জনগণকে ধ্বংস করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।'*

সম্মেলনে প্রস্তুত 'মুক্ত ইউরোপ সম্পর্কিত ঘোষণাপত্রে' গণতান্ত্রিক নীতিসমূহের ভিত্তিতে মুক্ত দেশসমূহের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলি সমাধানের কাজে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যে সহযোগিতার রূপরেখা নির্ধারিত হয়েছিল। জার্মানির কাছ থেকে যুদ্ধ জনিত ক্ষতিপূরণ আদায়ের বিষয়ে এবং খোদ পোল্যান্ড ও বিদেশ থেকে গণতান্ত্রিক রাজনীতিকদের নিয়ে পোল্যান্ডের কর্মরত অস্থায়ী সরকার পুনর্গঠনের বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে-প্রস্তাবটি দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন তা মেনে নেয়। সম্মেলনে এমন একটি সন্ধি হয় যা অনুসারে ফ্যাসিস্ট জার্মানির আত্মসমর্পণের ২-৩ মাস বাদে সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়।

এই সমস্ত সম্মেলন ফ্যাসিস্টবিরোধী জোট সুদৃঢ়করণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সূত্রপাত ঘটায়, সুস্পষ্টভাবে সে সহযোগিতার সম্ভাবনা ও তাৎপর্য বাতলে দেয়। সম্মেলনসমূহে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো ইঙ্গো-সোভিয়েত-মার্কিন জোট সুদৃঢ়করণে সহায়তা করে এবং জোটের শত্রুদের পক্ষে তা ছিল ধ্বংসনীয় আঘাত। এবং এ সমস্তকিছুতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন।

* তিন মিত্র রাষ্ট্র — সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেনের নেতৃবৃন্দের ক্রিমিয়া সম্মেলন। — মস্কো, ১৯৪৫, পৃঃ ১৪-১৫।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফ্যাসিস্ট জার্মানির পূর্ণ পরাজয়

১৯৪৫ সাল মানবেতিহাসে চিহ্নিত থাকবে নাৎসি জার্মানির সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর অন্তিম বিজয়ের বছর হিশেবে। ওই বছরের গোড়ার দিককার সামরিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি নির্ধারিত হয়েছিল সোভিয়েত জনগণ ও তাদের সৈন্য বাহিনীর বিপুল সাফল্যের দ্বারা। সোভিয়েত মানুষের আত্মোৎসর্গী শ্রমের কল্যাণে সোভিয়েত দেশের সামরিক অর্থনীতি শত্রু নিধনের উদ্দেশ্যে সৈন্য বাহিনী ও নৌ-বহরকে ক্রমশই অধিক পরিমাণে সমস্ত প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র আর অন্যান্য যুদ্ধোপকরণের জোগান দিচ্ছিল। আন্তর্জাতিক মঞ্চে সোভিয়েত ইউনিয়নের মর্যাদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের গোড়াতে যেখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল ১৭টি দেশের সঙ্গে, সেখানে ১৯৪৪ সালের শেষ দিকে এরূপ দেশের সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল ৪১টি।

কঠোর সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়নের সৈন্য বাহিনী অর্জন করে বিপুল রণনৈপুণ্য ও অভিজ্ঞতা। ১৯৪৪ সালে সফল আক্রমণাভিযানের ফলে সোভিয়েত ফৌজগুলো সোভিয়েত ভূখণ্ডকে জার্মান-ফ্যাসিস্ট দখলদারদের কবল থেকে মুক্ত করে পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশের মাটিতে সামরিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হয়। এই সমস্ত বিজয়ের প্রত্যক্ষ ফল ছিল নাৎসি জার্মানির পরবর্তী দুর্বলতাসাধন। তার অর্থনীতি বিকল হয়ে গিয়েছিল। ১৯৪৫ সালের জানুয়ারির দিকে নাৎসিরা জার্মান শিল্পের সমস্ত ক্ষমতার ১৫ শতাংশই হারিয়ে ফেলেছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও জার্মানির অবস্থান দুর্বলতর হয়ে যায়। সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর প্রবল আঘাতে ইউরোপে ফ্যাসিস্ট জোটটি পুরোপুরিভাবে ভেঙে পড়ে।

১৯৪৫ সালের গোড়ার দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল বিশাল ও অতি যুদ্ধক্ষম এক সৈন্য বাহিনীর অধিকারী। সংগ্রামরত বাহিনীতে,

সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর সদর-দপ্তরের রিজার্ভে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পশ্চিম, দক্ষিণ ও দূরপ্রাচ্যের সীমান্তগুলোতে ছিল ৯৪ লক্ষ ১২ হাজার লোক, ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ২ শো'টি তোপ ও মর্টার কামান, ১৫ হাজার ৭ শো'টি ট্যাঙ্ক ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গান এবং ২২ হাজার ৬ শো'টি জঙ্গী বিমান। স্থল বাহিনীতে ছিল ৮১ লক্ষ ১৮ হাজার লোক, বিমান বাহিনীতে — ৬ লক্ষ ৩৩ হাজার, নৌ-বাহিনীতে — ৪ লক্ষ ৫২ হাজার এবং বিমানবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বাহিনীতে — ২ লক্ষ ৯ হাজার লোক।

ওই সময় ফ্যাসিস্ট জার্মানিতে ভের্মাখ্‌টে ছিল ৯৪ লক্ষ ২০ হাজারের মতো লোক (ভিন্ন জাতীয় ফর্ম্যাশনসমূহের সাড়ে তিন লক্ষ লোক বাদ দিয়ে)। তার মধ্যে স্থলসেনাতে ছিল সমগ্র সংখ্যার ৭৫·৫ শতাংশ, বায়ুসেনাতে — ১৫·৯ শতাংশ ও নৌ-বহরে — ৮·৬ শতাংশ। জার্মান সৈন্য বাহিনীর হাতে ছিল ১ লক্ষ ১০ হাজার ১ শো'টি তোপ ও মর্টার কামান, ১৩ হাজার ২ শো'টির মতো ট্যাঙ্ক ও অ্যাসল্ট গান, ৭ হাজার জঙ্গী বিমান এবং প্রধান প্রধান শ্রেণীর ৪৩৪টি যুদ্ধ-জাহাজ। যুদ্ধরত সৈন্য বাহিনীতে লোক সংখ্যা ছিল ৫৪ লক্ষ।

আগেরই মতো ভের্মাখ্‌টের প্রধান শক্তিসমূহ কেন্দ্রীভূত ছিল সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে। এই রণাঙ্গনে ছিল ১৮৫টি ডিভিশন ও ২১টি ব্রিগেড (সালাশিপন্থীদের হাঙ্গেরীয় ডিভিশনগুলো সহ)। এখানে ছিল ৩৭ লক্ষ লোক, ৫৬,২০০টি তোপ ও মর্টার কামান ৮,১০০টি ট্যাঙ্ক ও অ্যাসল্ট গান এবং ৪,১০০টি জঙ্গী বিমান। এ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের মজুদ বাহিনী আর পশ্চাদ্ভাগস্থ ফর্ম্যাশনগুলোও ছিল, যেগুলোকে নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলী প্রধানত ব্যবহার করত সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে। অন্যান্য রণাঙ্গনে ছিল ১১৯টি ডিভিশন অথবা ৩৮ শতাংশ সৈন্য। অধিকৃত ভূখণ্ডে এবং জার্মানিতে — ১৬·৫ ডিভিশন অথবা ৫ শতাংশ। অতএব, ১৯৪৫ সালেও সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনই ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান ও নির্ধারক রণাঙ্গন।

১৯৪৫ সালের গোড়ার দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের সৈন্য বাহিনীগুলোর কাছে ছিল ১ কোটি ৬৪ লক্ষ লোক, ৮৩ হাজার ৪ শো'টি তোপ ও মর্টার কামান, ১৮ হাজার ২ শো'টি ট্যাঙ্ক ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গান, ৭৬ হাজার ১ শো'টি জঙ্গী বিমান, প্রধান প্রধান শ্রেণীর ১,৬৬৬টি যুদ্ধ-জাহাজ। এর মধ্যে যুদ্ধরত ফ্রণ্ট আর নৌ-বহরগুলোতে

ছিল: ৮৩ লক্ষ লোক, ৫৭ হাজার তোপ ও মর্টার কামান, ১৬ হাজার ২ শো'টি ট্যাঙ্ক ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গান, ২৬ হাজার জঙ্গী বিমান, প্রধান প্রধান শ্রেণীর ১,১৫৯টি যুদ্ধ-জাহাজ।

এইভাবে, শক্তির অনুপাত ছিল হিটলারবিরোধী জোটের অনুকূলে। কিন্তু ফ্যাসিস্ট জার্মানির কাছে তখনও যথেষ্ট বড় ও যুদ্ধক্ষম একটি সৈন্য বাহিনী ছিল। জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী আশা করেছিল যে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রধান শক্তিসমূহের সমাবেশ ঘটিয়ে এবং সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে দৃঢ় প্রতিরক্ষায় লিপ্ত হয়ে সোভিয়েত ফৌজের আক্রমণাভিযান রোধ করা যাবে এবং এই ভাবে যুদ্ধকে দীর্ঘ-স্থায়ী করে তুলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডের সঙ্গে পৃথক শান্তি চুক্তি সম্পাদন করা সম্ভব হবে। ১৯৪৪ সালের আগস্টের শেষে হিটলার বলেছিল: 'এমন এক সময় আসবে যখন মিত্রদের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে উত্তেজনা এরূপ আকার ধারণ করবে যে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াবে। ইতিহাসই দেখিয়ে দিয়েছে যে সমস্ত জোটই আগে অথবা পরে একদিন অবশ্যই ভেঙেছে।'* পশ্চিম রণাঙ্গনে নাৎসিরা যেন-তেন প্রকারে অ্যালসেস অঞ্চলে নিজেদের উদ্যোগ টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছিল, এবং তা জার্মানির অনুকূলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারত। জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলীর পরিকল্পনাটি আগের মতোই অবাস্তব ছিল। তারা নিজেদের সম্ভাবনাকে বড় করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বর্ধিত ক্ষমতাকে ছোট করে দেখে। হিটলারবিরোধী জোটের ভাঙন নিয়ে আশাটিও ছিল ভিত্তিহীন। বিদ্যমান মতবিরোধ সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন নাৎসি জার্মানিকে শর্তহীন আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে সচেষ্ট ছিল।

সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর বড় বড় বিজয় এবং ইউরোপে মুক্তি আন্দোলনের চমৎকার সাফল্য দেখে মিত্র সেনাপতিমণ্ডলী পূর্বাভিমুখে, জার্মানির গভীরে দ্রুত অগ্রগতির পরিকল্পনা রচনা করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল — সোভিয়েত ফৌজের আগে বার্লিন দখল করা। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সিদ্ধকরণের উপায় নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যে গভীর মতপার্থক্য ছিল। 'সংকীর্ণ রণাঙ্গন' স্ট্র্যাটেজির সমর্থক ব্রিটিশ

সেনাপতিমণ্ডলী উত্তরাভিমুখে প্রধান আঘাত হানার উদ্দেশ্যে সমস্ত মিত্র শক্তির সমাবেশ ঘটানোর দাবি তুলেন। তাঁর ব্রিটিশ ফৌজগুলোর দ্বারা আর্দেনের উত্তরে এই উদ্দেশ্যে প্রধান আঘাত হানার কথা ভাবছিলেন যাতে উত্তর দিক থেকে রুরে পৌছা যায় এবং তা দখল করে নিয়ে দ্রুত হামবুর্গ অভিমুখে ও ওখান থেকে বার্লিন অভিমুখে অগ্রসর হওয়া যায়।

মার্কিন সেনাপতিমণ্ডলী কিন্তু 'বিস্তৃত রণাঙ্গন' স্ট্র্যাটেজি অনুসরণ করছিলেন। তাঁরা বার্লিন অধিকার করতে চেয়েছিলেন 'অন্যান্য বিদ্যমান শক্তির সমর্থন প্রাপ্ত সম্মিলিত ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনীগুলোর দ্বারা সবচেয়ে সোজা ও দ্রুত উপায়ে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর ভেতর দিয়ে গিয়ে এবং পার্শ্ববর্তী স্ট্র্যাটেজিক অঞ্চলসমূহ দখল করে...।'* পশ্চিম রণাঙ্গনে মিত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক জেনারেল আইজেনহাওয়ার দুই পর্যায়ের অপারেশনের পরিকল্পনা নেন: প্রথম পর্যায়ে নিজের ডান পার্শ্বে ফ্রণ্ট লাইন সোজা হওয়ার পর বাহিনীসমূহের ২১তম গ্রুপের শক্তিগুলোর সাহায্যে বন শহরের দক্ষিণে রাইনে পৌছতে হবে। একই সময়ে ৩য় মার্কিন বাহিনীর আঘাত হানার কথা ছিল উত্তর-পূর্ব অভিমুখে মাইনটসের উপর। দ্বিতীয় পর্যায়ে কাজ ছিল — মে মাসের শেষে রাইন নদী পার হওয়া এবং জার্মানির অভ্যন্তর দিকে অগ্রসর হওয়া।** ১ নভেম্বর তারিখের নির্দেশ অনুসারে স্ট্র্যাটেজিক বিমান বাহিনীর বোমাবর্ষণ করার কথা ছিল দুটি অভিমুখে: শত্রুর কলকারখানা ও জ্বালানি গুদামের উপর এবং তার পরিবহণ ব্যবস্থার উপর।*** আটলাণ্টিক মহাসাগরে অবস্থিত মিত্র নৌবাহিনীর কাজ ছিল — নিজেদের সামুদ্রিক যোগাযোগ পথগুলো রক্ষা করা।

সোভিয়েত পরিকল্পনাটি নাৎসিদের পরিকল্পনার মতো অবাস্তব ছিল না। সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী তাঁদের পরিকল্পনাটি রচনা

* পগিউ ফ.। সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলী। ইংরেজী থেকে অনুবাদ। — মস্কো, ১৯৫৯, পৃঃ ৩১২।

** Parkinson R. A. Day's March Nearer Home, the War History from Alamein to VE — Day Based on the War Cabinet Papers of 1942 to 1945. — London, 1974, p. 412.

*** এর্মান জ.। বৃহৎ রণনীতি। ১৯৪৪ সালের অক্টোবর — ১৯৪৫ সালের আগস্ট। ইংরেজী থেকে অনুবাদ। — মস্কো, ১৯৫৮, পৃঃ ২৪, ২৮।

করেছিলেন সামরিক-রাজনৈতিক ও স্ট্র্যাটেজিক পরিস্থিতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে, সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতির বাস্তব সম্ভাবনাসমূহের কথা ভেবে এবং সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী ও নৌ-বহরের ক্ষমতা আর রণনৈপুণ্যের কথা মনে রেখে।

পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল বল্টিক সাগর থেকে কার্পেথিয়া পর্যন্ত, ১,২০০ কিলোমিটার দীর্ঘ রণাঙ্গনে, একই সময়ে কয়েকটি বড় বড় আক্রমণাত্মক অপারেশন চালিয়ে ফ্যাসিস্ট জার্মানিকে পরাস্তকরণের কাজ সম্পন্ন করা এবং মিত্রদের সঙ্গে মিলে তাকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে বাধ্য করা। ঠিক করা হয় যে প্রধান আঘাত হানা হবে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের মাঝখানে, পোল্যান্ডে, বার্লিন স্ট্র্যাটেজিক অভিমুখে, অর্থাৎ ভিস্টুলা-ওডের, পূর্ব-প্রুশীয়, পূর্ব-পমেরাণীয় অপারেশনের মতো স্ট্র্যাটেজিক অপারেশনগুলো এবং হাঙ্গেরি, চেকোস্লোভাকিয়া ও অস্ট্রিয়া মুক্তকরণের এবং জার্মানিকে চূড়ান্তভাবে পরাস্তকরণের অপারেশনগুলো পরিচালনা করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছিল।

১। পোল্যান্ডের মুক্তি
(১৯৪৫ সালের ১২ জানুয়ারি — ২ ফেব্রুয়ারি)

পোল্যান্ড মুক্তকরণে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর সদর-দপ্তর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেয় ওয়ার্শো-বার্লিন অভিমুখে আক্রমণরত ১ম বেলোরুশ ও ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টগুলোর সৈন্যদের। তাদের কর্তব্য ছিল— ভিস্টুলা ও সান্দমির ব্রিজ-হেডগুলো থেকে প্রবল আঘাত হানা, ভিস্টুলা ও ওডেরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে জার্মানদের বৃহৎ গ্রুপিংটি বিধ্বস্ত করা এবং পোল্যান্ড মুক্ত করা। উভয় ফ্রণ্টের সৈন্যদের সহায়তা জোগানোর দায়িত্ব ছিল — উত্তর থেকে ২য় বেলোরুশ ফ্রণ্টের বাম পার্শ্বের ইউনিট আর ফর্ম্যাশনগুলোর এবং দক্ষিণ থেকে ৪র্থ ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের ডান পার্শ্বের ইউনিট আর ফর্ম্যাশনগুলোর।

অপারেশন আরম্ভের দিকে কেবল ১ম বেলোরুশ ফ্রণ্টে (অধিনায়ক— মার্শাল গ. জুকোভ) এবং ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টেই (অধিনায়ক — মার্শাল ই. কনেভ) ছিল ১৬টি মিশ্র বাহিনী, ৪টি ট্যাঙ্ক ও ২টি বিমান বাহিনী, কয়েকটি স্বতন্ত্র ট্যাঙ্ক কোর, মেকানাইজ্‌ড ও অশ্বারোহী কোর, এবং ফ্রণ্ট দুটির অধীন অনেকগুলো ইউনিট। ওগুলোতে ছিল মোট ২২ লক্ষ

লোক, ৩৩,৫০০টি তোপ ও মর্টার কামান, ৭ হাজার ট্যাঙ্ক ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গান এবং ৫ হাজার বিমান। এটা ছিল সোভিয়েত সৈন্যদের সর্ববৃহৎ স্ট্র্যাটেজিক গ্রুপিং যা গঠিত হয়েছিল একটি মাত্র আক্রমণাত্মক অপারেশন পরিচালনার জন্য, এর আগে আর কখনও এত বড় সোভিয়েত গ্রুপিং গঠিত হয় নি। ফ্রন্টগুলো লড়ছিল ৫০০ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত এক রণাঙ্গনে এবং ভিস্টুলার বাঁ তীরে — মাগ্নুশেভ, পুলাভা ও সান্দমির অঞ্চলগুলোতে তারা ৩টি ব্রিজ-হেড দখল করে রেখেছিল। তাদের সামনে প্রতিরক্ষায় লিপ্ত ছিল জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীসমূহের 'A' গ্রুপের (২৬ জানুয়ারি থেকে তা 'সেণ্টার' গ্রুপ বলে পরিচিত এবং অধিনায়ক — কর্নেল-জেনারেল ই. গার্পে) প্রধান শক্তিসমূহ, যাদের কাছে ছিল ৫ লক্ষ ৬০ হাজার সৈনিক ও অফিসার, প্রায় ৫ হাজার তোপ ও মর্টার কামান, ১২ শতাধিক ট্যাঙ্ক ও অ্যাসল্ট গান এবং ৬ শতাধিক বিমান। এ ছাড়া, লড়াই চলাকালে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শত্রু পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে, জার্মানির অভ্যন্তর ভাগ এবং সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের কোন কোন অংশ থেকে পোল্যাণ্ডে আরও প্রায় ৪০টি ডিভিশন নিয়ে আসে।

সোভিয়েত সৈন্যদের আক্রমণাভিযান প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী পোল্যাণ্ডের ভূখণ্ডে, ভিস্টুলা ও ওডেরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে, আগে থেকেই বিস্তৃত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণ করে রাখে। এ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ছিল ৫০০ কিলোমিটার অবধি গভীর ৭টি আত্মরক্ষা লাইন। ব্যবস্থাটির দৃঢ়তা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে — বিশেষত ট্যাঙ্কবিরোধী প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে দৃঢ়তা বৃদ্ধির জন্য — ভিস্টুলা, ভার্তা, ওডের (ওডরা) ইত্যাদি নদীগুলোকে খুব ব্যবহার করা হচ্ছিল। আত্মরক্ষা লাইনসমূহে অন্তর্ভুক্ত ছিল সুদীর্ঘ প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুত শহর আর দুর্গগুলো — মদ্লিন, ওয়ার্শো, লদ্জ, রাদোম, কেল্ৎসে, ক্রাকোভ, ব্রমবের্গ (বিদগোশ), পজনান, ব্রেসলাউ (ভ্রৎস্লাভ), ওপেল্ন (ওপোলে), শ্নেইডেমিউল (পিলা), কিউস্ট্রিন (কস্ত্শিন), গ্লগাউ (গ্লগুভ) ইত্যাদি। সবচেয়ে মজবুত ছিল ভিস্টুলা যুদ্ধ-সীমাটি, যা গঠিত হয়েছিল মোট ৩০-৭০ কিলোমিটার গভীর ৪টি আত্মরক্ষা লাইন নিয়ে এবং ক্রইটস (ক্শিজ) ও উনরুস্টাডট (কার্গোভা) যুদ্ধ-সীমাটি, যা গঠিত হয়েছিল পমেরাণিয়া, মেজেরিৎস্ ও গ্লগাউ-ব্রেসলাউ সুদৃঢ় অঞ্চলসমূহ নিয়ে। জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী আশা করেছিল যে তারা আগে থেকে প্রস্তুত যুদ্ধ-সীমাসমূহের দৃঢ় প্রতিরক্ষা

ব্যবস্থার সাহায্যে সোভিয়েত ফৌজের আক্রমণাভিযানের ক্ষমতা হ্রাস করতে এবং তদ্দ্বারা যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করতে পারত।

সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলীর অভিপ্রায়টি ছিল — ব্রিজ-হেডগুলো থেকে একই সময়ে বিভিন্নমুখী প্রবল আঘাত হেনে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে ফেলা, উচ্চ গতিতে ক্ষিপ্র আক্রমণাভিযান চালিয়ে যাওয়া এবং শত্রুর পশ্চাদপসরণরত সৈন্যদের অথবা মজুদ সৈন্যদের আগেই মধ্যবর্তী আত্মরক্ষা লাইনগুলো কবজা করে নেওয়া। অপারেশনের মোট গভীরতা নির্ধারিত হয়েছিল ১ম বেলোরুশ ফ্রণ্টের জন্য ৩০০-৩৫০ কিলোমিটার এবং ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের জন্য ২৮০-৩০০ কিলোমিটার।

ওই সময় পোল্যাণ্ডে গঠিত হয়েছিল পোলিশ প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী সরকার। সোভিয়েত ইউনিয়নই সকলের আগে এই সরকারকে স্বীকৃতি দান করে। পোল্যাণ্ডের পূর্বাংশে প্রতিষ্ঠিত গণ-ক্ষমতা সুদৃঢ়করণের পথে এ ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং প্রতিক্রিয়াশীল প্রবাসী গ্রুপিং ও তার ইঙ্গো-মার্কিন পৃষ্ঠপোষকদের জন্য বিরাট এক আঘাত।

যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি নাৎসি দখলের কুফলগুলো দূরীকরণের উদ্দেশ্যে নতুন পোলিশ সরকার প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। এই সরকার গণতান্ত্রিক রূপান্তর সাধনে এবং পোলিশ সৈন্য বাহিনী সুদৃঢ়করণে মনোনিবেশ করেন।

পোলিশ জনগণ অস্থায়ী সরকারের ব্যবস্থাদির প্রতি সমর্থন জানাত, সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন মনোভাব পোষণ করত। সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীতে তারা দেখতে পায় সেই বাস্তব শক্তিটি যা ফ্যাসিস্টদের বিধ্বস্ত করতে এবং পোল্যাণ্ডকে স্বাধীনতা এনে দিতে পারে। এবং সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী সসম্মানে তার স্বদেশপ্রেমিক ও আন্তর্জাতিকতাবাদী কর্তব্য পালন করছিল — ফ্যাসিস্টদের পশ্চিমাভিমুখে খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এ ব্যাপারে সহায়তা করছিল ফৌজগুলোতে পরিচালিত রাজনৈতিক-শিক্ষামূলক কাজ, যার উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের অন্তিম লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছা — ফ্যাসিস্ট জানোয়ারকে তার নিজস্ব ডেরায় খতম করা এবং বার্লিনের উপর বিজয় পতাকা উত্তোলন করা।

কমাণ্ডার আর রাজনৈতিক কর্মীরা যোদ্ধাদের কাছে ব্যাখ্যা করছিল জার্মান-ফ্যাসিস্ট হানাদারদের কবল থেকে পোলিশ জনগণের পূর্ণ মুক্তির জন্য সংগ্রামের রাজনৈতিক তাৎপর্য, তারা সৈন্যদের পোল্যাণ্ডের মাটিতে পবিত্রতার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকের মান ও মর্যাদা রক্ষা

করতে বলছিল। বহু ইউনিতে পোলিশ বাসিন্দাদের সঙ্গে সোভিয়েত সৈন্যদের আন্তরিক সাক্ষাৎ ঘটছিল, — তখন পোলিশ নাগরিকরা নাৎসিদের কবল থেকে পোল্যাণ্ডের মাটি মুক্তকরণের জন্য সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীকে কৃতজ্ঞতা জানাত।

পোলিশ সৈন্য বাহিনীতেও অনেক রাজনৈতিক কাজ চলে। তাতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে প্রবাসী সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির এবং পোল্যাণ্ডের ভূখণ্ডে তার গুপ্তচরদের শত্রুতাপূর্ণ ক্রিয়াকলাপের স্বরূপ উদ্ঘাটন। সোভিয়েত যোদ্ধাদের সঙ্গে পোলিশ সৈনিকদের প্রায়ই সাক্ষাৎ ঘটত। তখন বন্ধুরা পরস্পরকে যুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা এবং রণাঙ্গনের জীবনের কথা বলত। এ সমস্তকিছু সোভিয়েত ও পোলিশ সৈন্য বাহিনীগুলোর মধ্যে সংগ্রামী সহযোগিতা বৃদ্ধিকরণে সহায়তা করছিল।

১৯৪৫ সালের ১২ জানুয়ারি সকাল বেলা প্রবল প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণের পর আক্রমণাভিযান আরম্ভ করে ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের সৈন্যরা। প্যারালেল ব্যারাজ-এর সাহায্যে ইনফেণ্ট্রি ও ট্যাঙ্ক দু' ঘণ্টার মধ্যে শত্রুর দু'টি প্রতিরক্ষাবস্থান ভেদ করে ফেলে। নাৎসিদের প্রবল প্রতিরোধ দমন করে সোভিয়েত সৈন্যরা পরের দিন সকাল নাগাদ ফ্রণ্ট বরাবর ৩৫ কিলোমিটার ও গভীরতা বরাবর ২০-২৫ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত জার্মান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ট্যাকটিকেল অঞ্চলটি ভেদকরণের কাজ সম্পন্ন করে নেয়। ১৫ জানুয়ারি কেল্ৎসে অঞ্চলে শত্রুর একটি ট্যাঙ্ক গ্রুপিংকে বিধ্বস্ত করা হয়। শত্রুকে বিধ্বস্তকরণের কাজে স্থলফৌজকে বিপুল সহায়তা জোগায় ২য় বিমান বাহিনী। তার বৈমানিকরা এক দিনে প্রায় ৭০০ বার উড্ডয়ন সম্পন্ন করেছিল, এর মধ্যে ৪০০ বার —— কেল্ৎসে ও খ্মেলনিক অঞ্চলে ফ্যাসিস্ট ট্যাঙ্কের সারিগুলোর উপর। ১৭ জানুয়ারি মুক্ত হয় পোল্যাণ্ডের বৃহৎ এক সামরিক ও শিল্প কেন্দ্র — চেনস্তখভ শহর। ক্রাকোভ অভিমুখে সফল আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যায় ফ্রণ্টের বাম পার্শ্বের সৈন্যরা। আক্রমণাভিযানের প্রথম দুই দিনে জার্মান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ট্যাকটিকেল অঞ্চলটি ভেদ করে ৫৯তম ও ৬০তম বাহিনীর সৈন্যরা ১৮ জানুয়ারি ক্রাকোভ শহরের উপকণ্ঠে গিয়ে উপনীত হয়।

চেনস্তখভ — ক্রাকোভ লাইনে, অর্থাৎ ১২০-১৪০ কিলোমিটার গভীরে পেণছে ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সৈন্যরা নির্ধারিত সময়ের পাঁচ দিন আগেই তাদের আশ কর্তব্যটি সম্পাদন করে ফেলে। জার্মান-ফ্যাসিস্ট সৈন্যরা পিছ হটতে শর করে।

১ম বেলোরশ ফ্রন্টের সৈন্যরাও ঠিক ওই ভাবে সাফল্যের সঙ্গে আক্রমণাভিযান আরম্ভ করে। ১৪ জানয়ারি খব ভোরে ২৫ মিনিট ব্যাপী গোলাবর্ষণের পর সসজ্জিত অগ্রবর্তী ব্যাটেলিয়নগলো শত্রকে আক্রমণ করে। তাদের ক্রিয়াকলাপে সহায়তা জোগায় ক্রিপিং ব্যারাজ। বেলা ১০টার দিকেই তারা নাৎসিদের প্রথম অবস্থানটি ভেদ করে ফেলে। অগ্রবর্তী ব্যাটেলিয়নগলোর ক্রিয়াকলাপ পরিণত হয় সার্বিক আক্রমণাভিযানে। দিনান্তে জার্মানদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করা হয় ১২ থেকে ২২ কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত।

পরবর্তী দ'দিন ধরে বিদ্ধস্থলে ঢোকানো হয় ১ম ও ২য় রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীগলোকে। ফ্রন্টের বিমান বাহিনীও খব সক্রিয় হয়ে ওঠে। কেবল ১৬ জানয়ারি তারিখেই তা ৩,৪৭০-এর বেশি বিমান-উড্ডয়ন চালায় এবং শত্রকে শোচনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

১৭ জানয়ারি সোভিয়েত সৈন্যরা ১ম পোলিশ বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতায় পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ার্শো নগরী মক্ত করে।

মক্ত শহরটি ছিল মৃত। ফ্যাসিস্ট পশদের দ্বারা বিধ্বস্ত ওয়ার্শো নগরীর চিত্রটি ছিল হতাশকারী। হানাদারেরা ধংস করে ও লটে নেয় শহরের সমৃদ্ধতম ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ, স্থাপত্য নিদর্শন আর বৈজ্ঞানিক সম্পদসমহ। তারা বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেয় রাজধানীর সর্ববৃহৎ ক্যাথিড্রালটি — সেণ্ট ইয়ানের ক্যাথিড্রাল, বিনষ্ট করে দেয় রাজ প্রাসাদ, অপেরা ও ব্যালে থিয়েটার, জ্বালিয়ে দেয় গ্রন্থাগারগলো, যেখানে ছিল হাজার হাজার পোলিশ ও বিদেশী পাণ্ডুলিপি, প্রাচীন বইপত্র, মানচিত্র আর অ্যাটলাস। মক্তিলাভের মহর্তে শহরে ছিল কেবল ১ লক্ষ ৬২ হাজার লোক, অথচ ১৯৩৯ সালের শেষ দিকে তাতে বাস করছিল ১৩ লক্ষ ১০ হাজার লোক।

ওয়ার্শোর মক্তিলাভের সংবাদ বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। পরদিনই বাসিন্দারা আপন শহরে ফিরতে আরম্ভ করে। পোল্যাণ্ডের জনগণ আনন্দের সঙ্গে বরণ করছিল তাদের মক্তিদাতাদের। সর্বত্র স্বতঃস্ফর্তভাবে দেখা দিতে থাকে সভাসমিতি আর মিছিল। পোল্যাণ্ডের প্রতিটি নাগরিক লাল

ফৌজ ও পোলিশ সৈন্য বাহিনীর যোদ্ধাদের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাতে, তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাতে ও সাধ্যমতো সহায়তা দানে সচেষ্ট ছিল।

অস্থায়ী পোলিশ সরকার সোভিয়েত সরকারের কাছে একটি পত্র লেখেন, যাতে বিশেষভাবে বলা হয়: 'আমাদের বহু লাঞ্ছিত রাজধানী ওয়ার্শোর মুক্তি উপলক্ষে, আমাদের লক্ষ লক্ষ ভাইবোনের এবং হাজার হাজার শহর ও গ্রামের মুক্তি উপলক্ষে আনন্দে অভিভূত হয়ে আমরা সমগ্র পোলিশ জনগণের তরফ থেকে বীর লাল ফৌজ ও সমগ্র সোভিয়েত জনগণের প্রতি সবচেয়ে গভীর ও অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।'

সোভিয়েত সরকার ক্ষতিগ্রস্ত ওয়ার্শোকে বিপুল সহায়তা প্রদান করেন। শহরের বাসিন্দাদের জন্য প্রেরিত হয়েছিল ৬০ হাজার টন ময়দা ও বৃহৎ পরিমাণ ঔষধপত্র।

ফ্রন্টের বাম পার্শ্বে আক্রমণাভিযান চলছিল লদ্‌জ শহর অভিমুখে এবং শক্তির একাংশ এগুচ্ছিল শিদ্‌লোভেৎস শহরের দিকে, যেখানে ১৮ জানুয়ারি তারিখে ফ্রন্টের ইউনিটগুলো মিলিত হয় ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সঙ্গে।

এইভাবে, অপারেশনের ৪ দিনের মধ্যে ১ম বেলোরুশ ফ্রন্টের সৈন্যরা ১০০-১৩০ কিলোমিটার গভীরে ঢুকে পড়ে। নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলী লাল ফৌজের আক্রমণাভিযান ঠেকানোর উদ্দেশ্যে তাড়াহুড়ো করে রিজার্ভ থেকে ও অন্যান্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নতুন শক্তি নিয়ে আসতে আরম্ভ করে। যেমন, ১৯ জানুয়ারি থেকে ৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে উভয় ফ্রন্টের এলাকায় তারা নিয়ে আসে ৪০টিরও বেশি ডিভিশন।

পরিস্থিতি বিবেচনা করে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর সদর-দপ্তর ১ম বেলোরুশ ফ্রন্টের অধিনায়ক মার্শাল গ. জুকোভকে ও ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের অধিনায়ক মার্শাল ই. কনেভকে শত্রুর আগমনকৃত রিজার্ভগুলোকে বিধ্বস্তকরণের উদ্দেশ্যে তার দ্রুত পশ্চাদনুসরণ আরম্ভ করার এবং গতিতে থেকে আত্মরক্ষা লাইনগুলো অতিক্রম করে ওডের নদীতে পৌঁছার নির্দেশ দেয়।

শুরু হল শত্রুর পশ্চাদনুসরণ, যার ব্যাপকতা ছিল অভূতপূর্ব। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা চলছিল এ পশ্চাদনুসরণ। তার সাফল্যে সহায়তা করেছিল উপযুক্ত সৈন্য বিন্যাস। মিশ্র বাহিনীগুলোর আগে আগে ৩০ থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে এগুচ্ছিল ট্যাঙ্ক বাহিনীগুলো। তারা প্রতি দিন ৪০ থেকে ৭০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করছিল। ওগুলোর প্রথম

এশিলনের ট্যাঙ্ক কোরগুলো থেকে প্রেরিত হচ্ছিল অগ্র দলগুলো, যারা ৩০-৪০ কিলোমিটার দূরে সামরিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হত। মিশ্র বাহিনী, কোর আর ডিভিশনগুলো থেকেও মোটরগাড়িতে করে অগ্র দল প্রেরিত হচ্ছিল। প্রধান শক্তিসমূহ থেকে ওদের দূরত্ব ছিল: বাহিনীতে — ৬০ কিলোমিটার, কোরে — ১৫-২০ কিলোমিটার, ডিভিশনে — ১০-১৫ কিলোমিটার। অগ্র দলগুলো কবজা করছিল গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ-সীমা আর ঘাঁটিগুলো, এবং প্রধান শক্তির আগমন না ঘটা পর্যন্ত তা ধরে রাখত। এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

১ম রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীর ১১শ রক্ষী ট্যাঙ্ক কোরের ৪৪তম রক্ষী ট্যাঙ্ক ব্রিগেড নিয়ে গঠিত অগ্র দলটি কর্নেল ই. গুসাকোভস্কির সেনাপতিত্বে দ্রুত হামলা চালিয়ে হখভাল্ডের কাছে মেজেরিৎস্ সুদৃঢ় অঞ্চল ভেদ করে এবং কিউস্ট্রিনের দক্ষিণে ওডের নদীতে পৌঁছে যায়। ১ ফেব্রুয়ারি রাত্রে ব্রিগেড নদী পেরিয়ে একটি ব্রিজ-হেড দখল করে নেয়। দু'দিন ধরে ট্যাঙ্ক যোদ্ধারা ব্রিজ-হেডে কঠোর লড়াইয়ে লিপ্ত থাকে, তারা শত্রুর পাল্টা-আক্রমণ প্রতিহত করে এবং নিজেদের প্রধান শক্তিসমূহের আগমন অবধি অধিকৃত অবস্থানগুলো টিকিয়ে রাখে।

পশ্চাদনুসরণের সময় ১ম বেলোরুশ ফ্রন্টের সৈন্যরা শত্রুর পজনান ও শ্নেইডেমিউল গ্রুপিংগুলোকে ঘিরে ফেলে। ২৯ জানুয়ারি তারা ফ্যাসিস্ট জার্মানির ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। সোভিয়েত যোদ্ধাদের জন্য এ ছিল বড় এক ঘটনা। ইউনিট আর সাব-ইউনিটসমূহে চলছিল মিটিং যাতে সৈন্যরা বলছিল: 'অবশেষে আমরা তা পেলাম যার জন্য তিন বছরেরও বেশি কাল আমরা চেষ্টা করেছি, স্বপ্ন দেখেছি এবং রক্ত দিয়েছি।' ফৌজগুলোতে বিরাজ করছিল প্রবল সংগ্রামী উদ্দীপনা। এরূপ পরিস্থিতিতে যাতে কোনরূপ অনাচার না ঘটে সেই উদ্দেশ্যে সোভিয়েত সরকার ফৌজসমূহকে জার্মানির জনগণের প্রতি মানবিক সম্পর্কের নীতিসমূহ কঠোরভাবে পালনের নির্দেশ দিলেন। এই নির্দেশ অনুসারে সমস্ত ইউনিটে কমান্ডার আর রাজনৈতিক কর্মীরা সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপক ব্যাখ্যামূলক কাজ চালায়। লাল ফৌজের যোদ্ধারা তাদের ঐতিহাসিক কর্তব্য পালনে লিপ্ত থেকে সোভিয়েত মানুষের মান ও মর্যাদা উচ্চে তুলে ধরে।

১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সৈন্যরাও কাজ করে দ্রুত। পশ্চাদনুসরণের সময় তারা সাফল্যের সঙ্গে সামরিক ক্রিয়াকলাপ চালায় শত্রুর পার্শ্বে এবং পশ্চাদ্ভাগে। এখানে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে শত্রুর সাইলেসীয় গ্রুপিংয়ের

পশ্চাদ্ভাগে জেনারেল প. রিবালকোর সেনাপতিত্বাধীন ৩য় রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীর সামরিক চাল। নাৎসিরা বড় বড় কয়লা খনি আর ধাতু কারখানার এই অঞ্চলটি নিজেদের দখলে রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। ট্যাঙ্ক বাহিনীর চাল ফ্যাসিস্টদের জন্য ছিল এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। পরিবেষ্টিত হতে পারে এই ভয়ে তারা তাড়াহুড়ো করে আপার সাইলেসিয়া ত্যাগ করে চলে যায়। তার পশ্চিমে তাদের ধ্বংস করে দেওয়া হয়। পোলিশ সরকার অনতিবিলম্বে এই শিল্পাঞ্চলের কলকারখানাগুলো চালু করার সুযোগ পেলেন, — ফ্যাসিস্টদের ওগুলো ধ্বংস করার সময় ছিল না।

আপার সাইলেসিয়ার জন্য লড়াইয়ে এবং শত্রুর পশ্চাদপসরণরত গ্রুপিংটি ধ্বংসকরণে সোভিয়েত স্থল বাহিনীকে বিপুল সমর্থন জুগিয়েছিল বিমান বাহিনী।

২৭ জানুয়ারি ফ্রন্টের বাম পার্শ্বের সৈন্যরা ওস্‌ভেনর্টসিম বন্দী শিবিরটি অধিকার করে। সোভিয়েত যোদ্ধাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল ফ্যাসিস্টদের বিভীষিকাময় অপরাধের চিত্র।

বন্দী শিবিরে ছিল কয়েদীদের পোশাকের ৩৫টি গুদাম। এর মধ্যে ২৯টি নাৎসি জল্লাদরা শেষ মুহূর্তে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু লাল ফৌজের দ্রুত আক্রমণাভিযান তাদের নিজস্ব অপরাধের চিহ্নগুলো পুরোপুরিভাবে মুছে ফেলতে বাধা দেয়। টিকে-থাকা কেবল ৬টি গুদাম-ঘরেই পাওয়া গিয়েছিল যন্ত্রণা-দিয়ে-হত্যা করা মানুষের ওপরের ও নিচের পোশাকের প্রায় ১২ লক্ষটি সেট, আর ওস্‌ভেনর্টসিম বন্দী শিবিরের চর্ম কারখানায় আবিষ্কৃত হয়েছিল ১ লক্ষ ৪০ হাজার নারীর মাথা থেকে কাটা ৭ হাজার কিলোগ্রাম চুল। বিশেষজ্ঞদের একটি কমিশন রায় দেয় যে কেবল এই শিবিরেই হত্যা করা হয়েছিল ৪০ লক্ষাধিক লোককে, যারা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড, যুগোস্লাভিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও অন্যান্য দেশের নাগরিক।*

জানুয়ারির শেষ দিকে ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট বিস্তৃত রণাঙ্গন জুড়ে ওডের নদীতে পেঁছে তা অতিক্রম করে ফেলে এবং কয়েকটি ব্রিজ-হেড দখল করে নেয়।

১ম বেলোরুশ ফ্রন্টের সৈন্যদের দ্রুত ওডেরে পেঁছার ফলে তাদের

---

* নুরেমবার্গ মোকদ্দমা। খণ্ড ৪। — মস্কো, ১৯৫৯, পৃঃ ৩৬৭-৩৬৯।

এবং উত্তরাভিমুখে — পূর্ব প্রাশিয়ার দিকে ২য় বেলোরুশ ফ্রন্টের আক্রমণরত প্রধান শক্তিসমূহের মধ্যে একটি ব্যবধান বা ফাটল সৃষ্টি হয়। তা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে মার্শাল জুকোভ ওয়ার্শোর মুক্তিলাভের পর দ্বিতীয় এশিলনে অবস্থিত ১ম পোলিশ বাহিনীর দু'টি ডিভিশনকে প্রেরণ করেন। কিন্তু পরে ব্যবধানটি আরও বেশি বৃদ্ধি পায়, এবং ১ম বেলোরুশ ফ্রন্টের ডান অংশকে সমর্থন জোগাচ্ছিল কেবল তার উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে আক্রমণরত ৪৭তম ও ৬১তম বাহিনীগুলো।

সোভিয়েত সৈন্যদের ওডেরে পৌঁছার পর উত্তর থেকে শত্রুর প্রতিঘাতের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সেই জন্যই এই অভিমুখে সামরিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনার উদ্দেশ্যে ফ্রন্টের অধিনায়ক ১ ফেব্রুয়ারি তারিখে ২য় রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীকে, আর তার পরের দিন ১ম রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীকেও ঘুরিয়ে দেন। এই ভাবে, ৩ ফেব্রুয়ারির দিকে ১ম বেলোরুশ ফ্রন্টের ৪টি মিশ্র বাহিনী, ২টি ট্যাঙ্ক বাহিনী ও ১টি অশ্বারোহী কোর উত্তরাভিমুখে অটলভাবে অগ্রসর হওয়ার সময় শত্রুর পমেরানীয় গ্রুপিংয়ের অনেকগুলো প্রতিআক্রমণ প্রতিহত করে। বার্লিন অভিমুখে থেকে গিয়েছিল আগেকার লড়াইয়ে দুর্বল-হয়ে-পড়া ৪টি মিশ্র বাহিনী, ২টি ট্যাঙ্ক ও ১টি অশ্বারোহী কোর।

এহেন পরিস্থিতিতে বার্লিন অভিমুখে আক্রমণাভিযান অব্যাহত রাখা যুক্তিসঙ্গত ছিল না এবং সর্বোচ্চ সদর-দপ্তরের নির্দেশানুযায়ী তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী কালে মার্শাল গেওর্গি জুকোভ লিখেছিলেন, 'অবশ্য এই বিপদ অগ্রাহ্য করে উভয় ট্যাঙ্ক বাহিনী ও ৩-৪টি মিশ্র বাহিনীকে সোজাসুজি বার্লিন অভিমুখে পাঠিয়ে দিয়ে তার কাছে পৌঁছা যেত। কিন্তু শত্রু উত্তর দিক থেকে আঘাত হেনে সহজেই আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে ওডেরের পাড়ি-ব্যবস্থায় পৌঁছে যেত এবং বার্লিন অঞ্চলে ফ্রন্টের ফৌজগুলোকে অতি শোচনীয় অবস্থায় ফেলে দিত।'*

সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর ভিস্টুলা-ওডের স্ট্র্যাটেজিক আক্রমণাত্মক অপারেশনটির বিপুল সামরিক-রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল। তার সফল পরিসমাপ্তির ফলে সোভিয়েত সৈন্যরা নাৎসিদের কবল থেকে মুক্ত করে রাজধানী ওয়ার্শো সহ পোল্যান্ডের মধ্য ও পশ্চিম অঞ্চলগুলো, অতিক্রম করে ওডের নদী এবং তার পশ্চিম তীরস্থ গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ-হেডগুলো

কবজা করে নেয়। ওখান থেকে বার্লিন পর্যন্ত দূরত্ব ছিল ৬০ কিলোমিটার।

অপারেশনের কুড়ি দিনে বিধ্বস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় শত্রুর ৬০টির মতো ডিভিশন, বন্দী হয় ১লক্ষ ৪৭ সহস্রাধিক সৈনিক ও অফিসার, কবজা করা হয় ১৩ শতাধিক ট্যাংক ও অ্যাসল্ট গান, ১৪ হাজারের মতো তোপ ও মর্টার কামান এবং ১,৩৬০টি বিমান।

আক্রমণাভিযান চলছিল ৫ শতাধিক কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ৫০০-৬০০ কিলোমিটার গভীর এক রণাঙ্গনে। গতিতে থেকে অতিক্রম করতে হচ্ছিল একাধিক আত্মরক্ষা লাইন ও বড় বড় জলবাধা। পশ্চাদনুসরণের গতি ছিল এরূপ: পদাতিক ফৌজের — ২৪ ঘণ্টায় ৩৫-৪০ কিলোমিটার, ট্যাংক ফৌজের — ৭০ কিলোমিটার পর্যন্ত। সোভিয়েত সৈন্যদের এরূপ গতিবেগ সেই যুদ্ধের সময় অর্জিত হয়েছিল সেই-ই প্রথম।

প্রাক্তন জার্মান জেনারেল ফ. মেল্লেণ্টিন লিখেছিল, '১৯৪৫ সালের প্রথম মাসগুলোতে ভিস্টুলা এবং ওডেরের মাঝখানে যাকিছু ঘটেছে তা অবর্ণনীয়। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে ইউরোপ অনুরূপ ঘটনা আর দেখে নি।*

অপারেশনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি ছিল — এক অপারেশনেল অভিমুখে প্রতি ফ্রন্টে দু'টি ট্যাংক বাহিনী ব্যবহার। এর ফলে ফ্রণ্টগুলো আক্রমণকারী গ্রুপিংসমূহের ভেদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং আক্রমণাভিযানের দ্রুত গতি সুনিশ্চিত হয়েছিল। আগেকার অপারেশনসমূহ আর এই অপারেশনটির মধ্যে তফাৎ ছিল এই যে এক-একটি ট্যাঙ্ক ব্রিগেড আর রেজিমেণ্টকে কোম্পানিতে বিভক্ত করা হত এবং ওগুলো ইনফেণ্ট্রি ব্যাটেলিয়নে অন্তর্ভুক্ত হয়ে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করার সময় সমগ্র গভীরতা জুড়ে তাদের সমর্থন জোগাত। এতে ইনফেণ্ট্রি ইউনিটগুলোর সঙ্গে ট্যাংক ফৌজের পারস্পরিক সহযোগিতা চালানোর উপায়টি অনেক সহজ হল।

অপারেশনটির আরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোতে আর্টিলারির ব্যাপকতা। তাতে অংশগ্রহণ করেছিল ব্যূহ ভেদকারী কয়েকটি আর্টিলারি কোর ও ডিভিশন। আচমকা ও সমকালীন

* মেল্লেণ্টিন ফ.। ট্যাঙ্ক-যুদ্ধ। ১৯৩৯-১৯৪৫। — মস্কো, ১৯৫৭, পৃঃ ২৮০।

আঘাত হানার উদ্দেশ্যে প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণের কাজ পরিচালিত হচ্ছিল ফ্রন্টগুলোর আয়তনে একটি কেন্দ্র থেকে।

অপারেশনের সফল পরিচালনায় বৃহৎ ভূমিকা পালন করে বিমান বাহিনী। অন্তরিক্ষে নিরবচ্ছিন্ন আধিপত্য বজায় রেখে তা মিশ্র ও ট্যাঙ্ক বাহিনীর ক্রিয়াকলাপে সমর্থন দিচ্ছিল, শত্রুর মজুদ ফৌজগুলোর উপর, তার প্রতিরক্ষা লাইন, সদর-দপ্তর আর পশ্চাদ্ভাগের উপর প্রবল আঘাত হানছিল। উভয় ফ্রন্টের বিমান বাহিনী ৫৪ সহস্রাধিক বিমান-উড্ডয়ন সম্পন্ন করে ১,১৫০টি বায়ুযুদ্ধ চালায় এবং শত্রুর ৯০৮টি বিমান বিধ্বংস করে। বিমানের উড্ডয়ন ও অবতরণের জন্য সোভিয়েত বৈমানিকরা ব্যবহার করেছিল মোটর সড়ক। যেমন, তিনবার 'সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর' উপাধিতে ভূষিত কর্নেল আ. পক্রিশকিনের সেনাপতিত্বাধীন ৯ম রক্ষী বিমান ডিভিশনটি তার উড্ডয়ন ও অবতরণ ক্ষেত্র হিশেবে ব্যবহার করেছিল ব্রেসলাউ-বার্লিন মোটর সড়কটি।

পোল্যান্ড মুক্তকরণে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল পোলিশ সৈন্য দলের ইউনিটগুলো। পোলিশ যোদ্ধারা উচ্চ রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করে, বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দেয়। যুদ্ধক্ষেত্রে দৃঢ়তা লাভ করে সোভিয়েত আর পোলিশ যোদ্ধাদের সংগ্রামী সহযোগিতা।

পোলিশ জনগণ সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী বীরোচিত কীর্তিকে উচ্চ মূল্য দেয়। জার্মান-ফ্যাসিস্ট দখলদারদের কবল থেকে পোলিশ মাটির মুক্তির জন্য সংগ্রামে নিহত সোভিয়েত সৈন্যদের স্মৃতি কালজয়ী করে রাখার উদ্দেশে ওয়ার্শো এবং পোল্যান্ডের অন্যান্য শহরে নির্মিত হয়েছে গৌরবব্যঞ্জিত মনুমেণ্ট।

২। পূর্ব প্রাশিয়ায় এবং পূর্ব পমেরানিয়ায় জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীসমূহের পরাজয়

পূর্ব-প্রুশীয় অপারেশন
(১৯৪৫ সালের ১৩ জানুয়ারি — ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত)

অপারেশনটি পরিচালনা করে ২য় ও ৩য় বেলোরুশ ফ্রন্টের সৈন্যরা এবং ১ম বল্টিক ফ্রন্টের শক্তিসমূহের একাংশ। তাদের সহায়তা করে বল্টিক নৌ-বহর। এই অপারেশনের উদ্দেশ্য ছিল — পূর্ব প্রাশিয়ায় এবং পোল্যান্ডের উত্তরাংশে জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজগুলোকে বিধ্বস্ত করা।

নাৎসিরা ঠিক করেছিল যেকোন উপায়ে পূর্ব প্রাশিয়া দখলে রাখতে হবে। এই উদ্দেশ্যে তারা ছ'টি সুদৃঢ় অঞ্চল বিশিষ্ট অতি মজবুত একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে। তাদের সৈন্যদের গ্রুপিংটি গঠিত হয়েছিল বাহিনীসমূহের 'সেন্টার' গ্রুপ এবং ২৬ জানুয়ারি থেকে 'উত্তর' এই নতুন নামে অভিহিত গ্রুপটি নিয়ে (অধিনায়করা যথাক্রমে — কর্নেল-জেনারেল গ. রেইনগার্ড ও কর্নেল-জেনারেল ল. রেন্ডুলিচ)। ওগুলোতে ছিল ১টি ট্যাঙ্ক বাহিনী, ২টি ফিল্ড আর্মি ও ১টি বিমান বহর, সর্বমোট ৭ লক্ষ ৮০ হাজার লোক, ৮,২০০টি তোপ ও মর্টার কামান, ৭০০ ট্যাঙ্ক ও অ্যাসল্ট গান এবং ৭৫৫টি বিমান।

সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলীর পরিকল্পনা ছিল — দু'টি প্রবল আঘাত হানা: একটি ৩য় বেলোরুশ ফ্রন্টের শক্তি দিয়ে স্টালুপেনেন অঞ্চল থেকে মাজুরিয়ান হ্রদসমূহের উত্তরে ইনস্টেরবুর্গ ও কনিগ্‌স্‌বার্গ অভিমুখে এবং অন্যটি ২য় বেলোরুশ ফ্রন্টের শক্তি দিয়ে রজান ও সেরোৎস্ক ব্রিজ-হেডগুলো থেকে মাজুরিয়ান হ্রদসমূহের দক্ষিণে ম্লাভা ও মারিয়েনবুর্গ অভিমুখে। এই দু'টি আঘাত হানার উদ্দেশ্য ছিল — ভের্মাখ্‌টের বাকী শক্তিসমূহ থেকে বাহিনীসমূহের 'সেন্টার' গ্রুপটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া, সমুদ্রের দিকে হটিয়ে দেওয়া, ওটাকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া এবং বল্টিক নৌ-বহরের সঙ্গে সহযোগিতায় অংশে অংশে ধ্বংস করা। ফ্রন্ট দু'টির প্রধান আঘাতগুলো যদিও পরস্পরের থেকে ২ শতাধিক কিলোমিটার দূরে হানা হচ্ছিল, ওগুলোর ক্রিয়াকলাপ কিন্তু পুরোপুরিভাবে সমন্বিত ছিল। সমন্বয় সাধনের কাজ চালাচ্ছিল সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর সদর-দপ্তর মার্শাল আ. ভাসিলেভস্কির মাধ্যমে।

অপারেশনে অংশগ্রহণ করেছিল ১৪টি মিশ্র বাহিনী, ১টি ট্যাঙ্ক বাহিনী, ৫টি ট্যাঙ্ক ও মেকানাইজ্‌ড কোর, ২টি বিমান বাহিনী, সর্বমোট প্রায় ১৬ লক্ষ ৭০ হাজার লোক, ২৫,৪২৬টি তোপ ও মর্টার কামান, ৩,৮৫৯টি ট্যাঙ্ক ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গান, ৩,০৯৭টি বিমান।

১৩ জানুয়ারি সকাল বেলা সোভিয়েত সৈন্যরা আক্রমণ আরম্ভ করে। সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অধিকারী শত্রুর প্রবল প্রতিরোধ এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুন প্রতিরক্ষা ব্যূহের ট্যাকটিকেল এলাকা ভেদকরণের কাজটি চলে মন্থর গতিতে। ২য় বেলোরুশ ফ্রন্টে তা চলছিল দু-তিন দিন ধরে, ৩য় বেলোরুশ ফ্রন্টে — পাঁচ-ছয় দিন ধরে। ভেদকরণের কাজ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে ফ্রন্ট দু'টি অধিনায়করা রিজার্ভ থেকে ফৌজ নিয়ে

আসেন, বাহিনীসমূহের মোবাইল গ্রুপগুলো এবং ফ্রন্টের (৩য় বেলোরুশ ফ্রন্টের) একটি মোবাইল গ্রুপকে লড়াইয়ে নিযুক্ত করেন। কিন্তু শত্রুও তখন তার সমস্ত মজুত শক্তি ব্যবহার করেছিল।

পরে ফৌজগুলোর আক্রমণাভিযানের গতি ইনফেণ্ট্রি ফর্ম্যাশনগুলোর জন্য দিনে বেড়ে যায় ১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত এবং ট্যাংক ফর্ম্যাশনগুলোর জন্য ২২-২৬ কিলোমিটার। এর ফলে সোভিয়েত সৈন্যরা ১ ফেব্রুয়ারির দিকে শত্রুর সমগ্র পূর্ব-প্রুশীয় গ্রুপিংটিকে ঘিরে ফেলে তিন অংশে বিভক্ত করে দিতে সক্ষম হয়: হাইল্‌সবের্গ অংশে (২৩টি ডিভিশন, যার মধ্যে ছিল একটি ট্যাংক ও তিনটি মোটোরাইজ্‌ড ডিভিশন, দু'টি স্বতন্ত্র গ্রুপ ও একটি ব্রিগেড), কনিগ্‌স্‌বার্গ অংশে এবং জেমল্যান্ড অংশে। কেবল ২য় জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীর কিছু শক্তি পূর্ব পমেরানিয়ায় হটে যেতে পেরেছিল।

১০ ফেব্রুয়ারি থেকে দ্বিতীয় বেলোরুশ ফ্রন্টের প্রধান শক্তিসমূহ পূর্ব-পমেরানীয় অপারেশন শুরু করে, আর ৩য় বেলোরুশ ফ্রন্ট ২য় বেলোরুশ ফ্রন্ট থেকে প্রাপ্ত ৪টি বাহিনী নিয়ে ১ম বল্টিক ফ্রন্টের (২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে তা সৈন্যদের জেমল্যান্ড গ্রুপে রূপান্তরিত) সঙ্গে সম্মিলিতভাবে — শক্তির পুনর্বিন্যাসের পর — শত্রুর পূর্ব-প্রুশীয় গ্রুপিংটির বিলোপ সাধনের কাজে হাত দেয়। শত্রুর হাইল্‌সবের্গ গ্রুপিংটির বিলোপ ঘটানো হয় ১৯৪৫ সালের ১৩ থেকে ২৯ মার্চের মধ্যে, কনিগ্‌স্‌বার্গ গ্রুপিংটি বিলুপ্ত হয় ৬ থেকে ৯ এপ্রিলের মধ্যে এবং জেমল্যান্ড গ্রুপিংটি — ১৩ থেকে ২৫ এপ্রিলের মধ্যে।

পূর্ব-প্রুশীয় অপারেশনে শত্রুর পরিবেষ্টিত ও বিচ্ছিন্ন গ্রুপিংসমূহের বিলোপ সাধনের বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল এরূপ। প্রথমত, সমস্ত গ্রুপিংই অবস্থিত ছিল সুদৃঢ় অঞ্চলগুলোতে, ওদের কাছে ছিল বিপুল সংখ্যক তোপ এবং তারা অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ লাইনগুলো ধরে ব্যাপকভাবে চলাচল করতে পারত। অথচ সোভিয়েত সৈন্যরা পূর্ববর্তী লড়াইগুলোতে জনবলে ও অস্ত্রবলে প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, বৈষয়িক সামগ্রী ও গোলাবারুদের ভাণ্ডার প্রায় পুরোপুরিভাবে নিঃশেষিত করে ফেলেছিল। দ্বিতীয়ত, পরিবেষ্টিত গ্রুপিংসমূহের বিলোপ সাধনের কাজটি সম্পাদিত হচ্ছিল সুদীর্ঘ (১০৩ দিন) ও কঠোর লড়াইয়ে, এবং এই সমস্ত লড়াই চলছিল বনাকীর্ণ-জলাময় স্থানে ও আক্রমণাভিযানের পক্ষে প্রতিকূল আবহাওয়াতে। এ ছাড়া, এই গ্রুপিংগুলো সমুদ্রের দিক থেকে পুরোপুরিভাবে

অবরুদ্ধ ছিল না। তৃতীয়ত, পরিবেষ্টিত ফৌজগুলোর সঙ্গে মিলিত হতে এবং তাদের সঙ্গে স্থল পথে যোগাযোগ পুনর্স্থাপন করতে সচেষ্ট শত্রুর প্রবল প্রতিঘাত প্রতিহত করতে হয়েছিল সোভিয়েত সৈন্যদের। আক্রমণের সম্ভাব্য দিকটিতে কেবল শক্তি ও সামগ্রীর দ্রুত পুনর্বিন্যাসের কল্যাণেই সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী শত্রুকে প্রথমে থামিয়ে দিতে, আর তারপর তার উপর জোর আঘাত হেনে পূর্বাবস্থানে হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। কেবল কনিগ্স্বার্গের পশ্চিমেই শত্রু উপসাগর বরাবর একটি অনতিবৃহৎ করিডর গড়েছিল। কিন্তু তা বেশি দিন টেকে নি। ঝঞ্ঝাক্রমণকারী দল আর গ্রুপগুলোর সাহায্যে চার দিন ধরে শত্রুর পাকা ঘাঁটিগুলো বিধ্বংসকরণের কাজ চালানো হয়, এবং এর পরপরই শত্রুর কনিগ্স্বার্গ গ্যারিসনটি বিলোপ পায়।

কনিগ্স্বার্গে জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের পরাজয় হিটলারকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ক্রোধান্বিত হিটলার কনিগ্স্বার্গ দুর্গের সেনাপতি জেনারেল লাশকে তার অনুপস্থিতে (লাশকে তখন সোভিয়েত বাহিনী বন্দী করে ফেলেছিল) মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার হুকুম দেয়। ৪র্থ জার্মান ফিল্ড আর্মির অধিনায়ক জেনারেল ম্যুল্লেরকে পদচ্যুত করে তার জায়গায় জেনারেল ফন জাউকেনকে নিযুক্ত করা হয়।

অপারেশনে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করে বাল্টিক নৌ-বহর। জটিল মাইন ও আবহাওয়া পরিস্থিতি সত্ত্বেও নৌ-বহরের বিমানগুলো, ডুবো জাহাজ আর টর্পেডো বোটগুলো সাফল্যের সঙ্গে শত্রুর যোগাযোগ পথগুলোতে সামরিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত থেকে তার পরিবহণ ব্যবস্থাকে ব্যাহত করে। বিমান বাহিনীর ও জাহাজের আর্টিলারির আঘাত এবং নৌ-সৈনিকদের অবতরণ সোভিয়েত স্থলসেনার আক্রমণাভিযানে সহায়তা করে। কিন্তু জাহাজসমূহের প্রয়োজনীয় শক্তির অভাব হেতু নৌ-বহর সমুদ্রের দিকে হটিয়ে-দেওয়া জার্মান গ্রুপিংগুলোকে পুরোপুরিভাবে অবরোধ করতে পারে নি।

শত্রুর পূর্ব-প্রুশীয় গ্রুপিংটির ধ্বংসের বৃহৎ সামরিক তাৎপর্য ছিল। ভের্মাখ্টের বিশাল শক্তিকে অকেজো করে দেওয়া হয় (২৫টিরও বেশি ডিভিশন সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়, ১২টি ডিভিশন ৫০ থেকে ৭৫ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়), আর জার্মান নৌ-বহর কয়েকটি সামরিক নৌ-ঘাঁটি হারায়। পূর্ব-প্রুশীয় অপারেশন বার্লিন অপারেশনের সফল পরিচালনায় সহায়তা করেছিল।

আক্রমণাভিযানের সময় ৩য় বেলোরুশ ফ্রণ্টের সৈন্যরা কয়েকটি অনতিবৃহৎ বন্দী শিবির দখল করে নেয়। যেমন, দমনাউতে ২৮তম বাহিনী একটি ফ্যাসিস্ট মৃত্যু শিবির কবজা করে, — নাৎসিরা ওটাকে সামরিক হাসপাতাল বলে চালাচ্ছিল। ওখানে ছিল সোভিয়েত, ফরাসি, বেলজিয়ান, ইতালিয়ান ও পোলিশ বাহিনীর ৬৬৪ জন যুদ্ধবন্দী। শিবিরের চারিদিকে ছিল কাঁটা তারের বেড়া এবং তার পাহারায় ছিল এস-এস বাহিনীর সৈন্যরা। বন্দীদের উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার চালানো হত, তাদের প্রতি অত্যন্ত অসৎ ব্যবহার করা হত, তাদের পেছনে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হত। যুদ্ধবন্দীদের রাখা হয়েছিল অতি অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতিতে, তারা কোনরূপ চিকিৎসা পেত না। দিনে এক বার তাদের খেতে দেওয়া হত বীটের সূপ আর ২০০-২৫০ গ্রাম রুটি যা তৈরি করা হত বিভিন্ন কৃত্রিম বস্তু দিয়ে ও কাঠের গুঁড়ো মিশিয়ে। অসুস্থ এবং হীনবল লোকেদের গুলি করে মেরে ফেলা হত। সোভিয়েত যুদ্ধবন্দীদের জন্য ছিল বিশেষ কঠোর ব্যবস্থা, শিবিরের অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে তারা যাতে মেলামেশা করতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে নাৎসিরা তাদের রেখেছিল আলাদা ব্যারাকে।

যুদ্ধকলার বিচারে অপারেশনটি পরিচালিত হয়েছিল চূড়ান্ত উদ্দেশ্য নিয়ে, পরস্পরের থেকে দূরে অবস্থিত ফ্রণ্টগুলোর প্রধান আঘাতের দিকসমূহ নির্বাচন করা হয়েছিল নির্ভুলভাবে এবং বিমান বাহিনী ও বল্টিক নৌ-বহরের সঙ্গে স্থলসেনার সহযোগিতা ছিল নিখুঁত।

শত্রুকে পরিবেষ্টনের কাজটি চলছিল বিচ্ছিন্নকারী আঘাত হানার মাধ্যমে, যার উদ্দেশ্য ছিল জার্মানদের বল্টিক সাগরের দিকে হটিয়ে দেওয়া। পরিবেষ্টিত নাৎসি গ্রুপিংসমূহের বিলোপ সাধনের কাজ চলছিল নিরবচ্ছিন্নভাবে, এবং প্রতিটি গ্রুপিংকে ধ্বংস করার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল সাধারণ স্ট্র্যাটেজিক পরিকল্পনার এক-একটি স্বতন্ত্র অপারেশনের। এই সমস্ত স্বতন্ত্র অপারেশনের আগে সম্পন্ন হত ফৌজের পুনর্বিন্যাস। যেমন, কনিগস্‌বার্গ অপারেশনে অল্প সময়ের মধ্যে পুনর্বিন্যস্ত হয়েছিল ৫টি মিশ্র বাহিনী, এবং এর মধ্যে ৩টি বাহিনী তিন-চার রাত্রে ১০০ থেকে ১৬০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। কনিগস্‌বার্গের উপর ঝঞ্ঝাক্রমণের সময় দূর পাল্লার বিমান বাহিনী সেই প্রথম বার দিনের বেলা শহরের উপর বোমাবর্ষণ করছিল।

পূর্ব প্রাশিয়ায় ঘটনা-প্রবাহ বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল কুর্ল্যাণ্ডে সোভিয়েত সৈন্যদের সামরিক ক্রিয়াকলাপ, — ওখানে

বল্টিক অপারেশনের ফলে জার্মানদের বৃহৎ শক্তিকে সমুদ্রের দিকে হটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পাঁচ মাসেরও বেশি কাল ধরে শত্রু সৈন্যের সঙ্গে চলে কঠোর লড়াই। এর ফলে জার্মান সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলী সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ওই সৈন্যদের ব্যবহার করতে পারে নি। ৮ মে কুর্ল্যান্ড গ্রুপিংটি আত্মসমর্পণ করে। সোভিয়েত সৈন্যরা ২ লক্ষ নাৎসি সৈনিক আর অফিসারকে নিরস্ত্র ও বন্দী করে।

পূর্ব-পমেরাণীয় অপারেশনটি

২য় ও ১ম বেলোরুশ ফ্রণ্টের সৈন্যরা বল্টিক নৌ-বহরের সহায়তায় পূর্ব-পমেরাণীয় অপারেশনটি সম্পন্ন করে ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ এপ্রিল তারিখের মধ্যে।

১৯৪৫ সালের জানুয়ারির শেষ দিকে ১ম বেলোরুশ ফ্রণ্টের সৈন্যরা ওডের নদী অতিক্রম করে তার পশ্চিম তীরে একটি ব্রিজ-হেড দখল করে নেয়। তাদের এবং ২য় বেলোরুশ ফ্রণ্টের মধ্যে শতাধিক কিলোমিটারের ব্যবধান সৃষ্টি হয়। জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী তাড়াহুড়ো করে বাহিনীসমূহের 'ভিস্টুলা' গ্রুপটির (অধিনায়ক — রাইখসফিউরের হেনরিখ হিমলের) শক্তিসমূহের একটি অংশকে পূর্ব পমেরাণিয়ায় মোতায়েন করতে আরম্ভ করে। এতে ছিল ৩টি বাহিনী — ২২টি ডিভিশন, যার মধ্যে ৪টি ট্যাঙ্ক ও ২টি মোটোরাইজ্‌ড ডিভিশন, — এবং তাদের উদ্দেশ্য ছিল ১ম বেলোরুশ ফ্রণ্টের ডান পার্শ্বে আঘাত হানা ও বার্লিন অভিমুখে তার আক্রমণাভিযান ব্যাহত করা।

সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী পূর্ব পমেরাণিয়ায় জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের বৃহৎ সমাবেশ লক্ষ্য করে ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৪টি মিশ্র বাহিনী, ১টি বিমান বাহিনী, ২টি ট্যাঙ্ক, ১টি মেকানাইজ্‌ড ও ১টি অশ্বারোহী কোর নিয়ে গঠিত ২য় বেলোরুশ ফ্রণ্টকে (অধিনায়ক — মার্শাল ক. রকোসভস্কি) শত্রুর পূর্ব-পমেরাণীয় গ্রুপিংটিকে বিধ্বস্ত করার, ডানজিগ ও গ্দিনিয়া বন্দরগুলো কবজা করার এবং বল্টিক উপকূলকে শত্রুমুক্ত করার হুকুম দেন।

পূর্ব-প্রুশীয় অপারেশনের প্রথম ধাপের পর কোনরূপ বিরতি ব্যতিরেকেই ১০ ফেব্রুয়ারি আক্রমণাভিযানে লিপ্ত হয়ে ২য় বেলোরুশ ফ্রণ্টের সৈন্যরা শত্রুর প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হল। শত্রুর প্রতিরক্ষা

ব্যূহ ভেদকরণের লড়াই দীর্ঘ কাল ধরে চলতে থাকল। বনাকীর্ণ-জলাময় স্থানের কঠিন পারিস্থিতিতে দশ দিন ব্যাপী কঠোর ও অটল লড়াই চলাকালে ফ্রণ্টের সৈন্যরা স্রেফ ৪০ থেকে ৭০ কিলোমিটার অগ্রসর হতে পেরেছিল এবং আক্রমণাভিযান বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিল। এদিকে তখন জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে পূর্ব পমেরাণিয়ায় প্রায় ৪০টি ডিভিশনের সমাবেশ ঘটায়, আর ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে স্টারগার্ডের দক্ষিণে অবস্থিত এক অঞ্চল থেকে ৬টি ডিভিশনের শক্তি দিয়ে ১ম বেলোরুশ ফ্রণ্টের ডান পার্শ্বের উপর প্রতিঘাত হানে এবং ৪৭তম বাহিনীটিকে ৮-১২ কিলোমিটার হটিয়ে দিয়ে পিরিটস ও বান শহরগুলো দখল করে নেয়। সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী বুঝতে পারলেন যে শত্রুর পূর্ব-পমেরাণীয় গ্রুপিংটি বিধ্বস্তকরণের পক্ষে কেবল এক ২য় বেলোরুশ ফ্রণ্টের শক্তিই যথেষ্ট নয়। সেই জন্য বাহিনীসমূহের 'ভিস্টুলা' গ্রুপটিকে বিধ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে তাঁরা ১ম বেলোরুশ ফ্রণ্টের ডান পার্শ্বের সৈন্যদেরও লড়াইয়ে নিযুক্ত করেন।

২৪ ফেব্রুয়ারি ২য় বেলোরুশ ফ্রণ্ট সর্বোচ্চ সদর-দপ্তরের রিজার্ভের ১৯শ বাহিনী ও একটি ট্যাঙ্ক কোরের সমর্থন পেয়ে সেমপেলবুর্গের উত্তরে অবস্থিত এক অঞ্চল থেকে কিওসলিন অভিমুখে আঘাত হানে, আর ১ মার্চ তারিখে আর্নসভাল্ডে অঞ্চল থেকে ফোলবের্গ অভিমুখে আঘাত হানে ১ম বেলোরুশ ফ্রণ্ট, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল পোলিশ ফৌজের ১ম বাহিনী। ৫ মার্চের দিকে সোভিয়েত সৈন্যরা পূর্ব-পমেরাণীয় গ্রুপিংটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দেয় এবং বল্টিক সমুদ্রোপকূলে পৌঁছে যায়। পরে ১ম বেলোরুশ ফ্রণ্টের সৈন্যরা ওডের নদীর মোহানার দিকে আক্রমণাভিযান চালায় এবং তারা সেখানে পৌঁছে যায় ২০ মার্চ আর ২য় বেলোরুশ ফ্রণ্টের সৈন্যরা ঘুরে যায় উত্তর-পূর্ব দিকে। ২৮ মার্চ কঠোর লড়াইয়ের পর মুক্ত হয় গ্দিনিয়া, আর তার দু'দিন বাদে ২য় বেলোরুশ ফ্রণ্টের সৈন্যরা ডানজিগ দখল করে নেয়। গ্দিনিয়া অঞ্চলে ২য় জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীর অবরুদ্ধ অবশিষ্ট শক্তিগুলো এপ্রিলের গোড়াতে পুরোপুরিভাবে বিধ্বস্ত ও বন্দী হয়। গ্দিনিয়া ও ডানজিগ সমুদ্র বন্দরগুলো দখলকরণে ২য় বেলোরুশ ফ্রণ্টকে সহায়তা করেছিল বল্টিক নৌ-বহর।

পূর্ব-পমেরাণীয় অপারেশনের ফলে শত্রু খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়: বিধ্বস্ত হয় ২১টিরও বেশি ডিভিশন ও ৮টি ব্রিগেড। ২য় বেলোরুশ ফ্রণ্টের সৈন্যরা বন্দী করে ৬৩ হাজার ৫ শতাধিক জার্মান সৈনিক আর

অফিসারকে, কবজা করে প্রায় ৬৮০টি ট্যাঙ্ক ও অ্যাসল্ট গান, ৩,৪৭০টি তোপ ও মর্টার কামান, ৪৩১টি বিমান এবং অন্যান্য বহু হাতিয়ারপত্র আর অস্ত্রশস্ত্র। পমেরাণিয়ায় জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলীর পরিকল্পনাগুলোর ব্যর্থতার দরুন হিমলেরকে বাহিনীসমূহের 'ভিস্টুলা' গ্রুপের সেনাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তার স্থান গ্রহণ করল জেনারেল গটার্ড হেইনরিটসি।

এই অপারেশনে পোলিশ সৈন্যদের অবদানকে উচ্চ মূল্য দিয়ে সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী ১ম পোলিশ ট্যাঙ্ক ব্রিগেডকে লাল পতাকা অর্ডারে ভূষিত করেন।

পূর্ব-পমেরাণীয় অপারেশনের ছিল বৃহৎ স্ট্র্যাটেজিক তাৎপর্য। প্রথমত, তা পরিচালিত হওয়ার ফলে ওডের নদীতে উপনীত ১ম বেলোরুশ ফ্রন্টের ফৌজগুলোর পার্শ্বদেশে শত্রুর আঘাতের সম্ভাবনা দূরীকৃত হয়। দ্বিতীয়ত, পোল্যাণ্ডকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় বড় বড় শহর ও বন্দর সহ সমগ্র পোলিশ বাল্টিক উপকূল। তৃতীয়ত, সমুদ্রের দিক থেকে শত্রুর কুর্ল্যাণ্ড গ্রুপিংটি পরিবেষ্টনের পক্ষে বাল্টিক নৌ-বহরের সুযোগসম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। চতুর্থত, ১০টি বাহিনী কর্মমুক্ত হল, ওগুলোকে বার্লিন অভিমুখে প্রেরণের জন্য পুনর্বিন্যাস করা সম্ভব হল, এতে বার্লিন অপারেশন পরিচালনার পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে উঠল।

পূর্ব-পমেরাণীয় অপারেশনের মুখ্য বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে এই যে তাতে অংশগ্রহণকারী উভয় ফ্রন্টের আক্রমণাভিযান চলে বিভক্ত অভিমুখে এবং এতে পূর্ব-পমেরাণীয় গ্রুপিংটিকে অংশে অংশে বিধ্বস্ত করার সুযোগ মেলে।

৩। অস্ট্রিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়ার মুক্তি

ভিয়েনা অভিমুখে আক্রমণাভিযান (১৯৪৫ সালের ১৬ মার্চ — ১৫ এপ্রিল)

ভিয়েনা আক্রমণাত্মক অপারেশনের উদ্দেশ্য ছিল — পশ্চিম হাঙ্গেরিতে জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজ বিধ্বস্তকরণের কাজ সম্পন্ন করা এবং অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা দখল করা। সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী অপারেশনে নিযুক্ত করেন মার্শাল ফ. তলবুখিনের ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টকে (এতে ছিল ৬টি মিশ্র বাহিনী, ১টি ট্যাঙ্ক ও ১টি বিমান বাহিনী, ২টি ট্যাঙ্ক কোর,

১টি মেকানাইজ্‌ড ও ১টি অশ্বারোহী কোর এবং মার্শাল র. মালিনোভ্‌স্কির ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের বাম পার্শ্বের ফৌজগুলোকে (তাতে ছিল ৪৬তম বাহিনী, ২য় রক্ষী মেকানাইজ্‌ড কোর, ডানিয়ুব ফ্লোটিল্যা ও ৫ম বিমান বাহিনী।

সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর সদর-দপ্তরের পরিকল্পনা ছিল — ফ্রন্টসমূহের সন্নিহিত পার্শ্বদেশগুলোতে দু'টি প্রবল আঘাত হানা: ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের ৯ম ও ৪র্থ রক্ষী বাহিনী দু'টির শক্তিসমূহ দিয়ে পাপা আর শপরন অভিমুখে এবং ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের ৪৬তম বাহিনী আর ২য় রক্ষী মেকানাইজ্‌ড কোরের শক্তিসমূহ দিয়ে দিওর অভিমুখে। পরে উভয় ফ্রন্টের সৈন্যদের ভিয়েনা অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার কথা ছিল।

সোভিয়েত ফৌজের বিরুদ্ধে খাড়া ছিল জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীসমূহের 'দক্ষিণ' গ্রুপটি (অধিনায়ক ইনফেণ্ট্রি জেনারেল ও. ভেলের) যা গঠিত হয়েছিল ৩য় হাঙ্গেরীয় বাহিনী এবং জার্মানদের ৬ষ্ঠ ফিল্ড, ৬ষ্ঠ ও ২য় ট্যাঙ্ক আর্মিগুলোকে নিয়ে। দক্ষিণে ১ম বুলগেরীয় ও ৩য় যুগোস্লাভ বাহিনীর সম্মুখে লড়ছিল জার্মান 'F' গ্রুপের একটি অংশ। জার্মান-ফ্যাসিস্ট সৈন্যের গ্রুপিংটিকে সমর্থন জোগাচ্ছিল ৭০০টি প্লেন নিয়ে গঠিত ৪র্থ বিমান বহরটি।

১৬ মার্চ প্রবল প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণের পর ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের আক্রমণকারী গ্রুপিংয়ের সৈন্যরা সেকেশফেখেরভারের উত্তরে অবস্থিত একটি অঞ্চল থেকে আক্রমণাভিযান আরম্ভ করে। শত্রুর পক্ষে এ ছিল এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। পরের দিন আক্রমণাভিযান শুরু করে ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের আক্রমণকারী গ্রুপের ফৌজগুলো। সোভিয়েত সৈন্যরা শত্রু প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে জার্মান বাহিনীসমূহের 'দক্ষিণ' গ্রুপটিকে পর্যুদস্ত করে দেয় এবং ভিয়েনার উপকণ্ঠে পৌঁছে যায়। ৬ এপ্রিল ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সৈন্যরা যুগপৎ কয়েকটি দিক থেকে ভিয়েনা অভিমুখে আঘাত হানে: দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে। ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের ৪৬তম বাহিনী আক্রমণ চালাচ্ছিল ডানিয়ুব নদীর বাঁ তীর বরাবর।

বেসামরিক জনতার অনর্থক প্রাণহানি এড়ানোর উদ্দেশ্যে এবং বহু ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ সম্বলিত শহরটিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ৩য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সেনাপতিমণ্ডলী ভিয়েনার বাসিন্দাদের কাছে একটি আবেদন জানান। তাতে শহরবাসীদের অনুরোধ করা হয় আপন আপন

বাসস্থানে থাকতে, সোভিয়েত যোদ্ধাদের সাহায্য করতে এবং জার্মান-ফ্যাসিস্ট সৈন্যদের শহরটি ধ্বংস করতে না দিতে। আবেদনে যে-কথাটির উপর জোর দেওয়া হয় তা হল এই যে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী অস্ট্রিয়ার ভূখণ্ডে পদার্পণ করেছে ফ্যাসিস্ট ফৌজগুলোকে বিধ্বস্তকরণের ও দেশকে জার্মানির অধীনতা থেকে মুক্তকরণের উদ্দেশ্যে, সোভিয়েত সৈন্যরা অস্ট্রিয়ায় ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ নাৎসি আক্রমণের আগে পর্যন্ত যে সমাজ ব্যবস্থা ছিল তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করবে, আর ন্যাশন্যাল-সোশ্যালিস্ট পার্টিকে ভেঙে দেওয়া হবে এবং তার সাধারণ সদস্যরা যদি সোভিয়েত বাহিনীর প্রতি নিজেদের আনুগত্য প্রকাশ করে তাহলে তাদের প্রতি কোনরূপ দমন নীতি অনুসরণ করা হবে না।

এপ্রিল মাসে সোভিয়েত সরকার একটা বিবৃতি প্রকাশ করেন যাতে অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতার বিষয়ে মিত্রদের মস্কো ঘোষণাপত্রটি মেনে চলার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করা হয়।* এই বিবৃতিটি অস্ট্রীয় জনগণের মনে বিপুল আনন্দ ও আশার সঞ্চার করে।

১৩ এপ্রিল তারিখে ভিয়েনা নগরী জার্মান-ফ্যাসিস্ট দখলদারদের কবল থেকে মুক্ত হয়। শত্রুর বিধ্বস্ত ইউনিট আর ফর্ম্যাশনগুলোর পশ্চাদনুসরণ করতে করতে উভয় ফ্রন্টের সৈন্যরা ১৫ এপ্রিলের দিকে মরাভা নদীর তীরে, শ্তক্কেরাউ শহরে ও মারিবরের পূর্বাঞ্চলে পৌঁছে যায় এবং পরে দ্রাভা নদীর উত্তর তীর বরাবর যুদ্ধ-সীমায় অগ্রসর হতে থাকে।

ভিয়েনা অপারেশনের ফলে সোভিয়েত বাহিনীগুলো হাঙ্গেরিকে পুরোপুরিভাবে মুক্ত করে এবং রাজধানী ভিয়েনা সহ অস্ট্রিয়ার পূর্বাংশ মুক্তকরণের কাজ সম্পন্ন করে। শত্রুর ৩২টি ডিভিশন বিধ্বস্ত হয়, ১ লক্ষ ৩০ হাজার জার্মান সৈনিক আর অফিসার বন্দী হয়, বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সাজসরঞ্জাম দখল করা হয়। অস্ট্রিয়া মুক্তকরণের জন্য লড়াইয়ে সোভিয়েত ফৌজের ২৬ হাজার লোক নিহত হয়। জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীর বলকান গ্রুপিংটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তাড়াহুড়ো করে পশ্চাদনুসরণ করতে বাধ্য হয়। অস্ট্রীয় জনগণ ফ্যাসিস্ট দাসত্বের কবল থেকে মুক্ত হয়। অস্ট্রীয় রাষ্ট্রিকতার পুনরুজ্জীবনের সূত্রপাত ঘটে।

* দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র নীতি। দলিল ও কাগজপত্র। খণ্ড ৩, পৃঃ ১৭১।

লাল ফৌজ অস্ট্রিয়ার জনগণকে বিপুল সহায়তা দেয়। ভিয়েনা অঞ্চলে সোভিয়েত যোদ্ধারা ডানিয়ুব নদীর উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ সেতুগুলো পুনর্স্থাপন করে, ডানিয়ুবের অস্ট্রীয় অংশের জাহাজ চলাচল পথটি মাইনমুক্ত করে, জলমগ্ন ১২৮টি জাহাজ উপরে তুলে দেয়, বন্দরগুলোর ৩০ শতাংশ ক্রেন ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম পুনর্স্থাপন করে, ১,৭১৯ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথ, ৪৫টি রেল সেতু, ২৭টি ডিপো পুনর্স্থাপন করে, অস্ট্রিয়াবাসীদের সঙ্গে মিলে ৩ শতাধিক স্টিম ইঞ্জিন ও প্রায় ১০ হাজার ওয়াগন মেরামত করে।

জনগণের দুর্দশার কথা বিবেচনা করে সোভিয়েত ইউনিয়ন অস্ট্রিয়াকে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য দিয়ে সাহায্য করল। নাৎসিদের কবল থেকে মুক্ত অঞ্চলসমূহে সোভিয়েত সৈন্যরা স্থানীয় লোকেদের শান্তিপূর্ণ কর্মজীবন আরম্ভ করতে সহায়তা করে। ১৯৪৫ সালের ১৬ মে অস্থায়ী অস্ট্রীয় সরকার প্রধান ক. রেন্নার ই. স্তালিনের কাছে প্রেরিত এক পত্রে লেখেন: '...নাৎসিদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত অস্ট্রীয় রাষ্ট্রিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা যে-গতিতে চলছে আমি তাতে খুবই সন্তুষ্ট, এবং আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে এ ব্যাপারে আমায় সাহায্য প্রদান করেছে সেই লাল ফৌজের সমর্থন, যে আমাদের ক্রিয়াকলাপের স্বাধীনতা সীমিত করে নি।*

চেকোস্লোভাকিয়ার মাটিতে

পশ্চিম-কার্পেথীয় অপারেশনটি চলে ১৯৪৫ সালের ১২ জানুয়ারি থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। তা পরিচালিত হয় ৪র্থ ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সৈন্যদের দ্বারা ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সঙ্গে সহযোগিতায় এবং ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সহায়তায়।

কার্পেথিয়ার পার্বত্য-বনাকীর্ণ অঞ্চল, তুষারপাত, বৃষ্টি, কুয়াশা এবং শত্রুর আগে-থেকে-প্রস্তুত সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সৈন্যদের আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপে বাধা সৃষ্টি করছিল। কিন্তু এই সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও সোভিয়েত সৈন্যরা শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করে সম্মুখাভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। সাফল্যের সঙ্গে লড়ছিল ১ম চেকোস্লোভাক ফৌজী কোর।

২৮ জানুয়ারি পপ্রাদ শহর মুক্ত করে তা ভাগ নদীর উপত্যকার উপর দিয়ে আক্রমণাভিযান চালিয়ে যায় রুজেমবেরোক অভিমুখী পথটি ধরে। নাৎসিরা ওখানে একাধিক দৃঢ় ঘাঁটি সমেত গভীর একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল এবং ভাগ নদীর উপত্যকাটি পুরোপুরিভাবে বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু আপন মাতৃভূমি মুক্তকরণে লিপ্ত চেকোস্লোভাক যোদ্ধাদের আক্রমণাভিযান কিছুই রুখতে পারে নি। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে কোরটি পৌঁছে যায় লিপ্তভ্স্কি ও সাণ্ট মিকুলাশের কাছে। এতে তাকে সক্রিয় সহায়তা জোগায় পার্টিজানরা।

৪র্থ ও ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টগুলোর সৈন্যদের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির আক্রমণাভিযানের ফলে মুক্ত হয়েছিল চেকোস্লোভাকিয়ার কশিৎসে, প্রেশোভ ও বান্স্কো বিস্ত্রিৎসা জেলাগুলো, যেখানে বাস করত ১৫ লক্ষ লোক। 'সেণ্টার' ও 'দক্ষিণ' গ্রুপ দু'টির পাঁচটি জার্মান বাহিনীকে বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। সোভিয়েত সৈন্যরা ১ লক্ষ ৩৭ সহস্রাধিক নাৎসি সৈনিক ও অফিসারকে বন্দী করে। এ ছাড়া পাওয়া যায় ২৩০টি তোপ ও মর্টার কামান, ৩২০টি ট্যাঙ্ক ও অ্যাসল্ট গান, ৬৫টি বিমান, এবং অন্যান্য বহু হাতিয়ারপত্র ও সামরিক সাজসরঞ্জাম। মরাভস্কা-ওস্ত্রাভা শিল্পাঞ্চলটি মুক্তকরণের জন্য অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে তোলা হয়।

মরাভস্কা-ওস্ত্রাভা অপারেশন
(১৯৪৫ সালের ১০ মার্চ — ৫ মে পর্যন্ত)

এই অপারেশনটি পরিচালিত হয় ৪র্থ ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের সৈন্যদের দ্বারা (অধিনায়ক জেনারেল ই. পেত্রোভ, ২৫ মার্চ থেকে — জেনারেল আ. ইয়েরেমেঙ্কো)। অপারেশনের উদ্দেশ্য ছিল — জার্মান-ফ্যাসিস্ট সৈন্যদের জেনারেল হেইনরিটসির আর্মি গ্রুপটিকে বিধ্বস্ত করা এবং মরাভস্কা-ওস্ত্রাভা শিল্পাঞ্চলটি অধিকার করা। সোভিয়েত সৈন্যদের পাশাপাশি লড়ছিল জেনারেল ল. স্ভোবোদার (এপ্রিলের গোড়া থেকে — জেনারেল ক. ক্লাপালেকের) সেনাপতিত্বাধীন ১ম চেকোস্লোভাক আর্মি কোরটি।

ফ্রণ্টকে আক্রমণাভিযান চালানোর কথা ছিল পার্বত্য-বনাকীর্ণ অঞ্চলের কঠিন পরিস্থিতিতে। তাকে শত্রুর বিরুদ্ধে শক্তি ও সামগ্রীতে সামান্য শ্রেষ্ঠতা নিয়ে (ইনফেণ্ট্রিতে — ১·৭ গুণ, আর্টিলারিতে — ২ গুণ, ট্যাঙ্ক

ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গানে — ১·৮ গুণ এবং বিমানে — ৩·৪ গুণ) শত্রুর আগে-থেকে-প্রস্তুত দৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটি ভেদ করতে হবে।

১০ মার্চ তারিখে ফ্রন্টের সৈন্যরা আক্রমণাভিযান আরম্ভ করে। শুরু হয় প্রবল, রক্তক্ষয়ী লড়াই। শত্রুর কঠোর প্রতিরোধ দমন করে ফ্রন্ট দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যায় এবং পুরো মার্চ মাসে শত্রুকে বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

সোভিয়েত সৈন্যরা যেখানেই পদার্পণ করছিল সেখানেই স্থানীয় লোকেদের নিঃস্বার্থ সহায়তা ও সমর্থন জোগাচ্ছিল। মুক্তিপ্রাপ্ত অঞ্চলসমূহে — যেখানে কয়েক বছর ধরে হিটলারী হানাদারেরা লুটতরাজে আর ধ্বংসলীলায় লিপ্ত ছিল — সোভিয়েত যোদ্ধারা শহর ও গ্রামগুলোর বাসিন্দাদের যুদ্ধজনিত ক্ষত দূর করে জীবন স্বাভাবিক করে তুলতে সাহায্য করছিল। সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর ইউনিটগুলো তাদের জন্য সরবরাহ করছিল ময়দা, চিনি, জ্বালানি: বাড়িগুলো, পুল আর রেলসেতুগুলো মাইনমুক্ত করছিল, মোটর ও রেল সড়ক ইত্যাদি মেরামত করছিল। এ ছিল চেকোস্লোভাক জনগণের প্রতি সোভিয়েত দেশের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ অনুভূতির উজ্জ্বল অভিব্যক্তি।

এপ্রিলের গোড়াতে চেকোস্লোভাক জনগণের জীবনে এক ঐতিহাসক ঘটনা ঘটল: দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ প্রথম জাতীয় ফ্রন্ট সরকার গঠন করল, যাতে প্রধান প্রধান মন্ত্রী পদগুলো পেল কমিউনিস্টরা। ৫ এপ্রিল তারিখে কশিৎসে শহরে নতুন সরকারের অধিবেশন বসে, এবং তাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয় জাতীয় ফ্রন্টের কর্মসূচি, যা চেকোস্লোভাক জনগণের সামনে খুলে দেয় সমাজতন্ত্রের পথ।

কর্মসূচিতে জার্মান-ফ্যাসিস্ট দখলদারদের কবল থেকে চেকোস্লোভাকিয়া মুক্তকরণের কাজে লাল ফৌজের অবদানের এবং চেকোস্লোভাক জনগণের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিতকরণে তার চূড়ান্ত ভূমিকার উচ্চ মূল্যায়ন করা হয়েছিল, এবং তাতে সোভিয়েত যোদ্ধাদের সাহসিকতা ও বীরত্বকে ন্যায্য প্রতিদান দেওয়া হয়েছিল।

সরকার গঠন এবং কশিৎসে কর্মসূচি গ্রহণ উপলক্ষে চেকোস্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি জনগণের উদ্দেশে একটি আবেদন পত্র প্রকাশ করে। তাতে বলা হয়: 'সমস্ত শক্তি দিয়ে আমাদের মুক্তিদাতা লাল ফৌজকে সাহায্য করুন এবং নতুন চেকোস্লোভাক বাহিনীতে ভর্তি

হোন। রেলপথ, মোটর সড়ক, সেতু, টেলিগ্রাফ, অর্থাৎ যাকিছু ফ্রণ্টের কাজে লাগবে তা-ই পুনর্স্থাপন করুন...'*

এপ্রিলেও কঠোর লড়াই চলে। শত্রুর দৃঢ় প্রতিরোধ ভেঙে দিয়ে ২১ এপ্রিল ফ্রণ্টের সৈন্যরা মরাভস্কা-ওস্ত্রাভার বহির্ভাগের প্রতিরক্ষা বেষ্টনীর কাছে পৌঁছে যায় এবং শহরের উপকণ্ঠে লড়াই শুরু করে দেয়। সোভিয়েত সৈন্যদের পাশাপাশি লড়ছিল চেকোস্লোভাক যোদ্ধারা। যেমন, ৩৮তম বাহিনীর পাশে থেকে সংগ্রাম করছিল ১ম স্বতন্ত্র চেকোস্লোভাক ট্যাংক ব্রিগেডের যোদ্ধারা। ওডের নদীর পশ্চিম তীরের লড়াইয়ে তারা বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছিল — ওখানে তারা নাৎসিদের অনেকগুলো পাল্টা-আক্রমণ প্রতিহত করেছিল। আর ১৮শ বাহিনীর পাশাপাশি লড়ছিল ১ম চেকোস্লোভাক আর্মি কোর যা ওই সময়ে কঠোর লড়াইয়ের পর জিলিনের উপকণ্ঠে পৌঁছে গিয়েছিল।

স্থলসেনাকে বিপুল সহায়তা জোগায় ৮ম বিমান বাহিনী এবং তার সঙ্গে সম্মিলিত সংগ্রামে লিপ্ত ১ম চেকোস্লোভাক বিমান ডিভিশনটি। তারা ২,৫৮৯ বিমান-উড্ডয়ন চালিয়ে শত্রুর যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, সামরিক সাজসরঞ্জাম ও গোলাবারুদ ধ্বংস করে দেয়।

২৬ এপ্রিল তারিখে মরাভস্কা-ওস্ত্রাভা শহর অভিমুখে আরম্ভ হয় চূড়ান্ত আক্রমণাভিযান। আক্রমণাভিযান আরম্ভ হওয়ার আগে ৪র্থ ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের অধিনায়কের ওবজারভেশন পোস্টে আসেন চেকোস্লোভাক কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ক্লেমেন্ত গতওয়ালদ, চেকোস্লোভাকিয়ার সরকার প্রধান জ্‌দেনেক ফির্লিনগের ও জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল লিউদভিগ স্‌ভোবোদা, যাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানায় সোভিয়েত ও চেকোস্লোভাক যোদ্ধারা। চেকোস্লোভাক ট্যাংক ব্রিগেডের সেনাপতি লেফটেনেণ্ট-কর্নেল ভ. ইয়ানকোর সঙ্গে আলাপের সময় ক্লেমেন্ত গত্‌ওয়ালদ বলেন যে সোভিয়েত ট্যাংকে করে দেশকে মুক্ত করা হচ্ছে চেকোস্লোভাক যোদ্ধাদের পক্ষে এক মহা সম্মানের বিষয়। যুদ্ধে গমনরত ট্যাংক ব্রিগেডের অফিসারদের বিদায় জানানোর সময় ফ্রণ্টের অধিনায়ক জেনারেল ইয়েরেমেংকোও তাদেরই প্রথমে ওস্ত্রাভায় ঢুকতে বলেন। ক্লেমেন্ত গতওয়ালদ ও ফ্রণ্টের অধিনায়কের কথাগুলো চেকোস্লোভাক

যোদ্ধাদের মনে গভীর ছাপ ফেলে। আক্রমণাভিযান সফল হয়।

৩০ এপ্রিল ১ম রক্ষী বাহিনী ও ৩৮তম বাহিনী মরাভস্কা-ওস্ত্রাভা শহরটি অধিকার করে ফেলে, আর ১৮শ বাহিনী দখল করে নেয় জিলিন শহর যা হচ্ছে পশ্চিম কার্পেথিয়ায় সড়কসমূহের গুরুত্বপূর্ণ এক সঙ্গমস্থল।

মরাভস্কা-ওস্ত্রাভার মুক্তি সামরিক ক্রিয়াকলাপের গতিতে আমূল পরিবর্তন সূচিত করে। সুদৃঢ় একটি অঞ্চল থেকে বঞ্চিত হয়ে নাৎসিরা এই অভিমুখে আর কোন দৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়তে পারে নি। ৬ মে তারিখে ৪র্থ ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট স্টের্নবের্গ শহর অধিকার করে নেয় এবং ওলমউৎস শহরের উপকণ্ঠে পেশছে যায়। ওলমউৎস অভিমুখে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে অগ্রসর হচ্ছিল ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সৈন্যরা। পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ার ভয়ে জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজ তাড়াহুড়ো করে মরাভস্কা-ওস্ত্রাভা শিল্পাঞ্চল থেকে পশ্চাদপসরণ করতে শুরু করেছিল।

অপারেশনটি পরিচালনা করে ৪র্থ ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সৈন্যরা মরাভস্কা-ওস্ত্রাভা শিল্পাঞ্চল দখল করে নেয়। চেকোস্লোভাকিয়ার মধ্যাঞ্চলের দিকে পরবর্তী আক্রমণাভিযানের পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে ওঠে। নাৎসিদের লক্ষাধিক সৈনিক ও অফিসার নিহত হয় এবং দেড় লক্ষাধিক লোক বন্দী হয়। ধ্বংস ও কবজা করা হয় ৪,০০০ তোপ, ১,৫৭০টি মর্টার কামান, ১,০৮৭টি ট্যাংক ও অ্যাসল্ট গান, ৭৩৭টি বিমান।

ব্রাতিস্লাভা-ব্রনো অপারেশনটি পরিচালিত হয় ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের ডান পাশ্বের (এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ১ম ও ৪র্থ রুমানীয় বাহিনী) সৈন্যদের দ্বারা — ১৯৪৫ সালের ২৫ মার্চ থেকে ৫ মে পর্যন্ত কালপর্যায়ের মধ্যে। সৈন্যদের সামনে ছিল শত্রুর আগে-থেকে-প্রস্তুত সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটি। পাহাড়পর্বত এবং গ্রন, নিত্রা, ভাগ আর মরাভা নদীর সুবিধাজনক প্রাকৃতিক যুদ্ধ-সীমায় অবস্থিত এই প্রতিরক্ষা ব্যূহটি ভেদ করা সহজ কাজ ছিল না।

চেকোস্লোভাকিয়ার ভূখণ্ডে ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের ৪২টি ডিভিশনের বিরুদ্ধে (তার মধ্যে ১৪টি রুমানীয় ডিভিশনও ছিল) প্রতিরক্ষামূলক লড়াইয়ে লিপ্ত ছিল জার্মান বাহিনীসমূহের 'দক্ষিণ' (১ মে থেকে 'অস্ট্রিয়া') গ্রুপের ১১টি ডিভিশন। শত্রুর উপর সোভিয়েত ও রুমানীয় ফৌজগুলোর শ্রেষ্ঠতা ছিল এরূপ: জনবলে — ১·৭ গুণ, তোপ ও মর্টার কামানে —

৩·৪ গুণ, ট্যাঙ্ক ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গানে — ২ গুণ, বিমানে — ৪·৩ গুণ।

শত্রুর উপর প্রধান আঘাত হানা হচ্ছিল গ্রন নদীর যুদ্ধ-সীমা থেকে (লেভিৎসে অঞ্চল) ব্রাতিস্লাভা, মালাৎস্কি ও ব্রনো অভিমুখে। ফ্রন্টের প্রধান আক্রমণকারী গ্রুপিংয়ের ক্রিয়াকলাপে সমর্থন জোগাচ্ছিল ৫ম বিমান বাহিনী ও ডানিয়ুব ফ্লোটিল্যার একাংশ।

২৪ মার্চ রাত্রিবেলা ৫৩তম ও ৭ম রক্ষী বাহিনীর অগ্রবর্তী ব্যাটেলিয়নগুলো শত্রুর পক্ষে অপ্রত্যাশিতভাবে ১৭ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত ফ্রন্টে কানায় কানায় ভরে উঠা গ্রন নদীটি অতিক্রম করে কয়েকটি ব্রিজ-হেড দখল করে নেয় এবং আক্রমণাভিযানের প্রথম দিনেই ওখানে বাহিনীসমূহের প্রধান শক্তিগুলো প্রেরিত হয়। ২৬ মার্চ তারিখে বিদ্ধস্থলে প্রবিষ্ট জেনারেল ই. প্লিয়েভের ১ম রক্ষী অশ্বারোহী-মেকানাইজ্ড গ্রুপটি দৃঢ়ভাবে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গভীরে ঢুকতে আরম্ভ করে। ২৮ মার্চের দিকে বিদ্ধস্থল প্রসারিত হয় ফ্রন্টের বরাবর ১৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত এবং গভীরতা বরাবর ৪০ কিলোমিটার।

পরে, কঠোর লড়াইয়ের মধ্যে ফ্রন্টের সৈন্যরা শত্রুর বৃহৎ এক গ্রুপিংয়ের প্রতিরোধ প্রতিহত করে তাকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করে দেয়। সামনে ছিল ব্রাতিস্লাভা। দুশমন শহরটিকে প্রতিরক্ষার জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রস্তুত করে রেখেছিল। শহরটিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে মার্শাল র. মালিনোভ্স্কি তাকে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘিরে ফেলার হুকুম দেন। পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ার ভয়ে শত্রু হটতে শুরু করে।

৪ এপ্রিল তারিখে জেনারেল ম. শুমিলোভের সেনাপতিত্বাধীন ৭ম রক্ষী বাহিনীর সৈন্যরা রিয়ার অ্যাডমিরাল গ. খলোস্তিয়াকোভের ডানিয়ুব ফ্লোটিল্যার সহায়তায় স্লোভাকিয়ার রাজধানী ব্রাতিস্লাভা মুক্ত করে। নাৎসিরা মরাভা নদীর ও-পারে চলে যায়। ভিয়েনা অঞ্চল থেকে তারা তাড়াহুড়ো করে ওখানে নিয়ে আসে ৬ষ্ঠ এস-এস ট্যাঙ্ক বাহিনীটিকে। কিন্তু কিছুই সোভিয়েত সৈন্যদের প্রবল আক্রমণাভিযান রুখতে পারল না। ১২ এপ্রিল মরাভা প্রতিরক্ষা লাইনটি বিদ্ধ হয়ে যায়। ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সৈন্যরা দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে এবং চেকোস্লোভাকিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্র — ব্রনো শহরটি মুক্তকরণের কাজে হাত দেয়। ২৩ এপ্রিল শহরের উপকণ্ঠে কঠোর লড়াই শুরু হয়; নাৎসিরা ওখানে সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে রেখেছিল এবং অন্যান্য জায়গা থেকে

৬টি ডিভিশন নিয়ে এসেছিল। ২৫ এপ্রিল সোভিয়েত সৈন্যরা সমস্ত দিক থেকে শহরটি ঘিরে ফেলে এবং সেদিন রাত্রিবেলা তার উপর ঝঞ্ঝাক্রমণ আরম্ভ করে। শত্রু চাপ সইতে পারে নি এবং সেদিনই বিধ্বস্ত হয়ে যায়। আগেরই মতো সোভিয়েত সৈন্যদের যথেষ্ট সহায়তা করেছিল শহরের বাসিন্দারা।

ব্রনো ও তার নিকটবর্তী গ্রামগুলোতে মুক্তির অব্যবহিত পরেই গড়ে উঠতে থাকে জাতীয় কমিটিগুলো, যা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করছিল শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা। শহরটির অবস্থা ছিল খুবই সংকটজনক: জল ছিল না, বিজলী ছিল না, খাদ্যদ্রব্য আর ঔষধপত্রের অভাব অনুভূত হচ্ছিল। সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য শহরবাসীদের প্রয়োজনীয় সমস্তকিছু দিয়ে জরুরীভাবে সাহায্য করেন।

২৭ এপ্রিল তারিখে ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট ৬ষ্ঠ রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনী ও ৫৩তম বাহিনীর শক্তি দিয়ে ওলমউৎস অভিমুখে ১ম জার্মান-ফ্যাসিস্ট ট্যাঙ্ক বাহিনীর পার্শ্বদেশ ও পশ্চাদ্ভাগ লক্ষ্য করে আঘাতের প্রবলতা বৃদ্ধি করতে থাকে। ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সৈন্যরা অগ্রসর হচ্ছিল আক্রমণরত ৪র্থ ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের দিকে (তা তখন মরাভস্কা-ওস্ত্রাভা অপারেশন চালিয়ে যাচ্ছিল)। পরিবেষ্টিত হওয়ার সম্ভাবনা শত্রুকে তাড়াহুড়ো পিছু হটতে বাধ্য করে।

প্রায় দেড় মাস ব্যাপী লড়াইয়ের ফলে ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সৈন্যরা ২০০ কিলোমিটার অগ্রসর হয় এবং জার্মানদের ৯টি ডিভিশনকে বিধ্বস্ত করে দেয়। স্লোভাকিয়া মুক্তকরণের কাজ সমাপ্ত হয়। চেকোস্লোভাকিয়ার জনগণ ফেরত পেল ব্রাতিস্লাভা ও ব্রনো শিল্পাঞ্চলগুলো। সোভিয়েত ফৌজের সামনে খুলে গেল চেকোস্লোভাকিয়ার মধ্যাঞ্চলগুলোতে প্রবেশের পথ।

মরাভস্কা-ওস্ত্রাভা অপারেশনেরই মতো ব্রাতিস্লাভা-ব্রনো অপারেশনটিও চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ শহর সহ বাকী সমগ্র ভূখণ্ডটি মুক্তকরণের পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

পশ্চিমাভিমুখে সোভিয়েত সৈন্যদের দ্রুত অগ্রগতি দেখে উত্তেজিত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের শাসক মহলগুলো জার্মান বাহিনীসমূহের আত্মসমর্পণ পত্র গ্রহণ করার এবং প্রাগ অধিকার করার উদ্দেশ্যে চেকোস্লোভাকিয়ায় নিজেদের সৈন্য ঢোকানোর সিদ্ধান্ত নিল। এ ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখান চার্চিল। ৩০ এপ্রিল তারিখে ট্রুম্যানের কাছে প্রেরিত

টেলিগ্রামে তিনি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি প্রাগ দখল করার দাবি জানান এবং পশ্চিম চেকোস্লোভাকিয়ার যতটা সম্ভব বেশি ভূখণ্ড অধিকার করে নেওয়ার প্রস্তাব দেন।*

মে মাসের গোড়ায় চেকোস্লোভাকিয়ার ভূখণ্ডে পদার্পণ করল জেনারেল প্যাটনের ৩য় মার্কিন বাহিনী। তার দ্বারা অধিকৃত শহরগুলোতে, দৃষ্টান্তস্বরূপ প্লজেনে, জাতীয় কমিটিগুলো ভেঙে দেওয়া হয় এবং যে-সমস্ত চেকোস্লোভাক জার্মানদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল তাদের সঙ্গে মিলে দখলদারী শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হয়। প্লজেনে আমেরিকান ফৌজের প্রবেশের আগে শহরটির উপর প্রবল বোমাবর্ষণ চলে যার ফলে শহরের দুই-তৃতীয়াংশ বাসগৃহ ধ্বংস ও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রাগ অপারেশন
(১৯৪৫ সালের ৬-১১ মে)

ইউরোপে যুদ্ধের এই অন্তিম আক্রমণাত্মক অপারেশনের প্রধান বৈশিষ্ট্যটি ছিল তার দ্রুততা। এর কারণগুলো এরূপ। প্রথমত, নাৎসিরা যথাসম্ভব বেশি কাল চেকোস্লোভাকিয়ায় টিকে থাকতে চাইছিল: তাদের আশা ছিল যে মিত্রদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের শাসক মহলগুলোর সঙ্গে একটা সমঝোতায় পৌঁছা যাবে। পূর্বে সোভিয়েত সৈন্যদের মরিয়া হয়ে প্রতিরোধ দেওয়ার এবং পশ্চিমে একই সময় ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনীসমূহের জন্য পথ খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা আশা করছিল যে চেকোস্লোভাকিয়ায় তাদের অবশিষ্ট প্রায় ১০ লক্ষ সৈন্যের সমগ্র গ্রুপিংটিকে শেষোক্তদের হাতে সমর্পণ করতে পারবে। দ্বিতীয়ত, এবং এটাই সম্ভবত প্রধান, ৫ মে তারিখে প্রাগে সশস্ত্র অভ্যুত্থান আরম্ভ হয়। অভ্যুত্থানকারীদের বিরুদ্ধে পাঠানো হয় জার্মান-ফ্যাসিস্ট সৈন্যদের। শহরের রাস্তায় রাস্তায় কঠোর লড়াই বেধে যায়। অভ্যুত্থানকারীদের অবস্থা ঘণ্টায় ঘণ্টায় ক্রমশই সঙ্গিন হয়ে উঠতে থাকে। প্রাগ থেকে শোনা যায় আবেদন: 'সমস্ত মিত্র সৈন্য বাহিনীর প্রতি প্রাগ শহরের অনুরোধ। সমস্ত দিক থেকে জার্মানরা প্রাগ আক্রমণ করছে। সামরিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত রয়েছে জার্মান

* Churchill W. The Second World War. Vol. VI, p. 506.

ট্যাঙ্ক, আর্টিলারি আর ইনফেণ্ট্রি। প্রাগ সনির্বন্ধভাবে সকলের সাহায্য প্রার্থনা করছে। বিমান, ট্যাঙ্ক আর অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ করুন। সাহায্য করুন, সাহায্য করুন, এক্ষুনি সাহায্য করুন!' ৬ মে ভোর প্রায় ৫টার সময় অনুরোধটি প্রচার করা হয় রুশ ভাষায় সরাসরি ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের সৈন্যদের উদ্দেশে: 'এক্ষুনি প্যারাট্রুপারদের নামান। প্রাগে অবতরণ — ভিনোগ্রাদি — ওলশান কবরখানা। সিগন্যাল — ত্রিভুজ। অস্ত্রশস্ত্র ও বিমান পাঠান।'

জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজগুলো যখন প্রাগের উপর ঝঞ্ঝাক্রমণ আরম্ভ করে তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শহরের দিকে তার সৈন্যদের অগ্রগতি বন্ধ করে দেয়। কিন্তু অবরুদ্ধ শহরের জন্য সহায়তা এল। আপন আন্তর্জাতিক কর্তব্যের প্রতি অনুগত সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনী অবিলম্বে প্রাগবাসীদের সাহায্যের ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে গেল এবং ৬ মে তারিখে, নির্ধারিত মেয়াদের এক দিন আগে, আক্রমণাভিযান আরম্ভ করল। ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের অধিনায়ক মার্শাল ই. কনেভ স্মরণ করেন যে সমস্তকিছু ছিল নির্দেশাধীন: 'প্রাগ চলো!' প্রাগকে বাঁচাতে হবে। ফ্যাসিস্ট বর্বরদের তাকে ধ্বংস করতে দেওয়া হবে না।* একই সঙ্গে প্রবল আক্রমণ চালায় ২য় ও ৪র্থ ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের সৈন্যরা। সোভিয়েত সৈন্যদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে লড়েছে ১ম চেকোস্লোভাক ফৌজী কোর, ২য় পোলিশ বাহিনী, ১ম ও ৪র্থ রুমানীয় বাহিনী।

অপারেশনের গোড়ার দিকে শক্তির অনুপাত ছিল সোভিয়েত সৈন্যদের অনুকূলে। সোভিয়েত বাহিনীগুলোতে ছিল ২০ লক্ষাধিক লোক, প্রায় সাড়ে তিরিশ হাজার তোপ ও মর্টার কামান, প্রায় ২,০০০টি ট্যাঙ্ক ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গান, ৩ সহস্রাধিক বিমান। জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীসমূহের 'সেণ্টার' গ্রুপে মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল ৯ লক্ষাধিক, ৯,৭০০টি তোপ ও মর্টার কামান, ১,৯০০টি ট্যাঙ্ক ও অ্যাসল্ট গান, ১,০০০টি বিমান।

প্রাগ অপারেশনের উদ্দেশ্য ছিল — ১ম, ৪র্থ ও ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের শক্তিসমূহের দ্বারা প্রাগ অভিমুখে সম্মিলিত আঘাত হেনে জেনারেল-ফিল্ডমার্শাল শের্নেরের সেনাপতিত্বাধীন বৃহৎ জার্মান গ্রুপিংটিকে অবরুদ্ধ ও ধ্বংস করা এবং চেকোস্লোভাক রাজধানী মুক্ত করা।

১৯৪৫ সালের শীতে ও বসন্তে
১৯৪৪ সালের শীতে ও গ্রীষ্মে
১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মে
১৯৪১/৪২ শীতে
১৯৪২/৪৩ সালের শীতে
উত্তর সাগর
বাল্টিক সাগর
জার্মানি
কৃষ্ণ সাগর
আজভ সাগর
বারেন্টস সাগর
কোলা উপদ্বীপ
শ্বেত সাগর
ফিনল্যান্ড
মস্কো
লেনিনগ্রাদ

জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীগুলোর চূড়ান্ত অগ্রগতির লাইন
জার্মান-ফ্যাসিস্ট বাহিনীগুলোর পূর্ণ পরাজয়ের পর সোভিয়েত ফৌজের ফ্রন্ট লাইন

নকশা ১১। সোভিয়েত ফৌজ কর্তৃক মুক্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের, পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের দেশসমূহের ভূখণ্ড

সোভিয়েত সেনাপতিদের এবং সদর-দপ্তরগুলোর উচ্চ নৈপুণ্য গোপনভাবে ও অল্প সময়ের মধ্যে সৈন্যের পুনর্বিন্যাস সম্পন্ন করতে ও আক্রমণাভিযানের উদ্দেশ্যে তাদের প্রাথমিক অবস্থান গ্রহণ করতে সাহায্য করল। যেমন, ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের ৩য় ও ৪র্থ রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনী এবং ইনফেণ্ট্রি ফর্ম্যাশনগুলো বার্লিনের উপকণ্ঠ থেকে ড্রেসডেনের উত্তর-পশ্চিমে আক্রমণাভিযানের জন্য প্রাথমিক অঞ্চল অভিমুখে ৩ দিনের মধ্যে ১০০ থেকে ২০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে।

৬ মে তারিখে কয়েকটি দিকে শত্রুর পশ্চাদপসরণের সুযোগ নিয়ে ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের ডান পার্শ্বের সৈন্যরা জার্মানদের পশ্চাদনুসরণ করতে আরম্ভ করে। শত্রুর পশ্চাৎ রক্ষী বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে সোভিয়েত ফৌজের অগ্রবর্তী দলগুলো প্রধান শক্তিসমূহের জন্য পথ করে দিয়ে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল। সামরিক ক্রিয়াকলাপ চলছিল দিনরাত। ৭ মে ফ্রন্টের বাম পার্শ্বের ও কেন্দ্রস্থলের সৈন্যরা আক্রমণ শুরু করে।

২য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সৈন্যরা জ্নোইমো, মিরোস্লাভ, ইয়ার্মেরজিৎসে শহরগুলো দখল করে নেয় এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে প্রাগ অভিমুখে আক্রমণাভিযান অব্যাহত রাখে। ৪র্থ ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট ৮ মে ওলমউৎস শহরটি অধিকার করে ফেলে এবং তারপর তার সৈন্যরা ৯ মে সকালে ২য় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের ইউনিটসমূহের সঙ্গে মিলিত হয়।

৮ মে রাত্রে ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের ৩য় ও ৪র্থ রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনীগুলো (অধিনায়ক — জেনারেল প. রিবালকো ও দ. লেলিউশেঙ্কো) অতি দ্রুত গতিতে ৮০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে পরদিন ভোর বেলা গতিতে থেকেই প্রাগে ঢুকে পড়ে। সেই দিনই প্রাগের কাছে গিয়ে পেশছে ২য় ও ৪র্থ ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের অগ্রবর্তী ইউনিটগুলো। অভ্যুত্থিত প্রাগের মুক্তিযোদ্ধাদের সক্রিয় সমর্থনে লাল ফৌজ ৯ মে তারিখে চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানীকে পুরোপুরিভাবে মুক্ত করে। প্রাগবাসীদের আনন্দের অন্ত ছিল না। তখন ছিল প্রাতঃকাল, কিন্তু তা সত্ত্বেও পথঘাট লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠেছিল। আবালবৃদ্ধবনিতা তাদের মুক্তিদাতাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল। চারিদিক থেকে শোনা যাচ্ছিল জয়ধ্বনি: ‘চেকোস্লোভাক জনগণের মুক্তিদাতা লাল ফৌজ — জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ!’ বাড়িগুলোর ব্যালকনিতে, ছাদে আর মিনারে দেখা যাচ্ছিল তিন-রঙা চেকোস্লোভাক পতাকা ও সোভিয়েত লাল পতাকা।

৯ মে, প্রাগে সোভিয়েত ফৌজের প্রবেশের দিনটি, হল চেকোস্লোভাকিয়ার জাতীয় উৎসবের দিন — মুক্তি দিবস। এই দিনটি দেশের জাতিসমূহের জীবনে আমূল পরিবর্তন সূচিত করে। তারা স্বল্প কালের মধ্যে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধন করে এবং অটলভাবে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথ ধরে যাত্রা শুরু করে।

১০-১১ মে তারিখে অবরুদ্ধ জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজগুলো প্রতিরোধ বন্ধ করে অস্ত্র ত্যাগ করে। প্রায় ৮৬ হাজার সৈনিক আর অফিসারকে বন্দী করা হয় এবং এদের মধ্যে '৬০ জন ছিল জেনারেল। এ ছাড়া ট্রফি হিশেবে পাওয়া গিয়েছিল ৯,৫০০টি তোপ ও মর্টার কামান, ১,৮০০টি ট্যাঙ্ক ও অ্যাসল্ট গান এবং প্রচুর পরিমাণ অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ আর সামরিক সাজসরঞ্জাম।

প্রাগ অপারেশন চলে ৬ দিন ধরে এবং ৬৫০ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত রণাঙ্গনে। এই অপারেশনের ফলে চেকোস্লোভাকিয়ার সমগ্র ভূখণ্ড মুক্ত হয়। সোভিয়েত সৈন্যদের ক্ষিপ্র ক্রিয়াকলাপ ইউরোপের সুন্দরতম একটি শহর — প্রাগকে বাঁচিয়ে দেয় এবং দেশের অন্যান্য শহর আর গ্রামকেও বিনাশের সম্ভাবনা থেকে, জার্মান-ফ্যাসিস্ট হানাদারদের কুকর্মের হাত থেকে রক্ষা করে। চেকোস্লোভাক জনগণ স্বাধীনতা অর্জন করল এবং আপন মাতৃভূমির ভাগ্য নির্ধারণের সুযোগ পেল।

বিজয় দিবস উপলক্ষে চেকোস্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অভিনন্দন বাণীতে বলা হয়েছিল, 'আমাদের জনগণ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বীর সোভিয়েত যোদ্ধাদের প্রতি অসীম ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সর্বদা এই স্মরণীয় দিনটির কথা মনে করবে। মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য ও আমাদের শহরগুলোর মুক্তির জন্য কঠোর সংগ্রামে তারা আমাদের দেশের মাটিকে আপন রক্ত দিয়ে সিঞ্চিত করে দিয়েছে। আমাদের জনগণ মুক্তিদাতা সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এই দিনটির কথা স্মরণ করবে।'*

চেক জনগণের মে অভ্যুত্থান — যার চূড়ান্ত পর্যায় ছিল প্রাগের সশস্ত্র বিদ্রোহ — চেকোস্লোভাক জনগণের ফ্যাসিস্টবিরোধী সংগ্রামের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী

স্বদেশপ্রেমিকরা ১ম চেকোস্লোভাক ফৌজী কোরের সৈন্য আর চেকোস্লোভাক পার্টিজানদের সঙ্গে মিলে নাৎসিদের পতন ঘটানোর কাজে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

চেকোস্লোভাকিয়ার মাটিতে যে-সমস্ত লড়াই হয় তাতে সোভিয়েত সৈন্যরা ধ্বংস, বিধ্বস্ত ও বন্দী করে ১২২টি জার্মান ডিভিশনকে, ১২ লক্ষ সৈনিক ও অফিসারকে ধরে ফেলে, কবজা করে ১৮,১০০টি তোপ ও মর্টার কামান, প্রায় ৩,২০০টি ট্যাঙ্ক ও ১,৯০০টি জঙ্গী বিমান। চেকোস্লোভাকিয়ার ভূখণ্ডে কঠোর সংগ্রামে প্রাণ দেয় লাল ফৌজের প্রচুর লোক। প্রায় ৫ লক্ষ সোভিয়েত সৈনিক ও অফিসার ওই দেশে নিজের রক্ত ঢালে, এবং তাদের মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার জন আত্মাহুতি করেছে চেকোস্লোভাকিয়ার মাটিতে। চেকোস্লোভাকিয়া মুক্তকরণের কাজটির ছিল আন্তর্জাতিকতাবাদী চরিত্র। তার ভূখণ্ডে সোভিয়েত সৈন্যদের পাশাপাশি লড়েছিল চেকোস্লোভাক, পোলিশ আর রুমানীয় ফর্ম্যাশনগুলো।

৪। বার্লিনের পতন এবং ফ্যাসিস্ট জার্মানির শর্তহীন আত্মসমর্পণ

১৯৪৫ সালের শীতকালীন আক্রমণাভিযানের ফলে ১ম ও ২য় বেলোরুশ ফ্রন্টের এবং ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সৈন্যরা সমগ্র পোল্যাণ্ড মুক্ত করে, ওডের ও নেইসে নদীতে পেঁছে যায় এবং ওডের নদীর পশ্চিম তীরে কয়েকটি ব্রিজ-হেড দখল করে নেয়, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কিউস্ট্রিন অঞ্চলে ১ম বেলোরুশ ফ্রন্ট অধিকৃত ব্রিজ-হেডটি।

কিন্তু ফ্যাসিস্ট জার্মানি তখনও ছিল শক্তিশালী ও বিপজ্জনক এক শত্রু। ১৯৪৫ সালের প্রথম তিন মাসে জার্মানির শিল্প উৎপাদন করল প্রায় ১,০০০টি ট্যাঙ্ক ও ২,৮০০টি বিমান, যার মধ্যে কয়েক শো'টি 'মে-২৬২' জেট ফাইটার ছিল। ওই বছরের এপ্রিলের দিকে শত্রুর কাছে ছিল বহু লক্ষ ফাউস্টপ্যাট্রন (ফলপ্রসূ ট্যাঙ্কবিরোধী উপকরণ) এবং বিপুল পরিমাণ অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ। সৈন্য বাহিনীতে বৃহৎ ক্ষতি পূরণের উদ্দেশ্যে জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত নাৎসিরা দেশজোড়া সৈন্যযোজন চালায়। সৈন্য বাহিনীতে ডাকা হয় ১৬-১৭ বছর বয়সের তরুণদের। একই সময়ে হিটলারী সেনাপতিমণ্ডলী বার্লিনের দিকে যেকোন উপায়ে লাল

ফৌজের আক্রমণাভিযান ব্যাহত করার ইচ্ছায় বার্লিনের স্ট্র্যাটেজিক অভিমুখে প্রতিরক্ষা সুদৃঢ়করণের জন্য জরুরী ব্যবস্থাদি অবলম্বন করছিল।

অপারেশনের গোড়ার দিকে এই অভিমুখের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গঠিত হয়েছিল ওডের-নেইসে প্রতিরক্ষা লাইন এবং বার্লিন প্রতিরক্ষা অঞ্চল নিয়ে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মোট গভীরতা ছিল ১০০-২০০ কিলোমিটার।

বার্লিনের প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি সম্পর্কে ৯ মার্চ প্রকাশিত নির্দেশে বলা হয়েছিল: 'শেষ লোকটি দিয়ে এবং শেষ গুলিটি দিয়ে রাজধানী রক্ষা করতে হবে।... বিপক্ষকে মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম দিলে চলবে না, দৃঢ় ঘাঁটি, প্রতিরক্ষা গ্রন্থি আর প্রতিরোধ কেন্দ্রের ঘন জালের মধ্যে তাকে শক্তি-হীন ও দুর্বল করে তুলতে হবে। প্রতিটি হারানো বাড়ি অথবা প্রতিটি দৃঢ় ঘাঁটি প্রতিআক্রমণের দ্বারা অনতিবিলম্বে ফিরিয়ে আনতে হবে।... বার্লিন যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণ করতে পারে।'*

সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর আক্রমণাভিযান প্রতিহত করার প্রস্তুতি নেওয়ার সময় নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলী আপন ফৌজকে সাংগঠনিকভাবে সুদৃঢ়করণের উদ্দেশ্যে বেশকিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করে। স্ট্র্যাটেজিক রিজার্ভ, মজুত ইউনিটগুলো এবং সামরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ দিয়ে প্রায় সমস্ত ডিভিশনের লোকসংখ্যা ও প্রযুক্তিগত সাজসজ্জা পুনরুদ্ধার করা হয়। এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় নাগাদ ইনফেণ্ট্রি কোম্পানিগুলোর লোকসংখ্যা ১০০ জনে পৌঁছে যায়। যেমনটি আগেই বলা হয়েছে, হিমলেরের পরিবর্তে বাহিনীসমূহের 'ভিস্টুলা' গ্রুপের অধিনায়ক নিযুক্ত হয় জেনারেল গ. হেইনরিটসি, যাকে ভের্মাখ্‌টে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বড় একজন বিশেষজ্ঞ বলে গণ্য করা হত। বাহিনীসমূহের 'সেণ্টার' গ্রুপের অধিনায়ক ফ. শের্নেরকে ৮ এপ্রিল ফিল্ডমার্শাল উপাধি প্রদান করা হয়। নাৎসি সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতে, স্থলসেনার জেনারেল স্টাফের নতুন অধিকর্তা জেনারেল ক্রেবস ছিল সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী সম্পর্কে সেরা বিশেষজ্ঞ, যেহেতু যুদ্ধের আগে সে ছিল মস্কোস্থ জার্মান দূতাবাসে মিলিটারি অ্যাটাচির সরকারী।

১৫ এপ্রিল তারিখে হিটলার পূর্ব রণাঙ্গনের সৈনিকদের উদ্দেশে বিশেষ একটি আবেদনপত্র প্রকাশ করে। তাতে সে তাদের যেন-তেন প্রকারে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করার আহ্বান জানায়। সেই

সঙ্গে ফিউরের তাদের এই বলেও হ্‌শিয়ার করে দেয় যে যারা পিছ্‌ হটার কিংবা পিছ্‌ হটতে হ্‌কুম দেওয়ার স্পর্ধা করবে তাদের সঙ্গে সঙ্গে গ্‌লি করে হত্যা করা হবে। আর যে-সমস্ত সৈনিক ও অফিসার সোভিয়েত ফৌজের কাছে আত্মসমর্পণ করবে তাদের পরিবারের বির্‌দ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের হ্‌মকি দেওয়া হয়।

সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান সদর-দপ্তরের অধিকর্তা ফিল্ডমার্শাল ভ. কেইটেল এবং পার্টি দপ্তরের অধিকর্তা রাইখ্‌স্‌লেইটের ম. বোরমান শেষ লোকটি দিয়ে প্রতিটি জনপদ রক্ষা করার নির্দেশ দেয়, যে এ ব্যাপারে সামান্যতম শিথিলতা দেখাবে তাকেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

ওডের নদীর তীরে উপনীত এবং বার্লিন থেকে ৬০ কিলোমিটার দ্‌রে অবস্থিত সোভিয়েত ফৌজগ্‌লোর বির্‌দ্ধে খাড়া ছিল শত্র্‌ সৈন্যের ক্ষমতাসম্পন্ন একটি গ্র্‌পিং যা গঠিত হয়েছিল বাহিনীসম্‌হের 'ভিস্টুলা' আর 'সেণ্টার' গ্র্‌পগ্‌লো নিয়ে। 'ভিস্টুলা' গ্র্‌পে ছিল — ৩য় ট্যাঙ্ক ও ৯ম ফিল্ড আর্মি, 'সেণ্টার' গ্র্‌পে ছিল — ৪র্থ ট্যাঙ্ক ও ১৭শ ফিল্ড আর্মি। জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলী সব মিলিয়ে এই অভিম্‌খে কেন্দ্রীভূত করেছিল ৮৫টি ডিভিশন (তার মধ্যে ছিল ৪৮টি ইনফেণ্ট্রি ডিভিশন, ৪টি ট্যাঙ্ক ও ১০টি মোটোরাইজ্‌ড ডিভিশন) এবং অনেকগ্‌লো স্বতন্ত্র রেজিমেণ্ট আর ব্যাটেলিয়ন। এ ছাড়া, বার্লিন অণ্ডলে গঠিত হচ্ছিল ২০০টির মতো গণ-ব্যাটেলিয়ন। জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজগ্‌লোতে মোট লোক সংখ্যা দাঁড়ায় ১০ লক্ষ। শত্র্‌র কাছে ছিল ১০,৪০০টি তোপ ও মর্টার কামান, ১,৫০০টি ট্যাঙ্ক ও অন্যাসল্ট গান, ৩,৩০০টি জঙ্গী বিমান ও ৩০ লক্ষাধিক ফাউস্টপ্যাট্রন।

জার্মানির সামরিক নেতৃবৃন্দ ফ্যাসিস্টবিরোধী জোটে মতভেদ সৃষ্টি করতে এবং মার্কিন য্‌ক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের সঙ্গে পৃথক শান্তি চুক্তি সম্পাদন করতে সচেষ্ট ছিল। এই উদ্দেশ্যে তারা একাধিক বার ইংরেজ ও আমেরিকানদের সঙ্গে কথাবার্তা চালায়, এবং পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে প্‌র্ব রণাঙ্গনে বিপ্‌ল শক্তি পাঠিয়ে দিয়ে পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মান ফৌজের প্রতিরোধ শিথিল করে দেয়। ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনীগ্‌লো দ্র্‌ত অগ্রগতির স্‌যোগ পেল। তাদের প্‌র্বেকার মন্থরতার স্থান নিল অত্যধিক দ্র্‌ততা। মার্কিন য্‌ক্তরাষ্ট্র আর ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদীরা জার্মান সাম্রাজ্যবাদকে প্‌র্ণ বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে জার্মানির যথাসম্ভব বড় একটি অংশ দখল করতে এবং বার্লিন অধিকার করে নিতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু এই সমস্ত

পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হল না। মিত্র বাহিনীগুলো যখন ওলডেনবুর্গ — মাগদেবুর্গ — ডেসাউ — নুরেমবার্গ লাইনে গিয়ে পৌঁছল, সোভিয়েত সৈন্যরা তখন বার্লিন অভিমুখে আক্রমণাভিযান আরম্ভ করে দিয়েছিল।

সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর সদর-দপ্তর বার্লিন অপারেশনের পরিকল্পনাটি রচনা করেন সোভিয়েত সৈন্যদের শীতকালীন আক্রমণাভিযান চলার সময়েই। ইউরোপের সামরিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর সদর-দপ্তর অপারেশনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেন, ফ্রন্টসমূহের সদর-দপ্তরগুলোতে প্রস্তুত পরিকল্পনাগুলো বিবেচনা করে দেখেন। অপারেশনের চূড়ান্ত পরিকল্পনাটি অনুমোদিত হয়েছিল এপ্রিলের গোড়াতে রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটির সদস্যদের এবং ১ম বেলোরুশ ও ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের অধিনায়কদের সঙ্গে সর্বোচ্চ সদর-দপ্তরের সম্মিলিত অধিবেশনে। বার্লিন অপারেশনের পরিকল্পনাটি ছিল সর্বোচ্চ সদর-দপ্তর, জেনারেল স্টাফ, ফ্রন্টসমূহের অধিনায়কদের ও সদর-দপ্তরগুলোর যৌথ কাজের ফল।

অপারেশনের উদ্দেশ্য ছিল — ১ম ও ২য় বেলোরুশ এবং ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের শক্তিসমূহ দিয়ে শত্রুর সমগ্র বার্লিন গ্রুপিংকে ঘিরে ফেলা এবং একই সময় তাকে অংশে অংশে বিভক্ত করে প্রতিটি অংশকে আলাদা-আলাদাভাবে ধ্বংস করা।

বল্টিক নৌ-বহর (অধিনায়ক অ্যাডমিরাল ভ. ত্রিবুৎস) সমুদ্রোপকূল বরাবর ২য় বেলোরুশ ফ্রন্টের আক্রমণাভিযানে সহায়তা করছিল এবং বিমান বাহিনী আর সাবমেরিন দিয়ে লিয়েপায়া থেকে রস্তক পর্যন্ত সামুদ্রিক যোগাযোগ পথগুলোর উপর আঘাত হানছিল। রণনৈতিকভাবে ১ম বেলোরুশ ফ্রন্টের অধীন নীপার সামরিক ফ্লোটিল্যার (অধিনায়ক — রিয়ার অ্যাডমিরাল ভ. গ্রিগোরিয়েভ) কর্তব্য ছিল শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদকরণে স্থলসেনাকে সাহায্য করা, ওডের নদীতে পাড়ি-ব্যবস্থার নিরাপত্তা বিধান করা এবং মাইনবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এছাড়া, ১ম বেলোরুশ ফ্রন্টের এলাকায় দূর পাল্লার ১৮শ বিমান বাহিনীটিকে ব্যবহার করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল।

বার্লিন অপারেশনটি যাতে সফলভাবে সম্পন্ন হয় সেই উদ্দেশ্যে সর্বোচ্চ সদর-দপ্তর নিজের রিজার্ভ থেকে যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি ও সামগ্রী দিয়ে ফ্রন্টগুলোকে সুদৃঢ় করে তোলে। এই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে তিনটি ফ্রন্টের সবগুলোতেই অপারেশনের গোড়ার দিকে ছিল ২৫ লক্ষ

লোক, ৪২,০০০টি তোপ ও মর্টার কামান, ৭,৫০০টি জঙ্গী বিমান, ৬,২৫০টি ট্যাঙ্ক। এরূপ বিপুল পরিমাণ শক্তি ও সামগ্রী আর কোন অপারেশন পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হয় নি। শত্রুদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত সৈন্যদের যথেষ্ট শ্রেষ্ঠতা ছিল।

১৬ এপ্রিল ভোর ৬টার সময় — তখনও অন্ধকার — শুরু হয় প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণ ও বোমাবর্ষণ, আর ২০ মিনিট বাদে — সার্বিক আক্রমণাভিযান। অপারেশনের প্রথম দিনের শেষ দিকে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রধান এলাকাটি ভেদ করে দ্বিতীয় এলাকার কাছে পেণছা সম্ভব হল (গভীরতা ৮-১০ কিলোমিটার)।

পরের তিন দিনে ১ম বেলোরুশ ফ্রন্টের সৈন্যরা জার্মানদের অনেকগুলো প্রতিআক্রমণ প্রতিহত করে শত্রুর সমগ্র ওডের প্রতিরক্ষা লাইনটি ৩০-৪০ কিলোমিটার গভীরে ভেদ করতে সক্ষম হয়।

১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের আক্রমণাভিযানটি চলে একটু অন্যভাবে। সকাল বেলা, প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণ ও বোমাবর্ষণের পর, প্রথম এশিলনের ফর্ম্যাশনগুলো নেইসে নদী অতিক্রম করে তার বিপরীত তীরে একটি ব্রিজ-হেড দখল করে নেয় এবং দিনের শেষ দিকে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহের প্রধান এলাকাটি ভেদ করে ফেলে। পরের দিন, ১৭ এপ্রিল তারিখে, আক্রমণকারী গ্রুপিংয়ের ফৌজগুলো — তার মধ্যে ট্যাঙ্ক বাহিনীগুলোও — শত্রুর রিজার্ভসমূহের প্রতিআক্রমণ প্রতিহত করে দ্বিতীয় এলাকাটি ভেদ করে ফেলে এবং দুই দিনে ১৮ কিলোমিটার গভীরে ঢুকে পড়ে। জার্মানরা শ্প্রিয়ে নদীর অন্য তীরে তৃতীয় প্রতিরক্ষা লাইনটির দিকে হটতে আরম্ভ করে।

অপারেশনের তৃতীয় দিনে, ১৮ এপ্রিল, ফ্রন্টের প্রধান আক্রমণকারী গ্রুপিংয়ের সৈন্যরা গতিতে থেকে শ্প্রিয়ে নদী অতিক্রম করে এবং ফৌজের একাংশ দিয়ে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার তৃতীয় এলাকাটি ভেদ করে ফেলে। নাৎসিরা জনবলে ও অস্ত্রবলে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফ্রন্টের ট্যাঙ্ক বাহিনীগুলো শত্রুর বার্লিন গ্রুপিংটিকে পরিবেষ্টিত করার উদ্দেশ্যে উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে আক্রমণাভিযান অব্যাহত রাখে। আক্রমণাভিযানের চতুর্থ দিনে ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট সমগ্র রণাঙ্গন জুড়ে নেইসে প্রতিরক্ষা লাইনটি ভেদ করে ফেলে এবং শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ৫০ কিলোমিটার অবধি গভীরে ঢুকে পড়ে।

২য় বেলোরুশ ফ্রন্টের সৈন্যদের সামরিক ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ হয়

দু'দিন পরে, ১৮ এপ্রিল তারিখে। দু'দিন ধরে ফৌজগুলো পূর্ব ওডের পার হয়, দুটি নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলটিকে শত্রুমুক্ত করে এবং পশ্চিম ওডেরের পূর্ব তীরে আক্রমণাভিযানের জন্য প্রাথমিক অবস্থান অধিকার করে নেয়। এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপের দ্বারা তারা নাৎসিদের ৩য় ট্যাঙ্ক বাহিনীর শক্তিসমূহকে সম্পূর্ণ অচল করে দেয় এবং জার্মান-ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলীকে ওটাকে প্রতিবেশী ৯ম বাহিনীর সাহায্যে প্রেরণ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। ৯ম বাহিনীটি তখন ১ম বেলোরুশ ফ্রন্টের কাছে পরাজয় বরণ করছিল।

ওডের-নেইসে প্রতিরক্ষা লাইন ভেদকরণের কাজ সম্পন্ন করে ১ম বেলোরুশ ফ্রন্টের প্রধান আক্রমণকারী গ্রুপিংয়ের সৈন্যরা বার্লিন অভিমুখে আক্রমণাভিযান অব্যাহত রাখে উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব দিক থেকে, আর ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সৈন্যরা — দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে। ২০ ও ২১ এপ্রিল তারিখে ১ম বেলোরুশ ফ্রন্টের সৈন্যরা বার্লিনের বহির্দিকস্থ প্রতিরক্ষা বেষ্টনী ভেদ করে ফেলে এবং শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে যায়। ভের্মাখ্‌টের সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর ডায়েরিতে ২০ এপ্রিল তারিখে লেখা হয়েছিল: 'সর্বোচ্চ সেনাপতিদের জন্য শুরু হচ্ছে জার্মান সশস্ত্র বাহিনীর নাটকীয় বিনাশের অন্তিম অঙ্ক।... সমস্তকিছু করা হচ্ছে তাড়াহুড়োর মধ্যে, কারণ দূরে শোনা যাচ্ছে রুশ ট্যাঙ্কের কামানের গোলাবর্ষণ।... সবাই হতাশাগ্রস্ত।'*

দক্ষিণ দিক থেকে বার্লিনের কাছে এসে উপনীত হয় ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের ইউনিটগুলোও। নাৎসিরা তাদের রাজধানীকে পরিবেষ্টিত হতে না দেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছিল। ২২ এপ্রিল মধ্যাহ্নের পরে সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয় যুদ্ধ সংক্রান্ত শেষ অধিবেশন যাতে উপস্থিত ছিল ভ. কেইটেল, আ. ইওডল, ম. বোরমান, হ. ক্রেবস ও অন্যান্যরা। ইওডল প্রস্তাব দিল: পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে সমস্ত ফৌজকে নিয়ে এসে বার্লিনের জন্য লড়াইয়ে লাগানো হোক। হিটলার প্রস্তাবটি মেনে নিল। এল্‌ব নদীর তীরে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নিয়ে-থাকা জেনারেল ভ. ভেন্‌কের ১২শ বাহিনীটিকে পূর্ব দিকে ঘুরে বার্লিন অভিমুখে অগ্রসর হয়ে ৯ম বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। একই সময়ে এস-এস জেনারেল ফ. স্টেইনেরের আর্মি গ্রুপটিকে (যা রাজধানীর

* KTB/OKW, Bd. IV.

উত্তরে লড়াইয়ে লিপ্ত ছিল) উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বার্লিন পরিবেষ্টনকারী সোভিয়েত ফৌজের গ্রুপিংটির পার্শ্বদেশে আঘাত হানার হুকুম দেওয়া হয়েছিল।*

১২শ জার্মান বাহিনীর আক্রমণাভিযান পরিচালনার উদ্দেশ্যে ভেন্‌কের সদর-দপ্তরে প্রেরিত হয় ফিল্ডমার্শাল কেইটেল।

২৩ ও ২৪ এপ্রিল সমস্ত দিকে সামরিক ক্রিয়াকলাপ বিশেষ কঠোর চরিত্র ধারণ করে। সোভিয়েত ফৌজগুলোর অগ্রসর হওয়ার গতি কিছুটা কমে যাওয়া সত্ত্বেও নাৎসিরা তাদের রুখতে পারে নি। ফ্যাসিস্ট সেনাপতিমণ্ডলীর পরিকল্পনা ছিল তাদের গ্রুপিংটিকে অবরুদ্ধ ও ভেঙে টুকরো টুকরো হতে দেবে না, কিন্তু তাদের পরিকল্পনা বানচাল করে দেওয়া হয়েছিল। ২৪ এপ্রিল ১ম বেলোরুশ ফ্রন্টের ৮ম রক্ষী বাহিনী, ৩য় ও ৬৯তম বাহিনীগুলোর সৈন্যরা বার্লিনের দক্ষিণ-পূর্বে ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের ৩য় রক্ষী ট্যাংক বাহিনী ও ২৮তম বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়। এই সামরিক চালের দ্বারা তারা শত্রুর ৯ম বাহিনীটিকে বার্লিন গ্রুপিং থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং একই সঙ্গে তাকে ঘিরে ফেলে।

পরের দিন, ২৫ এপ্রিল তারিখে, ১ম বেলোরুশ ফ্রন্টের ৪৭তম ও ২য় রক্ষী ট্যাংক বাহিনীর সৈন্যরা পট্‌স্‌ডামের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একটি অঞ্চলে ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের ৪র্থ রক্ষী ট্যাংক বাহিনীর ফৌজগুলোর সঙ্গে মিলিত হয় এবং তদ্দ্বারা সমগ্র বার্লিন গ্রুপিংকে পরিবেষ্টন করে ফেলে।

পোলিশ ফৌজের ২য় বাহিনী ও ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের ৫২তম বাহিনীর সৈন্যরা ড্রেসডেন অভিমুখে আক্রমনাভিযান চালিয়ে গোর্লিৎস অঞ্চল থেকে শত্রুর তিনটি ইনফেন্ট্রি, দু'টি ট্যাংক ও একটি মোটোরাইজ্‌ড ডিভিশনের প্রবল প্রতিঘাত প্রতিহত করে এবং তদ্দ্বারা ফ্রন্টের প্রধান আক্রমণকারী গ্রুপিংয়ের আক্রমণাভিযান সম্ভব করে তোলে।

২৫ এপ্রিল ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের ৫ম রক্ষী বাহিনীর প্রধান শক্তিসমূহ টর্গাউ অঞ্চলে এল্‌ব নদীর পূর্ব তীরে পৌঁছে যায় এবং ১ম মার্কিন বাহিনীর সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হয়। এর ফলে জার্মানির ভূখণ্ড ও তার সশস্ত্র বাহিনী খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায়।

২য় বেলোরুশ ফ্রন্টের সৈন্যরা পশ্চিম ওডের অতিক্রম করে ব্রিজ-হেড

* KTB/OKW, Bd. IV, S. 1457-1458.

প্রসারণের জন্য তুমুল লড়াই বাধিয়ে দেয়। বার্লিনের দক্ষিণ-পূর্বে শত্রুর অবরুদ্ধ ফ্রাংকফুর্ট-গুব্বিনেন গ্রুপিংটির বিলোপ সাধনের কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছিল ২৬ এপ্রিল থেকে ২ মে তারিখের মধ্যে উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দিক থেকে সমাভিমুখে আঘাত হানার মাধ্যমে।

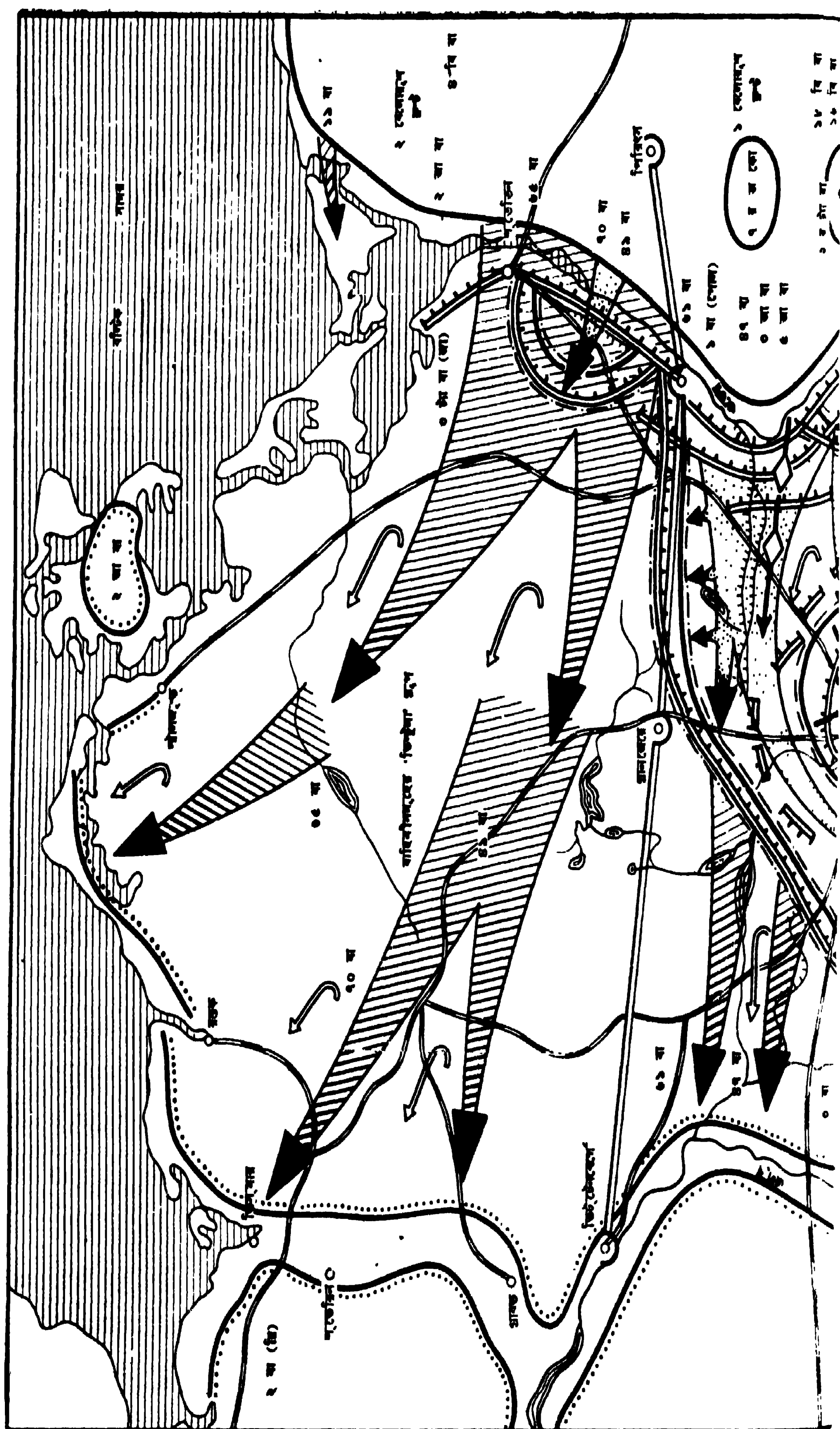
এই গ্রুপিংয়ের ৬০ সহস্রাধিক সৈনিক ও অফিসার নিহত হয়, বন্দী হয় ১ লক্ষ ২০ হাজারের মতো লোক। সোভিয়েত সৈন্যরা কবজা করে ৩ শতাধিক ট্যাংক ও অ্যাসল্ট গান, দেড় সহস্রাধিক কামান, ১৭,৬০০টি মোটর গাড়ি এবং বিভিন্ন ধরনের আরও অনেক সামরিক সাজসরঞ্জাম। শত্রুর কেবল অল্প সংখ্যক বিক্ষিপ্ত গ্রুপ হাত-ছাড়া হয়ে বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে পশ্চিমের দিকে পালিয়ে যায়।

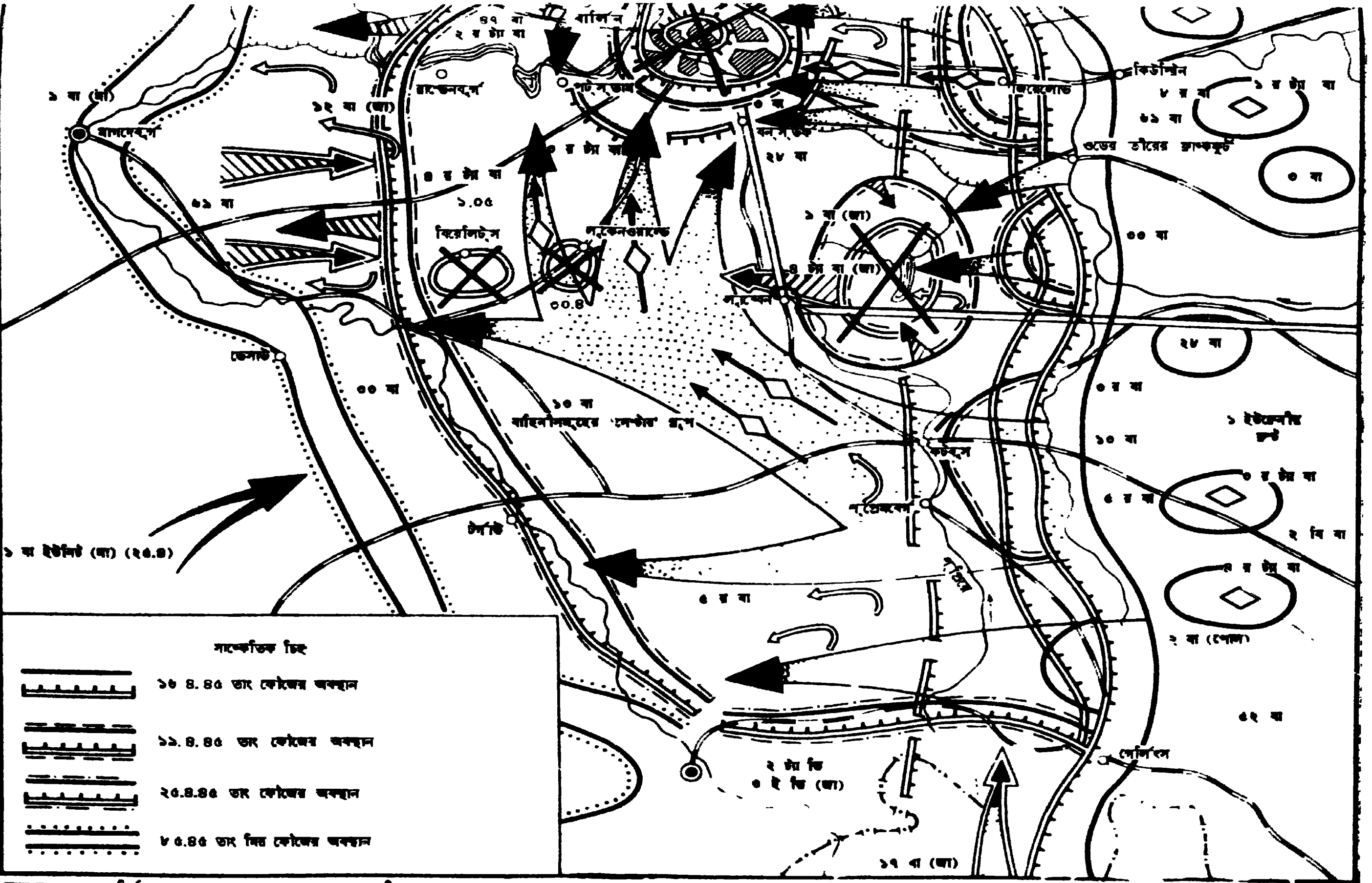
বার্লিনে পরিবেষ্টিত শত্রুকে ধ্বংস করা হচ্ছিল শহরের কেন্দ্রস্থল অভিমুখে চারিদিক থেকে গভীর আঘাত হেনে। এরূপ আঘাত গোটা এক-একটি অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করার এবং শত্রুকে অংশে অংশে বিনাশ করার সুযোগ দিচ্ছিল। ২ লক্ষাধিক সৈন্যের বার্লিন গ্রুপিংয়ের (বার্লিন গ্যারিসনের) বিলোপ সাধনের কাজ চলে কঠোর রাস্তার লড়াইয়ে। ফ্যাসিস্টরা কঠোর প্রতিরোধ দিচ্ছিল। ওরা লড়ছিল প্রতিটি আবাসিক এলাকার জন্য, প্রতিটি বাড়ির জন্য।

পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে নিয়ে-আসা ভেন্কের ১২শ বাহিনীর সৈন্যদের দিয়ে জার্মান সেনাপতিমন্ডলী যে-সমস্ত প্রতিআক্রমণ চালায় তা প্রতিহত করে দেওয়া হয়।

ভের্মাখ্টের সর্বোচ্চ সেনাপতিমন্ডলীর ডায়েরিতে লেখা হয়েছিল, 'এল্ব নদীর তীরে আমাদের সৈন্যরা আমেরিকানদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে বাইরে থেকে নিজেদের আক্রমণাভিযানের দ্বারা বার্লিনের রক্ষকদের অবস্থা সহজকরণের উদ্দেশ্যে।'* কিন্তু সে আক্রমণাভিযান আর ঘটল না।... ১২শ বাহিনীর অপর্যুদস্ত ফৌজগুলোর একাংশ মার্কিন সৈন্যদের দ্বারা পাতা সেতুগুলো দিয়ে এল্বের বাঁ তীরে সরে যায় এবং আমেরিকানদের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

সোভিয়েত সৈন্যরা বার্লিনের সেণ্ট্রেল সেক্টরে পেঁছে রাইখস্টাগের জন্য কঠোর লড়াই আরম্ভ করে। রাইখস্টাগের ভবনটি প্রতিরোধ দানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। জার্মানরা মরিয়া হয়ে প্রতিরোধ





নকশা ১৮। বার্লিন অপারেশন (১৯৪৫ সালের এপ্রিল-মে)

দিচ্ছিল, লড়াই সুদীর্ঘ ও কঠোর চরিত্র ধারণ করে। অনেকগুলো এলাকায় লড়াই পরিণত হয় হাতাহাতি যুদ্ধে।

রাইখস্টাগ ভবনে লড়াই চলছিল প্রতিটি করিডর, প্রতিটি কামরার জন্য। ৩০ এপ্রিল রাইখস্টাগের উপর উড়ল বিজয়ের লাল পতাকা, যা উত্তোলিত করেছিলেন সার্জেণ্ট ম. ইয়েগোরভ ও সার্জেণ্ট ম. কান্তারিয়া। বার্লিন গ্রুপিংটিকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হয়।

ফ্যাসিস্ট নেতৃমণ্ডলীর মধ্যে আতঙ্ক শুরু হয়। কৃত কুকর্ম ও অপরাধের জন্য শাস্তি এড়ানোর উদ্দেশ্যে হিটলার ৩০ এপ্রিল তারিখে আত্মহত্যা করল। সৈন্য বাহিনীর কাছে এ ব্যাপারটি গোপন রাখার জন্য ফ্যাসিস্ট রেডিও ঘোষণা করল যে হিটলার বার্লিনের উপকণ্ঠের রণাঙ্গনে নিহত হয়েছে। সেই দিনই ফিউরেরের উত্তরাধিকারী গ্রস-অ্যাডমিরাল ডোনিৎস শ্লেজভিগ-গলস্টেইনে 'সাম্রাজ্যের অস্থায়ী সরকার' গঠন করল। পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ থেকে বোঝা গেল যে এই 'সরকার' সোভিয়েতবিরোধী ভিত্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে চেষ্টা করছিল।*

কিন্তু ফ্যাসিস্ট জার্মানির অস্তিত্বের দিনগুলো ফুরিয়ে আসছিল। বার্লিন গ্রুপিংয়ের অবস্থা ছিল বিপর্যয়কর। ১ মে রাত ৩টার সময় জার্মান স্থলসেনার জেনারেল স্টাফের অধিকর্তা জেনারেল ক্রেবস সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলীর সঙ্গে সমঝোতা অনুসারে বার্লিনে ফ্রণ্ট লাইন অতিক্রম করে ৮ম রক্ষী বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল ভাসিলি চুইকোভের কাছে এল। সে হিটলারের আত্মহত্যার খবর দিল, সাম্রাজ্যের নতুন সরকারের সদস্যদের নামের তালিকা হাজির করল এবং জার্মানি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে শান্তির কথাবার্তার জন্য পরিবেশ গড়ার উদ্দেশ্যে রাজধানীতে সাময়িকভাবে সামরিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধকরণের বিষয়ে গেবেলস আর বোরমানের প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করল। কিন্তু এই দলিলটিতে আত্ম-সমর্পণ সম্পর্কে কোন কথাই বলা হয় নি। এটা ছিল হিটলারবিরোধী জোটে মতভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ফ্যাসিস্ট নেতাদের শেষ প্রচেষ্টা। কিন্তু সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী শত্রুর দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরেছিল।

মার্শাল গেওর্গি জুকোভের মাধ্যমে ক্রেবস প্রদত্ত সংবাদটি সর্বোচ্চ

সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর সদর-দপ্তরে প্রেরিত হয়েছিল। উত্তরটি ছিল অতি সংক্ষিপ্ত: বার্লিনের গ্যারিসনকে অবিলম্বে ও বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা হোক।

কথাবার্তা বার্লিনে লড়াইয়ের প্রবলতাকে প্রভাবিত করে নি। সোভিয়েত সৈন্যরা শত্রুর রাজধানীকে পুরোপুরিভাবে করায়ত্ত করার চেষ্টায় সক্রিয়ভাবে আক্রমণাভিযান চালিয়েই যাচ্ছিল, আর নাৎসিরা দৃঢ় প্রতিরোধ দানে লিপ্ত ছিল। সন্ধ্যা ৬টার সময় জানা গেল যে ফ্যাসিস্ট নেতৃবৃন্দ শর্তহীন আত্মসমর্পণের দাবি প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে। এর দ্বারা তারা আরও একবার প্রদর্শন করল লক্ষ লক্ষ সাধারণ জার্মান মানুষের অদৃষ্টের প্রতি তাদের পূর্ণ উদাসীনতা।

সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী আপন ফৌজকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে শত্রুর বার্লিন গ্যারিসনটিকে উচ্ছেদ করার হুকুম দিলেন।

উত্তর দিক থেকে আক্রমণরত ৩য় আক্রমণকারী বাহিনীর ইউনিটগুলো রাইখস্টাগের দক্ষিণে দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণরত ৮ম রক্ষী বাহিনীর ইউনিটসমূহের সঙ্গে মিলিত হয়, আর ২ মে বিকাল ৩টা নাগাদ শহরে শত্রুর প্রতিরোধ পুরোপুরিভাবে বন্ধ হয়ে যায় এবং বার্লিনের প্রতিরক্ষা বিভাগের অধিকর্তা জেনারেল ভেইডলিং ও তার বার্লিন গ্যারিসনের অবশিষ্ট সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করে। শহরটি পুরোপুরিভাবে সোভিয়েত সৈন্যদের দখলে চলে আসে।

অপারেশনের শেষ দিকে ২য় বেলোরুশ ফ্রন্টের ফর্ম্যাশনগুলো এল্‌বের তীরে এবং শ্‌ভেরিন ও রস্তক শহরে পৌঁছে যায়। ওখানেই তারা ব্রিটিশ সৈন্যদের মুখোমুখি হয়। নাৎসিদের ৩য় ট্যাঙ্ক বাহিনীর শক্তির একাংশকে সমুদ্রের দিকে হটিয়ে দিয়ে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়, আর অন্য অংশটি ইংরেজদের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

বার্লিন অপারেশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফলটি ছিল ফ্যাসিস্ট জার্মানির শর্তহীন আত্মসমর্পণ এবং ইউরোপে যুদ্ধের অবসান। বার্লিন অপারেশনের সমাপ্তির মানে ছিল — হিটলারী 'নতুন ব্যবস্থা' পতন, দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ইউরোপীয় জাতিসমূহের মুক্তি এবং ফ্যাসিজ-মের কবল থেকে বিশ্বসভ্যতার পরিত্রাণ।

বার্লিন অপারেশন চলাকালে সোভিয়েত সৈন্যরা বিধ্বস্ত করে শত্রুর ৭০টি ইনফেন্ট্রি, ১২টি ট্যাঙ্ক ও ১১টি মোটোরাইজ্‌ড ডিভিশনকে, ১৬ এপ্রিল থেকে ৭ মে পর্যন্ত বন্দী করে প্রায় ৪ লক্ষ ৮০ হাজার জার্মান

সৈনিক আর অফিসারকে। ওই কাল পর্যায়েই কবজা করা হয় দেড় সহস্রাধিক ট্যাংক, সাড়ে চার হাজার বিমান, প্রায় ১১ হাজার তোপ ও মর্টার কামান।

ফ্যাসিস্ট জার্মানির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য সোভিয়েত মানুষকে প্রচুর মূল্য দিতে হয়েছিল। ১৯৪৫ সালের ১৬ এপ্রিল থেকে ৮ মে পর্যন্ত ১ম ও ২য় বেলোরুশ এবং ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের বাহিনীগুলোর প্রায় ৩ লক্ষ লোক হতাহত হয়। ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনীগুলো পুরো ১৯৪৫ সালে পশ্চিম রণাঙ্গনে হারায় ২ লক্ষ ৬০ হাজার লোক।

সোভিয়েত যোদ্ধারা জার্মানির ভূখণ্ডে পদার্পন করে দিগ্বিজয়ী হিশেবে নয়, মুক্তিদাতা হিশেবে। জার্মান ফ্যাসিজমের অপরাধজনক নীতি দেশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়, আর জনগণকে ঠেলে দেয় নিঃস্বতা, অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট ও অবিশ্বাস্য দুর্দশার মধ্যে। অবশেষে এই বিভীষিকার হাত থেকে উদ্ধার মিলল। সোভিয়েত সরকার এবং সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর সেনাপতিমণ্ডলী লাল ফৌজ অধিকৃত জার্মান ভূখণ্ডে জীবনযাত্রা স্বাভাবিকীকরণের উদ্দেশ্যে — এবং সর্বাগ্রে জনগণের জন্য খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের লক্ষ্যে — অনেকগুলো ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। লড়াই চলাকালেই সোভিয়েত সৈনিকরা জার্মান নাগরিকদের সঙ্গে খাদ্য ভাগাভাগি করে খেত, আর সামরিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হওয়ার পর তারা বার্লিনবাসীদের সঙ্গে মিলে শহরের অর্থনীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে হাত দেয়। শহরে খাদ্যদ্রব্য পোঁছানোর জন্য এবং অনেকগুলো চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী জরুরী ব্যবস্থাদি অবলম্বন করেন। সোভিয়েত সরকার বার্লিনে প্রেরণ করেন ৯৬ হাজার টন শস্য, ৬০ হাজার টন আলু, ৫০ হাজারের মতো পশু এবং চিনি, তেল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য। মহামারী এড়ানোর উদ্দেশ্যে জরুরী ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা হয়। ২১ জুন নাগাদ বার্লিনে খোলা হয়েছিল ৯৬টি হাসপাতাল (যার মধ্যে ৪টি শিশু হাসপাতাল), ১০টি প্রসবালয়, ১৪৬টি ঔষধালয়, ৬টি ফার্স্ট এইড কেন্দ্র, যেগুলোতে কাজ করছিলেন ৬৫৪ জন ডাক্তার। প্রায় ৮০০ জন চিকিৎসককে প্রাইভেট প্র্যাকটিসের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী ও ম্যাজিস্ট্রেট বার্লিনের পৌর ব্যবস্থাদি চালুকরণের জন্য জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ২৯ এপ্রিল কার্ল্‌স্‌হর্স্ট অঞ্চলটিই প্রথম সোভিয়েত সৈন্য ও জার্মান ফ্যাসিস্টবিরোধীদের দ্বারা রক্ষিত ক্লিনগেনবের্গ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি থেকে বিদ্যুৎ শক্তি পেল। এই

অঞ্চলে সবচেয়ে আগে জল সরবরাহ শুরু করা হয়, নর্দমা-ব্যবস্থা চালু করা হয়।

বার্লিনের মুক্তির প্রথম দিনগুলো থেকেই সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী ও জার্মান ফ্যাসিস্টবিরোধীরা ফ্যাসিস্ট ভাবাদর্শ কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত জার্মান সংস্কৃতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার সমস্যাবলি সমাধানের কাজে হাত দেন। মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে আপন অনুষ্ঠান প্রচার করতে আরম্ভ করে বার্লিন রেডিও, সেই মাসের শেষে খোলা হয় প্রথম থিয়েটার, আর জুনের মাঝামাঝি নাগাদ শহরে চালু হয়েছিল ১২০টি সিনেমা হল। রাজনৈতিক জীবনের জাগরণের জন্য সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী সবচেয়ে অনুকূল পরিবেশ গড়ে দেন। জেনারেল বের্জারিনের ৫ম আক্রমণকারী বাহিনীর সেনাপতিমণ্ডলী (যাঁদের উপর ন্যস্ত হয়েছিল শহরের অভ্যন্তরীণ নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব) এবং শহরের অঞ্চলগুলোর সেনাপতি-দপ্তরগুলো বার্লিনের মুক্তির প্রথম ঘণ্টাগুলোতেই জার্মান জনগণের ফ্যাসিস্টবিরোধী ও স্বদেশপ্রেমিক শক্তিসমূহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় লিপ্ত হন। মে মাসের গোড়া থেকে এই সমস্ত শক্তি জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি ওয়াল্টের উলব্রিখটের পরিচালনাধীন একটি উদ্যোগী দলের কাছে দৃঢ় রাজনৈতিক নেতৃত্ব লাভ করে। সোভিয়েত সরকারের নির্দেশ মেনে সামরিক কর্তৃপক্ষ ধীরে ধীরে জার্মান স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ও ক্রিয়াকলাপের পরিধি বিস্তৃত করেন। জার্মান ভূমিতে নতুন রাষ্ট্র ক্ষমতা — শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতীদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পথে এগুলো ছিল প্রথম পদক্ষেপ।

জুলাই মাসে প্রবাস থেকে বার্লিনে প্রত্যাবর্তন করলেন জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান ভিলহেল্ম পিক এবং পার্টির একদল নেতৃস্থানীয় কর্মী। ভিলহেল্ম পিকের প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই কমিউনিস্ট পার্টির ক্রিয়াকলাপ সক্রিয় হয়ে যায় এবং অচিরেই তা পরিণত হয় দেশের একটি মুখ্য পার্টিতে। জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা ওট্টো গ্রটেভোল ওই সময় লিখেছিলেন, 'ইতিহাসে আর কোথায় এমন দখলকারী সৈন্য বাহিনী খুঁজে পাওয়া যাবে যা যুদ্ধ সমাপ্তির পাঁচ সপ্তাহ পরেই অধিকৃত রাষ্ট্রের জনগণকে পার্টি গঠনের ও সংবাদপত্র প্রকাশের সুযোগ দেবে, সভাসমিতি ও ভাষণদানের স্বাধীনতা প্রদান করবে?' ১ জুলাই নাগাদ শহরে স্বাভাবিক জীবন মোটামুটিভাবে ফিরে আসে এবং অর্থনীতির সফল বিকাশের জন্য পরিস্থিতি গড়ে ওঠে। পূর্ব জার্মানিতে যুদ্ধোত্তর

সমাজ ব্যবস্থা নির্ধারণ করে খোদ জার্মান জনগণ তাদের ফ্যাসিস্টবিরোধী পার্টিগুলো আর প্রাদেশিক সরকারসমূহের মাধ্যমে, আর জার্মানিতে মার্শাল গেওর্গি জুকোভের পরিচালনাধীন সোভিয়েত সামরিক প্রশাসনিক সংস্থাগুলো তাদের ক্রিয়াকলাপে কেবল সর্বাঙ্গীণ সহায়তা ও নিরাপত্তা জুগাচ্ছিল।

বার্লিন অপারেশন ছিল যুদ্ধের বছরগুলোতে সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনী ও সোভিয়েত সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলী কর্তৃক সঞ্চিত বিপুল অভিজ্ঞতার বাস্তব রূপায়ণ। এটা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বৃহত্তম অপারেশন, এবং তার প্রত্যক্ষ প্রস্তুতি কার্যে সময় লেগেছিল দুই সপ্তাহ। উভয় দিক থেকে অপারেশনে অংশগ্রহণ করেছিল ৩৫ লক্ষাধিক লোক, ৫০ সহস্রাধিক তোপ ও মর্টার কামান, প্রায় ৮ হাজার ট্যাংক ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গান, ৯ সহস্রাধিক বিমান। অপারেশনের ছিল নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। প্রথমত, এটা ছিল ইউরোপে দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের অন্তিম অপারেশন। দ্বিতীয়ত, তার প্রস্তুতির মেয়াদ হ্রাসকরণের প্রয়োজন হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির নাৎসি প্রয়াস বানচাল করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। তৃতীয়ত, অপারেশনটি পরিচালিত হয়েছিল ফ্যাসিস্ট জোটের পূর্ণ পতনের পরিস্থিতিতে।

অপারেশনে অংশগ্রহণকারী সোভিয়েত সৈন্যদের উচ্চ সামরিক দক্ষতার অভিব্যক্তি ঘটে শত্রুর বৃহৎ গ্রুপিংটি পরিবেষ্টনের মধ্যে, একই সঙ্গে তাকে অংশে অংশে বিভক্তকরণের মধ্যে এবং ওগুলোর প্রতিটিকে আলাদা-আলাদাভাবে ধ্বংসকরণের মধ্যে। অপারেশন চলাকালে ব্যাপক নৈশ হামলার আশ্রয় নেওয়া হয়। রাত্রির জন্য সৈন্যদের যে-সমস্ত কাজ দেওয়া হত তা সাধারণত সাফল্যের সঙ্গেই সম্পন্ন হত। বার্লিনের জন্য লড়াইয়ে ট্যাংক আর তোপ সমর্থিত ঝঞ্ঝাক্রমণকারী দল ও গ্রুপগুলোর ব্যাপক ব্যবহার আক্রমণকারীদের দ্রুত শত্রুর কেল্লা ও প্রতিরোধ কেন্দ্রসমূহ দখল করতে সহায়তা করে।

বার্লিনের আক্রমণাত্মক অপারেশনে অন্য যেকোন অপারেশনের তুলনায় সর্বাধিক সংখ্যক বিমান অংশগ্রহণ করেছিল। ওগুলো ব্যবহৃত হচ্ছিল ব্যাপকভাবে এবং লড়ছিল প্রবল প্রয়াসের সঙ্গে। কেবল প্রথম ১৪ দিনেই তিন ফ্রন্টের বিমান বাহিনী ৯১,৩৮৪ বিমান-উড্ডয়ন চালিয়ে ১৪,৫২৮টি বোমা বর্ষণ করে। বার্লিন অপারেশনের সময় সোভিয়েত বিমান বাহিনী ১,২৮২টি বায়ুযুদ্ধ চালায়, তাতে শত্রুর ১,১১৬টি বিমান

ভূপাতিত হয়। এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপ চলছিল জার্মানদের দ্বারা জেট প্লেন আর বিমান-বোমার* মতো নতুন ধরনের যুদ্ধোপকরণ ব্যবহারের পরিস্থিতিতে। অন্তরীক্ষে সোভিয়েত বিমান বাহিনীর পূর্ণ আধিপত্য এই নতুন উপকরণগুলোর আঘাত ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে সীমিত করে দেয়। সেই জন্যই শত্রু তা ব্যবহার করে বিশেষ ফল লাভ করতে পারে নি। বিমান বাহিনীর নতুন ট্যাকটিকেল পদ্ধতি প্রয়োগ — আক্রমণকারী বিমান হিশেবে ফ ভ-১৯০ ফাইটারগুলোর ব্যবহারও নাৎসিদের সাহায্য করতে পারল না। অন্তরীক্ষে সোভিয়েত বিমান বাহিনীর শ্রেষ্ঠতা শত্রুর এই রণকৌশলকে প্রায় অকেজো করে দেয়।

সোভিয়েত যোদ্ধাদের বীরকীর্তি নতুন বংশধরদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে বার্লিন আর কোনদিন আগ্রাসন ও দস্যুতার কেন্দ্র হতে পারবে না, জাতিসমূহের স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার নতুন অভিযানের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হতে পারবে না। এর গ্যারাণ্টি হচ্ছে নতুন, গণতান্ত্রিক জার্মানি, যা ফ্যাসিজমের জোয়াল ছুড়ে ফেলে দিয়ে সমাজতন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে।

৫। পশ্চিম রণাঙ্গনে মিত্র বাহিনীসমূহের সামরিক ক্রিয়াকলাপ

১৯৪৫ সালের জানুয়ারির শেষ দিকে জার্মানির সীমান্তে ইঙ্গো-মার্কিন সেনাপতিমণ্ডলীর হাতে ছিল প্রায় ৭০টি ডিভিশন। আর্দেনের উদ্‌গতাংশ থেকে নাৎসি ফৌজগুলোর অপসারণের পর ওদের বিরুদ্ধে খাড়া থাকে ৬০টি অসম্পূর্ণ জার্মান-ফ্যাসিস্ট ডিভিশন, যেগুলোর প্রকৃত লোকসংখ্যা মিত্র বাহিনীগুলোর এক-তৃতীয়াংশের বেশি ছিল না। ওই সময় সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টে লড়ছিল নাৎসিদের ১৮৫টি ডিভিশন ও ২১টি ব্রিগেড, যেগুলো লোকসংখ্যায় ও যুদ্ধক্ষমতায় পশ্চিম রণাঙ্গনে অবস্থিত জার্মান ফর্ম্যাশনগুলোর চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিল।

* বিমান-বোমা — এ হচ্ছে বিস্ফোরক পদার্থপূর্ণ বিমান-বোমারু উ-৮৮ যার উপর স্থাপিত হত ফাইটার ফ ভ-১৯০। উপযুক্ত সময়ে ওগুলো আলাদা হয়ে যেত: ফাইটার উড়তে থাকত, আর বোমারু (চালক ছাড়া) লক্ষ্যের উপর ছোঁ মারত।

অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মিত্র সেনাপতিমণ্ডলী জার্মানির গভীরে আক্রমণাভিযান আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ফেব্রুয়ারি-মার্চে তাঁদের সৈন্যরা বিশেষ অসুবিধা ব্যতিরেকেই রাইনের পশ্চিম তীরে পেঁ'ছে যায়। আর রাইন অতিক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল রুর অধিকারের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ইঙ্গো-মার্কিন সেনাপতিমণ্ডলীর রুর অপারেশনের উদ্দেশ্য ছিল দু'টি আঘাতের দ্বারা — উত্তর দিক থেকে বাহিনীসমূহের ২১তম গ্রুপের শক্তিসমূহের দ্বারা এবং দক্ষিণ দিক থেকে বাহিনীসমূহের ১২শ গ্রুপের শক্তিসমূহের দ্বারা রুরের পাশ কেটে গিয়ে জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজগুলোর রুর গ্রুপিংটিকে ঘিরে ফেলা এবং একই সঙ্গে বাহিনীসমূহের ৬ষ্ঠ গ্রুপের শক্তিসমূহ দিয়ে রাইন পার হয়ে পরে জার্মানির দক্ষিণাংশে আক্রমণাভিযান চালানো।

বাহিনীসমূহের ২১তম গ্রুপের সৈন্যদের দ্বারা রাইন অতিক্রমণ আরম্ভ হয় ২৩ মার্চ ভেজেল অঞ্চলে বিমান থেকে তিন দিন ব্যাপী প্রাগাক্রমণ বোমাবর্ষণ ও এক ঘণ্টা ব্যাপী প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণের পর। তা সম্পন্ন হয় সফলভাবে। পরের দিন সকাল নাগাদ মিত্র বাহিনীগুলো কয়েকটি ব্রিজ-হেড দখল করে নেয় এবং ওগুলোতে নিজেদের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করতে আরম্ভ করে। ওই দিনই রাইন থেকে ৬-৮ কিলোমিটার দূরে দু'টি এয়ারবোর্ন ডিভিশনের অবতরণ শুরু হয়। পরিবহণ বিমান বাহিনী যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও অবতরণ কার্য সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত হয়: ১,৫৯৫টি বিমান ও ১,৩৪৭টি গ্লাইডারের মধ্যে খুয়া গিয়েছিল যথাক্রমে ৪৯৩ ও ৩৩৭টি। ২৪ মার্চ দিনের দ্বিতীয়ার্ধে এয়ারবোর্ন ডিভিশনগুলো জার্মানদের তরফ থেকে কোনরূপ প্রতিরোধ না পেয়ে পরস্পরের সঙ্গে এবং ফ্রন্ট দিক থেকে আক্রমণরত ফৌজগুলোর সঙ্গে মিলিত হয়। স্থলসেনা ও বায়ুসেনার ক্রিয়াকলাপের সাফল্য নির্ধারণ করে বিমান বাহিনীর বিপুল সমর্থন এবং ইঞ্জিনিয়রিং বাহিনীর দ্রুত ও নিপুণ কাজ। কেবল এক ২৪ মার্চ তারিখেই মিত্র বিমান বাহিনী প্রায় ৮ হাজার বিমান-উড্ডয়ন চালায়, আর জার্মান বিমান বাহিনী — ১০০ বিমান-উড্ডয়নের বেশি নয়। মিত্র বাহিনীর ইঞ্জিনিয়রিং ইউনিটগুলো ২৬ মার্চ সন্ধ্যার দিকে বাহিনীসমূহের ২১তম গ্রুপের এলাকায় রাইনের উপর ১২টি সেতু গড়ে দেয়। এ সমস্তকিছু ২৮ মার্চ দিনের শেষ দিকে ইঙ্গো-মার্কিন ফৌজগুলোকে একটি ব্রিজ-হেড দখল করতে সাহায্য করে। ব্রিজ-হেডটির আয়তন ছিল — ফ্রন্ট বরাবর ৬০ কিলোমিটার আর গভীরতা বরাবর ৩০ কিলোমিটার।

বাহিনীসমূহের ১২শ ও ৬ষ্ঠ গ্রুপের ফৌজগুলো মাইন ও রেমাইনের দক্ষিণে অবস্থিত অঞ্চলগুলোতে পূর্বে অধিকৃত ব্রিজ-হেডগুলো প্রসারিত করছিল এবং মানখেইম অঞ্চলে রাইন নদী পার হয়েছিল। পরে মিত্র সৈন্যরা — ১ম ও ৯ম মার্কিন বাহিনী দক্ষিণ ও উত্তর থেকে রুর ঘিরে ফেলে এবং ১ এপ্রিল লিপস্টাডট্ আর পাডের্বোর্ন অঞ্চলে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়। জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজগুলোর ৩ লক্ষ ২৫ হাজার লোকের রুর গ্রুপিংটি পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে। অচিরেই তা আত্মসমর্পণ করে।

জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের দ্রুত আত্মসমর্পণের দুটি কারণ ছিল: প্রথমত, নাৎসিদের সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর আঘাতের মুখে পড়ার ভয়, আর দ্বিতীয়ত, রুরের ধন-কুবেরদের তাদের কলকারখানা, খনি আর আকরিক ক্ষেত্রগুলোকে বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করার প্রয়াস।

মিত্রদের হাতে শত্রুর রুর গ্রুপিংয়ের পরাজয়ের পর জার্মান-ফ্যাসিস্ট সৈন্যদের পশ্চিম রণাঙ্গনটির অস্তিত্ব লোপ পায়। মিত্র ফৌজগুলো সারিতে সারিতে অগ্রসর হয়ে এবং শত্রুর কাছ থেকে প্রায় কোন প্রতিরোধ না পেয়ে ২৫ এপ্রিল তারিখে টর্গাউ অঞ্চলে এল্‌ব নদীর তীরে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর ১ম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হয়।

ইতালীয় রণাঙ্গনে মিত্র বাহিনীগুলো ১৯৪৫ সালের জানুয়ারি মাসে আক্রমণাভিযান আরম্ভ করে এবং মাসের মাঝামাঝি সময়ে ১৫-২০ কিলোমিটার অগ্রসর হয়ে যায়। তাদের বিপুল সহায়তা জোগায় প্রতিরোধ আন্দোলনের ইউনিট আর ফর্ম্যাশনগুলো। ২৫ এপ্রিল অভ্যুত্থিত জনগণ মিলান নগরী অধিকার করে ফেলে। ইতালীয় একনায়ক মুসোলিনি পর্বতে পালিয়ে যায়, কিন্তু পরে সে পার্টিজানদের হাতে ধরা পড়ে, তার বিচার ও মৃত্যুদন্ড হয়। মিত্র বাহিনীগুলো আত্মসমর্পণকারী জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজগুলোকে গ্রহণ করতে লাগল। কিন্তু ১৯৪৫ সালের ১২ এপ্রিল অপ্রত্যাশিতভাবে মারা যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট। তাঁর মৃত্যু নাৎসি নেতৃবৃন্দের মনে ফ্যাসিস্ট জার্মানির অব্যাহতির আশা জাগিয়ে তুলে। হিটলার ভেবেছিল যে ঠিক তা-ই ঘটবে যা ঘটেছিল ১৭৬২ সালে সপ্তবর্ষী যুদ্ধের সময়, যখন রুশ সম্রাজ্ঞী এলিজাবেতার আকস্মিক মৃত্যু এবং ৩য় পিটারের সিংহাসনারোহণ প্রাশিয়াকে পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয়। ফ্যাসিস্ট প্রচার মাধ্যম রুজভেল্টের মৃত্যুকে অলৌকিক ঘটনা বলে, যুদ্ধের গতিতে এক পরিবর্তন

বলে ঘোষণা করে। কিন্তু হিটলারী সেনাপতিমণ্ডলী মিছেই ফ্যাসিস্ট জার্মানির পরিত্রাণের আশা করছিল। যুদ্ধ চলাকালে হিটলারবিরোধী জোট ফ্যাসিজমকে পরাস্তকরণের অভিন্ন কর্তব্যটি পালন করছিল।

১৯৪৫ সালের প্রথম তিন মাস মিত্র সেনাপতিমণ্ডলী ইতালীয় ফ্রণ্টে আক্রমণাত্মক অপারেশন আরম্ভ করতে সাহস পান নি, এবং কেবল এপ্রিলের গোড়াতেই মিত্র সৈন্যরা আক্রমণাভিযান আরম্ভ করে। তাদের সামরিক ক্রিয়াকলাপে সফল সমর্থন জোগায় বিমান বাহিনী। ইঙ্গো-মার্কিন সৈন্যরা যে-সমস্ত শহর ও জনপদে প্রবেশ করে তার বেশির ভাগই মুক্ত হয়েছিল অভ্যুত্থিত জনগণ আর পার্টিজানদের দ্বারা। ২৯ এপ্রিল ইতালিতে জার্মান সেনাপতিমণ্ডলীর প্রতিনিধিরা শর্তহীন আত্মসমর্পণের বিষয়ে একটি দলিল স্বাক্ষর করে, এবং ১৯৪৫ সালের ২ মে বেলা ১২টার সময় সেই দলিলটি বলবৎ হয়।

আটলাণ্টিক মহাসাগরে ও ভূমধ্যসাগরে মিত্রদের সামরিক ক্রিয়াকলাপ সীমিত ছিল প্রধানত নিজেদের সামুদ্রিক যোগাযোগ পথগুলোর নিরাপত্তা বিধানের মধ্যে। ওই সমস্ত পথ দিয়ে পশ্চিম ইউরোপে প্রেরিত হচ্ছিল সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্যদ্রব্য ও স্ট্র্যাটেজিক কাঁচামাল। প্রধানত ব্রিটিশ নৌ-বহর অন্য যে-একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছিল তা ছিল নরওয়ে ও হল্যাণ্ডের উপকূল বরাবর শত্রুর যোগাযোগ পথগুলো বিনষ্টকরণ, — ওই সমস্ত পথ দিয়ে জার্মানরা নরওয়ে থেকে সৈন্য ও লৌহ আকরিক প্রেরণ করছিল। মিত্রদের দৃঢ় সাবমেরিনবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দরুন জার্মান সাবমেরিনগুলো উল্লেখযোগ্য কোন সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। ১৯৪২ সালে জার্মানদের একটি ডুবো জাহাজ জলমগ্ন হলে মিত্রদের নিমজ্জিত হত ১৩·৬টি জাহাজ; কিন্তু সেই তুলনায় ১৯৪৫ সালে মিত্রদের জাহাজ ডুবির সংখ্যা ছিল কুল্লে ০·৩টি। এই অনুপাত থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে যুদ্ধের শেষ দিকে জার্মান-ফ্যাসিস্ট ডুবো জাহাজের সামরিক ক্রিয়াকলাপের ফলপ্রসূতা ১৯৪২ সালের তুলনায় ৪৫ গুণ কমে গিয়েছিল। অতএব, নাৎসিদের জলতলের যুদ্ধ তার সমগ্র ফলপ্রসূতা হারিয়ে ফেলেছিল।

ভূমধ্যেসাগরে জার্মানির নৌ-শক্তির সংখ্যাল্পতার দরুন নাৎসিদের প্রধান কাজটি সীমিত ছিল কেবল যোগাযোগ পথগুলো রক্ষার মধ্যে। এই সমস্ত পথ দিয়ে উত্তর ইতালিতে যুদ্ধরত সৈন্যদের এবং এজিয়ান সাগরের দ্বীপগুলোতে ও ক্রিটের পশ্চিমাংশে অবস্থিত গ্যারিসনগুলোকে রসদ

আর অস্ত্রশস্ত্রের জোগান দেওয়া হচ্ছিল। শত্রুর উপকূলের জাহাজগুলোর সঙ্গে সংগ্রামের জন্য মিত্ররা বিমান বাহিনীকে ব্যবহার করছিল, যা তার সফল ক্রিয়াকলাপের দ্বারা নাৎসিদের যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। মিত্রদের জাহাজ চলাচলের পক্ষে জার্মান যুদ্ধ-জাহাজ আর বিমান বাহিনী বড় কোন হুমকি ছিল না। তবে মাইনের ভয়ে মিত্ররা নিজেদের জাহাজ চলাচলের নিরাপত্তা বিধানের জন্য মাইন-সুইপিং ফ্লিটের যথেষ্ট শক্তিকে কাজে লাগাতে বাধ্য হয়েছিল। মোটামুটিভাবে যেমন আটলাণ্টিকে তেমনি ভূমধ্যসাগরে ফ্যাসিস্ট জার্মানির সামরিক নৌ-শক্তি পরাজয় বরণ করে।

ফ্যাসিস্ট জার্মানির শর্তহীন আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরের পর অ্যাডমিরাল ডেনিৎস সমুদ্রে অবস্থিত সমস্ত ডুবো জাহাজকে সামরিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করার এবং নিজ নিজ ঘাঁটিতে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। তদাবধি টিকে-থাকা ৪০৭টি জার্মান ডুবো জাহাজের মধ্যে ২২১টিকে খোদ জার্মানরাই ডুবিয়ে দেয়, ৩০টি জাহাজ মিত্ররা ভাগাভাগি করে নেয় আর ১৫৬টিকে যুদ্ধ-বিরতির শর্ত অনুসারে পরে ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

১৯৪৫ সালে মিত্র বাহিনীসমূহের যুদ্ধ কৌশলের প্রধান বৈশিষ্ট্যটি ছিল এই যে অপারেশনগুলোর পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির সময় বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল পরিচালিত সামরিক ক্রিয়াকলাপের গোপনীয়তার দিকে। সৈন্যরা মূল অবস্থানসমূহে সমাবেশিত হয়েছিল প্রধানত রাত্রিবেলা আক্রমণাভিযান পরিচালনার জন্য এবং তারা অপারেশনেল ও ট্যাকটিকেল ক্যামুফ্লেজের সমস্ত ব্যবস্থা মেনে চলছিল। সৈন্য বিন্যাস ও সৈন্যদের সারিগুলো সাধারণত গভীর ছিল। ফৌজী কোরসমূহের দ্বিতীয় ও তৃতীয় এশিলনে ট্যাংক ডিভিশনগুলোর অবস্থান মিত্র সেনাপতিমণ্ডলীকে অপারেশনেল গভীরতায় আক্রমণাভিযান চালিয়ে যাওয়ার জন্য ওগুলোকে (অর্থাৎ ট্যাংক ডিভিশনগুলোকে) ব্যবহার করতে সাহায্য করছিল।

ফৌজগুলোর আক্রমণাভিযানের আগে প্রবল বোমাবর্ষণ ও গোলাবর্ষণ চলে। যেমন, রুর শিল্পাঞ্চলে নাৎসিদের পরিবেষ্টনকরণের অপারেশনে শত্রুকে জার্মানির বাদবাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক প্রাগাক্রমণ বোমাবর্ষণ চলে পুরো এক মাস ধরে, আর সরাসরি প্রাগাক্রমণ বোমাবর্ষণ চলে ৪০ মিনিট (ইতালীয় রণাঙ্গনে) থেকে ১০ ঘণ্টা — ৩ দিন (পশ্চিম রণাঙ্গনে) পর্যন্ত। প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণ চলে ৪৫ মিনিট থেকে ৮ ঘণ্টা পর্যন্ত।

শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদকরণের কাজে লিপ্ত ছিল ইনফেণ্ট্রি

ফর্ম্যাশনগুলো যা গোলন্দাজ বাহিনী, ট্যাঙ্ক ফৌজ আর বিমান বাহিনীর সমর্থন পাচ্ছিল। আক্রমণাভিযানের সময় নদীগুলো অতিক্রমণের কাজ সাধারণত চলছিল পরিকল্পনাভিত্তিক প্রস্তুতি নিয়ে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ অপারেশনেল ও বৈষয়িক-প্রযুক্তিগত সমর্থন লাভের পরিবেশে। তাতে আক্রমণের আকস্মিকতা নিশ্চিত করা সম্ভব ছিল। যেমন, বাহিনীসমূহের ২১তম গ্রুপের সৈন্যদের দ্বারা রাইন নদী পার হওয়ার সময় মিথ্যা অতিক্রমণ ক্ষেত্রগুলো প্রস্তুত করার ব্যাপারে, প্রধান আঘাতের অভিমুখে ফৌজগুলোর ও অস্ত্রশস্ত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ ক্যামুফ্লেজের উদ্দেশ্যে ব্যাপক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হচ্ছিল। অতিক্রমণ সফল করার জন্য প্রবল ও নিরবচ্ছিন্ন প্রাগ্আক্রমণ গোলাবর্ষণ আর বোমাবর্ষণ চালানো হচ্ছিল। এ সমস্ত ব্যবস্থা ফৌজগুলোকে সাফল্যের সঙ্গে তাদের সামরিক কর্তব্য পালন করতে সাহায্য করে।

মিত্ররা ব্যাপক হারে এয়ারবোর্ন ল্যান্ডিং ফোর্স ব্যবহার করেছিল। তারা সফলভাবে রাইন অতিক্রম করতে সাহায্য করে। তারা কাজ করছিল পরিকল্পনা অনুযায়ী, উদ্যমের সঙ্গে এবং ফলপ্রসূভাবে। মোটের উপর ১৯৪৫ সালে জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের পরাজয়ে মিত্র বাহিনীগুলোরও অবদান ছিল।

৬। জার্মানির শর্তহীন আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষর

১৯৪৫ সালের ৮ মে মাঝরাতে বার্লিনের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে কার্ল্‌স্‌হর্স্টে আয়োজিত হয় ফ্যাসিস্ট জার্মানির শর্তহীন আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরের অনুষ্ঠান। সোভিয়েত ইউনিয়নের তরফ থেকে জার্মানির শর্তহীন আত্মসমর্পণ পত্র গ্রহণের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের ডেপুটি মার্শাল গেওর্গি জুকোভের উপর। মিত্রদের অভিযানকারী শক্তিসমূহের সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীর প্রতিনিধিত্ব করেন আইজেনহাওয়ারের সহকারী, ব্রিটেনের চিফ এয়ার মার্শাল এ. টেডার*, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর

* প্রথমে আইজেনহাওয়ার নিজেই ফ্যাসিস্ট জার্মানির শর্তহীন আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরে চার্চিলের ও তাঁর নিজের দুজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মীর আপত্তির

প্রতিনিধিত্ব করেন স্ট্র্যাটেজিক বায়ুসেনার অধিনায়ক জেনারেল ক. স্পাটস, ফ্রান্সের সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করেন, সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল জ.-ম. দে লাত্তর দে তাসিনি।

পরাভূত ফ্যাসিস্ট জার্মানির তরফ থেকে আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরের পূর্ণাধিকার সমেত বার্লিনে পেঁছানো হয় ভের্মাখ্‌টের সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীর সদর-দপ্তরের প্রাক্তন অধিকর্তা ফিল্ডমার্শাল ভ. কেইটেলকে, সামরিক নৌ-শক্তির সর্বাধিনাযক ফ্লিট অ্যাডমিরাল গ. ফ্রিডেবুর্গকে এবং বিমান বাহিনীর কর্নেল-জেনারেল গ. শ্‌টুম্‌ফকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় পতাকা সজ্জিত কক্ষে উপস্থিত ছিলেন সেই সমস্ত সোভিয়েত জেনারেল যাঁদের ফৌজগুলো বার্লিনের ঝঞ্চাক্রমণে অংশ নিয়েছিল। ওখানে সোভিয়েত আর বিদেশী সাংবাদিকরাও উপস্থিত ছিল।

দলিল স্বাক্ষরের অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল গেওর্গি জুকোভ। 'আমরা, সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর এবং মিত্র বাহিনীসমূহের সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীর প্রতিনিধিরা... জার্মান সেনাপতিমণ্ডলীর কাছ থেকে জার্মানির শর্তহীন আত্মসর্পণ পত্র গ্রহণের ব্যাপারে হিটলারবিরোধী জোটের সরকারসমূহের কাছে পূর্ণ অধিকার লাভ করেছি...'* — গাম্ভীর্যের সঙ্গে উচ্চারণ করেন তিনি।

তারপর হলঘরে আমন্ত্রিত হল জার্মান সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীর প্রতিনিধিরা। গেওর্গি জুকোভের প্রস্তাবানুযায়ী কেইটেল মিত্র ফৌজের প্রতিনিধিদলসমূহের প্রধানদের সেই দলিলটি প্রদান করল যদ্দ্বারা ডোনিৎস জার্মান প্রতিনিধিদলকে আত্মসমর্পণ পত্র স্বাক্ষর করার অধিকার দিয়েছিল। এর পর জার্মান প্রতিনিধিদলকে প্রশ্ন করা হয়, তাদের হাতে শর্তহীন আত্মসমর্পণ বিষয়ক দলিলটি আছে কি এবং তারা তা পড়ে দেখেছে কি? কেইটেল হাঁ-সূচক জবার দেয়। তারপর মার্শাল গেওর্গি জুকোভের নির্দেশ অনুযায়ী জার্মান সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধিরা নয় কপিতে রচিত দলিলটি

স্বাক্ষর করে। দলিল স্বাক্ষরের কাজ শেষ হলে জার্মান প্রতিনিধিদলকে হলঘর ত্যাগ করতে বলা হয়।

দলিলটিতে ছিল ৬টি ধারা। তাতে লেখা ছিল:

'১. আমরা, নিম্নে স্বাক্ষরকারীরা, জার্মান সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীর তরফ থেকে এতদ্দ্বারা ঘোষণা করছি যে লাল ফৌজের সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলী এবং একই সঙ্গে অভিযানকারী মিত্র বাহিনী-সমূহের সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীর কাছে জলে স্থলে ও অন্তরীক্ষে আমাদের সমস্ত সামরিক শক্তির এবং বর্তমানে জার্মান সেনাপতিমণ্ডলীর অধীনস্থ সমস্ত শক্তির শর্তহীন আত্মসমর্পণের ব্যাপারে নিজেদের সম্মতি দান করছি।

২. জার্মান সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলী অবিলম্বে স্থল বাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমান বাহিনীর সমস্ত জার্মান অধিনায়কদের এবং জার্মান সেনাপতিমণ্ডলীর অধিনস্থ সমস্ত সামরিক শক্তির উদ্দেশে নির্দেশপত্র প্রকাশিত করবে যাতে বলা হবে: ১৯৪৫ সালের ৮মে তারিখে মধ্য ইউরোপীয় সময় অনুসারে রাত ১১টা থেকে ১টার মধ্যে সামরিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করতে হবে, সৈন্যরাও ওই সময় যেখানে থাকবে ঠিক সেই ভাবেই নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করবে, তারা পুরোপুরিভাবে নিরস্ত্রীকৃত হবে, সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র, সামরিক সাজসরঞ্জাম আর অন্যান্য জিনিসপত্র স্থানীয় মিত্র সেনাপতিদের হাতে অথবা সর্বোচ্চ মিত্র সেনাপতিমণ্ডলীর প্রতিনিধিদের দ্বারা নিযুক্ত অফিসারদের হাতে তুলে দিতে হবে. জাহাজ, স্টিমার আর বিমানগুলো, ওগুলোর ইঞ্জিন, বডি ও যন্ত্রপাতি. এবং মোটর গাড়ি, যুদ্ধোপকরণ, কলকব্জা ও যুদ্ধ পরিচালনার সর্বপ্রকার সামরিক-প্রযুক্তিগত উপায় ধ্বংস ও বিনষ্ট করা হবে না।

৩. জার্মান সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলী অবিলম্বে নির্দিষ্ট সংখ্যক কমাণ্ডারকে নিযুক্ত করবে এবং লাল ফৌজের সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলী ও অভিযানকারী মিত্র বাহিনীসমূহের সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলী কর্তৃক প্রকাশিত পরবর্তী সমস্ত নির্দেশ পালন করতে বাধ্য থাকবে।

৪. এই দলিলটি তার পরিবর্তে আত্মসমর্পণের বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ জাতিসমূহ কর্তৃক অথবা তাদের নামে সম্পাদিত এবং জার্মানির ক্ষেত্রে ও মোটামুটিভাবে জার্মান সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অন্য কোন সাধারণ দলিল গ্রহণের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে না।

৫. যদি জার্মান সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলী অথবা তাদের অধীনস্থ কোন সশস্ত্র বাহিনী আত্মসমর্পণের এই দলিল মেনে না চলে, তাহলে লাল

ফৌজের সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলী এবং অভিযানকারী মিত্র বাহিনীসমূহের সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলী তাঁদের নিজেদের বিবেচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অথবা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করবে।

৬. এই দলিলটি প্রণীত হয়েছে রুশ, ইংরেজী ও জার্মান ভাষায়। কেবল রুশ ও ইংরেজী পাঠ দু'টি হচ্ছে প্রামাণ্য।'*

এ ঘটনাটির তাৎপর্য মূল্যায়ন করতে গিয়ে সোভিয়েত সরকার প্রধান ইওসিফ স্তালিন সোভিয়েত জনগণের উদ্দেশে প্রচারিত ভাষণে বলেন: 'জার্মানির বিরুদ্ধে মহাবিজয়ের দিনটি এল। লাল ফৌজ এবং আমাদের মিত্রদের ফৌজগুলোর কাছে নতজানু ফ্যাসিস্ট জার্মানি নিজেকে পরাস্ত বলে মেনে নিয়ে শর্তহীন আত্মসমর্পণ ঘোষণা করেছে।... আমাদের মাতৃভূমির মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য বিপুল লোকহানি, যুদ্ধ চলাকালে আমাদের জনগণের অপরিসীম বঞ্চনা আর লাঞ্ছনা, দেশমাতৃকার সেবায় দেশাভ্যন্তরে ও রণাঙ্গনে মানুষের অক্লান্ত শ্রম — এর কিছুই ব্যর্থ হয় নি এবং তা শত্রুর বিরুদ্ধে পূর্ণ বিজয় এনে দেয়।**

ফ্যাসিস্ট জার্মানির বিরুদ্ধে বিজয় উপলক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী ৯ মে তারিখকে জাতীয় উৎসব দিবস — বিজয় দিবস বলে ঘোষণা করেন এবং '১৯৪১-১৯৪৫ সালের দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধে জার্মানির বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্য' এক পদক প্রতিষ্ঠা করেন। এই পদকে ভূষিত হয় ১ কোটি ৩৫ লক্ষ সোভিয়েত যোদ্ধা।

নাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে বিজয় উপলক্ষে ২৪ জুন তারিখে মস্কোতে অনুষ্ঠিত হয় বিজয়ের প্যারেড, যাতে অংশগ্রহণ করেছিল সৈন্য বাহিনী, সামরিক নৌ-বহর আর মস্কো গ্যারিসনের সৈন্যরা। ১০টি ফ্রন্ট তাতে পাঠিয়েছিল নিজেদের সেরা যোদ্ধাদের। গৌরবময় সংগ্রামী পতাকা হাতে রেড স্কোয়ারের উপর দিয়ে মার্চ করে যায় মিশ্র রেজিমেণ্টগুলো। ড্রামের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ২০০ জন সোভিয়েত সৈনিক লেনিনের সমাধি-মন্দিরের পাদদেশে ছুঁড়ে ফেলে পর্যুদস্ত জার্মান বাহিনীর ২০০টি ধ্বজা। এই প্রতীক কাজটির দ্বারা সোভিয়েত যোদ্ধারা মানবজাতির স্মৃতিতে

* দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র নীতি। দলিলাদি ও কাগজপত্র। খণ্ড ৩. পৃঃ ২৬১-২৬২।

** স্তালিন ই.। সোভিয়েত ইউনিয়নের দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধ প্রসঙ্গে। — মস্কো, ১৯৫৩, পৃঃ ১৯২, ১৯৩।

চিরকালের জন্য বদ্ধমূল করে দেয় আপন জনগণ এবং তার শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনীর কালজয়ী বীরত্বের কাহিনী। 'এই মুহূর্তগুলো মহান কেবল বিজয়ীদের জন্যই নয়, জার্মানির জন্যও। এই মুহূর্তগুলোতে ড্র্যাগন ধ্বংস হয়। ন্যাশনেল-সোশ্যালিজম নামক ভয়ংকর ও অস্বাভাবিক দানবের মৃত্যু ঘটেছে, এবং জার্মানি অন্তত পক্ষে হিটলারের দেশ বলে অভিহিত হওয়ার অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভ করেছে'*, — সেই স্মরণীয় দিনগুলোতে বলেছিলেন প্রখ্যাত জার্মান লেখক টমাস মান।

৭। পট্‌স্‌ডাম সম্মেলন

১৯৪৫ সালের ১৭ জুলাই থেকে ২ আগস্ট পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের সরকার প্রধানদের পট্‌স্‌ডাম সম্মেলন চলে। তাতে যে-সমস্ত প্রশ্ন আলোচিত হয় তার মধ্যে ছিল: জার্মানির যুদ্ধোত্তর সমাজ ব্যবস্থা, তার কাছ থেকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ লাভ, পোল্যান্ডের পশ্চিম সীমান্ত, মুক্ত ইউরোপ বিষয়ক ইয়ালতা ঘোষণাপত্রের ধারাসমূহ বাস্তবায়ন ইত্যাদি। সম্মেলনে এই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়: জার্মানিকে নিরস্ত্রীকৃত ও অসামরিকীকৃত করতে হবে; হিটলারী পার্টিকে ধ্বংস করতে ও সমস্ত নাৎসি সংগঠনকে ভেঙে দিতে হবে; জার্মানি কর্তৃক অস্ত্রশস্ত্র, সামরিক সাজসরঞ্জাম, বিমান ও জাহাজ উৎপাদন নিষিদ্ধ করে দিতে হবে; গণতন্ত্রের নীতিসমূহ অনুসারে শিক্ষা ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা ও স্থানীয় স্বশাসন ব্যবস্থা পুনঃসংগঠিত করতে হবে; গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পার্টিসমূহের ক্রিয়াকলাপে অনুমতি দিতে ও অনুপ্রেরণা জোগাতে হবে; বাক স্বাধীনতা, মুদ্রণ ও ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতে হবে। পোল্যান্ড পেল পূর্ব প্রাশিয়ার একাংশ ও ডানজিগের ভূখণ্ড। তার পশ্চিম সীমান্ত নির্ধারিত হয় ওডের — পশ্চিম নেইসে লাইন অনুসারে। সোভিয়েত ইউনিয়ন পেল কনিগ্‌স্‌বার্গ ও তার সন্নিহিত একটি অঞ্চল।

সোভিয়েত প্রতিনিধিদল দৃঢ়তার সঙ্গে জার্মানির সামরিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিলোপ সাধনের নীতি অনুসরণের কথা বলেন। কিন্তু মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ড রুর শিল্পাঞ্চলের উপর — জার্মান সমরবাদের এই সামরিক-অর্থনৈতিক ঘাঁটির উপর চার মহাশক্তির যৌথ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রস্তাবগুলো মানল না।

পট্‌স্‌ডাম সম্মেলনে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দানের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি মীমাংসা করা হয়। ঠিক হল যে চার মিত্র শক্তির প্রত্যেকেই নিজ নিজ দখলীকৃত এলাকা থেকে এবং বিদেশে খাটানো জার্মান পুঁজি থেকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ পাবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এর উপর পাবে পশ্চিম এলাকাগুলো থেকে বাজেয়াপ্ত করা সমস্ত শিল্প সাজসরঞ্জামের ২৫ শতাংশ এবং তার মধ্যে ১৫ শতাংশ সমতুল্য পরিমাণ কয়লা, খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য সামগ্রীর বিনিময়ে। সোভিয়েত ইউনিয়ন তার প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের ভাগ থেকে পোল্যাণ্ডের ক্ষতিপূরণমূলক দাবিদাওয়া পূরণ করছিল। সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের প্রস্তাব অনুসারে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে জার্মানির সামরিক ও বাণিজ্য জাহাজগুলোকে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যে সমানভাবে ভাগাভাগি করা হবে, আর ডুবো জাহাজগুলো ডুবিয়ে দেওয়া হবে।

সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের দৃঢ় মতাবস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডকে জন-গণতান্ত্রিক পোল্যাণ্ডের উপর অনেকগুলো দাবি চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ দিল না। তাদের দাবিগুলোর মধ্যে ছিল: প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিদের নিয়ে সরকারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হোক। এ ছাড়া তারা সম্মেলনের উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহের জন-গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ওই সমস্ত দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে খোলাখুলিভাবে হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত।

এই সম্মেলন সংক্রান্ত ইশতেহারের ৩য় অনুচ্ছেদে ('জার্মানির বিষয়ে') বলা হয়েছে:

'সমগ্র জার্মানি মিত্র বাহিনীসমূহের দখলে আছে, এবং জার্মান জনগণ সেই সমস্ত ভয়ঙ্কর অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে আরম্ভ করেছে যা সম্পন্ন করা হয়েছিল তার নেতাদের পরিচালনায় তাদের সাফল্যের সময়ে যাদের জার্মান জনগণ খোলাখুলিভাবে নিজস্ব সমর্থন দিচ্ছিল এবং অন্ধের মতো মান্য করছিল।

মিত্র শক্তিসমূহের নিয়ন্ত্রণের কালপর্যায়ে বিজিত জার্মানির ক্ষেত্রে মিত্রদের সমন্বিত পলিসির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতিগুলো কীরূপ হবে সে সম্পর্কে সম্মেলনে একটা সমঝোতায় পেঁছা হয়।

এই সমঝোতার উদ্দেশ্য হচ্ছে জার্মানি সম্পর্কে ক্রিমিয়া ঘোষণাপত্রের

ধারাসমূহ বাস্তবায়ন। জার্মান সমরবাদ আর নাৎসিজমকে নির্মূল করে দেওয়া হবে, এবং মিত্ররা পরস্পরের সম্মতি অনুসারে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদিও অবলম্বন করবে যাতে জার্মানি আর কখনও তার প্রতিবেশীদের জন্য হুমকি সৃষ্টি করতে অথবা সারা পৃথিবীতে শান্তি বিঘ্নিত করতে না পারে।

মিত্ররা জার্মান জনগণকে ধ্বংস করতে অথবা দাস বানাতে চায় না। মিত্ররা জার্মান জনগণকে ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ ভিত্তিতে আপন জীবন পুনর্গঠনের জন্য প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ দানে আগ্রহী। এই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে জার্মান জনগণ যদি নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চালিয়ে যায় তাহলে কালক্রমে তারা বিশ্বের স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ জাতিসমূহের মধ্যে যোগ্য স্থান লাভ করতে পারবে।'*

এমনিভাবে, পট্স্ডাম সম্মেলনে তীব্র শ্রেণীগত সংগ্রামের পরিবেশে প্রশ্নগুলির আলোচনা ও মীমাংসার কাজে চূড়ান্তভাবে সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতি জয়লাভ করেছে। এই নীতি জাতিসমূহের গভীর শ্রদ্ধা লাভ করেছে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের মর্যাদা বৃদ্ধি ও দৃঢ়তর হওয়ার ব্যাপারে সহায়তা দিয়েছে।

৮। নুরেমবার্গ মোকদ্দমা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের প্রতিক্রিয়াশীল মহলগুলো যুদ্ধ চলাকালেই ফ্যাসিস্ট ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে যাতে মামলা রুজু করা না যায় তার জন্য ব্যাপক অভিযান আরম্ভ করে।

ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়নের পতনের পর বিজয়ী রাষ্ট্রসমূহের সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি বিনা বিচারেই যাবজ্জীবন নির্বাসনে প্রেরিত হন সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে। হিটলারের প্রতিও ঠিক সেরূপ আচরণ করার প্রস্তাবটি কাগজপত্রে খুব অলোচিত হচ্ছিল।** অনুরূপ সিদ্ধান্তের পেছনে প্রধান যুক্তিটি ছিল এই যে ফ্যাসিস্ট নেতাদের অপরাধ যদিও তর্কাতীত, কিন্তু বিচারের জন্য প্রমাণাদি সংগ্রহ করতে নাকি প্রচুর সময় ও শক্তি ব্যয় হবে।

* তেহেরান — ইয়াল্তা — পট্স্ডাম, পৃঃ ৩৮৬-৩৮৭।

** গ্রাইনিন আ.। নুরেমবার্গ মোকদ্দমা। প্রবন্ধ সংকলন। — মস্কো, ১৯৪৬, পৃঃ ২০।

ট্রুম্যান স্বীকার করেন যে চার্চিল ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসেই সোভিয়েত সরকার প্রধানকে বিনা বিচারেই নাৎসি যুদ্ধাপরাধীদের গুলি করে হত্যা করার বিষয়ে রাজী করাতে চেষ্টা করেছিলেন।*

এরূপ প্রস্তাব দানের প্রকৃত কারণটি ছিল — ফ্যাসিস্ট জার্মানির ক্ষমতাসম্পন্ন সামরিক মেশিন নির্মাণে হিটলারকে সহায়তা দানের ব্যাপারে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অগ্রাসনে তাকে অনুপ্রেরণা দানের ব্যাপারে পশ্চিমী শক্তিসমূহের নিজেদের স্বরূপ মোচনের ভয়।

একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নই নিরবচ্ছিন্ন ও অটলভাবে জার্মান-ফ্যাসিস্ট অপরাধীদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিচার, তাদের কঠোর ও ন্যায্য শাস্তি দাবি করছিল। এ প্রসঙ্গে সোভিয়েত সরকার একাধিক বার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন, এবং অবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডের প্রতিক্রিয়াশীল মহলসমূহের প্রতিরোধ সত্ত্বেও সমগ্র প্রগতিশীল মানব সমাজ সমর্থিত সোভিয়েত প্রস্তাবটি কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত হয়েছিল।

১৯৪৫ সালের ২০ নভেম্বর থেকে ১৯৪৬ সালের ১ অক্টোবর পর্যন্ত নুরেমবার্গের আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতে প্রধান যুদ্ধাপরাধীদের একটি গ্রুপের বিচার চলে। ইতিহাসে সেই প্রথম বার আসামীদের মধ্যে বিচার করা হয় কেবল খোদ আসামীদেরই নয়, তাদের দ্বারা সৃষ্ট অপরাধমূলক প্রতিষ্ঠান আর সংগঠনগুলোরও, এবং সেই সঙ্গে তাদের মানববিদ্বেষী 'তত্ত্ব' আর 'ভাবধারারও'।

নুরেমবার্গ মোকদ্দমায় জার্মান ফ্যাসিজমের মানববিদ্বেষী চরিত্রের, কোটি কোটি মানুষ নিধন এবং গোটা এক-একটা জাতিকে জাতি ও রাষ্ট্রকে রাষ্ট্র ধ্বংসকরণের পরিকল্পনাসমূহের স্বরূপ মোচন করা হয়, জার্মান সমরবাদের আগ্রাসী চরিত্রের, তার বিশ্বাধিপত্য লাভের এবং পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিলোপ সাধনের প্রয়াসের স্বরূপ মোচন করে দেওয়া হয়।

আদালত প্রমাণ করে যে পরের দেশ লুণ্ঠনের এবং বেসামরিক লোকজনের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারের মতবাদটি অতি বিশদভাবে তৈরি করা হয়েছিল আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার আগেই, — তাতে খুঁটিনাটি কোন ব্যাপারই বাদ পড়ে নি। ১৯৪০ সালের হেমন্তেই নাৎসি নেতারা সোভিয়েত দেশ আক্রমণের প্রশ্নটি বিবেচনা করেছিল।

* Truman H. Memoirs. Vol. I. — New York, 1955, p. 284.

আদালতে অকাট্যরূপে প্রমাণ করা হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট জার্মানির আক্রমণের 'নিরোধমূলক' চরিত্র সম্পর্কে নাৎসিদের দ্বারা রচিত কাহিনীর অযথার্থতা। হিটলারের দপ্তরে বিভিন্ন অধিবেশনের বহু প্রটোকল, ফিল্ডমার্শাল পাউল্যুসের সাক্ষ্য এবং অভিযুক্ত ফ্রিচ, ইওডল ও অন্যান্যদের স্বীকৃতির ভিত্তিতে রায়ে লেখা হয় যে সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করা হয়েছিল 'সামান্যতম বৈধ ভিত্তি ব্যতিরেকেই। এটা ছিল স্পষ্ট আগ্রাসন।'*

সামরিক আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দোষী সাব্যস্ত করে আগ্রাসী যুদ্ধের প্রস্তুতি ও তা পরিচালনার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার দরুন এবং মানবজাতির বিরুদ্ধে অন্যান্য অসংখ্য যুদ্ধাপরাধ ও কুকর্ম সম্পাদনের জন্য। আদালত ঘোষণা করে, 'আক্রমণাত্মক যুদ্ধ বাধানো হচ্ছে... সবচেয়ে গুরুতর আন্তর্জাতিক অপরাধ, অন্যান্য যুদ্ধাপরাধ থেকে যার একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে এই যে তাতে কেন্দ্রীভূত আকারে সেই হিংসাটি বর্তমান আছে যা রয়েছে বাদবাকী যুদ্ধাপরাধের প্রতিটিতে।'**

আদালত মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে গেরিঙকে, রিবেন্ট্রপকে, কেইটেলকে, কালটেনব্রুনেরকে, রজেনবের্গকে, ফ্রাঙ্ক্‌কে, স্ট্রেইখেরকে, জাউকেলকে, ইওডলকে, জেইস-ইনক্‌ভার্টকে ও বোরমানকে (অনুপস্থিতিতে); যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে গেসকে, ফুন্‌ককে ও রেডেরকে; ২০ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে শিরাখ আর শ্‌পিয়েরকে, ১৫ বছরের কারাদণ্ডে — নেইরাটকে এবং ১০ বছরের কারাদণ্ডে — ডোনিৎসকে। অভিযুক্ত লেই মোকদ্দমা আরম্ভ হওয়ার অল্পকাল আগে জেলখানায় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে, আর ক্রুপ দুরারোগ্য রোগে ভুগছিল বলে তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা থামিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৪৬ সালের ১৫ অক্টোবর রাত্রে মৃত্যুদণ্ডাধীন ব্যক্তিদের — কেবল গেরিঙ বাদে (সে বিষপান করে আত্মহত্যা করে) নুরেমবার্গ কারাগার ভবনে ফাঁশি দেওয়া হয়।

নুরেমবার্গ মোকদ্দমার ছিল বিপুল রাজনৈতিক তাৎপর্য। তা আগ্রাসনকে সবচেয়ে গুরুতর আন্তর্জাতিক অপরাধ বলে স্বীকার করে, আগ্রাসী যুদ্ধের প্রস্তুতি, তা বাধানো ও পরিচালনার জন্য যারা দোষী তাদের সাজা দেয়, কোটি কোটি নিরপরাধ মানুষকে নিধনের এবং গোটা

এক-একটা জাতিকে বশীভূতকরণের অপরাধমূলক পরিকল্পনা রচনাকারী ও বাস্তবায়নকারীদের ন্যায্যভাবে দণ্ডিত করে। এ ছিল ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে, আগ্রাসকদের বিরুদ্ধে ইতিহাসের বিচার। তা শান্তির সেবা করছে, শান্তি রক্ষার জন্য ও সতর্ক থাকার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ন্যুরেমবার্গ সামরিক আদালতের রায়ে প্রতিফলিত আন্তর্জাতিক আইনের নীতিসমূহ অনুমোদন করেছে। তদ্দারা জাতিসংঘ স্বীকার করেছে যে আগ্রাসী যুদ্ধ এবং মানবজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ হচ্ছে সবচেয়ে গুরুতর আন্তর্জাতিক অপরাধ।

সপ্তম অধ্যায়

সমরবাদী জাপানের পরাজয়

১। ১৯৪৫ সালের গ্রীষ্মকালে সামরিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি

বহু বছর ধরে জাপানী সমরবাদীরা এশিয়ার দেশগুলোতে দখলদারী নীতি অনুসরণ করছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণের পরিকল্পনা গড়ছিল। নাৎসি জার্মানিতে অবস্থানরত জাপানী রাষ্ট্রদূত ইওসিমা ১৯৪৩ সালের ১৮ এপ্রিল রিবেন্ট্রপকে বলেছিল: 'এ কথাটি সত্য যে গত ২০ বছর ধরে জাপানী জেনারেল স্টাফের সমস্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হচ্ছিল রাশিয়া আক্রমণের উদ্দেশ্যে।...'* প্রধান জাপানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক আদালত সংগৃহীত দলিলপত্রেও এর প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের শাসক মহলগুলো দূর প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদী জাপানের আগ্রাসনে ইন্ধন জুগিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ফ্যাসিস্ট জার্মানির পাশাপাশি জাপানকেও আক্রমণকারী শক্তির ভূমিকায় দেখতে চায়। জাপানের আগ্রাসী নীতিতে তাদের অহস্তক্ষেপের কারণ ছিল একমাত্র এটাই।

জাপানী শাসক মহলগুলো সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের জন্য বিশেষ সক্রিয় প্রস্তুতি চালায় সোভিয়েত দেশের উপর ফ্যাসিস্ট জার্মানির আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার পর। ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মের শেষে জাপানী জেনারেল স্টাফ তার সরকারের নির্দেশে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির একটা পরিকল্পনা রচনা করে। পরিকল্পনাটির নাম ছিল 'কন্তকুয়েন' — অর্থাৎ 'কুয়ান্টুং বাহিনীর বিশেষ মহড়া'। এর উদ্দেশ্য ছিল — একই সময়ে জাপানী ফৌজ কর্তৃক উপকূলীয় প্রিমোরিয়ে অঞ্চল (সোভিয়েত দূর প্রাচ্য দখলের জন্য) এবং ট্রান্স-বৈকাল (ওমস্কের মধ্যরেখা

* IMT, Vol. XXXI. — Nuremberg, 1948, p. 309.

পর্যন্ত সাইবেরিয়া দখলের জন্য) আক্রমণ। পরিকল্পনাটি অনুসারে কুয়াণ্টুং বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা দু' মাসের মধ্যে ৩ লক্ষ থেকে ৬ লক্ষ পর্যন্ত বাড়ানোর কথা ছিল।

জাপান সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের জন্য কেবল এক অনুকূল মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিল। এরূপ অনুকূল মুহূর্তটি হওয়ার কথা ছিল মস্কোর উপকণ্ঠে জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের বিজয়ের। কিন্তু তা ঘটল না। উল্টে বরং সোভিয়েত রাজধানীর কাছেই জার্মান সৈন্য বাহিনী প্রথম বৃহৎ পরাজয় বরণ করে। সেজন্যই জাপান সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণ আরম্ভ করল না।

১৯৪২ সালে জাপানী জেনারেল স্টাফ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নতুন একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করে যা অনুসারে স্থলসেনার সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতায় নৌ-বহর ও বিমান বাহিনীর ভ্লাদিভস্তকের উপর আকস্মিক হামলা আরম্ভ করার কথা ছিল। একই সময়ে কুয়াণ্টুং বাহিনীর আঘাত হানার কথা ছিল ব্লাগভেশেনস্ক শহরের উপর।

স্তালিনগ্রাদ আর কুর্স্কের লড়াইয়ে সোভিয়েত সৈন্যদের বিজয় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী জাপানের আগ্রাসী পরিকল্পনাগুলো বানচাল করে দেয়। কিন্তু জাপানী পক্ষ বার বার ১৯৪১ সালের ১৩ এপ্রিল তারিখে সম্পাদিত নিরপেক্ষতা চুক্তিটি অবিরত লঙ্ঘন করছিল। ১৯৪১ সালের গ্রীষ্ম থেকে ১৯৪৪ সালের শেষ অবধি জাপানী নৌ-বহর ১৭৮টি সোভিয়েত জাহাজ আটক করে। কেবল এক ১৯৪৪ সালেই কুয়াণ্টুং বাহিনী ১৪৪ বার সোভিয়েত দেশের সীমান্ত লঙ্ঘন করে এবং ৩৯ বার সোভিয়েত ভূখণ্ডে গোলাগুলিবর্ষণ করে। জাপান তার কূটনৈতিক আর সামরিক মিশনের মাধ্যমে নাৎসিদের সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থা সম্পর্কিত গোপন তথ্যাদি সরবরাহ করছিল।

প্রকৃত পক্ষে দূর প্রাচ্যে রণাঙ্গন কাজ না করলেও তার অস্তিত্ব কিন্তু ছিল। এতদঞ্চলে বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে সোভিয়েত ইউনিয়ন মাঞ্চুরিয়া সীমান্তে ৪০ ডিভিশন সৈন্য রেখেছিল যাদের সে জার্মান-ফ্যাসিস্ট হানাদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লাগাতে পারত। ওই সৈন্যরা সাংগঠনিকভাবে দূর প্রাচ্য ফ্রণ্টে (তখন তার অধিনায়ক ছিলেন জেনারেল ম. পুর্কায়েভ) ও ট্রান্স-বৈকাল ফ্রণ্টে (অধিনায়ক জেনারেল ম. কভালিওভ) অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ইউরোপে ফ্যাসিস্ট জার্মানি ও তার তাঁবেদার রাষ্ট্রসমূহের পরাজয়ের পরও সাম্রাজ্যবাদী জাপান মিত্রদের বিরুদ্ধে সামরিক ক্রিয়াকলাপ অব্যাহত রাখে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও চীন ১৯৪৫ সালের ২৬ জুলাই শর্তহীন আত্মসমর্পণের বিষয়ে যে যৌথ ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেছিল জাপান তা প্রত্যাখ্যান করে। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনের সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার প্রস্তাব পেশ করেন। আপন মিত্রসুলভ কর্তব্যে বিশ্বাসী সোভিয়েত ইউনিয়ন ইয়ালতা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত বিবেচনা করে এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করে।

ফ্যাসিস্ট জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধের সমগ্র চাপ পড়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানীদের দ্বারা বিধ্বস্ত তার সামরিক নৌ-বহর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল, আর ইংলণ্ড সাম্রাজ্যবাদী জাপানের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য অতিরিক্ত শক্তি নিয়োগ করতে পেরেছিল। তাতে ইঙ্গো-মার্কিন ফৌজগুলো ১৯৪৫ সালের গ্রীষ্মের দিকে খোদ জাপানের কাছেই সামরিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ পেল।

১৯৪৫ সালের ৬ ও ৯ আগস্ট তারিখে আমেরিকানরা জাপানী শহর হিরোশিমা ও নাগাসাকির উপর পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করে। এ ছিল নিষ্ঠুর ও অমানবিক এক কাজ যার ফলে ধ্বংস হয় দু'টি শহর, নিহত ও বিকলাঙ্গ হয় ৪ লক্ষ ৪৭ হাজার শান্তিপ্রিয় বাসিন্দা। ইংরেজ অধ্যাপক প. ম. স. ব্ল্যাকেট বলেছেন যে এই বোমাগুলোর বিস্ফোরণ ছিল 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ সামরিক কাজ নয়, রাশিয়ার বিরুদ্ধে ঠাণ্ডা কূটনৈতিক যুদ্ধের প্রথম কাজ।'*

পারমাণবিক বোমা প্রয়োগের সামরিক প্রয়োজনীয়তা ছিল না এবং তা জাপানকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে নি। জাপান প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর ছিল।

জাপানী সৈন্যের সমস্ত গ্রুপিংয়ের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল মাঞ্চুরিয়ায় কেন্দ্রীভূত কুয়াণ্টুং বাহিনী। এশিয়ায় আপন আগ্রাসী

* Blackett P.M.S. Military and Political Consequences of Atomic Energy, p. 127.

পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের ব্যাপারে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের বড় ভরসা ছিল এই বাহিনীটিই।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের সশস্ত্র বাহিনী মিত্রদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শক্তির চাপে পড়ে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। বর্মা হারানোর বাস্তব সম্ভাবনা দেখা দিল। প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান হারাল তার সমস্ত আজ্ঞাধীন দ্বীপ এবং ফিলিপাইনের বৃহৎ একটি অংশ। সামরিক ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ হয় খোদ জাপানের নিকটবর্তী অঞ্চলগুলোতে এবং দক্ষিণ চীন সাগরে। ম্যারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত মার্কিন বিমান বাহিনী জাপানের মূল ভূখণ্ডের কিউসিউ, সিকোকু ও হনসু দ্বীপের শিল্প কেন্দ্রগুলোর উপর বোমাবর্ষণ করতে আরম্ভ করে। মিত্র বাহিনীগুলো বনিন, ভলক্যানো ও রিউকিউ দ্বীপগুলোতে, তাইওয়ান দ্বীপে, চীনের পূর্ব উপকূলে এবং ইন্দোচীনে ঢুকে পড়তে সক্ষম হয়।

কিন্তু জাপান অস্ত্র ত্যাগ করতে চাইল না। মিত্রদের বিরুদ্ধে তার কাছে ছিল যথেষ্ট বৃহৎ সশস্ত্র বাহিনী এবং সে শেষ অবধি তাদের বিরুদ্ধে লড়ে যাওয়ার সংকল্প নিয়েছিল। তার পরিকল্পনায় ছিল: মহাদেশে চীনা গণমুক্তি বাহিনীর ইউনিটগুলোকে ও জাপানী ফৌজের পশ্চাদ্ভাগে যুদ্ধরত পার্টিজান দলগুলোকে বিধ্বস্ত করা এবং মধ্য ও দক্ষিণ চীন দখলের কাজ সমাপ্ত করা। প্রশান্ত মহাসাগরের অঞ্চলে জাপান তার মূল ভূখণ্ডের নিকটে দৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা আমেরিকান সৈন্যদের অগ্রগতি রোধ করার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডকে আপোসমূলক শান্তি চুক্তি সম্পাদনে রাজী করানোর চেষ্টা চালানোর কথা ভাবছিল।

জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ছিল ১৩ লক্ষ ৮৫ হাজার সৈনিক আর অফিসার নিয়ে গঠিত ৩টি ফিল্ড আর্মি (১৯টি ইনফেণ্ট্রি ডিভিশন, ১টি ল্যাণ্ডিং ডিভিশন, ১টি অশ্বারোহী ডিভিশন ও পশ্চাদ্ভাগের ইউনিটগুলো) এবং ৪ লক্ষ ৭৩ হাজার লোকের ২টি নৌ ইনফেণ্ট্রি কোর (৬টি ডিভিশন ও অন্যান্য সমস্ত ইউনিট)। প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌ-বহরে ছিল ২৩টি আক্রমণকারী ও ৫৪টি এসকর্ট বিমানবাহী জাহাজ, ২৩টি রণপোত, ২টি ব্যাটল ক্রুজার, ৫০টি ক্রুজার, ২৫৬টি ডেস্ট্রয়ার, ১৮৮টি সাবমেরিন এবং বিপুল সংখ্যক অন্যান্য রণতরী ও জাহাজ। মার্কিন বায়ুসেনার কাছে ছিল ২৫ সহস্রাধিক বিমান, যার মধ্যে ১৮ হাজারই ছিল প্রথম লাইনে। ব্রিটেন বিপুল শক্তির সমাবেশ ঘটিয়েছিল — ১০টি ইনফেণ্ট্রি ডিভিশন, ৩টি ইনফেণ্ট্রি ও ৩টি ট্যাঙ্ক

ব্রিগেড, সর্বমোট ৬ লক্ষ লোক, ১০টি বিমানবাহী জাহাজ, ৬টি রণপোত, ১৯টি ক্রুজার, ৪৯ট ডেস্ট্রয়ার, ৩১টি সাবমেরিম ও প্রায় ১,৩০০টি বিমান।

জাপানের কাছে বৃহৎ এক সশস্ত্র বাহিনীর বিদ্যমানতার কথা বিবেচনা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওই দেশের মূল ভূখণ্ডের দ্বীপগুলোতে কেবল ১৯৪৬ সালেই সৈন্য নামানোর কথা ভাবছিল। তবে সৈন্য অবতরণের পর জাপান দ্বীপপুঞ্জে ও এশিয়া মহাদেশে অপারেশনগুলো কত কাল চলবে সে বিষয়ে কেউ সঠিক কোনকিছু বলতে পারছিল না। এই ব্যাপারটিই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডকে সেই ইয়ালতা সম্মেলনেই (১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি) সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে বাধ্য করে। তারা সোভিয়েত ইউনিয়নকে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে এবং সম্মিলিত প্রয়াসে তাকে বিধ্বস্ত করতে আহ্বান জানায়।

২। প্রশান্ত মহাসাগরে এবং এশিয়ায় মিত্রদের সামরিক ক্রিয়াকলাপ

প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানী সেনাপতিমণ্ডলী অনতিবৃহৎ শক্তি রেখে দিয়েছিল এবং ওগুলো ছোট ছোট গ্যারিসনে ছড়ানো ছিল ৪৫ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত বিশাল এক অঞ্চলে।

প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রদের কাছে ছিল তিনটি বাহিনী, শক্তিশালী নৌ ও বায়ু সেনা। এরূপ শক্তি জাপানীদের বিরুদ্ধে তাদের যথেষ্ট শ্রেষ্ঠতা সুনিশ্চিত করছিল এবং ল্যাণ্ডিং অপারেশন পরিচালনার জন্য অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে দিচ্ছিল। এখানে সংক্ষেপে সবচেয়ে বৃহৎ অপারেশনগুলোর কথা বলা যেতে পারে।

ফিলিপাইনের লুসোন দ্বীপ অধিকারের জন্য মিত্রদের অপারেশন

১৯৪৫ সালের গোড়াতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লুসোন দ্বীপ দখলের জন্য প্রস্তুতি আরম্ভ করে। ওখানে জেনারেল ইয়ামাসিতার সেনাপতিত্বে আড়াই লক্ষাধিক লোকের একটি জাপানী ফৌজ এবং ৪র্থ বিমান বাহিনীর ৪০০-৫০০ বিমান ছিল। লুসোনে অনুরূপ সংখ্যক বিমান প্রেরণ করা সম্ভব ছিল তাইওয়ান, ওকিনাভা ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে।

লুসোন দ্বীপ দখলের জন্য মিত্ররা কাজে লাগিয়েছিল প্রায় ২ লক্ষ ৭৫ হাজার লোককে, ২,২০০টি বিমান (যার মধ্যে ১,৩০০টিরও বেশি

ছিল বিমানবাহী জাহাজগ্নলো থেকে), প্রায় ১,০০০টি যুদ্ধ-জাহাজ, পরিবহন ও অবতরণ জাহাজ। লিনগায়েন উপসাগর এবং মানিলা — প্রধান আঘাতের এই অভিমুখে লড়ার কথা ছিল ২ লক্ষ ৩ হাজার লোক নিয়ে গঠিত ৬ষ্ঠ বাহিনীর মুখ্য শক্তিসমূহের। ল্যান্ডিং ফোর্সের অবতরণে সাহায্য করছিল ১৬৪টি যুদ্ধ-জাহাজ, তার মধ্যে ১২টি এসকর্ট বিমানবাহী জাহাজ, ৬টি রণপোত, ৬টি ভারী ক্রুজার ও ৪৯টি ডেস্ট্রয়ার নিয়ে গঠিত ৭ম নৌ-বহরের ফর্ম্যাশনগুলো এবং মাইন সুইপার, গানবোট ও অন্যান্য জাহাজ।

৩য় মার্কিন নৌ-বহরের অপারেশনেল ফর্ম্যাশনকে বিমানবাহী জাহাজের বিমান দিয়ে তাইওয়ান, রিউকিউ ও লুসোন দ্বীপে জাপানী বায়ু সেনাকে অকেজো করে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

সার্বিক সেনাপতিত্বে ছিলেন জেনারেল ড. ম্যাকার্থার।

অপারেশনের প্রস্তুতি কালে মার্কিন বিমানবাহী জাহাজের বিমানগুলো বোমাবর্ষণ করে লুসোন দ্বীপস্থ জাপানী বিমান বন্দরগুলোর উপর, সৈন্য সমাবেশের উপর, প্রতিরক্ষা অবস্থান এবং অন্যান্য সামরিক কেন্দ্রগুলোর উপর।

৯ জানুয়ারি তারিখে লিনগায়েন উপসাগরের উপকূলে ৬ষ্ঠ মার্কিন বাহিনীর সৈন্য অবতরণের কাজ শুরু হয়ে যায়। তা চলে মার্কিন জাহাজের আর্টিলারির প্রবল গোলাবর্ষণ এবং বিমান বাহিনীর বোমাবর্ষণের সাহায্যে। প্রথম দিনেই দ্বীপে নামে ৬৮ হাজার লোক এবং অধিকৃত হয় ফ্রণ্ট দিক বরাবর ৩২ কিলোমিটার ও গভীরতা বরাবর ৭·৫ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত একটি ব্রিজ-হেড। পরে দ্বীপের অভ্যন্তর ভাগে আমেরিকান সৈন্যদের অগ্রসর হতে গিয়ে কঠোর ও প্রচন্ড লড়াই করতে হয়েছিল। জাপানীরা অটলভাবে প্রতিটি যুদ্ধ-সীমা রক্ষা করছিল। লুসোন দ্বীপে সামরিক ক্রিয়াকলাপ চলাকালের সঙ্গে সঙ্গেই আমেরিকানরা ৮ম মার্কিন বাহিনীর (অধিনায়ক জেনারেল র. এইগেলবের্গের) শক্তি দিয়ে দক্ষিণ ফিলিপাইন (মিন্দানাও, পালোয়ান ও অন্যান্য দ্বীপ) মুক্তকরণের জন্য একটি অপারেশন চালিয়ে যাচ্ছিল।

কিন্তু লুসোন দ্বীপে রক্তক্ষয়ী লড়াই আরম্ভ হয় ফিলিপাইনের রাজধানীর জন্য। ৪ মার্চ আমেরিকানরা মানিলা দখল করে নেয়, এবং এর পর সামরিক ক্রিয়াকলাপ প্রধানত চলে জাপানী ফৌজের বিচ্ছিন্ন গ্রুপিংগুলোকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে। জেনারেল ম্যাকার্থারের সদর-দপ্তরের

বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, সরকারীভাবে ফিলিপাইনে সামরিক ক্রিয়াকলাপ সমাপ্ত হয় ৫ জুলাই তারিখে।

জাপানী দখলদারদের সঙ্গে সংগ্রামে আমেরিকানদের বিপুল সহায়তা জোগায় ফিলিপাইনী পার্টিজানদের জাপানবিরোধী গণবাহিনী 'হুকবালাখাপ'। লুসোনের অনেকগুলো অঞ্চল মুক্তকরণে তারা সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়।

আমেরিকানরা হারিয়েছিল ৩৭ হাজার ৮ শো লোক, আর জাপানীরা — ২ লক্ষ ৫ হাজার ৫ শো।

মার্কিন সৈন্যদের দ্বারা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ অধিকৃত হওয়ার ফলে মিত্ররা সমুদ্র ও আকাশ থেকে দক্ষিণ চীন সাগরে, ইন্দোচীন ও মালয়ের উপকূলের কাছে জাপানী যোগাযোগ পথগুলোর উপর অধিকতর ফলপ্রসূ আঘাত হানার এবং মূল ভূখণ্ডকে অধিকতর ফলপ্রসূভাবে প্রভাবিত করার সুযোগ পেল।

ইও (ইভোদাজিমা) দ্বীপে মার্কিন সৈন্যদের অবতরণ

ইভোদজিমা — ২০·৩ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের একটি দ্বীপ যার উৎপত্তি হয়েছে আগ্নেয়গিরির লাভা থেকে। ওখানে জাপানীদের দুটো বিমান ঘাঁটি ছিল এবং আরও একটি নির্মিত হচ্ছিল। গ্যারিসনে ছিল ২৩ হাজার লোক। বিমান ঘাঁটিগুলোতে ছিল মাত্র ১০টি প্লেন। তবে আকাশ থেকে নিজের সৈন্যদের সমর্থন জোগানোর জন্য জাপানীরা টোকিওর বিমান ঘাঁটিগুলোতে অবস্থিত ৩য় বিমান বহরের প্ল্যানগুলোকে ব্যবহার করতে পারত।

ইভোদাজিমা দ্বীপ দখলের কাজে আমেরিকান সেনাপতিমণ্ডলী নিযুক্ত করলেন ৩টি নৌ ইনফেন্ট্রি ডিভিশন ও আর্মি ইউনিটগুলোকে। ওগুলোতে ছিল সর্বমোট ১ লক্ষ ১১ হাজার লোক, ১,৫২২টি বিমান (তার মধ্যে ১,১৭০টি বিমানবাহী জাহাজ থেকে) এবং ৬৮০টিরও বেশি রণতরী, পরিবহণ ও ল্যান্ডিং জাহাজ। ল্যান্ডিং অপারেশনের নেতৃত্বে ছিলেন অ্যাডমিরাল চ. নিমিট্স।

আমেরিকান সেনাপতিমণ্ডলী ইভোদাজিমা দ্বীপটি দখল করতে সিদ্ধান্ত নিলেন কেন? এই দ্বীপটি অবস্থিত রয়েছে ম্যারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ এবং জাপানের মাঝপথে, টোকিও থেকে ১,২০০ কিলোমিটার দূরে।

ম্যারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত মার্কিন বিমানগুলো যখন জাপানের উপর বোমাবর্ষণ করে নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরত, তখন ইভোদজিমা দ্বীপের বিমান বন্দরগুলো থেকে জাপানী ফাইটার প্লেনগুলো তাদের আক্রমণ করত। গোলাবিদ্ধ আমেরিকান বিমানগুলো জলে পড়ত, আর ওগুলোর চালকরা নিহত হত। এই দ্বীপটি দখলীকৃত হলে আমেরিকানরা অধিকতর ফলপ্রসূভাবে জাপানের উপর বিমান হামলা চালাতে পারত এবং তা করতে গিয়ে তাদের অনেক কম ক্ষয়ক্ষতি সইতে হত।

ল্যান্ডিং ফোর্স নামানোর আগে কয়েক মাস ধরে মার্কিন স্ট্র্যাটেজিক বিমান বাহিনী ও বিমানবাহী জাহাজের প্লেনগুলো অন্তরীক্ষে আধিপত্য লাভের উদ্দেশ্যে নিয়মিতভাবে বোমাবর্ষণ করছিল ইভোদজিমা দ্বীপস্থ বিমান ঘাঁটিগুলোর উপর এবং নিকটবর্তী দ্বীপসমূহের উপর।

তিন দিন ব্যাপী প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণ ও বোমাবর্ষণের পর ১৯ ফেব্রুয়ারি ইভোদজিমা দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের দুটি এলাকায় একই সঙ্গে সৈন্যাবতরণ শুরু হয়। জাপানী সৈন্যরা তাদের সুদৃঢ় অবস্থানগুলোর উপর নির্ভর করে প্রবল প্রতিরোধ দিচ্ছিল। কেবল ১৬ মার্চের দিকে তাদের প্রতিরোধ দমন করে আমেরিকানরা পুরো দ্বীপটি কবজা করতে সক্ষম হল। বিমান ও আর্টিলারির যথেষ্ট সমর্থনের অভাব হেতু তার জন্য সংগ্রামে তারা অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে — ২৮ হাজার ৬ শো লোক হারায় যার মধ্যে নিহতের সংখ্যা ছিল ৬ হাজরা ৩ শো। মার্কিন বিমান বাহিনী হারায় ১৬৮টি বিমান, আর নৌ-বহর — এস্কর্ট বিমানবাহী জাহাজ 'বিসমার্ক'। তাছাড়া ৩০টি যুদ্ধ-জাহাজ খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল আক্রমণকারী বিমানবাহী জাহাজ 'সারাটগা' ও ক্রুজার 'পেনসাকোলা'। আমেরিকানদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরও বেশি হত, যদি জাপানী উপকূলীয় আর্টিলারি অসময়ে — অর্থাৎ ল্যান্ডিং অপারেশন আরম্ভ হওয়ার আগে — গোলাবর্ষণ শুরু না করত এবং তা দিয়ে নিজের অবস্থান দেখিয়ে না দিত।'*

ইভোদজিমা দ্বীপে ২১ সহস্রাধিক জাপানী সৈন্য প্রাণ হারায়, এবং ২১২ জন লোক আহত হয়।

ইভোদজিমা দ্বীপ দখলের ফলে মার্কিন বিমান বাহিনী জাপানের

* Morison S. History of United States Naval Operations in World War II. Vol. XIV, p. 69.

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্রগুলোর উপর অধিকতর প্রবল আঘাত হানার সুযোগ পেল, কেননা ওগুলোর দূরত্ব দ্বিগুণ কমে গিয়েছিল, আর বিমানে করে সময় লাগত কেবল তিন ঘণ্টা। এই কারণে দ্বীপে বিপুল সংখ্যক মার্কিন বিমান এসে নামে এবং যুদ্ধের শেষ অবধি তার বিমান বন্দরগুলো থেকে ২,৪০০টির মতো বোমারু বোমাবর্ষণের কাজে লিপ্ত থাকে।

ওকিনাভা অপারেশন (১৯৪৫ সালের ২৫ মার্চ — ২১ জুন)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গনের ক্ষেত্রে মার্কিন সৈন্য বাহিনীর দ্বারা পরিচালিত শেষ অপারেশনটি ছিল রিউকিউ দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত ওকিনাভা দ্বীপে মার্কিন সৈন্যাবতরণ। এই অপারেশনের উদ্দেশ্য ছিল ওকিনাভা দ্বীপ দখল করা, জাপানের নিকটবর্তী প্রবেশ পথগুলোতে পৌঁছা এবং মূল ভূখণ্ড আক্রমণের জন্য অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে তোলা।

ওকিনাভা দ্বীপে (দৈর্ঘ্য — ৯৫ কিলোমিটার, গড় চওড়াই — ১০ কিলোমিটার) প্রতিরক্ষা কার্যে লিপ্ত ছিল ৭৭ হাজার লোক নিয়ে গঠিত ৩২তম জাপানী বাহিনীর ইউনিট আর ফর্ম্যাশনগুলো। বাহিনীর কাছে ছিল ৯০টি ট্যাঙ্ক, আর্টিলারি ও মর্টার কামান ইউনিটগুলো। বাহিনীটির অধীনে ছিল সামরিক নৌ-ঘাঁটি (প্রায় ১০ হাজার লোক), উপকূলীয় আর্টিলারির তোপশ্রেণী আর বিমানবিধ্বংসী ইউনিটগুলো। অন্তরীক্ষ থেকে ৩২তম বাহিনীকে সমর্থন জোগানোর দায়িত্ব ছিল ৫ম বিমান বহরের — ২৫০টি বিমানের। মার্কিন অবতরণ ফৌজগুলো বিধ্বস্তকরণের কাজে মুখ্য ভূমিকা দেওয়া হয় অন্ধবিশ্বাসী বা ফ্যানাটিক সামরিক কর্মীদের ভেতর থেকে মনোনীত মৃত্যুকামী লোকেদের: বৈমানিকদের — 'কামিকাদ্জে' ও ডুবো জাহাজের নাবিকদের — 'কাইতেন'।*

দ্বীপের অবতরণ বাহিনীবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল দুর্বল। তা গঠিত হয়েছিল দ্বীপের দক্ষিণাংশে নির্মিত তিনটি প্রতিরক্ষা লাইন নিয়ে এবং ওগুলোর মোট গভীরতা ছিল ৭-৮ কিলোমিটার। প্রথম লাইনে ছিল কয়েকটি দৃঢ় ঘাঁটি এবং তা রক্ষা করছিল অনতিবৃহৎ সৈন্যদলগুলো। দ্বিতীয় লাইনটি ছিল প্রধান লাইন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং দিক থেকে তা ছিল

* 'কামিকাদ্জে' — 'পবিত্র বাতাস'; 'কাইতেন' — 'স্বর্গের পথ'।

সবচেয়ে সুদৃঢ় ও রক্ষিত হচ্ছিল প্রধান শক্তিসমূহের দ্বারা। লাইনটিতে ছিল মজুদ শক্তি। দ্বীপের দক্ষিণাংশের প্রবেশ পথগুলো আচ্ছাদিত ছিল মগ্নশৈলের উপর সারিতে সারিতে স্থাপিত কাষ্ঠ কীলকের দ্বারা এবং ওগুলোর সীমান্তে ছিল মাইন ক্ষেত্র।

ওকিনাভা দ্বীপ দখলের জন্য আমেরিকান সেনাপতিমণ্ডলী প্রেরণ করেন বিপুল এক অভিযানকারী বাহিনী যাতে ছিল ৪ লক্ষ ৫২ হাজার লোক, ১,৫০০টি রণতরী, অবতরণ, পরিবহণ ও সহায়ক জাহাজ, তার মধ্যে ৫৯টি আক্রমণকারী ও এস্‌কর্ট বিমানবাহী জাহাজ (১,৭২৭টি বিমান), ২২টি রণপোত, ৩৬টি ক্রুজার, ১৪০টিরও বেশি ডেস্ট্রয়ার আর টর্পেডো জাহাজ। এছাড়া অপারেশনে নিযুক্ত হয়েছিল স্ট্র্যাটেজিক বিমান বাহিনীর ৭০০টি প্লেন (পরে নিযুক্ত হয়েছিল ট্যাকটিকেল বিমান বাহিনীও) এবং জাপানী সামরিক নৌ-ঘাঁটির প্রবেশ পথগুলোতে রাখা সাবমেরিনগুলো। এই ভাবে, মার্কিন সেনাপতিমণ্ডলীর জনবলে শ্রেষ্ঠতা ছিল ৬ গুণ, বিমান শক্তিতে ৩ গুণেরও বেশি আর নৌ-শক্তিতে নিরঙ্কুশ।

আমেরিকান সেনাপতিমণ্ডলীর পরিকল্পনাটি ছিল এরূপ: প্রাথমিকভাবে বিমান থেকে বোমাবর্ষণের সাহায্যে জাপানীদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সর্বাধিক মাত্রায় দুর্বল করে দেওয়া, কেরামা দ্বীপগুলো (ওকিনাভা দ্বীপের নিকটে অবস্থিত) দখল করা, আর ১ এপ্রিল সকালে ওকিনাভার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে অবতরণ করা এবং যুগপৎ তিন দিকে (পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে) আক্রমণাভিযান চালিয়ে দ্বীপটি অধিকার করে ফেলা।

মার্চের গোড়ায় মার্কিন বিমান বাহিনী ওকিনাভা দ্বীপের উপর বোমাবর্ষণ করতে শুরু করেছিল। ২৫ মার্চ থেকে সামরিক নৌ-বহরের প্রধান শক্তিসমূহ দ্বীপের উপকূল ভাগে নিরবচ্ছিন্নভাবে তোপ দাগতে আরম্ভ করে।

১ এপ্রিল সকাল বেলা ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ ফ্রণ্ট জুড়ে প্রবল প্রাগাক্রমণ বোমাবর্ষণ ও গোলাবর্ষণের পর দ্বীপে সৈন্যাবতরণ শুরু হয়। জাপানী সৈন্যরা প্রায় কোন প্রতিরোধই দেয় নি। দিনের শেষ নাগাদ দ্বীপে নামানো হয় ৬০ হাজার সৈন্য। অবতরণ ফৌজ অধিকৃত ব্রিজ হেডটি ফ্রণ্ট বরাবর ছিল ১৪ কিলোমিটার আর গভীরতা বরাবর ৫ কিলোমিটার।

পরে সমুদ্র ও অন্তরীক্ষ থেকে বিপুল সমর্থন সত্ত্বেও দ্বীপের অভ্যন্তর অভিমুখে মার্কিন সৈন্যদের আক্রমণাভিযান চলে খুবই মন্থর গতিতে। শত্রু প্রবল প্রতিরোধ দিচ্ছিল। দু'মাস ব্যাপী লড়াইয়ের পরই কেবল ৩

জ্বন তারিখে আমেরিকান সৈন্যরা জাপানীদের প্রধান প্রতিরক্ষা লাইনটি দখল করতে সক্ষম হয়। পরের দিন জাপানীদের পশ্চাদ্ভাগে নামানো হয় নৌ-সৈনিকদের, এবং তারপরই মার্কিন সৈন্যদের আক্রমণাভিযানের গতি বৃদ্ধি ঘটে। ২১ জ্বন, অর্থাৎ অবতরণের ৮২ দিন বাদে, ওকিনাভা দ্বীপ প্রর্ণ দখলে চলে আসে।

অপারেশন চলাকালে মিত্রদের ১২,৫১৩ জন লোক নিহত ও ৩৬,৬৩১ জন লোক আহত হয়। তাদের ৩৩টি রণতরী ও সাধারণ জাহাজ জলমগ্ন হয়, ৩৭০টি হয় ক্ষতিগ্রস্ত; সহস্রাধিক বিমান ভূপাতিত হয়। জাপানীদের ১ লক্ষ লোক নিহত ও ৭,৮০০ বন্দী হয়েছিল। তারা হারিয়েছিল ১৬টি রণতরী ও সাধারণ জাহাজ (ছোটগ্বলো বাদ দিয়ে), ৪২০টিরও বেশি বিমান।

দ্বীপের দেড় লক্ষ বাসিন্দাও লড়াইয়ের বলি হয়। 'সংগ্রামের আগ্বনে প্রাণ দেয় এমনকি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা যাদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল সৈন্য বাহিনীর সার্ভিস কর্মিদল। 'লিলি বাহিনীর' ট্র্যাজেডি ম্বল ভূখণ্ডের জন্য 'চ্ড়ান্ত' লড়াইয়ে শান্তিপ্রিয় জাপানী নাগরিকদের দ্বরদ্ণিষ্টর প্বর্বাভাস দেয়।'*

ওকিনাভা অপারেশন ছিল প্রশান্ত মহাসাগরে সর্ববৃহৎ অপারেশন। কিন্তু শক্তিতে মার্কিন ফৌজের বিপ্বল শ্রেষ্ঠতা সত্ত্বেও বিচ্ছিন্ন জাপানী গ্যারিসনটি বিধ্বস্ত করতে তিন মাস লেগেছিল। জাপানীরা জায়গাগ্বলো ভালো চিনত এবং সেই জন্য তারা দ্ঢ় প্রতিরোধ দিতে পারছিল।

জাপানী বিমান বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করা ছিল বিশেষ কঠিন কাজ। ৬ এপ্রিল থেকে ২২ জ্বন পর্যন্ত কাল পর্যায়ে 'কামিকাদ্জে' আমেরিকান যুদ্ধ-জাহাজগ্বলোর উপর ১০ বার ব্যাপক হামলা চালায়। প্রতিটি হামলায় অংশ নিয়েছিল ১১০-১৮৫টি করে, আর এক হামলায় এমনকি ৩৫৫টি বিমান। আমেরিকানদের তাদের বিমানবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্বনর্গঠিত করতে হয়েছিল। র‍্যাডার সজ্জিত যুদ্ধ-জাহাজগ্বলো দিয়ে অবতরণের অঞ্চলে ৫৫ ও ১৩০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের দ্ব'টি বেষ্টনী গড়া হয়েছিল।

* প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধের ইতিহাস। খণ্ড ৪। — মস্কো: বিদেশী সাহিত্য প্রকাশনালয়, ১৯৫৭, প্ঃ ১৬০; ('লিলি বাহিনী' — এ ছিল জাপানী স্কুলছাত্রীদের নিয়ে গঠিত একটি স্যানিটারি দল যা ওকিনাভা দ্বিপে সামরিক ক্রিয়াকলাপের সময় প্ররোপ্ররিভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল)।

বিমানবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি জাহাজকে রক্ষা করছিল ৪ থেকে ১২টা ফাইটার প্লেন। শত্রুর বিমান লক্ষ্য করলে গাইডেন্স পোস্ট ফাইটারগুলোকে ডেকে নিশান ধরার পরিচালনা দিত।

বিমান বাহিনীর সাহায্যে আমেরিকান অবতরণ ফৌজকে বিধ্বস্ত করার জাপানী প্রয়াস আকাঙ্ক্ষিত ফল দিল না। এর কারণ ছিল জাপানী বৈমানিকদের নৈপুণ্যের অভাব এবং সেকেলে প্রযুক্তি।

ওকিনাভা দ্বীপ দখলের ফলে আমেরিকানরা জাপানের নিকটে একাধিক লাভজনক অবস্থান লাভ করল। তবে এখানেই জাপানের বিরুদ্ধে তাদের সামরিক ক্রিয়াকলাপ বস্তুত শেষ হয়ে যায়। মিত্ররা জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধে প্রবেশের অপেক্ষায় ছিল।

ওলন্দাজ ইস্ট ইণ্ডিজ অভিমুখে সামরিক ক্রিয়াকলাপ প্রসঙ্গে বলতে হয় যে এখানে জাপানীরা কার্যত ইঙ্গো-মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীকে কোন প্রতিরোধ দিচ্ছিল না এবং সে-জন্যে ইঙ্গো-মার্কিন ফৌজগুলো বোর্নিও দ্বীপ দখল করে নেয়।

৬ মে তারিখে রেঙ্গুনে অবতরণ করল ব্রিটিশ সৈন্যরা। ওই সময় নাগাদ জন-গণতান্ত্রিক সৈন্য বাহিনী জাপানী হানাদারদের কবল থেকে বর্মার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো মুক্ত করে ফেলেছিল। এই বাহিনীটির নেতৃত্বে ছিল বর্মার কমিউনিস্ট পার্টি।

১৯৪৫ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিন নৌ-ইনফেণ্ট্রির ১ লক্ষ সৈন্য অবতরণ করে চীনের ভূখণ্ডে, তিয়ানৎসিন, সিনদাও অঞ্চলে, সাংহাইয়ে ও অন্যান্য স্থানে। এ ছিল চীনা জনগণের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ আক্রমণ।

ওই কাল পর্যায়ে মিত্রদের সামরিক ক্রিয়াকলাপে নতুনত্ব ছিল এটাই যে তারা বিচিত্র ধরনের সামরিক প্রযুক্তির, বিশেষত বিমান বাহিনীর ব্যাপক সমাবেশ ঘটাচ্ছিল। অপারেশনে মুখ্য ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল বিমান বাহিনীকে।

স্থলসেনার ভালো প্রযুক্তিগত প্রস্তুতি এবং নৌ-বহর ও বিমান বাহিনীর বিপুল শক্তি দিয়ে সমুদ্র ও অন্তরীক্ষ থেকে তাদের নির্ভরযোগ্য সহায়তা দানের ব্যাপারটি বিশেষ লক্ষণীয়।

মিত্রদের সামুদ্রিক ল্যাণ্ডিং অপারেশনসমূহের শ্রেষ্ঠ দিকগুলো ছিল: জাহাজে অবতরণ করা, সমুদ্র অতিক্রম করা এবং উপকূলে বৃহৎ শক্তি নামানোর কাজ সংগঠনের দক্ষতা, অবতরণ ফৌজকে নির্ভরযোগ্য বিমান

ও নৌ সহায়তা প্রদান এবং আধুনিক ল্যাণ্ডিং উপকরণসমূহের ব্যবহার। কিন্তু সেই সঙ্গে উপকূলে তাদের ক্রিয়াকলাপ চলছিল মন্থর গতিতে এবং ব্রিজ হেড়ে প্রচুর সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র পুঞ্জীভূত হয়েছিল।

এই ভাবে, ১৯৪৫ সালের প্রথমার্ধে প্রশান্ত মহাসাগরে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সমরবাদী জাপানের সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে অনেকগুলো বিজয় অর্জন সত্ত্বেও মিত্র বাহিনীগুলো জাপানকে পরাস্ত করতে পারল না। দূর প্রাচ্যে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে তার কাছে তখনও যথেষ্ট শক্তি ও সুযোগ-সম্ভাবনা ছিল। এহেন পরিস্থিতিতে জাপানী আগ্রাসকদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধে নামার ব্যাপারটি চূড়ান্ত তাৎপর্য লাভ করছিল।

প্রশান্ত মহাসাগরে ইঙ্গো-মার্কিন ফৌজের অপারেশনগুলো চলছিল আগেরই মতো অনুকূল পরিস্থিতিতে, — শত্রুর বিরুদ্ধে শক্তি ও যুদ্ধোপকরণে তাদের যথেষ্ট শ্রেষ্ঠতা ছিল এবং ওগুলোর প্রস্তুতির জন্য তাদের হাতে প্রচুর সময় ছিল। মিত্রদের দ্বারা পরিচালিত সামরিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করছিল সমস্ত ধরনের সশস্ত্র বাহিনী। নৌ-বহরে রণপোতের পরিবর্তে প্রধান ভূমিকা পালন করতে আরম্ভ করে দ্রুতগামী বিমানবাহী জাহাজগুলো, আর নৌ-যুদ্ধের পরিণতি নির্ধারণ করছিল বিমানবাহী জাহাজের প্লেনগুলো। সাবমেরিনগুলোও বিশেষ করে শত্রুর যোগাযোগ পথে ভাসন্ত জাহাজগুলোর সঙ্গে সংগ্রামে বড় ভূমিকা পালন করছিল।

প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধ-পরিস্থিতি পশ্চিম রণাঙ্গনের চেয়ে ভিন্ন ছিল, — ওখানে অধিকাংশ ল্যাণ্ডিং অপারেশনেই অংশগ্রহণ করছিল এক-দুই ডিভিশন সৈন্য, এর বেশি নয়। কেবল নির্দিষ্ট কয়েকটি বৃহৎ অপারেশনে (লেইটে, লুসোন, ওকিনাভা দ্বীপগুলোতে) সৈন্য সংখ্যা ৭ ডিভিশন পর্যন্ত পোঁছেছিল।

অপারেশনের প্রস্তুতি চলত দুই-তিন মাস ধরে। ওই সময় বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হত অনুসন্ধান কার্য চালানোর দিকে, অন্তরীক্ষে আধিপত্য অর্জনের দিকে এবং হামলায় আকস্মিকতা আনার দিকে। ল্যাণ্ডিং ফৌজের অবতরণ আরম্ভ হত প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণ ও বোমাবর্ষণের পর এবং বিমান বাহিনী ও যুদ্ধ-জাহাজস্থ আর্টিলারির সমর্থনে তা সম্পন্ন হত অল্প সময়ের মধ্যে। অবতরণের অব্যবহিত পরেই বিমান ঘাঁটিগুলোকে প্রস্তুত করা হত যাতে বিমান নামতে পারে।

যুদ্ধের সময় প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় সশস্ত্র সংগ্রামের নতুন নতুন উপকরণ — নাপালম্ ও রিঅ্যাক্টিভ গোলা, অধিকতর উন্নত মানের র‌্যাডার ব্যবস্থা ও নেভিগেশন সরঞ্জাম, বড় বড় ভাসমান গুদাম ও কর্মশালা, সৈন্যাবতরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের উপকরণ।

৩। কুয়াণ্টুং বাহিনীর পরাজয় এবং সমরবাদী জাপানের শর্তহীন আত্মসমর্পণ

সাম্রাজ্যবাদী জাপানের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী আরম্ভ করেন ক্রিমিয়া সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই। বিপুল সাংগঠনিক কাজ সম্পন্ন করা হয়। সোভিয়েত দূরপ্রাচ্যে বিদ্যমান দু'টি ফ্রণ্ট থেকে — ট্রান্স-বৈকাল ও দূর প্রাচ্য ফ্রণ্ট থেকে ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে উপকূলীয় গ্রুপটিকে পৃথক করে দেওয়া হয়, এবং ২ আগস্ট তারিখে ওটাকে নতুন নাম দেওয়া হয় — ১ম দূর প্রাচ্য ফ্রণ্ট। ঠিক ওই সময় দূর প্রাচ্য ফ্রণ্টটি ২য় দূর প্রাচ্য ফ্রণ্ট নামে অভিহিত হতে থাকে।

তিন মাসের মধ্যে (মে থেকে আগস্টের মধ্যে) কুয়াণ্টুং বাহিনীকে দ্রুত বিধ্বস্তকরণের উদ্দেশ্যে দূর প্রাচ্যে, ৯ থেকে ১১ হাজার কিলোমিটার দূরে, রেলপথে প্রেরিত হয় তিনটি মিশ্র বাহিনী (৫ম, ৩৯তম ও ৫৩তম), একটি ট্যাঙ্ক বাহিনী (৬ষ্ঠ রক্ষী), একটি অশ্বারোহী-মেকানাইজ্ড গ্রুপ ও বিপুল সংখ্যক স্বতন্ত্র ফর্ম্যাশন — ইনফেণ্ট্রি, ট্যাঙ্ক ও মেকানাইজ্ড ফৌজের সর্বমোট ৩৯টি ফর্ম্যাশন এবং যথেষ্ট পরিমাণ বিমান ও আর্টিলারি (এর আগে এই সমস্ত সৈন্য বাহিনী লড়ছিল পশ্চিম রণাঙ্গনে)। দূর প্রাচ্যে ওই সময় বৃহৎ সৈন্য-পুনর্বিন্যাসের কাজও সম্পন্ন করা হয়। সদর-দপ্তরগুলো ও সেনাপতি দলসমূহকে সুদৃঢ় করে তোলা হচ্ছিল বিপুল যুদ্ধাভিজ্ঞতাসম্পন্ন অফিসারদের দিয়ে।

১৯৪৫ সালের ৮ আগস্ট সোভিয়েত সরকার মস্কোয় জাপানী রাষ্ট্রদূতকে জানিয়ে দেন যে পরদিন থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেকে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত বলে গণ্য করবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড ও চীনের ১৯৪৫ সালের ২৬ জুলাই তারিখের ঘোষণাপত্রে যোগ দিচ্ছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'সোভিয়েত সরকার মনে করেন যে তাঁর এরূপ নীতিই হচ্ছে একমাত্র উপায় যা শান্তি ঘনিয়ে আনতে, পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি, মৃত্যু ও দুঃখদুর্দশা থেকে জাতিসমূহকে মুক্ত করতে এবং শর্তহীনভাবে

আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করার পর জার্মানিকে যে-সমস্ত বিপদ আর ধ্বংসলীলার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল জাপানী জনগণকে সেই সমস্ত বিপদ ও ধ্বংসলীলা থেকে পরিত্রাণ লাভের সুযোগ দিতে সক্ষম।'*

জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত সরকারের যুদ্ধ ঘোষণা করার সিদ্ধান্তটি সোভিয়েত মানুষের কাছে, এশিয়ার সমস্ত জাতির কাছে পূর্ণ সমর্থন লাভ করে।

কিন্তু শত্রুকে তা বিব্রত অবস্থায় ফেলে। ৯ আগস্ট তারিখে সর্বোচ্চ সামরিক পরিষদের অধিবেশনে জাপানের প্রধানমন্ত্রী সুজুকি সবার মনোভাব প্রকাশ করে বলেন: 'আজ সকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধে যোগ দিয়েছে... এবং তাতে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠছে।'**

যখন সামরিক ক্রিয়াকলাপ শুরু হয় তখন দূর প্রাচ্যে সোভিয়েত সৈন্যদের গ্রুপিংটিতে ছিল ১৭ লক্ষাধিক লোক, ২৯,৮৩৫টি তোপ ও মর্টার কামান, ৫,২৫০টি ট্যাংক ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গান, ৫,১৭১টি জঙ্গী বিমান।

জাপানীদের কুয়াণ্টুং বাহিনীতে ছিল ১০ লক্ষাধিক লোক, ৬,৬৪০টি তোপ ও মর্টার কামান, ১,২১৫টি ট্যাংক, ১,৯০৭টি বিমান। সোভিয়েত সীমান্ত বরাবর জাপানীরা মোট ১,০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ ১৭টি সুদৃঢ় অঞ্চল গড়ে এবং ওগুলোতে ছিল ৮ হাজারটি মজবুত ঘাঁটি।

অপারেশনেল গভীরে জাপানীরা গড়েছিল দুটি প্রতিরক্ষা লাইন: একটি পূর্বমুখী — মুদানজিয়ান-ইয়ান্‌সি লাইন বরাবর, দ্বিতীয়টি — গিরিন-চানচুন-মুকদেন লাইন বরাবর।

কুয়াণ্টুং বাহিনীতে ছিল তিনটি ফ্রণ্ট (১ম, ৩য়, ১৭শ), একটি (১৪শ) স্বতন্ত্র ফিল্ড আর্মি, দুটি (২য় ও ৫ম) বিমান বাহিনী ও সুনগারি নদীর সামরিক ফ্লোটিল্যা (২৫টি টর্পেডো ও পাহারা বোট এবং গানবোট)।

কুয়াণ্টুং বাহিনীর অধীনে ছিল স্থানীয় ক্রীড়নক সরকারগুলোর সৈন্যরা — মানগুড়-গো'র সৈন্য বাহিনী (২টি ইনফেণ্ট্রি ডিভিশন, ১২টি ইনফেণ্ট্রি ব্রিগেড, ২টি অশ্বারোহী ডিভিশন, ৪টি অশ্বারোহী রেজিমেণ্ট), প্রিন্স দে ভানের সেনাপতিত্বে অভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়ার সৈন্য বাহিনী (৫টি

* দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র নীতি। দলিল ও কাগজপত্র। খণ্ড ৩। — মস্কো, ১৯৪৭, পৃঃ ৩৬২-৩৬৩।

** আধুনিক জাপানের ইতিহাস। — মস্কো, ১৯৫৫, পৃঃ ২৬৪।

অশ্বারোহী ডিভিশন, ২টি অশ্বারোহী ব্রিগেড)। দক্ষিণ সাখালিনে ও কুরিল দ্বীপপুঞ্জে মোতায়েন করা হয়েছিল ৫ম ফ্রন্টের সৈন্যদের — চারটি ইনফেণ্ট্রি ডিভিশন ও একটি ট্যাঙ্ক রেজিমেণ্টকে।

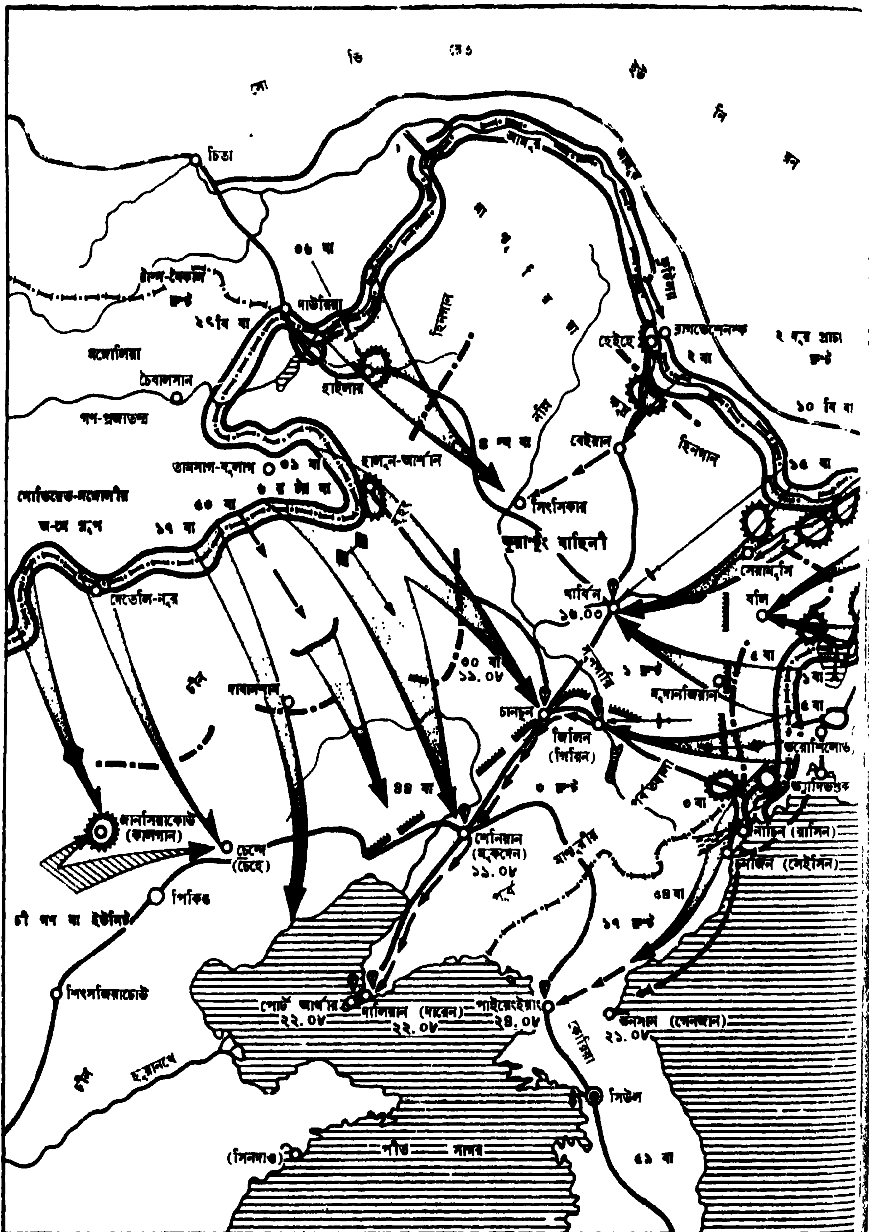
১৯৪৫ সালের বসন্তে জাপানী সেনাপতিমণ্ডলী যে-পরিকল্পনাটি প্রস্তুত করেছিল তার উদ্দেশ্য ছিল এরূপ: প্রতিরক্ষামূলক অপারেশনের প্রথম পর্যায়ে সীমান্তবর্তী এলাকায় সোভিয়েত সৈন্যদের অগ্রগতি রোধ করা। দ্বিতীয় পর্যায়ে — সুদৃঢ় অঞ্চলগুলোতে রক্ষাব্যূহ বিদ্ধ হলে মধ্য মাঞ্চুরিয়ায় কেন্দ্রীভূত প্রধান শক্তিসমূহের দ্বারা প্রবল প্রতিঘাত হানা ও সোভিয়েত ফৌজকে মূল অবস্থানে হটিয়ে দেওয়া। কেবল সোভিয়েত সৈন্যরা বিপুল সাফল্য লাভ করলেই কুয়াণ্টুং বাহিনীর প্রধান শক্তিগুলোর কোরিয়া সীমান্তে পার্বত্য অঞ্চলে হটে যাওয়ার অনুমতি ছিল।

জাপানী কুয়াণ্টুং বাহিনীর বিরুদ্ধে সোভিয়েত ফৌজগুলোর শ্রেষ্ঠতা ছিল এরূপ: জনবলে — প্রায় ২ গুণ, তোপে — ৪ গুণ, ট্যাঙ্ক ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গানে — ৪·৬ গুণ, বিমানে — ২ গুণের বেশি।

সর্বোচ্চ সদর-দপ্তর এই পরিকল্পনা নিয়েছিল যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌ-বহর ও আমুর নদীর ফ্লোটিল্যার সহায়তায় ট্রান্স-বৈকাল ফ্রণ্ট, ১ম ও ২য় দূর প্রাচ্য ফ্রণ্টের শক্তিসমূহ দিয়ে কুয়াণ্টুং বাহিনীকে ঘিরে ফেলা হবে, এবং একই সঙ্গে তাকে অংশে অংশে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে প্রতিটি অংশকে আলাদা-আলাদাভাবে ধ্বংস করা হবে।

ট্রান্স-বৈকাল ফ্রণ্ট (অধিনায়ক মার্শাল র. মালিনোভ্স্কি) লড়ছিল মঙ্গোলীয় গণ-প্রজাতন্ত্রের ভূখণ্ড থেকে এবং তিনটি মিশ্র বাহিনী (১৭শ, ৩৯তম, ৫৩তম) ও ৬ষ্ঠ রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনী দিয়ে চানচুন অভিমুখে প্রধান আঘাত হানছিল। তাছাড়া ফ্রণ্ট দু'টি সহায়ক আঘাত হানছিল: একটি দলোনর ও কালগান অভিমুখে অশ্বারোহী-মেকানাইজ্ড গ্রুপের শক্তিসমূহ দিয়ে (গ্রুপে মঙ্গোলীয় ফৌজও ছিল), অন্যটি — হাইলার ও চ্জালানতুন অভিমুখে ৩৬তম বাহিনী শক্তিসমূহ দিয়ে।

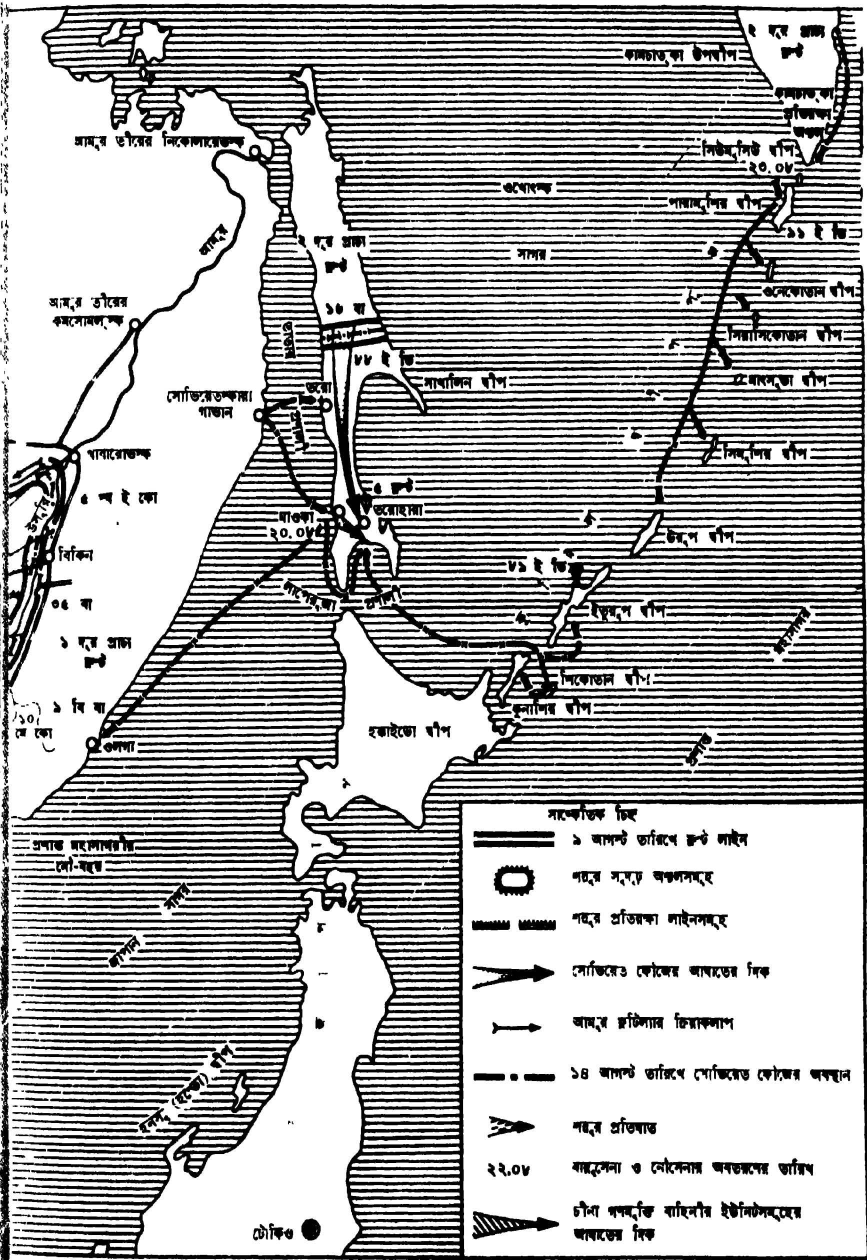
১ম দূর প্রাচ্য ফ্রণ্ট (অধিনায়ক মার্শাল ক. মেরেৎস্কোভ) আক্রমণাভিযান চালাচ্ছিল উপকূলীয় প্রিমোরিয়ে অঞ্চল থেকে এবং ১ম রেডবেনার-প্রাপ্ত বাহিনী ও ৫ম বাহিনী দিয়ে প্রধান আঘাত হানছিল মুদানজিয়ান অভিমুখে, আর সহায়ক আঘাতগুলো: বলি অভিমুখে — ৩৫তম বাহিনীর শক্তি দিয়ে এবং ভানসিন অভিমুখে — ২৫তম বাহিনীর শক্তিগুলো দিয়ে।



নকশা ২১। সমরবাদী জাপানের কুয়াণ্টুং বাহিনীর পরাজয়

২য় দূর প্রাচ্য ফ্রণ্টটি (অধিনায়ক জেনারেল ম. পুর্কায়েভ) আমুর অঞ্চল থেকে লড়ছিল এবং খার্বিন ও সিংসিকার অভিমুখে আঘাত হানছিল।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌ-বহর (অধিনায়ক অ্যাডমিরাল ই. ইউমাশেভ)



নিজের বন্দরগুলো ও সামুদ্রিক যোগাযোগ পথগুলো রক্ষা করছিল এবং উত্তর কোরিয়ায়, সাখালিনে ও কুরিল দ্বীপপুঞ্জে শত্রুর বন্দর আর নৌ-ঘাঁটিগুলো দখলের কাজে স্থলসেনাকে সাহায্য করছিল।

এই ভাবে, সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর সদর-দপ্তরের অভিপ্রায়ে

ছিল লক্ষ্যনিষ্ঠতা ও দঢ়তা। সর্বোচ্চ সদর-দপ্তর সৈন্যদের সামনে সাম্রাজ্যবাদী জাপানের প্রধান আক্রমণকারী শক্তি হিশেবে কুয়াণ্টুং বাহিনীকে বিধ্বস্ত করার, তাকে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য করার এবং তদ্দ্বারা এশিয়ায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উৎসটি বিলোপ করার কর্তব্য হাজির করে। প্রধান প্রয়াস কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল শত্রুর পার্শ্ববর্তী গ্রুপিংসমূহ বিধ্বস্তকরণের কাজে। এ ধরনের অপারেশন শত্রুকে অচল করে দিচ্ছিল এবং তার প্রধান শক্তিসমূহকে ঘিরে ফেলতে সাহায্য করছিল।

মুখ্য ভূমিকা পালন করছিল ট্রান্স-বৈকাল ফ্রণ্ট ও ১ম দূর প্রাচ্য ফ্রণ্ট, যা আঘাত হানছিল সমাভিমুখে। ২য় দূর প্রাচ্য ফ্রণ্টের কাজ ছিল -- কুয়াণ্টুং বাহিনীকে অংশে অংশে ভেঙে দিতে ও তাকে ধ্বংস করতে সাহায্য করা।

মাঞ্চুরীয় অপারেশনের বৈশিষ্ট্য ছিল ক্রিয়াকলাপের আকস্মিকতা। তা সম্ভব হয়েছিল অপারেশনেল ক্যামুফ্লেজের জন্য। এই ক্যামুফ্লেজের উদ্দেশ্য ছিল আক্রমণাভিযানের প্রস্তুতি গোপন রাখা এবং সোভিয়েত সৈন্যদের প্রধান আঘাতের দিকগুলো সম্পর্কে শত্রুকে ভ্রান্ত ধারণা দেওয়া। তবে এ কাজটি করা কিন্তু সহজ ছিল না। জেনারেল স. শ্তেমেঙ্কো লিখেছেন, 'ক্রিয়াকলাপের আকস্মিকতার ব্যাপারে আমাদের প্রচেষ্টা এই জন্য জটিল হয়ে উঠেছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুদ্ধের অনিবার্যতা সম্পর্কে ধারণা জাপানীদের মনে অনেক আগে থেকেই এবং দঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। স্ট্র্যাটেজিক আকস্মিকতা অর্জন প্রায় সম্ভবই ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সমস্যাটি নিয়ে ভাবার সময় আমরা বার বার দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের প্রথম দিনগুলোর কথা স্মরণ করছিলাম: আমাদের দেশ এই যুদ্ধেরও অপেক্ষা করছিল, তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, কিন্তু জার্মানদের আঘাতটি ছিল আকস্মিক। সুতরাং, এ ক্ষেত্রেও অকালে আকস্মিকতা অস্বীকার করা উচিত ছিল না।'*

সাম্রাজ্যবাদী জাপানের সঙ্গে যুদ্ধারম্ভের আকস্মিকতা নির্ভর করছিল সর্বাগ্রে অপারেশনের অভিপ্রায় গোপন রাখার উপর এবং সোভিয়েত সৈন্যদের আক্রমণাভিযানের প্রস্তুতির মাত্রার উপর।

সর্বোচ্চ সদর-দপ্তরের নির্দেশ অনুসারে, অপারেশনের পরিকল্পনা

প্রণয়নের অধিকার ছিল: অধিনায়কের, সদর-দপ্তরের অধিকর্তার ও ফ্রন্টের সদর-দপ্তরের অপারেশনেল বিভাগের অধিকর্তার — পূর্ণ মাত্রায়। বিভিন্ন ধরনের ফৌজ ও সার্ভিসের অধিকর্তাদের পরিকল্পনার বিশেষ বিশেষ পরিচ্ছেদ প্রণয়নে নিযুক্ত করা হয়, তবে তাঁরা ফ্রন্টের সাধারণ কর্তব্যগুলোর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। নির্দেশে বলা হয়েছিল, 'ফ্রন্টের অধিনায়ক ব্যক্তিগতভাবে বাহিনীসমূহের সেনাপতিদের কাজ দেবেন, এবং তিনি তা করবেন মৌখিকভাবে, কোনরূপ লিখিত নির্দেশ ব্যতিরেকে। বাহিনীর পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সেই নিয়মই অনুসরণ করতে হবে যা অনুসরণ করা হচ্ছে ফ্রন্টের পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে। ফৌজগুলোর ক্রিয়াকলাপের পরিকল্পনা সংক্রান্ত সমস্ত দলিলপত্র থাকবে ফ্রন্টের অধিনায়কের এবং বাহিনীসমূহের অধিনায়কদের ব্যক্তিগত আলমারিতে।'*

আক্রমণাভিযানের জন্য সোভিয়েত সৈন্যদের সামরিক প্রস্তুতির মাত্রা গোপন রাখার উদ্দেশ্যে অতি কঠোরভাবে অনুসরণ করা হচ্ছিল সৈন্য পুনর্বিন্যাসের বিশেষ ব্যবস্থা। সামরিক ক্রিয়াকলাপ আরম্ভের সময় কাউকেই জানানো হয় নি। জেনারেল স্টাফ এরূপ অনুমানের উপর ভিত্তি করে এগুচ্ছিল: ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথের অপেক্ষাকৃত কম পরিবহণ ক্ষমতার কথা এবং আগস্ট মাসে মাঞ্চুরিয়ায় বর্ষার কথা বিবেচনা করে জাপানী সেনাপতিমণ্ডলী ভাবছে যে সোভিয়েত সৈন্যরা সামরিক ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ করতে পারবে কেবল হেমন্ত কালে। পরে দেখা গেল যে সোভিয়েত জেনারেল স্টাফের অনুমান ঠিকই ছিল। জাপানী সেনাপতিমণ্ডলী সত্যিই ভেবেছিল যে যুদ্ধ শুরু হবে ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে অথবা অক্টোবরের গোড়ায়। এর প্রমাণ মেলে বন্দী জাপানী জেনারেলদের কথাবার্তা থেকে। কুয়াণ্টুং বাহিনীর সদর-দপ্তরের উপ-অধিকর্তা মেজর-জেনারেল ম. তমোকাৎসু বলে, 'বাহিনীর সদর-দপ্তর জানত যে ১৯৪৫ সালের মার্চ মাস থেকে মাঞ্চুরিয়া সীমান্তে সোভিয়েত সৈন্য সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পেয়ে এসেছে। তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধে প্রবেশের সঠিক সময়টি আমাদের কাছে অজানাই থেকে গিয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক ৮ আগস্ট তারিখে যুদ্ধ ঘোষণা কুয়াণ্টুং সেনাপতিমণ্ডলীর পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এক ব্যাপার ছিল।'**

* ঐ, পৃঃ ৩৫৪-৩৫৫।

** ঐ, পৃঃ ৩৭২।

মূল অবস্থানে সৈন্য সমাবেশ, পুনর্বিন্যাস ও মোতায়েনের কাজটি চলছিল পূর্ণ ক্যামুফ্লেজের পরিস্থিতিতে।

নবাগত ইউনিট আর ফর্ম্যাশনগুলোর সমাবেশের অঞ্চলসমূহ নির্ধারিত হয়েছিল বিস্তৃত ফ্রণ্টে এবং এরূপ দূরত্বে যা তাদের প্রতীক্ষা ক্ষেত্রগুলোতে ও মূল অবস্থানে কেবল দ্রুতই নয় যুগপৎ প্রবেশেরও সুযোগ দিচ্ছিল। সৈন্য চলাচলের সমস্ত কাজ সম্পন্ন হচ্ছিল মহড়া পরিচালনার ভেতর দিয়ে এবং তাতে গোপনীয়তা অর্জিত হচ্ছিল ও একই সময়ে ইউনিট আর ফর্ম্যাশনসমূহের সংঘবদ্ধতা সুদৃঢ় হয়ে উঠছিল।

সীমান্তরক্ষী বাহিনীগুলো আগেরই মতো নিজ নিজ এলাকায় প্রহরাকার্য চালিয়ে যাচ্ছিল। সুদৃঢ় অঞ্চলসমূহে বিশেষভাবে প্রেরিত সৈন্যদলগুলো শত্রুর চোখের উপর শুকনো ঘাস সংগ্রহ করছিল, — বছরের এই ঋতুতে গ্যারিসনগুলো সচরাচর যা করে তারা ঠিক তা-ই অনুকরণ করছিল।

সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দাদের অন্য কোথাও সরানো হয় নি, এবং তাদের শান্তিপূর্ণ জীবনে কিছুই কোন ব্যাঘাত ঘটায় নি। পুনর্বিন্যাস, সমাবেশ ও মোতায়েনের সময় সৈন্য চলাচলের সমস্ত কাজ চলছিল কেবল রাত্রিবেলা। সৈন্যরা বিশ্রাম করত ও দিবাকাল কাটাত বনের মধ্যে আর ঢালুগুলোতে। সমস্ত হাতিয়ারপত্র ও সাজসরঞ্জাম ভালোভাবে লুকিয়ে রাখত। দাউরিয়া এবং মঙ্গোলিয়ার স্তেপাঞ্চলগুলোতে ট্যাঙ্ক, তোপ আর মোটর গাড়ি লুকিয়ে রাখা হত বিশেষভাবে খোঁড়া গহ্বরে। উপর থেকে হাতিয়ারপত্র ঢাকা হত ক্যামুফ্লেজ আবরণ জাল দিয়ে।

রাষ্ট্রীয় সীমান্তের লাইনের কাছে মূল অবস্থানে ফৌজগুলোকে আনা হচ্ছিল অপারেশন আরম্ভের এক-দু'দিন আগে। মূল অবস্থানের অঞ্চলসমূহে চলাচল, রন্ধন কার্য ও বৃক্ষচ্ছেদন নিষিদ্ধ ছিল।

বেতার কেন্দ্রগুলো করত কেবল বহুক্ষণ ধরে সীমান্তের কাছে অবস্থিত ইউনিটসমূহে, আর নবাগত ইউনিটগুলোতে সংবাদ কেবল সংগ্রহ করা হত।

সমস্ত ফ্রণ্টে ট্রেনে ও মোটর গাড়িতে ভুয়ো পরিবহণের কাজ চলছিল, সৈন্য সমাবেশের ভুয়ো অঞ্চল প্রস্তুত করা হচ্ছিল। শত্রুর দৃষ্টিগোচর রাস্তাগুলো খাড়া ক্যামুফ্লেজ বেড়া আর ক্রস স্ক্রিন দিয়ে ঢাকা হয়েছিল। কেবল এক ৫ম বাহিনীর এলাকাতেই প্রধান আঘাতের অভিমুখে ১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি ক্যামুফ্লেজ বেড়া ও ১,৫১৫টি ক্রস স্ক্রিন স্থাপন করা হয়েছিল। অবস্থান নিরীক্ষণের সময় অফিসাররা সৈনিকের উর্দি পরে

চলাফেরা করতেন। বায়ুসেনার ঘাঁটিগুলো গোপন রাখা হচ্ছিল একাধিক ভুয়ো বিমান বন্দর গড়ে, বিমানগুলো লুকিয়ে রেখে।

জাপানী সেনাপতিমণ্ডলীকে বিভ্রান্ত করার এবং প্রধান আঘাতসমূহের দিকগুলো সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মূল অবস্থানের অঞ্চল গড়া হচ্ছিল সমগ্র রণাঙ্গন জুড়ে। প্রধান দিকগুলোতে ইঞ্জিনিয়রিং কাজকর্ম চলছিল মুখ্যত রাত্রিবেলা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শালবৃন্দ আ. ভাসিলেভস্কি, র মালিনোভ্স্কি, ক. মেরেৎস্কোভ ও কয়েকজন জেনারেলের দূর প্রাচ্যে আগমণের ব্যাপারটি গোপন রাখার উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে তাঁদের গোত্রনাম আর সামরিক খেতাবসূচক চিহ্নগুলো (কাঁধের ব্যাজ, ট্যাব ইত্যাদি) বদলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।*

সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছিলেন দূর প্রাচ্যে নতুন নতুন সৈন্যদলের আগমনের খবর গোপন রাখার দিকে। এ সমস্যাটি সমাধানে সবচেয়ে বেশি অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল ১ম দূর প্রাচ্য ফ্রণ্টের ৫ম বাহিনীকে। ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে খাবারোভস্ক থেকে ভ্লাদিভস্তক পর্যন্ত ৪ শতাধিক কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথটি গেছে সরাসরি রাষ্ট্রসীমার নিকট দিয়ে এবং কোন কোন জায়গায় তা ছিল শত্রুর দৃষ্টিগোচরতার মধ্যে। তাছাড়া ৫ম বাহিনীর কেন্দ্রীভূত হওয়ার কথা ছিল রাষ্ট্রসীমার নিকটে অনতিবৃহৎ একটি অঞ্চলে। মূল অঞ্চলে তার সমাবেশের সংবাদ গোপন রাখার উদ্দেশ্যে ট্রেনগুলো থেকে সৈন্যদের নামিয়ে সীমান্তের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল কেবল রাত্রিবেলা, স্থানীয় বাসিন্দাদের অলক্ষ্যে। ১ম দূর প্রাচ্য ফ্রণ্টের এক সহায়ক অভিমুখে সৈন্য সমাবেশের একটি ভুয়ো অঞ্চল প্রস্তুত করা হচ্ছিল।

সোভিয়েত ফৌজগুলো আক্রমণাভিযান আরম্ভের সময় সম্পর্কে জাপানী সেনাপতিমণ্ডলীকে ভ্রান্ত ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রবল গতিতে প্রতিরক্ষামূলক কাজকর্ম চলছিল এবং সে রকম কাজকর্ম ওখানে আগেও হচ্ছিল।

এখানে এটা উল্লেখ করা উচিত যে সমস্ত ফ্রণ্ট আর বাহিনীর

অপারেশনগুলোর পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছিল একই সঙ্গে বিপুল পরিমাণ শক্তিকে লড়াইয়ে লিপ্ত করে আকস্মিক আঘাত হানার নীতির ভিত্তিতে।

অপারেশনের গতি দেখিয়ে দিল যে সমস্ত ফ্রন্টে অনুসৃত অপারেশনেল ক্যামুফ্লেজ ব্যবস্থা খুব ভালো ফল দিয়েছিল। সোভিয়েত সৈন্যদের প্রধান আঘাতের শক্তি ও দিকগুলো জাপানী সেনাপতিমণ্ডলীর পক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল অপ্রত্যাশিত। ৫ম জাপানী বাহিনীর অধিনায়ক লেফটেনেন্ট-জেনারেল সেমিদ্জু বলেছিল, 'আমরা ভাবি নি যে রুশ সৈন্য বাহিনী তাইগার মধ্য দিয়ে যাবে, এবং দুর্গম অঞ্চলগুলোর দিক থেকে রুশদের বিপুল শক্তির আক্রমণাভিযান আমাদের জন্য সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এক ব্যাপার ছিল।'*

সোভিয়েত-জাপান যুদ্ধ — এ ছিল মরু-স্তেপ ও পার্বত্য-তাইগা অঞ্চলের পরিস্থিতিতে তিনটি ফ্রন্ট, বিমান বাহিনী, নৌ-বহর, ফ্লোটিল্যা ও দেশের বিমানবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সৈন্যদের সুসমন্বিত সামরিক ক্রিয়াকলাপের প্রথম শিক্ষাপ্রদ অভিজ্ঞতা। ট্রান্সবৈকাল ফ্রন্টের এলাকায় অঞ্চলটির মরু-স্তেপীয় চরিত্র ফ্রন্টের সৈন্যদের সুদৃঢ় অঞ্চলসমূহের দুই পার্শ্বদেশ বরাবর এগিয়ে যাওয়ার দিকগুলোতে আক্রমণাভিযান চালানোর সুযোগ দিল। কিন্তু ১ম দূর প্রাচ্য ফ্রন্টের এলাকায় পার্বত্য-তাইগা অঞ্চল সুদৃঢ় অঞ্চলসমূহের দু-পাশ দিয়ে অভিযান করার সুযোগ থেকে সোভিয়েত সৈন্যদের বঞ্চিত করছিল এবং সুদৃঢ় অঞ্চলসমূহ ভেদ করার আক্রমণাভিযান চালানোর অপরিহার্যতা দেখিয়ে দিচ্ছিল।

মাঞ্চুরিয়ায় সামরিক ক্রিয়াকলাপের প্রস্তুতি চলছিল তিনটি স্ট্র্যাটেজিক অভিমুখে: ট্রান্সবৈকাল-মাঞ্চুরীয়, আমুর-মাঞ্চুরীয় ও প্রিমোরিয়ে উপকূলাঞ্চল-মাঞ্চুরীয় অভিমুখে।

অপারেশনের প্রস্তুতি চলাকালে সৈন্যদের পরিচালনা ও নেতৃত্বদানের কাজটি সুসংগঠিত হয়। দূর প্রাচ্যের রণাঙ্গনের বিপুল দূরত্ব, তার বিশাল ভূখণ্ড, জটিল প্রাকৃতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং তিনটি ফ্রন্টের সবগুলোর স্বার্থে প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌ-বহরের যথাযোগ্য ও যথাকালীন ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ সামরিক ক্রিয়াকলাপে স্ট্র্যাটেজিক নেতৃত্বদানের জন্য দূর প্রাচ্যে সোভিয়েত ফৌজের

* প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় মহাফেজখানা, সূচক ২৯৪, তালিকা ৩৬৪০২, নং ৩, পৃঃ ৮৭।

সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলী গঠন করল। সেনাপতিমণ্ডলীর নেতৃত্বে ছিলেন মার্শাল আ. ভাসিলেভস্কি। সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর সদর-দপ্তর তাঁর সঙ্গে দূর প্রাচ্যে পাঠাল সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর বায়ুসেনার অধিনায়ক চিফ এয়ার মার্শাল আ. নভিকোভকে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক নৌ-বহরের সর্বাধিনায়ক অ্যাডমিরাল ন. কুজ্‌নেৎসভকে, যোগাযোগ-বিভাগীয় ফৌজের উপ-অধিকর্তা কর্নেল-জেনারেল ন. প্‌সুর্সেভকে, আর্টিলারির উপ-অধিনায়ক মার্শাল ম. চিস্তিয়াকোভকে, বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগের উপ-অধিকর্তা কর্নেল-জেনারেল ভ. ভিনোগ্রাদোভকে ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক গণ-কমিসার দপ্তরের অন্যান্য কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মীকে। সদর-দপ্তরের অধিকর্তা নিযুক্ত হন কর্নেল-জেনারেল স. ইভানোভ।*

দূর প্রাচ্যে স্ট্র্যাটেজিক নেতৃত্বদানের সংস্থা হিশেবে সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলী গঠনের ব্যাপারটির পূর্ণ সার্থকতা প্রমাণিত হয়েছিল। এই সেনাপতিমণ্ডলী সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলীর সদর-দপ্তরের নির্দেশাবলি অবিলম্বে বাস্তবায়িত করার, অপারেশনেল-স্ট্র্যাটেজিক ও সামরিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সমস্ত পরিবর্তন বিবেচনা করার, যথাকালে তাতে সাড়া দেওয়ার এবং যথাস্থানে ফ্রন্টসমূহকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দানের সুযোগ দিলেন।

জাপানের সঙ্গে যুদ্ধের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি ছিল তার দ্রুত গতি। অতি অল্প কালের মধ্যে স্ট্র্যাটেজিক কর্তব্যগুলো সম্পাদনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। অভিযানের প্রস্তুতি চলছিল আক্রমণের অপারেশন হিশেবে এবং তাতে ছিল যুদ্ধারম্ভের সমস্ত বৈশিষ্ট্য: সৈন্য মোতায়েনের গোপনতা, ক্রিয়াকলাপের আকস্মিকতা ও প্রথম এশিলনে যথাসম্ভব বেশি শক্তির অংশগ্রহণের আঘাত্। এই অপারেশনের সাফল্য নির্ধারক চূড়ান্ত বিষয়টি ছিল সোভিয়েত রাষ্ট্র ও তার সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষমতা, দেশের সর্বোচ্চ সামরিক-রাজনৈতিক নেতৃমণ্ডলীর সংগঠক ভূমিকা এবং ফ্যাসিস্ট জার্মানির বিরুদ্ধে সামরিক ক্রিয়াকলাপের অর্জিত অভিজ্ঞতা। মাঞ্চুরিয়া অপারেশনটি পশ্চিমে লাল ফৌজ সম্পাদিত স্ট্র্যাটেজিক অপারেশনসমূহের মতো ছিল না, — এটার প্রস্তুতি চলছিল যুদ্ধ ঘোষণার আগে থেকে।

অপারেশনের প্রস্তুতি পর্বে ফৌজগুলোতে বৃহৎ রাজনৈতিক-শিক্ষামূলক

কাজ চালানো হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল — সামরিক ক্রিয়াকলাপের জন্য সৈন্যদের গোপন প্রস্তুতিতে উদ্দীপিত করা (কেননা যুদ্ধ তখনও ঘোষিত হয় নি) এবং পার্বত্য-তাইগা ও মরু-স্তেপীয় রণাঙ্গনের জটিল পরিস্থিতিতে সৈন্যদের দ্বারা আক্রমণাভিযানের পদ্ধতিসমূহ রপ্ত করা। সৈন্যদের বলা হয় সোভিয়েত মাতৃভূমির উপর জাপানের একাধিক বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ হামলার বিষয়ে, ১৯১৮ — ১৯২২ সালে জাপানী হানাদারদের লুণ্ঠন ক্রিয়াকলাপের বিষয়ে, ১৯৩৮ সালে দূর প্রাচ্যে খাসান হ্রদের অঞ্চলে এবং ১৯৩৯ সালে মঙ্গোলিয়া গণ-প্রজাতন্ত্রের ভূখণ্ডে খালখিন-গোল নদীর নিকটে সমরবাদী জাপানের আগ্রাসনের বিষয়ে। লড়াইয়ের নির্দেশ প্রাপ্তির পর ৮ আগস্ট তারিখে অনুষ্ঠিত মিটিংগুলোতে যোদ্ধারা মর্যাদার সঙ্গে কর্তব্য পালনের শপথ গ্রহণ করে।

দূর প্রাচ্যে সোভিয়েত ফৌজের সর্বাধিনায়ক অপারেশন আরম্ভের আগে চীনা জনগণের প্রতি যে-আবেদন জানান তাতে জোর দিয়ে বলা হয়: 'লাল ফৌজ, মহান সোভিয়েত জনগণের সৈন্য বাহিনী, মিত্র চীনকে এবং বন্ধুভাবাপন্ন চীনা জনগণকে সাহায্য দানের জন্য এগিয়ে আসছে। এখানেও, এই প্রাচ্যে, সে তার সংগ্রামী ধ্বজা উড্ডীন রাখবে জাপানী নির্যাতন ও দাসত্ব থেকে চীন, মাঞ্চুরিয়া আর কোরিয়ার জনগণের মুক্তিদাতা সৈন্য বাহিনী হিশেবে।'

৮ আগস্ট রাত্রিবেলা সোভিয়েত সৈন্যরা বস্তুতপক্ষে প্রাগাক্রমণ গোলাবর্ষণ ও বোমাবর্ষণ ব্যতিরেকেই আক্রমণাভিযান আরম্ভ করে। পরের দিন সামরিক ক্রিয়াকলাপ শুরু করে মঙ্গোলিয়া গণ-প্রজাতন্ত্রের সৈন্যরা।

ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের অগ্রদলগুলো শত্রুর সীমান্তবর্তী প্রহরা ও রক্ষী দলগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। তাদের পেছন পেছন আক্রমণ আরম্ভ করে প্রধান শক্তিসমূহ। বিশেষ বিপুল সাফল্য অর্জন করে ৬ষ্ঠ রক্ষী ট্যাঙ্ক বাহিনী। দু'দিনে তা অতিক্রম করে ৩০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এক অর্ধমরু অঞ্চল, আর তৃতীয় দিনে — বৃহৎ হিনগান পর্বতশ্রেণী। ১৪ আগস্ট তারিখে ফ্রন্টের সৈন্যরা উত্তর-পূর্ব চীনের মধ্যাঞ্চলগুলোতে পৌঁছে যায়।

১ম দূর প্রাচ্য রণাঙ্গনে সোভিয়েত সৈন্যরা সুদৃঢ় অঞ্চলসমূহের গ্যারিসনগুলোর কঠোর প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। আক্রমণাভিযান আরও বেশি জটিল হয়ে পড়েছিল এই জন্য যে তা চলছিল তাইগার (নিবিড় অরণ্যের) ভেতরে যেখানে কোন রাস্তাঘাট ছিল না। ফৌজের আগে আগে চলছিল ট্যাঙ্ক, তা গাছগুলো ভূপাতিত করছিল, আর সাবমেশিন গানার ও

স্যাপাররা গাছগ‍ুলো ঠেলে ঠেলে সরিয়ে ৫ মিটার চওড়া একটা রাস্তা তৈরি করে দিচ্ছিল যা দিয়ে এগ‍ুচ্ছিল বাদবাকি ফৌজ। শত্র‍ুর প্রতিরোধ কতটা একরোখা ছিল তার প্রমাণ মেলে অপারেশনের প্রথম দিনে তার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ থেকে, — সে দিন নিহত হয় ২,৩২২ জন জাপানী সৈনিক ও অফিসার এবং কেবল ৩৫ জন লোক বন্দী হয়। লড়াইয়ের ছয় দিনে ফ্রণ্টের ইউনিটগ‍ুলো জাপানীদের স‍ুদ‍ৃঢ় অঞ্চলগ‍ুলো ভেদ করে ১০০ কিলোমিটার গভীরে ঢুকে পড়ে এবং শত্র‍ুর দ‍ৃঢ় প্রতিরোধ কেন্দ্র ম‍ুদানজিয়ান শহরের জন্য লড়াইয়ে লিপ্ত হয়।

ওই রাত্রেই ২য় দ‍ূর প্রাচ্য ফ্রণ্টের সৈন্যরাও স‍ুনগারি ও জাওখে অভিম‍ুখে আক্রমণাভিযান আরম্ভ করে। আম‍ুর নদীর ফ্লোটিল্যার সমর্থন পেয়ে তারা আম‍ুর নদী অতিক্রম করে বিপরীত তীরের ব্রিজ-হেডগ‍ুলো দখল করে নেয় এবং পরে দেশের অভ্যন্তর ভাগের দিকে আঘাত হানতে শ‍ুর‍ু করে। ১৪ আগস্ট নাগাদ ফ্রণ্টের সৈন্যরা শত্র‍ুকে শোচনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে ৫০-২০০ কিলোমিটার গভীরে ঢুকে পড়ে।

এই ভাবে আক্রমণাভিযানের প্রথম ছয় দিনের মধ্যে সোভিয়েত সৈন্যরা স‍ুদ‍ৃঢ় অঞ্চলসম‍ূহের প্রতিরক্ষা লাইন ভেদ করে ফেলে এবং শত্র‍ু বাহিনীর প্রধান শক্তিগ‍ুলোকে বিধ্বস্ত করে দেয়। এর ফলে জাপানী আগ্রাসকরা বিপর্যয়ের সম্ম‍ুখীন হয়।

১৪ আগস্ট তারিখে জাপান সরকার আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কিন্তু ফৌজগ‍ুলোকে সামরিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করার ব্যাপারে কোন নির্দেশ দেওয়া হয় নি। কুয়াণ্টুং বাহিনী প্রতিরোধ দিতে থাকে। এমতাবস্থায় সোভিয়েত সৈন্যরা আক্রমণাভিযান অব্যাহত রাখার আদেশ পায়।

১৭ আগস্টের দিকে তিনটি ফ্রণ্টের সৈন্যরা উত্তর-প‍ূর্ব চীনের মধ্যাঞ্চলগ‍ুলোতে পে‍ৗঁছে যায়, উত্তর কোরিয়ার বন্দরগ‍ুলো দখল করে নেয় এবং কালগান অঞ্চলে ৮ম চীনা গণ-ম‍ুক্তি বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়। এর ফলে কুয়াণ্টুং বাহিনী জাপানের ম‍ূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাছাড়া বাহিনী আগে থেকে প্রস্তুত সমস্ত আত্মরক্ষা লাইন থেকে বঞ্চিত হয়। সেই জন্য কুয়াণ্টুং বাহিনীর সেনাপতিমণ্ডলী দ‍ূর প্রাচ্যে সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলীর কাছে সামরিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করার ব্যাপারে প্রস্তাব পেশ করতে বাধ্য হয়। ওই দিনই বেতার মাধ্যমে কুয়াণ্টুং বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল ইয়ামাদার একটি নির্দেশ প্রচার করা হয় যাতে বলা

হয়েছিল: 'কুয়াণ্টুং বাহিনীর সংগ্রামরত সমস্ত ইউনিট অবিলম্বে সামরিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করবে এবং অস্ত্রত্যাগ করবে।'

কিন্তু এই হুকুম জারি হওয়ার পরও জাপানী বাহিনীর অধিকাংশ ইউনিটই প্রতিরোধ দেওয়ার কাজ অব্যাহত রাখে। রণাঙ্গনের কেবল মাত্র কয়েকটি অংশে শত্রু আত্মসমর্পণ করতে শুরু করে।

আত্মসমর্পিত জাপানী ফৌজগুলোর নিরস্ত্রীকরণ এবং তাদের দ্বারা দখলীকৃত ভূখণ্ড মুক্তকরণের কাজ ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে মার্শাল আ. ভাসিলেভস্কি তিন ফ্রণ্টের ফৌজকে এরূপ হুকুম দেন: 'জাপানীদের প্রতিরোধ দমিত, কিন্তু রাস্তাঘাটের দুরবস্থা নির্ধারিত কর্তব্য পালনের জন্য আমাদের বাহিনীগুলোর প্রধান শক্তিসমূহের দ্রুত অগ্রগতিতে বিরাট প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করছে। সেই জন্য চানচুন, মুকদেন, গিরিন ও খার্বিন শহরগুলোর অবিলম্বিত অধিকারের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে গঠিত দ্রুতগতিসম্পন্ন ও সুসজ্জিত সৈন্য দলসমূহকে কাজে লাগাতে হবে।'* এই সৈন্য দলসমূহের ভিত্তি গঠিত হয়েছিল ট্যাঙ্ক ইউনিট আর ফর্ম্যাশনগুলো নিয়ে। একই সময়ে উত্তর-পূর্ব চীনের সর্ববৃহৎ শহরগুলোতে — এবং তার মধ্যে ছিল মুকদেন, খার্বিন, গিরিন, চানচুন, দালনি বন্দর, পাইয়েংইয়াং — ১৮ থেকে ২২ আগস্টের মধ্যে অনেক প্যারাট্রুপার নামানো হয়। প্যারাট্রুপারদের সক্রিয় ক্রিয়াকলাপের ফলে অনেকগুলো সামরিক-অর্থনৈতিক উদ্যোগ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেল এবং জাপানী ফৌজগুলোর আত্মসমর্পণ ত্বরান্বিত হল। মুকদেন বিমান ঘাঁটিতে প্যারাট্রুপাররা একটি জাপানী বিমান কব্জা করে যার ভেতরে ছিল ক্রীড়নক মাঞ্চু-গো রাষ্ট্রের সম্রাট পু-ই। পু-ই জাপানে পালিয়ে যেতে প্রস্তুত হয়।

১৯ আগস্ট তারিখে ১ম দূর প্রাচ্য ফ্রণ্টের সদর-দপ্তরে পেঁছানো হয় কুয়াণ্টুং বাহিনীর সদর-দপ্তরের অধীনায়ক লেফটেনেণ্ট-জেনারেল খাতাকে যার মারফত দূর প্রাচ্যস্থ সোভিয়েত ফৌজের সর্বাধিনায়ক মার্শাল ভাসিলেভস্কি কুয়াণ্টুং বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল ইয়ামাদার কাছে চরম পত্র প্রেরণ করেন। চরম পত্রে এরূপ দাবি ছিল: 'কুয়াণ্টুং বাহিনীর ইউনিটগুলো অবিলম্বে সর্বত্র সামরিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করুক, আর

যেখানে তা অসম্ভব বলে মনে হবে সেখানে অনতিবিলম্বে সামরিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধকরণের বিষয়ে ফৌজগুলোর কাছে দ্রুত নির্দেশ পৌঁছে দেওয়া হোক এবং ১৯৪৫ সালের ২০ আগস্ট ১২টার মধ্যে সামরিক ক্রিয়াকলাপের অবসান ঘটানো হোক।' এর পর রণাঙ্গনের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে জাপানী সৈন্যরা অস্ত্র ত্যাগ করতে আরম্ভ করল। কেবল বিচ্ছিন্ন কয়েকটি গ্রুপই প্রতিরোধ অব্যাহত রাখল, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিটগুলো অচিরেই ওদের বিলোপ ঘটায়।

একই সঙ্গে মাঞ্চুরিয়ায় সামরিক ক্রিয়াকলাপ চালানোর সময় ২য় দূর প্রাচ্য ফ্রন্টের ফৌজগুলো প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌ-বহরের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতায় লিপ্ত হয়ে ১১ থেকে ২৫ আগস্টের মধ্যে দক্ষিণ-সাখালিন আক্রমণাত্মক অপারেশনটি সম্পন্ন করে, আর ১৮ আগস্ট থেকে ১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত — কুরিল অবতরণ অপারেশন চালায়, যার ফলে দক্ষিণ সাখালিন ও কুরিল দ্বীপপুঞ্জ জাপানী সৈন্যদের কবল থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়। দক্ষিণ সাখালিনে আত্মসমর্পণ করে ১৮ হাজার জাপানী সৈনিক ও অফিসার, আর কুরিল দ্বীপপুঞ্জে — ৫৪,৪৪২ জন।

এটা উল্লেখযোগ্য যে সোভিয়েত প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌ-বহরের সক্রিয় ক্রিয়াকলাপের সময় ইঙ্গো-মার্কিন নৌ-বহর বস্তুতপক্ষে জাপানের সামরিক নৌ-শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম বন্ধ করে দিয়েছিল। এ ছাড়া উত্তর কোরিয়ার বন্দর ও সামরিক নৌ-ঘাঁটিগুলোর এলাকায় আমেরিকানরা বিপুল সংখ্যক মাইন পেতেছিল এবং ওগুলোতে লেগে কয়েকটি সোভিয়েত জাহাজ বিনষ্ট হয়ে যায়। তার মধ্যে ছিল 'নাগিন' ও 'দালস্ত্রই'-এর মতো বৃহৎ জাহাজগুলো।

কুয়াণ্টুং বাহিনীকে বিধ্বস্তকরণের অপারেশন চলাকালে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছিল মঙ্গোলিয়া গণ-প্রজাতন্ত্রের সৈন্যরা। এর ফলে একাধিক বার সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মঙ্গোলিয়া আক্রমণকারী অভিন্ন শত্রু সমরবাদী জাপানের সঙ্গে সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মঙ্গোলিয়া গণ-প্রজাতন্ত্রের মধ্যে সামরিক সহযোগিতা আরও বেশি বৃদ্ধি পায়।

মাঞ্চুরিয়ায় সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর হাতে কুয়াণ্টুং বাহিনীর পরাজয়ের ফলে সাম্রাজ্যবাদী জাপান বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর হাতে কুয়াণ্টুং বাহিনীর পর্যুদাস সমরবাদী জাপানের পূর্ণ সামরিক পতনে এক চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করে।

সাম্রাজ্যবাদী জাপানের আত্মসমর্পণের ফলে বিলুপ্ত হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ উৎস। সারা পৃথিবীতে এল দীর্ঘপ্রত্যাশিত শান্তি। ১৯৪৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত নির্দেশ ক্রমে 'জাপানের বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্য' একটি পদক প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৪৫ সালে দূর প্রাচ্যে সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর বিজয়ের ছিল বিশ্ব-ঐতিহাসিক তাৎপর্য। কুয়াণ্টুং বাহিনীর পরাজয় জাপানকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। জাপান তার সমস্ত ব্রিজ-হেড আর সামরিক ঘাঁটি হারায়, — ওগুলো থেকে বহু বছর ধরে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণের প্রস্তুতি চলছিল। সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনী মাতৃভূমিকে ফিরিয়ে দিল আপন রুশ মাটি — দক্ষিণ সাখালিন ও কুরিল দ্বীপপুঞ্জ।

শত্রুর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল বিপুল: প্রায় ৮৪ হাজার সৈনিক ও অফিসার নিহত হয়, ৫ লক্ষ ৯৩ সহস্রাধিক সৈনিক ও অফিসার বন্দী হয়। প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়েছিল।

দূর প্রাচ্যে জাপানী ফৌজের দ্রুত পরাজয় লক্ষ লক্ষ মার্কিন, ব্রিটিশ, অস্ট্রেলীয়, ভারতীয় ও চীনা সৈন্যকে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন উত্তর-পূর্ব চীন মুক্ত করে এবং তদ্দ্বারা চীনা জনগণকে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধকরণের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ আর কুওমিনটাঙের প্রতিক্রিয়াশীল পরিকল্পনাসমূহ বানাচাল করে দেয়। মাঞ্চুরিয়ায় নয়া-উপনিবেশবাদের অনুপ্রবেশের সবচেয়ে সুবিধাজনক পথ — পোর্ট আর্থার ও দালনি বন্দরগুলো সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী পুরোপুরিভাবে বন্ধ করে দিয়েছিল।

মঙ্গোলীয় গণ-বৈপ্লবিক বাহিনী, চীনা গণমুক্তি ফৌজ আর কোরীয় পার্টিজানদের সঙ্গে মিলে সোভিয়েত সৈন্যরা মাঞ্চুরিয়া মুক্ত করে। অর্থনৈতিক দিক থেকে চীনের সবচেয়ে বিকশিত এ অঞ্চলটি পরিণত হয় দেশের বৈপ্লবিক শক্তিসমূহের এক নির্ভরযোগ্য সামরিক-স্ট্র্যাটেজিক ব্রিজ-হেডে, চীনা বিপ্লবের নতুন রাজনৈতিক কেন্দ্রে। মাঞ্চুরিয়ায় অবস্থানরত বৈপ্লবিক ফৌজগুলোর কাছে যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ ছিল। তা তাদের দিয়েছিল সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী। কেবল দুই সোভিয়েত ফ্রন্ট অধিকৃত যুদ্ধ-সামগ্রীর মধ্যেই ছিল ৩ হাজার ৭ শতাধিক তোপ ও মর্টার কামান, ৬০০ ট্যাংক, ৮৬১টি বিমান, প্রায় ১২ হাজার মেশিন গান, প্রায় ৬৮০টি বিভিন্ন রকমের গুদাম এবং সুনগারি নদীর সামরিক ফ্লোটিল্যার সমস্ত জাহাজ। এ সমস্তকিছু চীনা গণ-মুক্তি বাহিনীর

ফৌজগুলোকে পুনর্সজ্জিত করার সুযোগ দিল। চীনা বাহিনীটিকে সোভিয়েত অস্ত্রশস্ত্রেরও একাংশ দেওয়া হয়েছিল।

এই বাস্তব সহায়তা চীনা গণ-মুক্তি বাহিনীকে সংখ্যাগত ও গুণগতভাবে দৃঢ়তা লাভ করতে এবং পার্টিজান সংগঠন থেকে স্থায়ী সৈন্য বাহিনীতে রূপান্তরিত হতে সাহায্য করেছিল। এটা উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে যে ১৯৪৫ সালের ১ নভেম্বর তারিখে চীনা গণ-মুক্তি বাহিনীর ৫ লক্ষ ২২ হাজার যোদ্ধা ও সেনাপতির মধ্যে ৩ লক্ষ ৯৭ হাজারই মোতায়েন ছিল উত্তর চীনে। ১৯৪৭-১৯৪৮ সালে মাঞ্চুরিয়া থেকেই তারা সর্বপ্রথম কুওমিনটাঙের ফৌজগুলোর বিরুদ্ধে বড় রকমের বিজয় অর্জন করেছিল যার ফলে চিয়াং কাইশেকের পচে-যাওয়া শাসন ব্যবস্থা থেকে সমগ্র চীনকে মুক্তকরণের সূত্রপাত ঘটে। মাও-সে তুঙ তখন লিখেছিলেন: 'লাল ফৌজ আগ্রাসকদের বিতাড়িত করতে চীনা জনগণকে সাহায্য করতে এসেছিল। চীনের ইতিহাসে এ হচ্ছে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। এ ঘটনার প্রভাব মূল্যায়ন করা যায় না।'*

সোভিয়েত ইউনিয়ন কোরীয় জনগণকে জাপানী শাসন থেকে মুক্ত করে। কিম ইল সেঙ বলেছেন, 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান বিজয় এবং সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর হাতে সাম্রাজ্যবাদী জাপানের পরাজয় আমাদের দেশকে সুদীর্ঘ ঔপনিবেশিক নির্যাতন থেকে মুক্ত করেছে ও কোরীয় জনগণের সামনে নতুন, স্বাধীন এক জীবনের দ্বার খুলে দিয়েছে।'**

জাপানী সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক নির্যাতন থেকে কোরীয় জনগণকে মুক্তি দানকারী সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর সম্মানে কোরিয়া জন-গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ জাতীয় পরিষদের ১৯৪৮ সালের ১৬ অক্টোবর তারিখের নির্দেশ অনুসারে 'কোরিয়া মুক্তকরণের জন্য' একটি পদক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পদকে ভূষিত হয় সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী ও নৌ-বহরের সেই যোদ্ধারা, যারা কোরিয়া মুক্তকরণে অংশগ্রহণ করেছিল।

দেশের ইতিহাসে বৃহৎ একটি ঘটনা হচ্ছে ১৯৪৮ সালে কোরিয়া জন-গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠন। সোভিয়েত ইউনিয়নই সর্বপ্রথমে তাকে স্বীকৃতি দেয় ও তার সঙ্গে মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে।

দূর প্রাচ্যে সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর সামরিক ক্রিয়াকলাপ ঔপনিবেশিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে ভিয়েতনামী ও ইন্দোনেশীয় জনগণের চূড়ান্ত বিজয়ে সাহায্য করেছে। এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এমন একটি দেশও নেই যার ভাগ্য কোন-না-কোনভাবে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর ঐতিহাসিক বিজয়ের সঙ্গে জড়িত ছিল না। ঠিক এই বিজয় প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পতনের সূত্রপাত ঘটায়।

জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিজয় এবং জার্মান ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে বিজয় লাতিন আমেরিকা ও আরব দেশগুলো সহ সর্বত্র জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের প্রবলতা বৃদ্ধিতে বিপুলভাবে সাহায্য করে। এ আন্দোলন কলঙ্কজনক ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পূর্ণ পতন ঘটায়।

জাপানী সমরবাদের পরাজয় খোদ জাপানের জনগণের জন্যও বিপুল তাৎপর্যবহ ঘটনা। তা লক্ষ লক্ষ জাপানী নাগরিককে মৃত্যু ও লাঞ্ছনার কবল থেকে রক্ষা করে, সামরিক-ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব থেকে মুক্ত করে, দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে জাপানের শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক বিকাশের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হতে সহায়তা করে। যুদ্ধের পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের সঙ্গে সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক স্থাপন করে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত-জাপানী সম্পর্ককে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থের বিরুদ্ধে, দূর প্রাচ্যের দেশসমূহের মধ্যে সহযোগিতার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চেষ্টা করছে। তবে নিরবচ্ছিন্নভাবে শান্তির নীতি অনুসরণকারী সোভিয়েত ইউনিয়ন পারস্পরিক স্বার্থে সোভিয়েত-জাপানী সম্পর্কের পরবর্তী বিকাশ ঘটাতে, সোভিয়েত ও জাপানী জনগণের মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতা সুদৃঢ় করতে সচেষ্ট।

যুদ্ধ কৌশলের দৃষ্টিকোণ থেকেও দূর প্রাচ্যে স্ট্র্যাটেজিক অপারেশনটির বিপুল তাৎপর্য ছিল। গত যুদ্ধে এটাই সম্ভবত একমাত্র অপারেশন ছিল যাতে সামরিক ক্রিয়াকলাপের ২০ দিনের মধ্যে বিধ্বস্ত হয়ে যায় এশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সৈন্য বাহিনী। তদুপরি এরূপ শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয় অপেক্ষাকৃত কম প্রাণহানি

ঘটিয়ে। সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী সব মিলিয়ে প্রায় ৩২ হাজার লোক হারায়। এটা হচ্ছে সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী ও সদর-দপ্তরসমূহের সৈন্য পরিচালনার উচ্চ মানের এবং সোভিয়েত ফৌজগুলোর উচ্চ যুদ্ধ কৌশল আর রণ নৈপুণ্যের জাজ্বল্যমান উদাহরণ।

কুয়াণ্টুং বাহিনীকে বিধ্বস্তকরণের কাজে সোভিয়েত বায়ু সেনার বিপুল অবদান ছিল। বিমান বাহিনী সর্বমোট ২২ সহস্রাধিক বিমান-উড্ডয়ন সম্পন্ন করে এবং শত্রুর উপর প্রায় ৩ হাজার টন বোমা ফেলে। বায়ু সেনা শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করতে সাহায্য করে, তার মজুদ শক্তিকে অচল করে দেয়, অনুসন্ধান কার্যে, সৈন্যাবতরণে ও জাপানীদের প্রতিঘাত প্রতিহত করার ব্যাপারে বৃহৎ ভূমিকা পালন করে।

অপারেশন চলাকালে বিমানে করে স্থানান্তরিত করা হয় ১৬,৫০০ সৈনিক ও অফিকারকে, ২,৭৮০ টন জ্বালানি, ৫৬৩ টন গোলাবারুদ্ধ ও ১,৪৯৬ টন বিভিন্ন রকমের মালপত্র।

সাম্রাজ্যবাদী জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলাকালে তিনটি ফ্রণ্ট প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌ-বহর আর আমুর নদীর ফ্লোটিল্যার সঙ্গে সহযোগিতা করে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌ-বহর উত্তর কোরিয়ার বন্দরগুলো ও দক্ষিণ সাখালিন মুক্তকরণের উদ্দেশ্যে সৈন্যাবতরণের কাজে এবং সমুদ্রোপকূলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠনে ১ম দূর প্রাচ্য ফ্রণ্টকে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌ-বহরের ল্যাণ্ডিং ক্রিয়াকলাপের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি ছিল তাদের উচ্চ গতি। এ ব্যাপারে যা সাহায্য করেছিল তা হল সৈন্য পরিবহণ ও অবতরণের জন্য সোভিয়েত নৌ-বহরে বিশেষ বিশেষ ধরনের যুদ্ধ-জাহাজ ও সাধারণ জাহাজের ব্যবহার।

আমুর নদীর ফ্লোটিল্যার যুদ্ধ-জাহাজগুলো ২য় দূর প্রাচ্য ফ্রণ্টের সৈন্যদের আমুর, উসুরি ও সুনগারি নদীর মতো বৃহৎ জলবাধাগুলো অতিক্রম করতে এবং শত্রুর ক্ষমতাসম্পন্ন রক্ষা লাইন বিধ্বংস করতে সাহায্য করে।

মাঞ্চুরীয় অপারেশনের মুখ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অভূতপূর্ব আয়তন, বিশেষ করে ভূখণ্ডের দিক থেকে। এ অপারেশনটি চলছিল ৫ সহস্রাধিক কিলোমিটার দীর্ঘ এক ফ্রণ্টে, এবং সৈন্যদের আক্রমণাভিযানের গভীরতা ছিল ৬০০ থেকে ৮০০ কিলোমিটার পর্যন্ত, এবং সামরিক ক্রিয়াকলাপ অব্যাহত থাকে তিন সপ্তাহের মতো। উপরোক্ত তথ্যগুলো থেকে দেখা যাচ্ছে যে মাঞ্চুরীয় অপারেশনের রণনৈতিক ফলপ্রসূতা ছিল সময় ও স্থানের দিক থেকে অতি

তাৎপর্যপূর্ণ। বলা যেতে পারে যে মাঞ্চুরীয় অপারেশনটি পরিচালিত হয়েছিল সর্বোচ্চ কর্মদক্ষতার সঙ্গে।

৪। জাপানের শর্তহীন আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষর

১৯৪৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর। টোকিও খাড়িতে মার্কিন রণপোত 'মিসৌরির' উপরে সম্পন্ন হয় জাপানের আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরের অনুষ্ঠান। মিত্র ফৌজের সর্বোচ্চ অধিনায়ক হিশেবে জেনারেল ম্যাকার্থারকে আত্মসমর্পণ কার্য পরিচালনা ও সম্পাদন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই বিজয় প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় শত বছরের পলিসির খতিয়ান করছে সেটার উপর জোর দেওয়ার ইচ্ছায় আমেরিকানরা রণপোতের উপর একটা পতাকা নিয়ে এসে তা এমন এক জায়গায় স্থাপন করল যাতে সবার চোখে পড়ে। ওই পতাকাটি নিয়েই ১৮৫৪ সালে কমাণ্ডোর ম. পেরি জাপান 'আবিষ্কার' করেন, অর্থাৎ তোপের মুখে তাকে অসমান একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন। 'মিসৌরির' উপরের ডেকে রাখা একটি টেবিলটির কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স, চীন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, হল্যান্ড ও নিউ জিল্যাণ্ডের প্রতিনিধিবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন বহুসংখ্যক সংবাদদাতা। জাপানী প্রতিনিধিদলকে জাহাজের উপর নিয়ে আসা হয় ৮ টা ৫৫ মিনিটের সময়। টেবিলের কাছে না গিয়ে জাপানী প্রতিনিধিরা একটু দূরে দাঁড়াল — এল 'কলঙ্কের মুহূর্তগুলো'। জেনারেল ম্যাকার্থারের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার পর ৯টা ৪ মিনিটের সময় জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মামোরু সিগেমিৎসু ও জেনারেল স্টাফের অধিকর্তা ইয়োসিদজিরো উমেদজু শর্তহীন আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর দিল। তারপর তাতে নিজেদের স্বাক্ষর রাখলেন মিত্র রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিরা: সমস্ত মিত্র জাতির পক্ষে সর্বোচ্চ অধিনায়ক জেনারেল ড. ম্যাকার্থার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের — অ্যাডমিরাল চ. নিমিৎট্স, চীনের — কুওমিনটাঙের — জেনারেল সু ইউন-চান, গ্রেট ব্রিটেনের — অ্যাডমিরাল ব. ফ্রেইজের, সোভিয়েত ইউনিয়নের — জেনারেল ক. দেরেভিয়ানকো, অস্ট্রেলিয়ার — জেনারেল ট. ব্লেইমি, ফ্রান্সের — জেনারেল জ. লেকলের্ক, হল্যাণ্ডের — লেফটেনেণ্ট-জেনারেল ল. স্ক. ভান ওয়েন, নিউ জিল্যাণ্ডের — বিমান বাহিনীর ভাইস মার্শাল ল. ইসিট, কানাডার — কর্নেল ন. মুর-কসগ্রেইভ।

আত্মসমর্পণের দলিল অনুসারে জাপান ১৯৪৫ সালের ২৬ জুলাই তারিখে স্বাক্ষরিত পট্‌স্‌ডাম ঘোষণাপত্রের শর্তসমূহ গ্রহণ করে এবং নিজের ও তার নিয়ন্ত্রণাধীন সমস্ত ফৌজের শর্তহীন আত্মসমর্পণের কথা ঘোষণা করে। সমস্ত জাপানী সৈন্য ও সেখানকার অধিবাসীদের নির্দেশ দেওয়া হয় অবিলম্বে সামরিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করতে; জাহাজ, বিমান, সামরিক ও বেসামরিক সম্পত্তি রক্ষা করতে; বেসামরিক, সামরিক ও নৌ কর্মচারিরা মিত্র রাষ্ট্রসমূহের সর্বোচ্চ অধিনায়কের আদেশ পালনে বাধ্য থাকবে; জাপানী সরকার ও জেনারেল স্টাফকে অনতিবিলম্বে সমস্ত মিত্র যুদ্ধবন্দী ও অন্তরীণ বেসামরিক ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়; সম্রাট ও সরকারের ক্ষমতা চলে আসে মিত্র রাষ্ট্রসমূহেব সর্বোচ্চ অধিনায়কের হাতে যিনি আত্মসমর্পণের শর্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বন করবেন।*

আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হওয়ার পর জাপান প্রতিরোধ দান থেকে পুরোপুরিভাবে বিরত হয়। ব্রিটিশ ও অস্ট্রেলীয় ফৌজের অংশগ্রহণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যরা জাপানের মূল ভূখণ্ড অধিকার করতে আরম্ভ করে। একই সময়ে মিত্র সেনাপতিমণ্ডলীর প্রতিনিধিরা প্রশান্ত মহাসাগর, চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে জাপানী ফৌজের আত্মসমর্পণ বাস্তবায়িত করার ব্যবস্থা নিতে শুরু করেন। এই প্রক্রিয়াটি চলে কয়েক মাস ধরে।

সমরবাদী জাপানের পরাভবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের বড় অবদান ছিল। কিন্তু চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করেছিল সোভিয়েত সৈন্যরা, যারা জাপানের প্রধান স্থল শক্তি কুয়াণ্টুং বাহিনীকে পরাস্ত করেছিল। ওই সময় এ কথা স্বীকার করতেন পশ্চিমের বহু রাজনৈতিক ও সামরিক কর্মী। যেমন আমেরিকান জেনারেল ক. চেন্নোল্ট — যিনি ১৯৪৫ সালে চীনে মার্কিন বায়ু সেনার অধিনায়ক ছিলেন — 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' সংবাদপত্রের প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেন: 'জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবেশ ছিল এক নিয়ামক বিষয় যা প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধের সমাপ্তি ত্বরান্বিত করে। এমনকি পারমাণবিক বোমা ব্যবহার না করলেও ঠিক সেটাই ঘটত। জাপানের উপর লাল ফৌজ যে চূড়ান্ত আঘাত

---

* দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র নীতি। দলিল ও কাগজপত্র। খণ্ড ৩, পৃঃ ৪৮০-৪৮১।

হানে তা দিয়ে সেই পরিবেষ্টন কার্য সম্পন্ন হয় যা জাপানকে নতজানু করে দেয়।'*

বর্তমানে পশ্চিমে এরূপ একটা কথা ব্যাপক প্রচার লাভ করেছে যে জাপানের আত্মসমর্পণে চূড়ান্ত ভূমিকা নাকি পালন করেছে হিরোশিমা আর নাগাসাকির উপর পারমাণবিক বোমাবর্ষণ। কিন্তু ইতিহাসের তথ্য অখণ্ডনীয়। পারমাণবিক বোমাবর্ষণের পর জাপান অস্ত্রত্যাগ করে নি। মূল ভূখণ্ডে, চীনে ও মাঞ্চুরিয়ায় তার কাছে প্রচুর সৈন্য ছিল। সোভিয়েত ফৌজের হাতে জাপানের প্রধান আক্রমণকারী শক্তি — কুয়াণ্টুং বাহিনীর পরাজয়ই কেবল জাপানী সমরবাদীদের বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আরও একটা কথা খুব শোনা যায় — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নাকি জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবেশের বিরোধিতাই করছিল। কিন্তু তথ্য থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের সরকার জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবেশের জন্য একরোখা ও নিয়মিতভাবে চেষ্টাচরিত্র চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ প্রশ্নটি তাঁদের দ্বারা উত্থাপিত হয়েছিল ১৯৪৩ সালে অনুষ্ঠিত তেহেরান সম্মেলনে, ১৯৪৪ সালে মস্কোয় সোভিয়েত নেতাদের সঙ্গে চার্চিল ও ইডেনের আলাপ-আলোচনার সময়, ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ক্রিমিয়া সম্মেলনে এবং পট্‌স্‌ডাম সম্মেলনে। ব্রিটিশ বুর্জোয়া ইতিহাসবিদ এ. টেইলোর লিখেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ও সরকারের এরূপ অটলতার ভিত্তিতে ছিল 'তাঁর সামরিক উপদেষ্টাদের একাত্মতা'।

তাই জাপানের বিরুদ্ধে বিজয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে কৃতিত্বের পুরোটাই দাবি করে তার পেছনে নির্ভরযোগ্য কোন যুক্তি নেই।

৫। টোকিওর আন্তর্জাতিক আদালত

১৯৪৬ সালের ৩ মে তারিখে প্রধান যুদ্ধাপরাধীদের উপর বিচারকার্য শুরু করল টোকিওর আন্তর্জাতিক ট্রিবুন্যাল।

কাঠগড়ায় দাঁড়ায় ২৮টি লোক যারা আগ্রাসনের নীতি প্রণয়ন ও অনুসরণ করেছিল। এরা হল: বিভিন্ন সালে জাপানের প্রধানমন্ত্রীরা — ক.

* 'New York Times', 15.08.1945.

কইসো, হ. তদাজিও, ক. হিরানুমা, ক. হিরোতা, উপ-প্রধানমন্ত্রী ন. হসিনো, সমরমন্ত্রীরা — ম. আরাকি, স. ইতাগাকি, ড. মিনামি, স. খাতা, উপ-সমরমন্ত্রী হ. কিমুরা, সামুদ্রিক মন্ত্রীরা — ও. নাগানো, স. সিমাদা, সামুদ্রিক উপ-মন্ত্রী ট. ওকা, মধ্য চীনে জাপানী ফৌজের অধিনায়ক ই. মাৎসুই, সামরিক মন্ত্রণালয়ের সামরিক ব্যাপারাদির ব্যুরোর অধিকর্তারা — আ. মুতো, ক. সাতো, সর্বোচ্চ সামরিক পরিষদের সদস্য ক. দইহারা, সৈন্য বাহিনীর জেনারেল স্টাফের অধিকর্তা ই. উমেদ্‌জু, পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা — ই. মাৎসুওকা, ম. সিগেমিৎসু, স. তগো, কূটনীতিকদ্বয় হ. ওসিমা ও ট. সিরাতরি, অর্থমন্ত্রী ও. কাইয়া, যুব ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের সংগঠক ক. হাসিমতো, জাপানী ফ্যাসিজমের ভাবাদর্শী স. ওকাভা, লর্ড প্রাইভি সিল ক. কিদো, মন্ত্রিপরিষদের অধীনস্থ পরিকল্পনা পরিষদের চেয়ারম্যান ট. সুজুকি।

আসামীদের ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত করা হয়। জার্মানি ও ইতালির সঙ্গে মিলে তারা 'সমগ্র বিশ্বের উপর আগ্রাসী দেশসমূহের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং এই সমস্ত দেশ দ্বারা তার শোষণ সুনিশ্চিত করতে চেয়েছিল।'*

তিনটি গ্রুপে বিভক্ত ৫৫টি অভিযোগাত্মক ধারা উপস্থাপিত করা হয়: ক) 'পৃথিবীর বিরুদ্ধে অপরাধ' যাতে অন্তর্ভুক্ত হয় আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গকারী আগ্রাসী যুদ্ধের প্রস্তুতি ও পরিচালনা; খ) 'হত্যা', যাতে আসামীদের অবৈধ সামরিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত থাকার সময় সামরিক কর্মী ও বেসামরিক ব্যক্তিদের হত্যা এবং যুদ্ধের নিয়ম ও ঐতিহ্য লঙ্ঘন করে অন্যান্য রকমের হত্যার (যুদ্ধবন্দীদের হত্যা, বেসামরিক লোকজনের ব্যাপক হত্যার) জন্য অভিযুক্ত করা হয়; গ) 'যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ', যাতে যুদ্ধবন্দী ও অন্তরীণ বেসামরিক ব্যক্তিদের সঙ্গে অমানবিক ব্যবহারের কথা বলা হয়।**

প্রায় অর্ধেক সংখ্যক আসামীকে — দইহারা, ইতাগাকি, কিমুরা, কইসো, মাৎসুই, মুতো, সিগেমিৎসু, তদাজিও, খাতা ও হিরোতাকে —

* অক্টোবর বিপ্লবের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় মহাফেজখানা, সূচক ৭৮৬৭, তালিকা ১, নং ৯, পৃঃ ২

** ঐ, পৃঃ ৮১-৮২।

অভিযুক্ত করা হয় যুদ্ধবন্দী ও বেসামরিক অন্তরীণ ব্যক্তিদের সঙ্গে অমানবিক ব্যবহারের সঙ্গে জড়িত ধারাসমূহ অনুসারে।

ব্যাপক হত্যাকান্ড,. 'মৃত্যু মার্চ', যখন যুদ্ধবন্দীদের (এদের মধ্যে এমনকি অসুস্থ লোকও থাকত) দূর দূর পথ অতিক্রম করতে বাধ্য করা হত এমন সব পরিস্থিতিতে যা এমনকি ভালো তালিম-পাওয়া সৈন্যদের পক্ষেও দুঃসহ ছিল, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উত্তাপের মধ্যে কোনরূপ আবরণ ব্যতিরেকেই বাধ্যতামূলক শ্রম, বাসস্থান ও ঔষধপত্রের পূর্ণ অভাব যার দরুন হাজার হাজার লোক রোগে মারা যায়, গুপ্ত তথ্য লাভের জন্য অথবা স্বীকৃতি আদায়ের জন্য মারপিট ও সর্বপ্রকার যন্ত্রণা দান এবং এমনকি নরমাংস ভক্ষণ — এ হচ্ছে সেই সমস্ত নৃশংসতার কেবল একটি মাত্র অংশ মোকদ্দমা চলাকালে যার প্রমাণ উপস্থাপিত করা হয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জাপানের আগ্রাসী ক্রিয়াকলাপের প্রশ্নটি বিশদভাবে আলোচিত হয়। রায় দেওয়ার সময় বলা হয় যে জাপান সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর হামলা আরম্ভ করে খাসান হ্রদের কাছে আর মঙ্গোলিয়া গণ প্রজাতন্ত্রের উপর — খালখিন-গোল নদীর তীরে। ট্রাইব্যুন্যাল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট জার্মানির আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার পর জাপানের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আচরণও সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে।

সামরিক আদালত ৭ জন লোককে ফাঁশি দিয়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। এরা হল: তদজিও, হিরোতা (প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীদ্বয়), ইতাগাকি (প্রাক্তন সমর মন্ত্রী এবং ১৯৪৪-১৯৪৫ সালে কোরিয়ায় জাপানী সৈন্যদের সেনাপতি), মাৎসুই, দইহারা, কিমুরা, মুতো (সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীর প্রতিনিধি); ১৬ জনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেওয়া হয়, ১ জনকে — ২০ বছরের (প্রাক্তন মন্ত্রী তগো) ও ১ জনকে — ৭ বছরের (প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী সিগেমিৎসু) জেল দেওয়া হয়। দু'জন (প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী মাৎসুওকা ও অ্যাডমিরাল নাগানো) মোকদ্দমা চলার সময়ই মারা যায়। এক জনকে (জাপানী ফ্যাসিজমের ভাবাদর্শী ওকাভা) অপ্রকৃতিস্থ সাব্যস্ত করা হয়, এবং তার বিরুদ্ধে চালানো মোকদ্দমা সাময়িকভাবে তুলে নেওয়া হয়।

টোকিও মোকদ্দমার খতিয়ান করতে গিয়ে ১৯৪৮ সালের ২৮ নভেম্বর তারিখের 'ইজভেস্তিয়া' সংবাদপত্র লিখেছিল: 'ট্রাইব্যুন্যালের প্রকৃত অবদানটি হচ্ছে এই যে প্রধান জাপানী অপরাধীদের উকিল আর অন্যান্য রক্ষকদের বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, এমনকি ট্রাইব্যুন্যালের কয়েকজন সদস্যের নানা রকমের ফন্দি সত্ত্বেও সে ন্যায়সঙ্গত ও কঠোর দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেছে।...

মোকদ্দমা চলাকালে মুখ্য জাপানী যুদ্ধপরাধীদের অনেক রক্ষক দেখা যায় যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ উচ্চ পদে আসীন ছিল। এটা অসম্ভব নয় যে এই রক্ষকরা আসামীদের দণ্ড লঘু করার উদ্দেশ্যে শেষ চেষ্টা চালাবে।'

এবং ঠিক তাই ঘটল। জেনারেল ম্যাকার্থার রায় অনুমোদন করলেন বটে, কিন্তু তিনি তা বাস্তবে রূপায়িত করেন নি। নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে তিনি দণ্ডিত হিরোতা ও দইহারার কাছ থেকে আপীল গ্রহণ করেন তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টে প্রেরণের উদ্দেশ্যে, আর অন্য সমস্ত আসামীর ক্ষেত্রে রায় বাস্তবায়নের কাজ মুলতুবি রাখেন। পরে কিদো, ওকা, সাতো, সিমাদা আর তগোও আপীল করল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট এদের আপীল বিবেচনা করার জন্য নিয়েছিল।

আপন ক্ষমতা অপব্যবহারকারী ম্যাকার্থারের আচরণ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের অবৈধ হস্তক্ষেপ সমগ্র প্রগতিশীল জনসমাজের মনে ন্যায়সঙ্গত বিক্ষোভ উদ্রেক করে। তা মার্কিন সরকারকে জাপানী প্রধান যুদ্ধাপরাধীদের আপীল বিবেচনা করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে বাধ্য করে।

১৯৪৮ সালের ২২ ডিসেম্বর রাত্রে দণ্ডাদেশ পালিত হয়। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত সাত ব্যক্তিকে টোকিওর সুগামো জেলের প্রাঙ্গণে ফাঁশি দেওয়া হয়।

নুরেমবার্গ মোকদ্দমার মতো টোকিও সামরিক ট্রাইবুন্যালেরও আন্তর্জাতিক নিয়ম ও নীতি বাস্তবায়নের পক্ষে বিপুল তাৎপর্য ছিল। তা জাপানী আগ্রাসনের সমস্ত দিকের নিন্দা করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সমরবাদী জাপানের আগ্রাসী ক্রিয়াকলাপের ঘটনাটি স্বীকার করে।

টোকিও মোকদ্দমায় ঘোষিত ও কার্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় সেই সমস্ত বিধি, যা অন্তর্ভুক্ত হয় আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনে এবং পরবর্তী কালে জাতিসঙ্ঘ কর্তৃক অনুমোদিত হয় আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আইনের নীতি হিশেবে। শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য, সামরিক অপরাধের জন্য এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য তা অনুসারেই অপরাধীরা দণ্ডনীয়।

অষ্টম অধ্যায়

যুদ্ধের ফলাফল ও শিক্ষা

আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক প্রস্তুত ও বাধানো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হয় আগ্রাসকের পূর্ণ পরাজয়ে। এই যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য ছিল — সামরিক ক্রিয়াকলাপের অভূতপূর্ব ব্যাপকতা, সামরিক উৎপাদনের বিপুল বিকাশ, প্রচুর লোকহানি ও বৈষয়িক ক্ষয়ক্ষতি। সব মিলিয়ে এই যুদ্ধ চলে ২১৯৪ দিন (৬ বছর)। তাতে অংশগ্রহণ করে ৬১টি রাষ্ট্র, যেখানে বাস করত ১৭০ কোটি লোক। এ ছিল পৃথিবীর সমস্ত বাসিন্দার প্রায় ৮০ শতাংশ। সামরিক ক্রিয়াকলাপ চলছিল ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার ৪০টি দেশের ভূখণ্ডে এবং আটলাণ্টিক মহাসাগর, উত্তর মহাসাগর, প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের বিশাল জলরাশিতে; সৈন্য বাহিনীগুলোতে ভর্তি করা হয়েছিল ১১ কোটিরও বেশি লোককে। তাই পূর্বেকার অন্য যেকোন যুদ্ধের চেয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল অনেক বেশি সংখ্যক লোক যারা ফ্যাসিজমের সঙ্গে সংগ্রামে ব্যাপকতম সক্রিয়তা প্রদর্শন করেছে।

সামরিক উৎপাদনের মানের সূচকও সশস্ত্র সংগ্রামের আয়তনের সাক্ষ্য বহন করে। যুদ্ধের বছরগুলোতে (১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) কেবল হিটলারবিরোধী জোটের দেশসমূহেই উৎপাদিত হয়েছিল ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার বিমান (এর মধ্যে ৪ লক্ষ ২৫ হাজারটিই জঙ্গী বিমান), ২ লক্ষ ৩৬ হাজার ট্যাঙ্ক, ১৪ লক্ষ ৭৬ হাজার তোপ, ৬ লক্ষ ১৬ হাজার মর্টার কামান; জার্মানিতে — প্রায় ১ লক্ষ ৯ হাজার বিমান, ৪৬ হাজার ট্যাঙ্ক ও অ্যাসল্ট গান, ৪ লক্ষ ৩৫ সহস্রাধিক তোপ ও মর্টার কামান এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ। কেবল এক ইউরোপেই যুদ্ধজনিত বিনাশ হেতু বৈষয়িক ক্ষতির (এবং তা-ও পূর্ণ হিসাব অনুযায়ী নয়) পরিমাণ ছিল ২৬ হাজার কোটি ডলার (১৯৩৮

সালের ম্ল্যান্সারে); য্দ্ধরত দেশসম্হের প্রত্যক্ষ সামরিক ব্যয় ছিল তাদের জাতীয় আয়ের ৬০-৭০ শতাংশ। সব মিলিয়ে নিহত হয় ৫ কোটিরও বেশি লোক। সর্বাধিক সংখ্যক লোক হারায় সোভিয়েত ইউনিয়ন — ২ কোটিরও বেশি; সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূখণ্ডে বিনষ্ট হয় ১,৭১০টি শহর, ৭০ হাজার জনপদ ও গ্রাম, ধ্বংস হয় ৩২ হাজার শিল্প প্রতিষ্ঠান। আগ্রাসকদের বির্দ্ধে সংগ্রামে পোল্যান্ড হারায় প্রায় ৬০ লক্ষ লোক আর য্গোস্লাভিয়া — ১৭ লক্ষ। অন্যান্য রাষ্ট্রেরও বিপ্ল লোকহানি হয়েছিল। মার্কিন য্ক্তরাষ্ট্র হারিয়েছিল ৪ লক্ষ লোক, ইংলন্ড — ৩ লক্ষ ৭০ হাজার। জার্মানির ১ কোটি ৩৬ লক্ষ লোক হতাহত ও বন্দী হয়, আর তার ইউরোপীয় মিত্ররা হারায় ১৫ লক্ষাধিক লোক।

সামরিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনার উপায়-উপকরণের বিচারে দ্বিতীয় বিশ্বয্দ্ধে ম্খ্যত ব্যবহৃত হয়েছিল অপেক্ষাকৃত-সীমিত ক্ষমতার এবং অপারেশনের কম রেঞ্জের অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত সৈন্য বাহিনীগ্লো। য্দ্ধের শেষ দিকে ব্যবহৃত পারমাণবিক অস্ত্র ও রকেট তৈরি হওয়ার ফলে ফৌজের বৈষয়িক-প্রয্ক্তিগত সাজসজ্জায় এবং য্দ্ধ পরিচালনার পদ্ধতিতে আম্ল পরিবর্তন ঘটে যায়।

১। সামরিক-রাজনৈতিক ফলাফল

দ্বিতীয় বিশ্বয্দ্ধের প্রধান ফলটি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে আগ্রাসী শক্তিসম্হের বির্দ্ধে ফ্যাসিস্টবিরোধী রাষ্ট্রসম্হের জোটের, বিশ্বের প্রগতিশীল শক্তিসম্হের বিজয়। এই বিজয় প্থিবীতে রাজনৈতিক ও শ্রেণী শক্তির অন্পাতে আর বিন্যাসে আম্ল পরিবর্তন ঘটায়, য্দ্ধোত্তর সমগ্র বিকাশের গতি নির্ধারণ করে। সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণকারী শক্তিসম্হের বির্দ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের নির্ধারক ভূমিকায় অর্জিত বিজয়ের ছিল বিশ্ব-ঐতিহাসিক তাৎপর্য। এই বিজয়ে প্রতিভাত হয় আধ্নিক য্গের সবচেয়ে গ্র্ত্বপ্র্ণ বৈশিষ্ট্য — সমাজতন্ত্রের অদমনীয়তা। ইতিহাস আবারও স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দেয় যে অস্ত্রের সাহায্যে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে দ্র্বল অথবা ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসম্হের প্রচেষ্টা সর্বদাই ব্যর্থ হবে। সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা বাধানো য্দ্ধ উল্টে বরং জার্মানি, জাপান, ইতালি ও ফ্যাসিস্ট জোটের অন্যান্য দেশে সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শাসন ব্যবস্থাগ্লোকে ধ্বংস করে দেয়, তাদের পলিসি আর ভাবাদর্শের প্র্ণ পতন ঘটায়। অন্য কথায়, আবারও

প্রমাণিত হল যে যুদ্ধ পুঁজি আধিপত্যকে মজবুত করে না, বিনাশ করে।

ফ্যাসিজম ও সমরবাদের বিরুদ্ধে ,বিজয় অনেকগুলো দেশ ও জাতির সামনে মুক্তি, স্বাধীনতা আর সমাজ প্রগতির পথ খুলে দিল। হিটলারীদের এবং জাপানী সমরবাদীদের আগ্রাসন নীতির জবাবে, তাদের কুকর্মের জবাবে জাতিসমূহ শুরু করেছিল প্রবল মুক্তি সংগ্রাম। ফ্যাসিস্ট-সমরবাদী জোটের সামরিক পরাজয় এবং বিশ্বজোড়া ব্যাপক জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন জার্মান ও জাপানী হানাদারদের বিশ্বাধিপত্য লাভের পরিকল্পনাই কেবল সম্পূর্ণরূপে ভণ্ডুল করে নি, সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকেও শোচনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই পরাজয় পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহে এবং এশিয়ার কয়েকটি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ে ও প্রবল বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠনে সহায়তা করে। ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পর এটাই হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

পশ্চিম ইউরোপেও ফ্যাসিস্টবিরোধী মুক্তি আন্দোলন বিকাশ লাভ করছিল সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর বিজয় এবং মিত্র বাহিনীগুলোর ক্রিয়াকলাপের প্রভাবে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের সরকার তার বিকাশে এবং সমাজ ব্যবস্থার পরবর্তী গণতন্ত্রীকরণে বাধা দেয়, কেননা এতে তারা নিজেদের পক্ষে প্রত্যক্ষ এক হুমকি দেখতে পাচ্ছিল। তবে তা সত্ত্বেও ব্যাপক জনগণের সংগ্রাম ইতালি, ফ্রান্স ও অন্যান্য কতকগুলো রাষ্ট্রের জাতীয় স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় চূড়ান্ত এক ভূমিকা পালন করে।

‘পুরনো’ উপনিবেশ আর অর্ধ-উপনিবেশগুলোতে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের আগুন জ্বলে উঠতে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবেশের অব্যবহিত পরেই। এই সমস্ত দেশের — এবং সর্বাগ্রে কোরিয়া, ভিয়েৎনাম, ভারত, বর্মা, মালয়, সিরিয়া ও লেবাননের জাতিসমূহ দেখতে পেল যে তাদের মুক্তির পক্ষে এবার নতুন, অধিকতর অনুকূল পরিস্থিতি দেখা দিচ্ছে এবং তারা তা হাতছাড়া করল না। তারা হানাদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম জোরদার করে তুলল।

সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পতনের এবং নতুন নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভবের প্রক্রিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর অনেকটা ত্বরান্বিত হয়ে যায়। কেবল যুদ্ধোত্তর ১৫ বছরের মধ্যেই দেখা দেয় ২২টি নব্য স্বাধীন রাষ্ট্র। তবে ‘নির্ধারক’ ছিল এর পরের ১৫টি বছর (১৯৬০-১৯৭৫ সাল)। ওই সময় প্রাক্তন উপনিবেশ ও অর্ধ-উপনিবেশসমূহের জায়গায়

গঠিত হয় ৬২টি স্বাধীন রাষ্ট্র। ৭০-এর দশকে বৃহৎ বৃহৎ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলো পরিণত হয় ইতিহাসের বস্তুতে। বিশ্বজোড়া অদম্য মুক্তি সংগ্রাম থামাতে সাম্রাজ্যবাদ অক্ষম প্রতিপন্ন হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদ উপনীত হয় তার পতন ও ধ্বংসের পর্যায়ে; মানবজাতির অধিকাংশের উপর থেকে চিরতরে লুপ্ত হয় তার ক্ষমতা। এল নির্যাতিত জাতিসমূহের মুক্তির যুগ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে চরম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে বিজয় জাতিসমূহ ও রাষ্ট্রসমূহের সামনে খুলে দিল প্রগতিশীল পরিবর্তনের পথ, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এনে দিল গভীর অবস্থান্তর, ভূখণ্ডগত জটিল সমস্যাবলি সমাধানের কাজটিও সহজ হল। তা সর্বাগ্রে লক্ষ্য করা গেল তখন, যখন যুদ্ধ চলাকালে ও তার সমাপ্তির পর সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড ও অন্যান্য দেশের ন্যায্য রাষ্ট্রীয় সীমারেখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশের চারিদিক থেকে পুঁজিতান্ত্রিক বেষ্টনী দূর করা হল। সাম্রাজ্যবাদীরা সেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ-হেড থেকে বঞ্চিত হল যেগুলো সুদীর্ঘ বছর ধরে প্রস্তুত করা হচ্ছিল সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য।

ফ্যাসিজম ও সমরবাদের বিরুদ্ধে অর্জিত বিজয় প্রমাণ করল যে আধুনিক যুগে আগ্রাসনের সামাজিক ভিত্তি সংকীর্ণ হয়ে আসছে, আর প্রগতিশীল শক্তিসমূহের সামাজিক ভিত্তি প্রসারিত হচ্ছে। ফ্যাসিজম আর সমরবাদের সঙ্গে লড়েছে বহু জাতি ও রাষ্ট্রের সম্মিলিত শক্তিসমূহ। স্বাধীনতা, জাতীয় সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র ও প্রগতি রক্ষার্থে তাদের নিবিড় সহযোগিতা পরিণত হয়েছে জাতিসমূহের শান্তি আর নিরাপত্তার আদর্শের বিজয়ের ভিত্তিতে।

তবে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক সহমিতালির অন্যান্য দেশের প্রয়াসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফলগুলোর রাজনৈতিক ও বৈধ দৃঢ়তা সুনিশ্চিত করতে প্রায় তিরিশটি বছর লেগেছিল। এ ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে ১৯৭৫ সালে ইউরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতা বিষয়ক হেলসিঙ্কি চুক্তি স্বাক্ষরের ঘটনাটি। এই চুক্তি বিগত যুদ্ধের ফলাফলগুলো মূল্যায়ন করে, জাতিসমূহের শান্তি আর নিরাপত্তা সুদৃঢ়করণের জন্য নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করে।

সমগ্র যুদ্ধোত্তর পর্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিরবচ্ছিন্নভাবে ও দৃঢ়তার সঙ্গে শান্তির নীতি, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সহযোগিতার নীতি অনুসরণ

করেছে এবং এখনও করছে। শান্তি রক্ষা করা — আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি, সোভিয়েত জনগণ এবং পৃথিবীর সমস্ত জাতির পক্ষে বর্তমানে এর চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কোন কর্তব্য নেই।

সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী বিজয় লাভ করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত জাতির নিঃস্বার্থ সমর্থনের কল্যাণে। রণাঙ্গন ও তার পশ্চাদ্ভাগের, সৈন্য বাহিনী ও জনগণের ঐক্য ছিল বিজয়ের চূড়ান্ত শর্ত।

সোভিয়েত সৈন্যদের অর্জিত বিজয়ের মূলে ছিল রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের ঐক্য, সোভিয়েত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামরিক স্ট্র্যাটেজির অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ যার ভিত্তি হচ্ছে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব এবং অগ্রণী সোভিয়েত সমর বিজ্ঞান।

হিটলারী সৈন্য বাহিনীকে কিছুই সাহায্য করল না: না আগ্রাসনের আগে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে জনবল ও অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষেত্রে গড়ে-তোলা শ্রেষ্ঠতা, না ফ্যাসিস্ট ভের্মাখ্‌টের সেবার নিয়োজিত প্রায় সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের বিপুল অর্থনৈতিক সম্পদ, না আক্রমণের আকস্মিকতা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী পরিচালিত বৃহত্তম সমস্ত লড়াইয়ে অভিব্যক্তি লাভ করেছে সোভিয়েত যুদ্ধ কৌশলের এই বৈশিষ্ট্যগুলো: সর্বোচ্চ সামরিক সক্রিয়তা, লক্ষ্যনিষ্ঠতা, সামরিক ক্রিয়াকলাপের রূপ ও পদ্ধতি নির্বাচনে নমনীয়তা। সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর বিজয় একই সঙ্গে ছিল শত্রুর অস্ত্রশস্ত্রের বিরুদ্ধে সোভিয়েত অস্ত্রশস্ত্রের বিজয়, দেশের অভ্যন্তরে নিজের নিঃস্বার্থ শ্রমের দ্বারা অস্ত্র প্রস্তুতকারী মেহনতীদের বিজয়।

যুদ্ধের সময় সোভিয়েত সৈন্যরা প্রদর্শন করেছে তাদের উচ্চ নৈতিক গুণাবলি, অনুপম সামরিক দক্ষতা, আর প্রদীপ্ত সোভিয়েত স্বদেশপ্রেম সোভিয়েত সৈন্যদের ব্যাপক বীরোচিত কার্য সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করে। যুদ্ধের বছরগুলোতে ৭০ লক্ষাধিক সোভিয়েত সৈনিক আর অফিসার সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন অর্ডার আর পদক লাভ করে। সোভিয়েত মানুষের স্বদেশপ্রেমের, আপন সৈন্য বাহিনীর প্রতি তাদের সক্রিয় সমর্থনের উজ্জ্বলতম অভিব্যক্তি ঘটে কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে ব্যাপকারে আরব্ধ পার্টিজান আন্দোলনে। শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে সক্রিয় ছিল প্রায় ৬,২০০টি পার্টিজান দল আর গ্রুপ, সর্বমোট ১৩ লক্ষ স্বদেশপ্রেমিক, ৭৩৫টি গুপ্ত পার্টি সংস্থা। পার্টিজান আন্দোলন ছিল দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ

এক স্ট্র্যাটেজিক বিষয়। ফ্যাসিস্ট হানাদারদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভে এই আন্দোলন অতি উল্লেখযোগ্য এক ভূমিকা পালন করে।

২। যুদ্ধের প্রধান ও নির্ধারক রণাঙ্গন

ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়েছিল হিটলারবিরোধী জোটের দেশসমূহের জনগণের সম্মিলিত প্রয়াসে। তৃতীয় রাইখের সঙ্গে সংগ্রামে তারাই ছিল প্রধান শক্তি। তবে অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় অর্জনে জোটের অংশগ্রহণকারীদের ভূমিকা মোটেই সমান ছিল না। ফ্যাসিস্ট জোটকে পরাস্তকরণে চূড়ান্ত অবদান ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের। সোভিয়েত ইউনিয়নই ছিল সেই প্রধান শক্তি যা জার্মান ফ্যাসিজমের বিশ্বাধিপত্য লাভের পথ রোধ করেছে, যুদ্ধের আসল চাপটি নিজে সয়েছে এবং প্রথমে নাৎসি জার্মানির ও তার পরে সমরবাদী জাপানের পরাজয়ে চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করেছে। যুদ্ধের বছরগুলোতে কেউ-ই সরকারীভাবে এ কথাটি অস্বীকার করত না। তখন পশ্চিমে সোভিয়েত ইউনিয়নের চূড়ান্ত ভূমিকা সম্পর্কে অনেককিছু বলা হত।

আমেরিকান জেনারেল জর্জ মার্শাল বলেছিলেন যে 'লাল ফৌজের সফল ক্রিয়াকলাপ ব্যতিরেকে আমেরিকান সৈন্যরা আগ্রাসকের মোকাবিলা করতে পারত না এবং যুদ্ধ চলে যেত আমেরিকা মহাদেশে'।*

১৯৪২ সালের মে মাসের কঠিন দিনগুলোতে, যখন জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় গ্রীষ্মকালীন আক্রমণাভিযানের হুমকি দিচ্ছিল, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট জেনারেল ম্যাকার্থারের কাছে প্রেরিত এক তারবার্তায় বলেন: 'বৃহৎ স্ট্র্যাটেজির দৃষ্টিকোণ থেকে একটি সাধারণ জিনিস খুবই স্পষ্ট — ঐক্যবদ্ধ জাতিসমূহের ২৫টি রাষ্ট্রের সবগুলো একসঙ্গে যা করছে তার তুলনায় রুশরা শত্রুর বেশি সংখ্যক সৈন্যকে হত্যা করছে এবং তার বেশি পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসজ্জা ধ্বংস করছে।'**

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি যাঁর মোটেই কোন সহানুভূতি ছিল না

* The War Report of George G. Marschall, H. H. Arnold, Ernest S. King. — New York, 1947, p. 149.

** 'New York Times', 20.10.1955, p. 10.

এমনকি সেই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে 'রুশ সৈন্য বাহিনীই জার্মান সামরিক যন্ত্রকে অচল করেছিল।'* পশ্চিম ইউরোপে মিত্রদের যৌথ অভিযানকারী শক্তিসমূহের সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক জেনারেল ড. আইজেনহাওয়ার 'রুশদের অপূর্ব আক্রমণাভিযান' দেখে পরমানন্দিত হন, 'তাদের মহান বিজয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের' প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে লেখেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থলসেনার অধিনায়ক জেনারেল স্টিলওয়েল বলেছিলেন, 'বিশেষ করে রুশ সৈনিকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে আমেরিকানরা... তাদের নিজেদের সৈনিকদেরই মনোভাব ব্যক্ত করবে। স্থায়ী সংগ্রামের তিন বছরে আমরা দেখতে পেরেছি কী করে সে জার্মানদের প্রবল আক্রমণের পুরো চাপটা সয়েছে এবং ওদের বিধ্বস্ত করে দিয়েছে।... সমগ্র সভ্য দুনিয়াকে এই সংগ্রামের মুখ্য অংশগ্রহণকারী — রুশ সৈনিকের অবদানকে বিশেষ মূল্য দিতে হবে।'** এরূপ উক্তি আছে অসংখ্য।

কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলন্ড ও অন্যান্য পুঁজিতান্ত্রিক দেশে বুর্জোয়া ইতিহাসবিদ আর সামরিক কর্মীরা ফ্যাসিজমের পরাজয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকাটি খাটো করে দেখাতে শুরু করে। এবং পশ্চিমের আগ্রাসী মহলগুলোর হিতার্থে, আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের শত্রুদের স্বার্থে তারা এখনও তাই করে যাচ্ছে। তবে ইতিহাসের সত্য অখণ্ডনীয়।

হিটলারী জার্মানির বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের সশস্ত্র সংগ্রাম চলে প্রায় চার বছর ধরে। এই পুরো সময়টি ধরে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গন (পশ্চিমী সাহিত্যে যাকে পূর্ব অথবা রুশ রণাঙ্গন বলে অভিহিত করা হয়) ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান রণাঙ্গন। পুরো এই সময় ধরে এখানে যুদ্ধরত ছিল ফ্যাসিস্ট জার্মানি ও তার ইউরোপীয় মিত্রদের বেশির ভাগ সৈন্য। ১৯৪১-১৯৪২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লড়ছিল ভের্মাখ্টের সমস্ত ডিভিশনের ৭০-৭৬ শতাংশ, আর ইঙ্গো- মার্কিন ফৌজের বিরুদ্ধে — মাত্র ২-৪ শতাংশ। ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে ইউরোপে এমনকি দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার পরও সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে লড়ছিল সমস্ত

ফ্যাসিস্ট ডিভিশনের অর্ধেকেরও বেশি, আর পশ্চিমী মিত্রদের বিরুদ্ধে — গড়ে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ।

সশস্ত্র সংগ্রামের আয়তন ও প্রবলতার দিক থেকেও সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গন গত যুদ্ধের অন্যান্য সমস্ত রণাঙ্গন থেকে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইতালি ও উত্তর আফ্রিকায় রণাঙ্গনের দৈর্ঘ্য ৩০০-৩৫০ কিলোমিটারের বেশি ছিল না, পশ্চিম ইউরোপে — ৮০০ কিলোমিটার, কিন্তু সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের দৈর্ঘ্য যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ে ছিল ৩ হাজার থেকে ৬,২০০ কিলোমিটার পর্যন্ত।

এবার সামরিক ক্রিয়াকলাপের সক্রিয়তা তুলনা করা যাক। ইতালিতে সামরিক ক্রিয়াকলাপে ব্যয়িত হয় রণাঙ্গনের অস্তিত্ব কালের ৭৪ শতাংশ, উত্তর আফ্রিকায় — ২৯ শতাংশ, পশ্চিম ইউরোপে — ৮৬·৭ শতাংশ। কিন্তু সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে সক্রিয় সামরিক ক্রিয়াকলাপে ব্যয়িত হয় ওই রণাঙ্গনের অস্তিত্ব কালের ৯৩ শতাংশ।

সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে ধ্বংস হয় জার্মানি এবং তার তাঁবেদার রাষ্ট্রসমূহের প্রধান শক্তিগুলো — ৬০৭ ডিভিশন। উত্তর আফ্রিকা এবং পশ্চিম ইউরোপে মিত্ররা বিধ্বস্ত ও বন্দী করে সর্বমোট ১৭৬ ডিভিশন। সোভিয়েত ফৌজের সঙ্গে লড়াইয়ে নাৎসিরা হারায় তাদের বেশির ভাগ তোপ ও ট্যাঙ্ক, তিন-চতুর্থাংশ বিমান, ১,৬০০টিরও বেশি যুদ্ধ-জাহাজ ও পরিবহণ পোত। ফ্যাসিস্ট জার্মানির মোট ১ কোটি ৩৬ লক্ষ হতাহত ও নিখোঁজ সৈন্যের মধ্যে ১ কোটি (৭৩ শতাংশেরও বেশি) হতাহত ও নিখোঁজ হয় সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে।

সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর প্রবল আঘাতেই ভেঙ্গে পড়ে ফ্যাসিস্ট জোট। লাল ফৌজের বিজয়ের ফলে যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে পড়ে রাজার রুমানিয়া, জারের বুলগেরিয়া, মানেরহাইমের ফিনল্যান্ড ও হর্তির হাঙ্গেরি। এই দেশগুলো লড়ছিল নাৎসি জার্মানির পক্ষে।

যুদ্ধ হচ্ছে দ্বিপাক্ষিক প্রক্রিয়া, এবং সেই জন্য ফ্যাসিস্ট জার্মানির বিরুদ্ধে বিজয় লাভের উদ্দেশ্যে হিটলারবিরোধী জোটের রাষ্ট্রসমূহ যে-পরিমাণ লোক হারিয়েছে তা হিসাব থেকে বাদ দেওয়া চলে না। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন — দুই কোটি সোভিয়েত মানুষ নিহত হয় রণক্ষেত্রে, ফ্যাসিস্ট বন্দী শিবিরে আর কারাগারে। ইংলন্ড হারায় ৩ লক্ষ ৭০ হাজার, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র — ৪ লক্ষ লোক।

এ সমস্তকিছু থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের ভূমিকাই ছিল প্রধান ও নির্ধারক।

প্রগতিশীল ইংরেজ লেখক পির্স পল রীড বলেছেন, 'হিটলারের পরাজয় — যুদ্ধের এরূপ পরিণতির মানেই ছিল ফ্যাসিস্ট বাহিনী আর ফ্যাসিস্ট নৈতিকতার পরাজয়, তা পূর্বনিরূপিত হয়েছিল উত্তর আফ্রিকার মরুভূমি অথবা নরম্যাণ্ডির উপকূলের লড়াইগুলোতে নয়, পূর্বনিরূপিত হয়েছিল স্তালিনগ্রাদে, লেনিনগ্রাদে ও কুর্স্কে। হিটলারের পক্ষে ইংলণ্ড অথবা উত্তর আফ্রিকার ছিল গৌণ তাৎপর্য। রাশিয়ায় তার দানবীয় উন্মত্ততার প্রকাশ ঘটে বিভীষিকাময় শক্তিতে। রাশিয়ায় সে পরাস্ত হয়।'

দুনিয়ার সমস্ত সততাপরায়ণ লোক নির্দ্বিধায় এই মূল্যায়নটি মেনে নিতে পারত। কিন্তু বুর্জোয়া ভাবাদর্শীরা পৃথিবীর জাতিসমূহকে সোভিয়েত জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের বিষয়ে, ফ্যাসিজমের পরাজয়ের তাদের চূড়ান্ত অবদানের বিষয়ে সত্য কথাটি গোপন রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। ১৯৭৮ সালে লণ্ডনে প্রকাশিত 'রুশ রণাঙ্গন' বইয়ের ভূমিকায় বলা হচ্ছে, 'পশ্চিমী পাঠকের অধিকাংশই এই সত্য কথাটি জানে না যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অদৃষ্ট নির্ধারিত হয়েছিল পূর্বে — সোভিয়েত ইউনিয়নে — বিশ্ব ইতিহাসের সর্ববৃহৎ সামরিক অভিযানে।'

জানে না এই জন্য যে সাম্রাজ্যবাদের ভাবাদর্শীরা তা জানতে দেয় না। ফ্যাসিস্ট জার্মানির পরাজয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবদান খাটো করে বুর্জোয়া প্রচার ব্যবস্থা ভাবে যে তার মাধ্যমে সে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে, তার বিপুল জীবনী শক্তি সম্পর্কে সত্য কথাটি নিজ নিজ দেশের জনগণের কাছে গোপন রাখতে পারবে, দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার ব্যাপারে গড়িমসির কারণগুলো, মার্কিন ও ব্রিটিশ ফৌজগুলোর প্রায়ই পূর্বকল্পিত নিষ্ক্রিয়তার কারণগুলো অজ্ঞাত রাখতে পারবে।

পশ্চিমী ভাবাদর্শীরা আজ বিশেষ উদ্যমের সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবদানের স্তুতিগান করে থাকে। কিছু কিছু বুর্জোয়া প্রাবন্ধিক ও ইতিহাসবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধের বছরগুলোর 'পয়লা নম্বর শক্তি', 'মিত্রদের বিজয়ের স্থপতি' বলে অভিহিত করে। খ্যাতনামা আমেরিকান ইতিহাসবিদ ও সাংবাদিক হ. বলডুইনের মতে, 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সমস্ত রাষ্ট্রের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিঃসন্দেহেই ছিল সবচেয়ে ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র', এবং এর দ্বারাই নাকি বিজয়ে তার ভূমিকা নির্ধারিত হয়েছে।

অনুরূপ মিথ্যা যুক্তিতর্কের দ্বারা ১৯৪১ সালে ফ্যাসিস্ট আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যাপারে সোভিয়েত জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের তাৎপর্যকেই কেবল খাটো করা হয় না, সেই ইঙ্গো-মার্কিন নেতৃমণ্ডলীর স্ট্র্যাটেজিও সমর্থন করা যাঁরা ওই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বলে মনে করেছিলেন এবং অমূলকভাবে আশা করেছিলেন যে বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করে, অর্থনৈতিক অবরোধ আর সীমিত আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে জার্মানিকে বিধ্বস্ত করা যাবে।

এটা অবশ্য ঠিক যে ফ্যাসিস্ট জোটের রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবেশের ফলে হিটলারবিরোধী জোটের সম্ভাব্য ক্ষমতা বেড়ে যায়। তবে এই প্রবেশই যে ফ্যাসিস্ট জোটের পরাজয়ে 'চূড়ান্ত ফ্যাক্টর' ছিল এরূপ কথা বলার পক্ষে মোটেই কোন ভিত্তি নেই। এটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই সময় যুদ্ধে নামে যখন সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী তাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে 'বিদ্যুৎগতির যুদ্ধের' হিটলারী পরিকল্পনা একেবারে ভণ্ডুল করে দিয়েছিল এবং অন্যান্য দেশ ও মহাদেশে ফ্যাসিস্ট আগ্রাসনের পথ রোধ করেছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে প্রবেশের আগেই, ১৯৪১ সালের ৫ ডিসেম্বর সোভিয়েত সৈন্যরা মস্কোর উপকণ্ঠে প্রবল পাল্টা-আক্রমণ আরম্ভ করে। ১৯৪২ সালের ২০ জানুয়ারি লণ্ডন বেতার মাধ্যমে প্রচারিত ভাষণে জেনারেল শার্ল দ্য গল বলেন যে মস্কোর উপকণ্ঠে ফ্যাসিস্ট দুশমন 'ইতিহাসের সবচেয়ে শোচনীয় একটি পরাজয় বরণ করে'।*

'কে কাকে' এই প্রশ্নটির উত্তর বস্তুত পক্ষে পাওয়া যায় ফ্যাসিস্ট জার্মানির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের একার সংগ্রামে এবং যুদ্ধের গতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটে প্রধানত সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রয়াসে। আমূল পরিবর্তন ঘটে সেই সময় যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনী এবং সামরিক অর্থনীতি যুদ্ধের জন্য কেবল প্রস্তুত হচ্ছিল। এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য বাহিনীর সদর-দপ্তরের অধিকর্তা জেনারেল জর্জ মার্শালের নিজস্ব স্বীকৃতিটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া সঙ্গত হবে। ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্ম কালে সমর মন্ত্রীর কাছে পেশ-করা রিপোর্টে তিনি জানান: 'যুদ্ধের শুরু

* গল, শার্ল দ্য। সামরিক স্মৃতিকথা। খণ্ড ১। — মস্কো, ১৯৫৭, পৃঃ ৬৫৭।

থেকে দেশের জন্য চূড়ান্ত হেতু ছিল সময়...। এই সময় আমরা পেয়েছি সোভিয়েত জনগণের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের কল্যাণে।'

বুর্জোয়া রাজনীতিবিদ ও ইতিহাসবিদরা প্রায়ই ফ্যাসিস্ট জার্মানিকে পরাস্তকরণের ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নে লেন্ড-লিজ ব্যবস্থা অনুযায়ী মার্কিন সামরিক সরবরাহের তাৎপর্যকে বাড়িয়ে দেখায়। লেন্ড-লিজ ব্যবস্থার অন্তর্গত সরবরাহের কথা সোভিয়েত মানুষের ভালো মনে আছে এবং তারা এটাকে উচ্চ মূল্য দেয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সোভিয়েত অস্ত্র উৎপাদনের তুলনায় এই সরবরাহ ছিল মোট ৪ শতাংশ মাত্র।

আমেরিকান সরকারী তথ্য অনুসারে, যুদ্ধ চলাকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রেরিত হয়েছিল ১৪,৪৫০টি বিমান ও প্রায় ৭,০০০ ট্যাঙ্ক; ইংলন্ড থেকে (১৯৪৪ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত) — ৩,৩৮৪টি বিমান ও ৯,২৯২টি ট্যাঙ্ক; কানাডা থেকে এসেছিল ১,১১৮টি ট্যাঙ্ক। অথচ সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধের শেষ তিন বছর ধরে প্রতি বছরে উৎপাদন করছিল ৩০ সহস্রাধিক ট্যাঙ্ক আর সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গান এবং ৪০ হাজারের মতো বিমান। আর লেন্ড-লিজের অন্তর্গত সরবরাহের বছরগুলোতে সোভিয়েত ইউনিয়ন সব মিলিয়ে উৎপাদন করেছিল ৪ লক্ষ ৮৮ হাজার তোপ, ১ লক্ষ ৪ হাজার ট্যাঙ্ক ও সেলফ-প্রপেল্ড অ্যাসল্ট গান, ১ লক্ষ ৩৭ হাজার বিমান। অতএব দেখা যাচ্ছে যে বিজয়ের প্রকৃত অস্ত্রাগার নির্মিত হয়েছিল সোভিয়েত জনগণের আত্মোৎসর্গী শ্রমের দ্বারা। স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ. রুজভেল্টও সে কথা বলেছিলেন: 'আমরা কখনও এটা ভাবি নি যে লেন্ড-লিজ ব্যবস্থার অন্তর্গত সরবরাহই হিটলারের পরাজয়ে প্রধান ফ্যাক্টর ছিল। বিজয় অর্জন করেছে লাল ফৌজের যোদ্ধারা যারা অভিন্ন শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামে নিজের রক্ত ও জীবন দান করেছে।*

যুদ্ধের বছরগুলোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে লেন্ড-লিজ ব্যবস্থার অন্তর্গত বিদেশে সরবরাহের মোট মূল্য ছিল ৪,৬০০ কোটি ডলারের বেশি। তার মধ্যে ব্রিটেন পেয়েছিল ৩,০০০ কোটি ডলারের বেশি, অর্থাৎ সমগ্র সাহায্যের তিন-পঞ্চমাংশেরও অধিক।

লেন্ড-লিজ অনুসারে সরবরাহের বিষয়ে ১৯৪২ সালের ১১ জুলাই

* Sherwood R. Roosevelt and Hopkins. An Intimate History. — New York, 1950, p. 897.

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করার পর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রাপ্ত সরবরাহের মোট মূল্য ছিল প্রায় ১,০০০ কোটি ডলার। সেই সঙ্গে খোদ আমেরিকানদের পক্ষে তখন লেণ্ড-লিজের বিপুল গুরুত্ব ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এর তাৎপর্য মূল্যায়ন করতে গিয়ে মার্কিন সরকারী প্রতিনিধিরা এই স্বীকার করতে বাধ্য হন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে লেণ্ড-লিজ ছিল হিটলারবিরোধী জোটের সামরিক প্রয়াসে অংশগ্রহণের অনিবার্য ও লাভজনক একটি রূপ। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান বলেছিলেন: 'লেণ্ড-লিজে ব্যয়িত অর্থ নিঃসন্দেহেই বহু আমেরিকানের প্রাণ রক্ষা করেছে। লেণ্ড-লিজ অনুসারে সাজসরঞ্জাম প্রাপ্ত প্রতিটি রুশ, ইংরেজ অথবা অস্ট্রেলীয় সৈনিক যুদ্ধে গিয়ে আমাদের নিজস্ব যুব সম্প্রদায়ের পক্ষে আনুপাতিকভাবে সামরিক বিপদ হ্রাস করেছে।'

বুর্জোয়া ভাবাদর্শীরা গত যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাকে সর্বোপায়ে অতিরঞ্জিত করে বর্তমানে পৃথিবীতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের 'নেতৃ অবস্থানের' দাবিগুলো সমর্থনের উদ্দেশ্যে। ১৯৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'ইউ. এস. নিউজ এণ্ড ওয়ার্ল্ড্ রিপোর্ট' পত্রিকাই লিখেছিল যে বিগত যুদ্ধে আমেরিকার 'ক্ষমতা', মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক 'বিজয়ের স্থপতির' ভূমিকা পালন নাকি আমেরিকাকে যুদ্ধের পরে নিজের ঘাড়ে 'সমগ্র বিশ্বের দায়িত্ব' তুলে নিতে প্রস্তুত করেছে।

ফ্যাসিস্ট জার্মানি এবং সমরবাদী জাপানের পরাজয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবদান ছিল নির্ধারক। সে আজও হচ্ছে যুদ্ধ ও আগ্রাসনের শক্তিসমূহের পথে প্রবল এক প্রতিবন্ধক, শান্তি ও জাতিসমূহের নিরাপত্তার নির্ভরযোগ্য রক্ষক।

৩। সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর মুক্তি মিশন

যুদ্ধের সময় সোভিয়েত জনগণ ও সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী কেবল সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমির মুক্তি আর স্বাধীনতার জন্যই সংগ্রাম করে নি, তারা ঐতিহাসিক মুক্তি মিশনও সম্পন্ন করেছিল — ইউরোপ এবং এশিয়ার জাতিসমূহকে তাদের মুক্তি ও স্বাধীনতার ন্যায্য সংগ্রামে সহায়তা জুগিয়েছে, নিজের আন্তর্জাতিকতাবাদী কর্তব্য পালন করেছে।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের বিজয়ের দিন থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকার যে আন্তর্জাতিকতাবাদী

নীতি অনুসরণ করছেন মহান মুক্তি মিশনটি ছিল তারই স্বাভাবিক ও সঙ্গত ধারাবাহিকতা। এই আন্তর্জাতিকতাবাদী নীতির মূলে রয়েছে সোভিয়েত দেশের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভাবাদর্শ।

জার্মান ফ্যাসিজম এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ইউরোপীয় ও এশীয় জাতিসমূহের মুক্তির জন্য সংগ্রাম সোভিয়েত ইউনিয়ন আরম্ভ করেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নামার প্রথম দিনগুলো থেকেই এবং অবিশ্বাস্য রকমের জটিল সামরিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনের রাষ্ট্রনেতা ও সামরিক কর্তারা তখন কেবল ইউরোপেরই নয়, অন্যান্য মহাদেশের জাতিসমূহের পক্ষেও বাস্তব হুমকির অস্তিত্ব স্বীকার করেছিলেন। ১৯৪১ সালের ২৭ মে তারিখে মার্কিন জনগণের প্রতি এক আবেদনে প্রেসিডেন্ট ফ. রুজভেল্ট সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে লাতিন আমেরিকা বিজয়ের পর নাৎসিরা 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা ডোমিনিয়ন দখলের কথা ভাবছে'।

ওই দিনগুলোতে, যখন বারেনৎস সাগর থেকে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল রণাঙ্গনে সোভিয়েত সৈন্যরা হিটলারী জোটের বাহিনীগুলোর সঙ্গে এক সুবিপুল সংগ্রামে লিপ্ত ছিল, তখন 'ওয়াশিংটন পোস্ট' সংবাদপত্র লিখেছিল: 'আক্রমণরত জার্মান ফৌজের আঘাতে লাল ফৌজ যদি বিধ্বস্ত হয়ে যেত, রুশ জনগণ যদি কম সাহসী ও নির্ভীক হত তাহলে কী ঘটত সে কথা ভাবতেই গা শিউরে উঠে।... এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে রুশেরা একই সঙ্গে মানবজাতির সমস্ত শত্রুর কবল থেকে সভ্যতাকে রক্ষা করছিল। তারা সকলের সংগ্রামে এমন এক অবদান রেখেছে যা তাৎপর্যের দিক থেকে অভূতপূর্ব'।

সোভিয়েত জনগণ ও তাদের সশস্ত্র বাহিনীর সংগ্রামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্পষ্টরূপে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছিল যুদ্ধের প্রথম দিনগুলোতেই — সোভিয়েত ইউনিয়নের গণ-কমিশার পরিষদ ও সারা-ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৪১ সালের ২৯ জুনের নির্দেশে এবং প্রতিরক্ষা পরিষদের চেয়ারম্যান ই. স্তালিনের ১৯৪১ সালের ৩ জুলাইয়ের বেতার ভাষণে। কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত সরকারের তরফ থেকে তিনি ঘোষণা করেন যে 'ফ্যাসিস্ট নির্যাতকদের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক সর্বজনীন যুদ্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবল আমাদের দেশের উপর ঘনিয়ে আসা বিপদ দূর করাই নয়, জার্মান ফ্যাসিজমের কবলে পতিত ইউরোপের সমস্ত জাতিকে সহায়তা দান করাও',

এবং 'এই মুক্তি যুদ্ধে আমরা একা থাকব না। এই মহাযুদ্ধে আমাদের বিশ্বস্ত মিত্র হবে ইউরোপ এবং আমেরিকার জাতিসমূহ, নাৎসি সর্দারদের দ্বারা দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ জার্মান জনগণও।'*

সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় সীমারেখায় পৌঁছার পর সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ ও সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কমণ্ডলী থেকে এই মর্মে কিছু কড়া নির্দেশ পেল যে তারা যেন মুক্তিপ্রাপ্ত রাষ্ট্রসমূহের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে, ওই রাষ্ট্রসমূহের জনগণকে যেন তাদের নিজেদের ইচ্ছা মতো আপন ভাগ্য নির্ধারণ করার অধিকার দেয়। এই নির্দেশগুলোর ভিত্তিতে ছিল ফ্যাসিজম কবলিত ইউরোপের জাতিসমূহকে মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য তাদের ন্যায্য সংগ্রামে সহায়তা দানের কর্মসূচিটি। এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী পুরোপুরিভাবে প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের ভাবধারা অনুসরণ করে চলছিল। এই ভাবধারাসমূহের প্রতি তারা সর্বদাই ছিল অনুগত।

সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনী পুরোপুরিভাবে অথবা আংশিকভাবে মুক্ত করে ইউরোপের ১০টি এবং এশিয়ার ২টি দেশের ভূখণ্ড। ওগুলোর মোট আয়তন ছিল ২৫ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার ও লোক সংখ্যা — ১০ কোটির বেশি। ইউরোপের দেশগুলো মুক্ত করার সময় সোভিয়েত সৈন্যরা ওখানকার কলকারখানা, ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ, শহর ও গ্রামগুলোকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। যেমন, পোল্যাণ্ড মুক্তকরণের সময় সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী ক্রাকোভ শহর ও সাইলেসীয় শিল্পাঞ্চলকে ধ্বংস হতে দেয় নি, আর চেকোস্লোভাকিয়া মুক্তকরণের সময় তারা ওস্ত্রাভা শিল্পাঞ্চল ও প্রাগ নগরীকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এখানে এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে ইঙ্গো-মার্কিন সেনাপতিমণ্ডলী কিন্তু তাঁদের সামরিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনার সময় শান্তিপূর্ণ শহর ও ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধসমূহ রক্ষার কথা ভাবেন নি। তার প্রমাণ দেয় ড্রেসডেন, সোফিয়া ও অন্যান্য শহরের উপর ইঙ্গো-মার্কিন বিমান বাহিনীর বর্বরোচিত হামলা। অথচ এই সমস্ত আঘাত হানার পেছনে সামরিক প্রয়োজনীয়তা ছিল না। ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে

* স্তালিন ই.। সোভিয়েত ইউনিয়নের দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধ প্রসঙ্গে। ৫ম সংস্করণ। — মস্কো, ১৯৪৮, পৃঃ ১৬।

জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরের উপর পারমাণবিক বোমাবর্ষণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানবজাতির বিরুদ্ধে এক অদৃষ্টপূর্ব অপরাধ করে। পারমাণবিক বোমাবর্ষণের ফলে শহরগুলো বাসিন্দা সমেত ধ্বংস হয়ে যায়।

জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজগুলোর বিরুদ্ধে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়ছিল পোলিশ, চেকোস্লোভাক, যুগোস্লাভ, বুলগেরীয় ও রুমানীয় ফর্ম্যাশনগুলো, কয়েকটি হাঙ্গেরীয় স্বেচ্ছাসেবী সাব-ইউনিট, ফরাসি বিমান রেজিমেণ্ট। দূর প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদী জাপানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সোভিয়েত ফৌজে থেকে সামরিক ক্রিয়াকলাপ চালাচ্ছিল মঙ্গোলীয় গণ-বাহিনী। ইউরোপ ও এশিয়ার অনেকগুলো দেশের সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর নিবিড় সহযোগিতার ভিত্তিতে ছিল সোভিয়েত জনগণের দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের মুক্তিদায়ক চরিত্র এবং সোভিয়েত জনগণ আর মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য জার্মান ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত জাতিসমূহের স্বার্থ ও লক্ষ্যের অভিন্নতা।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার সশস্ত্র বাহিনী ফ্যাসিজমের কবল থেকে খোদ জার্মান জনগণকেও মুক্ত করে। সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী জার্মানিতে প্রবেশ করে দিগ্বিজয়ী অথবা প্রতিহিংসক হিশেবে নয়, মুক্তিদাতা বাহিনী হিশেবে, যার উদ্দেশ্য ছিল ফ্যাসিজম নির্মূল করা, সমরবাদ ধ্বংস করা ও ইউরোপে শান্তি সুনিশ্চিত করা। এবং জার্মানরা স্বচক্ষে তা দেখতে পায়।

ইউরোপের জাতিগুলোকে মুক্ত করার জন্য সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীকে বিপুল শক্তি নিয়োগ করতে ও প্রচুর প্রাণ দিতে হয়েছিল। রুমানিয়ার ভূখণ্ডে লড়াইয়ে নিহত হয় ৬৯ হাজার, পোল্যাণ্ডে — প্রায় ৬ লক্ষ, চেকোস্লোভাকিয়ায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার, হাঙ্গেরিতে — ১ লক্ষ ৪০ হাজার, জার্মানিতে — ১ লক্ষ ২ সহস্রাধিক সোভিয়েত সৈন্য। ইউরোপের দেশগুলোতে সর্বমোট ১০ লক্ষাধিক সোভিয়েত সৈনিক ও অফিসার প্রাণ দিয়েছে।

মুক্তিপ্রাপ্ত দেশসমূহের মেহনতীরা মুক্তিদাতা সোভিয়েত যোদ্ধাদের বীরকীর্তির কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। এই যোদ্ধাদের সম্মানে তারা গড়েছে অসংখ্য স্মারকস্তম্ভ, মনুমেণ্ট; বহু রাস্তা, স্কোয়ার, কলকারখানা আর স্কুল বহন করছে তাদের নাম। হাজার হাজার সোভিয়েত সৈনিক ও অফিসার ভূষিত হয়েছে বিদেশী অর্ডার আর পদকে।

জার্মান-ফ্যাসিস্ট নির্যাতনের কবল থেকে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী

কর্তৃক মুক্ত রাষ্ট্রসমূহের জাতিগুলো সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল এবং করছে। চেকোস্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক গুস্তাভ হুসাক বলেন, 'চেকোস্লোভাকিয়ার মুক্তির জন্য লড়াইয়ে সোভিয়েত মানুষ যে আত্মাহুতি দিয়েছে তার কথা আমাদের জনগণ চিরকাল কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে।'*

বুলগেরীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক গণ-প্রজাতন্ত্রী বুলগেরিয়ার রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতি তদোর জিভকভ বলেন: 'বুলগেরিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিজয় লাভ করেছে সোভিয়েত ইউনিয়নের চূড়ান্ত সহায়তায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের উদাহরণ অনুসরণ করে এবং তার নিরবচ্ছিন্ন উদার ও নিঃস্বার্থ সাহায্যের কল্যাণে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বুলগেরিয়া তার শতাব্দীর অনগ্রসরতার অবসান ঘটিয়েছে এবং বিকাশশীল শিল্প-কৃষি প্রধান সমাজতান্ত্রিক দেশে রূপান্তরিত হয়েছে।'**

১৯৭৯ সালের অক্টোবর মাসে উদ্‌যাপিত হয় জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ৩০তম বার্ষিকী। তখন যুদ্ধের বছরগুলোর ঘটনাবলি ও জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের আজকের দিনগুলোর কথা বলতে গিয়ে জার্মানির সমাজতান্ত্রিক ঐক্য পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদক এরিখ হনেক্কের জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জনগণের তরফ থেকে ঘোষণা করেন: 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারবিরোধী জোটের চূড়ান্ত ফ্রন্টে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে নিজের বিজয়ের দ্বারা, নিজের অমর মুক্তিদায়ক বীরোচিত কীর্তির দ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের জনগণের জন্যও সুখী ভবিষ্যতের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। আমরা চিরকাল সোভিয়েত দেশের সেই ২ কোটি সন্তানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব যারা এর জন্য জীবন বিসর্জন দিয়েছে।'***

ফ্যাসিস্টদের 'নতুন ব্যবস্থার' তিক্ত অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত অন্যান্য ইউরোপীয়

জাতিও মুক্তিদাতা সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে। ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে শার্ল দ্য গল বলেছিলেন: 'ফরাসিরা জানে সোভিয়েত রাশিয়া তাদের জন্য কী করেছে এবং জানে যে এই সোভিয়েত রাশিয়াই তাদের মুক্তিলাভে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে।'*

ঐতিহাসিক বিজয় অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ এক হেতু ছিল ইউরোপের দেশগুলোতে প্রতিরোধ আন্দোলনের শক্তিসমূহের সঙ্গে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর সামরিক সহযোগিতা। সেই সহযোগিতা সর্বোচ্চ ধাপে উন্নীত হয় ১৯৪৪ সালে, যখন ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর অনুরোধে অনেকগুলো সোভিয়েত পার্টিজান ফর্ম্যাশন মাতৃভূমির সীমানার বাইরে সামরিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হয়। যেমন, ১৯৪৪ সালের বসন্ত কালে পোল্যাণ্ডের মাটিতে লড়ছিল সোভিয়েত পার্টিজানদের ১০টিরও বেশি ফর্ম্যাশন ও দল। স্লোভাকিয়ার গণ অভ্যুত্থানের সাহায্যার্থে এগিয়ে গিয়েছিল ১০টি সোভিয়েত পার্টিজান ফর্ম্যাশন ও দল। সেই সঙ্গে চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, রুমানিয়া ও অন্যান্য দেশে প্রেরিত হয়েছিল অভিজ্ঞ পার্টিজানদের নিয়ে গঠিত গ্রুপ আর দলগুলো, যারা ওই সমস্ত দেশে জাতীয় পার্টিজান আন্দোলন বিকাশে সহায়তা করেছে।

ইউরোপের দেশগুলোতে প্রতিরোধ আন্দোলনকে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে-সহায়তা দান করে তার বিপুল সামরিক ও নৈতিক তাৎপর্য ছিল। সোভিয়েত সৈন্যদের বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সহায়তা লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষকে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছে, তাদের মনে শক্তি যুগিয়েছে এবং বিজয়ে দৃঢ় বিশ্বাস জাগিয়েছে।

ফ্যাসিজমকে প্রতিরোধ দানকারী শক্তিসমূহকে সোভিয়েত ইউনিয়ন যথেষ্ট সাহায্য দিলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডের শাসক মহলগুলো কিন্তু মুক্তি আন্দোলনের ব্যাপকতা হ্রাস করতে চেষ্টা করছিল। তারা স্বদেশপ্রেমিকদের জন্য অস্ত্র সরবরাহের পরিমাণ কমিয়ে দিল এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ নিজেদের স্বার্থাধীন করতে চেষ্টা করত। যেমন, এরূপ একটা ঘটনা এর প্রমাণ দেয়: ১৯৪৪ সালের ১৭ জুলাই চার্চিল জেনারেল এ. দ' আস্তিয়ের সঙ্গে আলাপের সময় তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, তিনি এই মর্মে এমন কোন গ্যারাণ্টি দিতে পারেন কি যে ফরাসিরা প্রাপ্ত অস্ত্র খোদ ইংরেজদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে না এবং জেনারেল আইজেনহাওয়ারের

আদেশ পালন করবে? ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ইতালিতে মিত্র ফৌজের অধিনায়ক ফিল্ডমার্শাল হ্যারল্ড আলেকজাণ্ডার পার্টিজান সৈন্য বাহিনী ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেন। ওই মাসেই ব্রিটিশ ফৌজ চার্চিলের নির্দেশে রাজতন্ত্রী-ফ্যাসিস্ট প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষ নিয়ে গ্রীসের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে।

সমরবাদী জাপানের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ এশীয় জাতিসমূহের বেলায়ও, এবং সর্বাগ্রে চীনের জনগণের ক্ষেত্রে, সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী আন্তর্জাতিকতাবাদী কর্তব্য পালন করেছিল। জাপানী সমরবাদের পরাজয় বিদেশী হানাদারদের নির্যাতন থেকে মুক্ত করেছে কেবল এশিয়ার জাতিসমূহকেই নয়, খোদ জাপানী জনগণকেও সামরিক-ফ্যাসিস্ট একনায়কত্বের কবল থেকে উদ্ধার করেছে।

পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতিসমূহ সাম্রাজ্যবাদী জাপানের পরাজয়ে এবং জাপানী আগ্রাসকদের কবল থেকে তাদের মুক্তিলাভে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার সৈন্য বাহিনীর বিপুল অবদান স্বীকার করে। কোরিয়া জন-গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী পাইয়েং ইয়াং শহরের কেন্দ্রস্থলে মরানবন টিলার উপরে গৌরবব্যঞ্জিত একটি মনুমেণ্ট রয়েছে যার গায়ে এই কথাগুলো খোদিত আছে: 'জাপানী দাসত্ব থেকে কোরীয় জনগণকে মুক্তিদানকারী ও কোরিয়ার স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা সুনিশ্চিতকারী সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর সৈন্য বাহিনীর গৌরব চিরকাল অক্ষুণ্ন থাকুক। ১৫ আগস্ট, ১৯৪৫ সাল।'

সোভিয়েত ইউনিয়নের মুক্তি মিশনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য মুক্তিপ্রাপ্ত রাষ্ট্রসমূহের সীমানাগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আগেই যেমনটি বলা হয়েছে, সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর বিজয় শান্তি ও সমাজতন্ত্রের অনুকূলে সমগ্র আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে বদলে দেয়। সেই বিজয় ইউরোপ ও এশিয়ার অনেকগুলো দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের জন্য, ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলোতে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

এই ভাবে, বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মুক্তি মিশন সোভিয়েত দেশের প্রতিষ্ঠাতা লেনিনের কথাগুলোর সত্যতা প্রমাণ করে: 'আমরা কোনকিছুর প্রতি ও কারো প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করি নি, একটা মিথ্যাও প্রশংসন করি নি ও গোপন রাখি নি, একটি বন্ধু ও সাথীকেও বিপদের সময়

যাকিছু দিয়ে পেরেছি এবং আমাদের কাছে যাকিছু ছিল তা দিয়ে সাহায্য করতে পিছপা হই নি।'*

ভারতের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের ব্যাপারে লেনিনের অন্তিম নির্দেশটি পালন করে সোভিয়েত জনগণ ভারতে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনকে সর্বপ্রকার সমর্থন জুগিয়েছে। অন্য দিকে ভারতীয়রা সোভিয়েত দেশের প্রতি সর্বদা মৈত্রী ও সংহতির অনুভূতি পোষণ করেছে। এখানে এই সমস্ত অনুভূতির একটি হৃদয়স্পর্শী উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ১৯৪৩ সালে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত স্তালিনগ্রাদে কলকাতা থেকে এসেছিল অনেকগুলো তাঁবু, যা তৈরি করেছিল ভারতীয় মেহনতীরা। ১৯৮১ সালের ২২ জুন ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতি কর্তৃক সোভিয়েত জনগণের উদ্দেশে প্রেরিত এক অভিনন্দন বার্তায় বলা হয়: 'সোভিয়েত জনগণের কাছে, এবং বিশেষ করে স্তালিনগ্রাদের রক্ষকদের কাছে আমরা ভারতীয়রা যে কত ঋণী তা কখনও ভুলব না। তারা নিজেদের তুলনাহীন সাহসিকতা ও আত্মোৎসর্গের দ্বারা নাৎসি দস্যুদের পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করে এবং আমাদের পবিত্র মাটিতে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের শক্তিসমূহের সঙ্গে হিটলারের মিলিত হওয়ার পরিকল্পনাটি বানচাল করে দেয়।'

৪। এ শিক্ষা ভোলা উচিত নয়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে অনেক দিন আগে, কিন্তু তা আজও বহু দেশের রাজনীতিজ্ঞ, রাষ্ট্রনেতা, সামরিক কর্মী, ইতিহাসবিদ, অর্থনীতিবিদ ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের এবং বিশ্ব জনসমাজের ব্যাপক স্তরের মানুষের গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে প্রকাশিত হয়েছে অনেক বড় বড় বই, স্মৃতিকথা, দলিলাদির সংকলন, লেখা হয়েছে অসংখ্য প্রবন্ধ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অনেকগুলো পুঁজিতান্ত্রিক দেশে যুদ্ধের কারণ, চরিত্র, ফলাফল ও শিক্ষাকে খুবই অমার্জিতভাবে বিকৃত করা হয়। অথচ আসলে এই জিনিসগুলোরই গভীর ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ প্রয়োজন, এই জিনিসগুলোই সর্বদা মনে রাখা উচিত।

তাহলে বিগত যুদ্ধের প্রধান শিক্ষাগুলো কী রূপ?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের প্রথম ও প্রধান শিক্ষাটি হচ্ছে — ফ্যাসিস্ট জার্মানি এবং সমরবাদী জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয়ের নিয়মানুবর্তিতা।

বুর্জোয়া ইতিহাসবিদ ও সামরিক কর্মীরা (বিশেষ করে মার-খাওয়া ফ্যাসিস্ট জেনারেলরা) ফ্যাসিস্ট জোটের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয়কে আপাতিক ঘটনা হিশেবে, সোভিয়েত দেশের বিশাল আয়তন, রুশ শীত, পথাভাব, হিটলারের ভুল ইত্যাদির ফল হিশেবে দেখাতে চেষ্টা করে। এ সমস্ত কিছুই সম্পূর্ণ মিথ্যা। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের ঐতিহাসিক বিজয় — সর্বাগ্রে এ হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবল জীবনী শক্তির শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। যুদ্ধে সোভিয়েত জনগণ মহাবিজয় লাভ করে, এবং তার কারণটি হচ্ছে এই যে সমাজতন্ত্র সমগ্র সোভিয়েত সমাজের অবিনাশী ঐক্য সুনিশ্চিত করেছে, তার অর্থনীতিকে অভূতপূর্ব শক্তি জুগিয়েছে, সমর বিজ্ঞানের ব্যাপক বিকাশ ঘটিয়েছে, চমৎকার যোদ্ধা ও সেনাপতিদের গড়েছে। যুদ্ধ সুস্পষ্টরূপে দেখিয়ে দিয়েছে যে পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যে সমাজতন্ত্র ধ্বংস করতে পারে, নিজের সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমির প্রতি বিশ্বস্ত জনগণকে নতজানু করতে পারে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার বিপুল শ্রেষ্ঠতা, পরিকল্পনাভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠতা সোভিয়েত সরকারকে দেশের জনগণের আত্মোৎসর্গী শ্রমের উপর নির্ভর করে অধিকতম ফলপ্রসূভাবে নিজের সমস্ত মজুদ ক্ষমতা ও সুযোগ-সম্ভাবনা কাজে লাগাতে এবং অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক সাজসরঞ্জাম উৎপাদনে ফ্যাসিস্ট জার্মানিকে ছাড়িয়ে যেতে, সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক বিজয় লাভ করতে সাহায্য করেছে।

দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধ — এ হচ্ছে রণাঙ্গনে এবং দেশাভ্যন্তরে সোভিয়েত মানুষের অদৃষ্টপূর্ব বীরত্বের ইতিবৃত্ত। সারা পৃথিবী জানে ব্রেস্ত দুর্গ, ওদেসা, সেভাস্তপোল ও লেনিনগ্রাদ রক্ষাকারীদের কঠোর দৃঢ়তা। মস্কো ও স্তালিনগ্রাদের উপকণ্ঠে, ককেশাসে ও কুর্স্কের বাঁকে ঐতিহাসিক লড়াইগুলোতে, ১৯৪৪ ও ১৯৪৫ সালের চমৎকার অপারেশনগুলোতে সোভিয়েত যোদ্ধারা অপরিসীম বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল।

কোন্ উৎস থেকে সোভিয়েত মানুষ এই বিপুল শক্তি সংগ্রহ করছিল? সর্বাগ্রে তা হচ্ছে তাদের উচ্চ ভাবাদর্শ, সোভিয়েত মাতৃভূমির

প্রতি নিঃস্বার্থ আনুগত্য, শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ে, কমিউনিজমের বিজয়ে দৃঢ় বিশ্বাস।

গত যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয় নির্ধারক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল হিটলারের ভের্মাখ্‌টের যুদ্ধ-কৌশলের চেয়ে সোভিয়েত যুদ্ধ-কৌশলের শ্রেষ্ঠতা, মিলিটারি অপারেশন পরিচালনার ক্ষেত্রে সেনাপতি ও রাজনৈতিক কর্মীদের উচ্চ দক্ষতা। এর প্রমাণ — জটিল সামরিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পরিচালিত সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর অপূর্ব অপারেশনগুলো। মস্কোর উপকণ্ঠের লড়াইয়ে বিধ্বস্ত হয়েছিল জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের বৃহৎ একটি গ্রুপিং, যদিও ওখানে জনবলে ও অস্ত্রশস্ত্রে শত্রুর শ্রেষ্ঠতা ছিল; স্তালিনগ্রাদের লড়াইয়ে অবরুদ্ধ ও বিধ্বস্ত হয়েছিল শত্রুর ৩ লক্ষ ৩০ হাজার সৈন্যের একটি গ্রুপিং, যেখানে উভয় পক্ষের শক্তি বস্তুত পক্ষে সমানই ছিল; এবং সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর পরের অপারেশন-গুলোর বৈশিষ্ট্য ছিল: লক্ষ্যার্জনে দৃঢ়তা, বিরাট ব্যাপকতা, পরিকল্পনার গভীরতা ও তা বাস্তবায়নে স্পষ্টতা, সৈন্য চলাচলের নৈপুণ্য এবং সৈন্য পরিচালনার দক্ষতা।

ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয় — এ হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক সামরিক সংগঠনের বিজয়, এ হচ্ছে ফ্যাসিস্ট জার্মানির সমর বিজ্ঞান ও যুদ্ধ-কৌশলের বিরুদ্ধে সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনী, সোভিয়েত সমর বিজ্ঞান ও যুদ্ধ-কৌশলের বিজয়।

নাৎসি জেনারেল এবং অন্যান্য বুর্জোয়া ব্যক্তিবর্গ সোভিয়েত সমর বিজ্ঞান ও সোভিয়েত যুদ্ধ-কৌশলের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে নুরেমবার্গ মোকদ্দমা চলার সময় গেরিঙয়ের উকিল আদালতে এই মর্মে একটি শ্লেষাত্মক মন্তব্য করেছিল যে বন্দী দশায় ফিল্ড মার্শাল পাউলুস নাকি সোভিয়েত সামরিক আকাদেমিতে রণনীতি সম্পর্কে লেকচার দিয়েছিল। এর জবাবে পাউলুস বলে: 'সোভিয়েত স্ট্র্যাটেজি আমাদের স্ট্র্যাটেজির চেয়ে এত বেশি উন্নত যে ওখানে এমনকি নিম্নতর অফিসারদের স্কুলেও আমার শিক্ষকতায় রুশদের প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ — ভোলগা তীরের লড়াইয়ের পরিণাম, যার ফলে আমি বন্দী হই এবং এই সব মহাশয়রাও এখন এখানে বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে।'*

আমেরিকান প্রাবন্ধিক ইনগেরসল তাঁর 'সম্পূর্ণ গোপনীয়' বইয়ে লিখেছেন: 'লোকে যেভাবে দাবার বোর্ডের দিকে তাকায় রুশরা ঠিক সেই ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে তাকাত: তারা আগে থেকেই অনেকগুলো চাল বিবেচনা করে রাখত এবং জার্মানদের সব সময় শক্তি স্থানান্তরিত করতে বাধ্য করত যাতে বল্টিক থেকে ডানিয়ুবের মোহানা পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল দাবা বোর্ডের কখনও এখানে কখনও ওখানে ওদের আক্রমণাভিযান প্রতিহত করতে পারে। এই বোর্ডে কী ঘটছিল তা বোঝার ব্যাপারে রুশদের সঙ্গে জার্মানদের কোন তুলনাই ছিল না।'*

সোভিয়েত জনগণ ও তাদের সৈন্য বাহিনী নাৎসি জার্মানি ও তার মিত্রদের অতি শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করে, অন্যান্য দেশ ও মহাদেশের দিকে আগ্রাসকের পথ রোধ করে দেয়। ইতিহাস আবারও স্পষ্টরূপে প্রমাণ করল যে সাম্রাজ্যবাদের সামরিক হঠকারিতা এবং তার আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপের ফল শেষ পর্যন্ত তাকে নিজেকেই ভোগ করতে হয়।

যুদ্ধের দ্বিতীয় — কিন্তু কোনোমতেই গৌণ নয় — গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটি হচ্ছে এই যে যুদ্ধ তার প্রকৃত অপরাধী আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের আসল স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে এবং সারা দুনিয়ার জাতিসমূহকে সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী শক্তিসমূহকে দমনের জন্য, নতুন ও আরও বেশি রক্তক্ষয়ী ও ধ্বংসকারী বিশ্বযুদ্ধ এড়ানোর জন্য, পৃথিবীতে দৃঢ় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চূড়ান্ত সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছে।

বুর্জোয়া ভাবাদর্শীরা যুদ্ধের প্রকৃত অপরাধীদের বিষয়ে ও যুদ্ধের কারণসমূহ সম্পর্কে সত্য কথাগুলো লুকানোর যতই চেষ্টা করুক না কেন বিভিন্ন তথ্য আর দলিলাদি কিন্তু এই সাক্ষ্যই বহন করছে যে পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদীরাই ফ্যাসিস্ট জার্মানিকে লালনপালন করেছিল সমাজতন্ত্রের প্রথম দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তার আক্রমণাভিযান চালিত করার আশায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলন্ড ও ফ্রান্সের ঋণ ব্যতিরেকে, তাদের প্রযুক্তিগত সহায়তা ব্যতিরেকে, তাদের মিউনিখ পলিসি ব্যতিরেকে ফ্যাসিস্ট জার্মানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধাতে পারত না।

* ইনগেরসল র.। সম্পূর্ণ গোপনীয়। ইংরেজী থেকে অনুবাদ। — মস্কো: বিদেশী সাহিত্য প্রকাশনালয়, ১৯৪৭, পৃঃ ৪১৮।

এবং যুদ্ধ চলাকালে, সামরিক সহযোগিতা বিষয়ক চুক্তি থাকা সত্ত্বেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলতে দেরি করছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে দুর্বল করে তোলার নীতি অনুসরণ করছিল যাতে পরে ফ্যাসিস্ট জার্মানি বিজিত হওয়ার পর যুদ্ধোত্তর পৃথিবী গঠনের নিজস্ব শর্ত চাপানো যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলন্ড যেখানে যুদ্ধ দীর্ঘ করার এবং জার্মান-ফ্যাসিস্ট হানাদারদের কবল থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েকটি দেশে প্রতিক্রিয়াশীল শাসন ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার নীতি অনুসরণ করছিল, সেখানে সোভিয়েত ইউনিয়ন মিত্র হিশেবে তার সমস্ত দায়িত্ব সততার সঙ্গে পালন করছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শিক্ষাগুলো পরিষ্কার দেখিয়ে দিয়েছে যে চিরকালের যুদ্ধের উৎস সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট সামরিক হুমকির সঙ্গে লড়া প্রয়োজন স্থায়ীভাবে, অটলভাবে ও দৃঢ়তার সঙ্গে। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা সমস্ত শান্তিকামী মানুষকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদীদের সামরিক প্রস্তুতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে, যথা সময়ে তাদের সম্প্রসারণবাদী, আধিপত্যবিস্তারবাদী প্রচেষ্টা রুখতে এবং আগ্রাসককে দমন করার জন্য ব্যবস্থাদি অবলম্বন করতে উদ্বুদ্ধ করছে।

তৃতীয় শিক্ষা — এবং এটা নিঃসারিত হচ্ছে পূর্বোক্তটি থেকে — সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনমূলক পরিকল্পনা আর চক্রান্তের ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলছে। যুদ্ধ বাধিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা ওগুলোর রাজনৈতিক সারমর্ম ও অর্থনৈতিক বনিয়াদকে ছদ্মাবরণ পরায়, ওগুলোর প্রকৃত কারণ ও উদ্দেশ্য গোপন রাখে, এবং এর জন্য নানা প্রকারের রাজনৈতিক ছলচাতুরীর, নিজ নিজ দেশের জনগণকে ও বিশ্ব জনমতকে প্রতারণার আশ্রয় নেয়।

যেমন, জার্মান ফ্যাসিজম তার বিশ্বাধিপত্য লাভের আগ্রাসী পরিকল্পনাগুলোর সমর্থনে যে-সমস্ত 'যুক্তি' দেখিয়েছিল তা হল: জার্মানির 'বেঁচে থাকার পক্ষে কম জায়গা', 'কমিউনিস্ট বিপদ'। সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ ও আকস্মিক আক্রমণের সমর্থনে হিটলারীরা বলত যে তার নাকি প্রয়োজন ছিল আত্মরক্ষামূলক আঘাত হানার জন্য, — তারা নাকি সোভিয়েত ইউনিয়নের আক্রমণ প্রতিহত করছিল। সমরবাদী জাপানও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করেই প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকান সামরিক নৌ-ঘাঁটি পার্ল হার্বারের উপর আকস্মিকভাবে প্রবল আঘাত হানে।

যুদ্ধোত্তর পর্বেও সাম্রাজ্যবাদীরা এই সমস্ত বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ পদ্ধতি কাজে লাগিয়েছিল। যেমন, ১৯৫৬ সালে মিশরের বিরুদ্ধে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইসরায়েল আক্রমণ আরম্ভ করেছিল সুয়েজ খালে নাকি জাহাজ চলাচলের 'স্বাধীনতা' রক্ষার উদ্দেশ্যে, অথচ আসলে কেউ-ই সে স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন উত্তর ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধায় তখন দক্ষিণ ভিয়েৎনামী জনগণের 'স্বাধীনতা রক্ষার' বিষয়ে যে মার্কিন স্লোগান শোনা যাচ্ছিল তা আগাগোড়া মিথ্যা ছিল। এই সব রাষ্ট্র সামরিক ক্রিয়াকলাপ শুরু করেছিল যুদ্ধ ঘোষণা না করেই, যাতে আকস্মিকতার হেতুর সুযোগে অল্পকালের মধ্যেই উদ্যোগ নিয়ে চূড়ান্ত ফল লাভ করা যায়।

আজকালকার দিনেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের নিজেদেরই বানানো 'সোভিয়েত সামরিক হুমকি' সম্পর্কিত কাহিনী শুনিয়ে অস্ত্র-প্রতিযোগিতার গতি বৃদ্ধি করে চলেছে। তারা বর্তমান শক্তির অনুপাতকে নিজেদের অনুকূলে পরিবর্তিত করতে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের বিরুদ্ধে সামরিক শ্রেষ্ঠতা লাভ করতে চেষ্টা করছে। এর প্রমাণ হচ্ছে পশ্চিম ইউরোপে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশকে নিশানা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রথম আঘাত হানার উপযোগী নতুন নিউক্লিয়ার অস্ত্র (ব্যালিস্টিক ও ক্রুজ রকেট) স্থাপন।

চতুর্থ শিক্ষাটি হচ্ছে এই যে যুদ্ধ দেখিয়ে দিয়েছে অভিন্ন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্গত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতার কী ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারবিরোধী জোটের ক্রিয়াকলাপই হচ্ছে এরূপ সহযোগিতার উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক উদাহরণ। বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে নিবিড় ও সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা বিকাশের পক্ষে, বিশ্ব পারমাণবিক যুদ্ধ এড়ানোর পক্ষে তার তাৎপর্য আধুনিক পরিস্থিতিতেও কার্যকর।

পঞ্চম শিক্ষা — এ হচ্ছে আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী মহলগুলোর 'শক্তির অবস্থান' থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কথা বলার প্রচেষ্টার ভবিষ্যতহীনতা। সামরিক হঠকারীদের মনে রাখা উচিত যে সোভিয়েত জনগণ ও তাদের সৈন্য বাহিনী যেকোন আক্রমণকারীর হাত থেকে অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্যসমূহ রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সমাজতন্ত্র ও প্রগতি রক্ষার কাজে নিযুক্ত রয়েছে জাতি-

সমূহের শান্তি ও নিরাপত্তার দৃঢ় দুর্গ — ওয়ার্শো চুক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো। এ ব্যাপারটিরও বিশেষ তাৎপর্য আছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে দিয়েছে যে সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্বাধিপত্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়িত হওয়ার নয়। আর বর্তমানে তা আরও বেশি অসম্ভব এই কারণে যে এখন কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নই নয়, সমগ্র বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, প্রবল জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন, কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলন শান্তি, প্রগতি ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পর কেটেছে ৪০ বছর, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদীরা তার ফলাফল ও শিক্ষা থেকে উপযুক্ত কোন সিদ্ধান্ত টানে নি। তারা দ্রুত গতিতে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সামরিক প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে, নতুন নতুন আগ্রাসী জোট গড়ছে এবং পুরনোগুলোকে অধিকতর দৃঢ় করে তুলছে, এশিয়া আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন দমনের জন্য খোলাখুলিভাবে সামরিক শক্তি ব্যবহার করছে।

আগ্রাসী উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গত তিরিশ বছরের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২ শতাধিক বার তার সশস্ত্র বাহিনী ব্যবহার করেছে। সি. আই. এ. এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের গুপ্তচর সংস্থাগুলো প্রগতিশীল শাসন ব্যবস্থা উৎখাতের উদ্দেশ্যে অগণিত ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করে। সামরিক পোশাক পরিহিত প্রতি চতুর্থ আমেরিকান আজ কাজ করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সীমানার বাইরে। মার্কিন পদাতিক বাহিনী, বিমান ও নৌ-বাহিনীগুলোর বিপুল পরিমাণ শক্তি অবস্থিত রয়েছে খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে। এই শক্তিগুলো অন্যান্য রাষ্ট্রের উপর স্থায়ী রাজনৈতিক ও সামরিক চাপ সৃষ্টি করছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল ও শিক্ষার কথা ভোলা উচিত নয়। হুমকি, অর্থনৈতিক অবরোধ কিংবা সামরিক আগ্রাসনের সাহায্যে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের বিকাশকে বিঘ্নিত করার এবং জাতীয় স্বাধীনতা ও সামাজিক ন্যায়পরতার জন্য জাতিসমূহের সংগ্রামে বাধা সৃষ্টি করার যেকোন প্রচেষ্টাই অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর বছরগুলো যথেষ্ট স্পষ্টরূপে দেখিয়ে দিয়েছে: অনুরূপ পদ্ধতিগুলো সাম্রাজ্যবাদীদের উপকারে তো লাগেই না, তা বরং তাদের

আশার বিপরীত ফলই দেয়। কিন্তু, যেমনটি দেখা যাচ্ছে, ইতিহাসের শিক্ষা থেকে সবাই লাভবান হয় নি।

আজ যখন যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নটি বিশেষ জরুরী হয়ে উঠেছে, যখন আন্তর্জাতিক — এবং সর্বাগ্রে মার্কিন — সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন ক্ষমতা তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শোকাত্মক শিক্ষাগুলো উপেক্ষা করলে পরিণামফল খুবই মারাত্মক হতে পারে।

যুদ্ধের আশঙ্কাকে অবহেলা করে অতীতে বিরাট ভুল করা হয়েছিল। সেই ভুলটির পুনরাবৃত্তি হতে দেওয়া উচিত নয়। বহু জাতিকে সেই ভুলের মাশুল দিতে হয়েছে বিপুল পরিমাণ রক্ত দিয়ে, অগণিত প্রাণ দিয়ে। তাদের সইতে হয়েছে অপরিমেয় ক্ষয়ক্ষতি। তা যাতে আর না ঘটে সেই উদ্দেশ্যে এই ধ্রুব সত্যটি মনে রাখা উচিত যে যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়া দরকার তা শুরু হওয়ার আগে। যুদ্ধের হুমকির বিরুদ্ধে বিশ্বজোড়া ব্যাপক আন্দোলনের জন্য, যুদ্ধের সমর্থকদের, সর্বপ্রকার প্রতিশোধকামীদের, নয়া-ফ্যাসিস্টদের এবং তাদের ভাবাদর্শের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য সমস্ত যুদ্ধবিরোধী শক্তির সমাবেশ ঘটানো প্রয়োজন।

ঠিক এই কারণেই যুদ্ধের ফলাফল ও শিক্ষা অধ্যয়ন আর প্রচার, তার উৎপত্তির প্রকৃত কারণসমূহ ও তার সামাজিক-রাজনৈতিক চরিত্র বিশ্লেষণ বিশ্বের সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিকে নতুন যুদ্ধ এড়ানোর জন্য সংগ্রাম করতে সাহায্য করছে।

ভাববাদী অনুমান, ভ্রান্তি, সাজানো মিথ্যা কাহিনী আর কুৎসা দিয়ে বুর্জোয়া ইতিহাসবিদ্যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উৎপত্তির সমস্যাটি ঢেকে রেখেছে। পশ্চিমে বলা হয়ে থাকে যে হিটলারের আগ্রাসী নীতিই ছিল যুদ্ধের প্রধান এবং এমনকি একমাত্র কারণ। হিটলার ও তার নিকটতম সহযোগীরা নাকি যুদ্ধের আগুন লাগিয়েছিল এবং জার্মানি ও তার মিত্রদের পরাজয়ের পথে নিয়ে গিয়েছিল।

বলাই বাহুল্য যে আমরা কঠোর সামরিক অপরাধের জন্য হিটলার ও তার সহযোগীদের দায়িত্ব হ্রাস করতে চাই না। কিন্তু যদি বলা হয় যে কেবল একটি লোকের ক্রিয়াকলাপ ও সিদ্ধান্তই ছিল বিশ্বযুদ্ধের কারণ তাহলে সত্যের অপলাপ করা হবে, — প্রকৃত ইতিহাসের সঙ্গে এ ধরনের

বক্তব্যের কোন যোগাযোগ থাকতে পারে না। যেমন, এই ভাষ্যের রচয়িতারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এরূপ তথ্য গোপন রাখে এবং সে সম্পর্কে নীরব থাকে:

— সাম্রাজ্যবাদ প্রসূত হিটলারিজমকে জার্মান ও আন্তর্জাতিক ধন-কুবেররা পুষেছিল, ক্ষমতাসীন করেছিল ও আপাদমস্তক অস্ত্রসজ্জিত করেছিল প্রধান কমিউনিস্টবিরোধী ও সোভিয়েতবিরোধী শক্তি হিশেবে;

— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তি ঘটে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরে বিশ্বাধিপত্যের জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের সংগ্রামের নীতির পূর্বানুবর্তন হিশেবে এবং প্রথম পর্যায়ে উভয় যুদ্ধরত গ্রুপিংয়ের দিক থেকে তা ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ;

— হিটলারবিরোধী জোটের তরফ থেকে যুদ্ধের চরিত্র ধীরে ধীরে বদলাচ্ছিল সংগ্রামে ব্যাপক মানুষের অংশগ্রহণের ফলে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফ্যাসিস্টবিরোধী ও মুক্তিযুদ্ধে পরিণত হওয়ার প্রধান ও চূড়ান্ত হেতুটি ছিল তাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবেশ।

বুর্জোয়া ভাবাদর্শীরা বিগত যুদ্ধের প্রকৃত কারণ ও রাজনৈতিক চরিত্র ঢেকে ও গোপন রেখে সর্বোপায়ে এটা প্রমাণ করতে চেষ্টা করছে যে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলো নাকি অস্ত্র ধারণ করতে এবং যুদ্ধে নামতে বাধ্য হয়েছিল 'গণতন্ত্রের নিঃস্বার্থ রক্ষক' হিশেবে। এরূপ প্রত্যয় জনমতকে প্রতারিত করতে সাহায্য করে এবং সেই সঙ্গে যুদ্ধপূর্ব বছরগুলোতে ও যুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও অন্যান্য রাষ্ট্রের তৎকালীন সরকারগুলোর কপট ও দুমুখো নীতি সমর্থন করে। এর দ্বারা অনুমোদিত হচ্ছে 'অহস্তক্ষেপের' নীতি ও আগ্রাসককে 'শান্তকরণের' নীতি, প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তাবিত যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা; হিটলারের সঙ্গে মিউনিখ ষড়যন্ত্রকে ন্যায়সঙ্গত বলে প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। ১৯৩৯ সালের সোভিয়েত-জার্মান চুক্তি সম্পাদনের কারণ ও পরিস্থিতি নোংরাভাবে বিকৃত করে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী মহলগুলো ভয়ঙ্কর এই কুৎসা রটাতে আরম্ভ করে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন নাকি নাৎসি জার্মানির সঙ্গে 'চক্রান্তে' লিপ্ত ছিল, এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থ ছিল আর যুদ্ধ বাধার জন্য সে-ও দায়ী। তা করতে গিয়ে তারা এরূপ প্ররোচনামূলক কথাও তুলে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমস্ত কমিউনিস্টরা মোটের উপর যুদ্ধ বাধাতেই আগ্রহী, কেননা 'যুদ্ধ নাকি, লেনিনের কথা মতো, বিপ্লব ডেকে আনে'। এর দ্বারা অতি জঘন্য উপায়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মূল নীতিটি বিকৃত করা

হচ্ছে, আর লেনিনের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে যুদ্ধের মাধ্যমে বিপ্লব 'ডেকে আনার' বিষয়ে বামপন্থী-ত্রৎস্কিবাদী ভাবধারা, অথচ লেনিন নিজেই দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধের সঙ্গে লড়েছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি তাদের সমগ্র ঐতিহাসিক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা, শান্তির জন্য অক্লান্ত সংগ্রামের দ্বারা লেনিনীয় এই থিসিসটিরই সত্যতা প্রমাণ করছে যে 'যুদ্ধ কমিউনিস্টদের পার্টির প্রয়াসের বিরোধী'।* লেনিন বলেন, '...আমরা শান্তির জন্য সমস্তকিছু করতে শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। এবং তা করবই।'** সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি সর্বদা লেনিনের এই নির্দেশটি অনুসরণ করেছে এবং এখনও করছে।

* লেনিন ভ. ই.। সম্পূর্ণ রচনাবলি, খন্ড ৩৬, পৃঃ ৪৭০।

** ঐ, পৃঃ ৩৪৩।

নকশা-মানচিত্রের তালিকা

৮। ১৯৪১-১৯৪২ সালে প্রশান্ত মহাসাগরে এবং এশিয়ায় সামরিক ক্রিয়াকলাপ

৯। কুর্স্কের উপকণ্ঠে লড়াইয়ের সাধারণ গতি (১৯৪৩ সালের জুলাই-আগস্ট)

১০। দক্ষিণ তীরস্থ ইউক্রেন এবং ক্রিমিয়ার মুক্তি (১৯৪৪ সালের জানুয়ারি-মে)

১১। বেলোরুশ অপারেশন (১৯৪৪ সালের জুন-আগস্ট)

১২। সিসিলি দ্বীপে অবতরণ অভিযান (১৯৪৩ সালের ১০ জুলাই-১৭ আগস্ট)

১৩। নর্ম্যাণ্ডিতে অবতরণ অভিযান (১৯৪৪ সালের ৬-৩০ জুন)

১৪। ১৯৪৪ সালের জুন-ডিসেম্বরে পশ্চিম ইউরোপে সামরিক ক্রিয়াকলাপ

১৫। বল্টিক উপকূলে জার্মান-ফ্যাসিস্ট ফৌজের পরাজয় (১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর)

১৬। (ক) আর্দেন অপারেশন (১৯৪৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর-১৯৪৫ সালের ২৫ জানুয়ারি)

(খ) অ্যালসেস অপারেশন (১৯৪৫ সালের ১-২৭ জানুয়ারি)

১৭। ১৯৪৫ সালের জানুয়ারি-মে মাসে ইউরোপে সামরিক ক্রিয়াকলাপ। ফ্যাসিস্ট জার্মানির আত্মসমর্পণ

১৮। বার্লিন অপারেশন (১৯৪৫ সালের এপ্রিল-মে)

১৯। সোভিয়েত ফৌজ কর্তৃক মুক্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের, পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের দেশসমূহের ভূখণ্ড

২০। ১৯৪৩-১৯৪৫ সালে প্রশান্ত মহাসাগরে এবং এশিয়ায় সামরিক ক্রিয়াকলাপ

২১। সমরবাদী জাপানের কুয়াণ্টুং বাহিনীর পরাজয়

নকশা-মানচিত্রের সংকেতের অর্থ

(অস্ট্রে) — অস্ট্রেলিয়া
(ই) — ইতালি
(ওল) — ওলন্দাজ
(কা) — কানাডা
(গ্রী) — গ্রীস
(জা) — জার্মানি
(জাপ) — জাপান
(দ আ) — দক্ষিণ আফ্রিকা
(নি জি) — নিউ জিল্যান্ড
(পোল) — পোল্যান্ড
(ফ) — ফ্রান্স
(ফি) — ফিনল্যান্ড
(বু) — বুলগেরিয়া
(বেল) — বেলজিয়াম
(ব্রি) — ব্রিটেন
(ভা) — ভারত
(মা) — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
(রু) — রুমানিয়া
(স্ক) — স্কটল্যান্ড
(হা) — হাঙ্গেরি
১ বি ব — ১ম বিমান বহর

৩ বা — ৩য় বাহিনী
ব্রি বা — ব্রিটিশ বাহিনী
১৪ ফৌ কো — ১৪শ ফৌজী কোর
৪ ট্যা গ্রু — ৪র্থ ট্যাঙ্ক গ্রুপ
১ আ বা — ১ম আক্রমণকারী বাহিনী
১ র অ কো — ১ম রক্ষী অশ্বারোহী কোর
১ মে কো — ১ম মেকানাইজ্‌ড কোর
২ মো ডি — ২য় মোটরাইজ্‌ড ডিভিশন
৪ ই ডি — ৪র্থ ইনফ্যাণ্ট্রি ডিভিশন
মোট রে-র অনু দল — মোটরসাইকেল রেজিমেণ্টের অনুসন্ধানী দল
স্টে. লজা্কি — রেলস্টেশন লজা্কি
৫ অনু দল — ৫ম অনুসন্ধানী দল
৯ সাঁ ব্রি — ৯ম সাঁজোয়া গাড়ি ও ট্যাঙ্ক ব্রিগেড
১ নৌ ব — ১ম নৌ-বহর
২ বা ইউ — ২য় বাহিনীর ইউনিটসমূহ
১ বা (হা) — ১ম বাহিনী (হাঙ্গেরি)
উপ স্বতন্ত্র বা — উপকূলবর্তী স্বতন্ত্র বাহিনী
ই-জা — ইতালীয়-জার্মান
জার্ম — জার্মানরা
মিত্র — মিত্রদের সৈন্য বাহিনী
অনুপ — অনুপাত
৫০ কম — ৫০ কিলোমিটার
৩০০ মি — ৩০০ মিটার
২ স্ব ফৌ কো — ২য় স্বতন্ত্র ফৌজী কোর
১ প্যা বা — ১ম প্যারাশুট বাহিনী
৫ ল্যা ডি — ৫ম ল্যাণ্ডিং ডিভিশন
৫ ট্যা বা ইউনিট — ৫ম ট্যাঙ্ক বাহিনীর আলাদা ইউনিটসমূহ
৪ ইউ ফ্র — ৪র্থ ইউক্রেনীয় ফ্রণ্ট
৭ র অ কো — ৭ম রক্ষী অশ্বারোহী কোর
৩ আ বা — ৩য় আক্রমণকারী বাহিনী
১ বা ইউনিট (মা) — ১ম বাহিনীর ইউনিটসমূহ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)
৫ নৌ ব, ৭ বি বা — ৫ম নৌ-বহর, ৭ম বিমান বাহিনী

যু গণ ফৌ — যুগোস্লাভিয়ার গণমুক্তি বাহিনী
চী গণ বা ইউনিট — চীনা গণমুক্তি বাহিনীর ইউনিটসমূহ
অ-মে গ্রুপ — অশ্বারোহী-মেকানাইজড গ্রুপ
৮ ব্রি বা — ৮ম ব্রিটিশ বাহিনী

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
১৭, জুবোভ্স্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers,
17, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union

প্রগতি প্রকাশন

প্রকাশিত হল

ভ. চুইকোভ। 'তৃতীয় রাইখের অবসান'

বিখ্যাত সোভিয়েত সেনাপতি সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল ভাসিলি চুইকোভ রাশিয়ার গৃহযুদ্ধে (১৯১৮-১৯২০) ও ফাশিস্ত জার্মানির বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধ (১৯৪১-১৯৪৫) সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। জার্মান ফাশিস্ত হানাদারদের সঙ্গে সংগ্রামের বছরগুলিতে ভাসিলি চুইকোভ ৬২তম বাহিনীর অধিনায়কত্ব করেন (১৯৪৩ সালে তা পুনর্গঠিত হয়ে ৯ম গার্ডস বাহিনী নামে পরিচিত হয়)। স্তালিনগ্রাদের প্রতিরক্ষায় এই বাহিনী এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে এবং লড়াই করতে করতে ভোল্‌গার তীর থেকে বার্লিনে গিয়ে পেশছয়।

চুইকোভ যুদ্ধের শেষ কয়েক সালের রণনীতিগত ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেছেন, বার্লিন গ্যারিসন ও জার্মানির সশস্ত্র বাহিনীর আত্মসমর্পণ সম্পর্কে নাৎসি সেনাপতিমণ্ডলীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার বর্ণনা দিয়েছেন।

সাধারণ পাঠকের উপভোগ্য এই বইটিতে প্রচুর ফটো ও নকশা আছে।

প্রগতি প্রকাশন

প্রকাশিত হল

ক. রকোস্‌সভ্‌স্কি। 'সৈনিকের ব্রত'

খ্যাতনামা সোভিয়েত সামরিক নেতা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল, কনস্তান্তিন রকোস্‌সভ্‌স্কি এই বইতে দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের (১৯৪১-১৯৪৫) ঘটনাগুলির স্মৃতিচারণ করেছেন। এই যুদ্ধে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন।

যুদ্ধের প্রারম্ভিক পর্যায়ে সোভিয়েত সীমান্তে, তার পরে মস্কো, স্তালিনগ্রাদ ও কুর্স্কের কাছে, শত্রুর প্রবল আক্রমণ উপেক্ষা করে নীপার নদী পার হওয়ার সময়ে, বেলোরুশিয়া ও ওয়ারশ মুক্ত করার সময়ে, এবং সব শেষে পূর্ব প্রাশিয়া, পমেরানিয়া ও বার্লিন অভিমুখে যাত্রার সময়ে কনস্তান্তিন রকোস্‌সভ্‌স্কির অধিনায়কত্বে সৈন্যদের সামরিক তৎপরতাগুলি এই বইতে বর্ণিত হয়েছে। এক পরস্পরবিরোধী ও গতিশীল পরিস্থিতিতে সৈন্য নিয়ন্ত্রণের জটিল প্রক্রিয়ার বর্ণনাও পাঠক এই বইতে পাবেন। সাধারণ সদরদপ্তরের সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীর কাজের পদ্ধতি সম্পর্কেও পাঠক একটা ধারণা করতে পারবেন।

প্রগতি প্রকাশন

প্রকাশিতব্য

রীড জন। 'দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন'

লেখক ও সাংবাদিক জন রীড (১৮৮৭-১৯২০) ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এই বইটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯১৯ সালে আর সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯২৩ সালে রুশ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। তার পর থেকে এটির পুনর্মুদ্রণ হয়েছে বহুবার।

অক্টোবর বিপ্লবের প্রথম ক'দিনের প্রাণবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন লেখক — রীড যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন পাঠকও যেন তা মনশ্চক্ষে দেখতে পান। ব্যাপক জনসাধারণের ইতিহাস-সৃষ্টিকারী কাজকর্ম ও লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টির বিরাট ভূমিকাও বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে।

মানবজাতির ইতিহাসে নবযুগ প্রবর্তক রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে সারা পৃথিবীকে যে গ্রন্থে সত্য ঘটনা জানানো হয়েছিল জন রীডের বইটি ছিল সেই প্রথম সাহিত্যকর্ম।

এই গ্রন্থের পঞ্চম বাংলা সংস্করণটি অচিরেই প্রকাশিত হবে।